প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রকাশক : রথীন্দ্রকুমার পালিত
পাবলিকেশন্‌স্ অফিসার
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

প্রচ্ছদ : গণেশ বসু

মুদ্রক : শ্রীকালীচরণ পাল, নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আমার সহধর্মিণী

শ্রীমতী আলেয়া দেবীর

করকমলে

সাদর উপহার

পূর্ব পীঠিকা

বাল্যকালে ইস্কুলে ষষ্ঠশ্রেণীতে অবশ্যপাঠ্য দ্বিতীয় ভাষারূপে পার্সী নির্বাচন ক'রে বিপাকে পড়েছিলাম। শুধু একদিনের আলিফ, বে, পে, তে, সে বর্ণমালার সাক্ষাৎ দর্শন এবং শ্রবণ আমাদের গৃহে বিসুবিয়াসের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আমাদের হিতৈষী পণ্ডিত মহাশয়ের অভিযোগে ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত হ'য়েছিলেন; কারণ অপরিণাম-দর্শী বালকের এই অবিমৃষ্য নির্বাচন নাকি আমাদের বংশ-পরম্পরাগত ঐতিহ্যের সর্বনাশ সাধন করবে। বিধর্মীর ভাষা সুনিশ্চিতভাবে কৌলাচারের মূলে কুঠারাঘাত ক'রে থাকে; তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ডিগ্রীধারী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন দাদা সেদিন বুঝলেন না, তিনি স্বয়ং জীবিকার্থে আদালতে নিত্য বিদেশীভাষায় সওয়াল জবাব করে থাকেন এবং ইংরেজরা নিশ্চিতই বিধর্মী। আমার দোষটা কোথায়? অবশ্যই সেকালে আমার এই কূটতার্কিক বুদ্ধির উন্মেষও হয়নি, হ'লেও বড়র সঙ্গে সেকালে তর্ক চলতো না; কিন্তু বেশি বিলম্ব ঘটলো না। দু এক বছরের মধ্যেই দেখলাম জার্মান ভাষা আমাদের পরিবারের সকলকেই আক্রমণ ক'রে বসেছে। আমার উত্তর পুরুষেরা এখন, ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে, জার্মান ও ফরাসীতে প্রাবীণ্য অর্জন ক'রে চলেছে। কেউ কেউ এই দুই ভাষায় দ্রুত-ভাষণে আমাকে মুগ্ধ করে। মন্দভাগ্য আমারই শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দক্ষিণ-বামাচারের প্রশ্ন উঠেছিল। বলা বাহুল্য দেবভাষা সংস্কৃতই আমাকে তার পবিত্র চত্বরে টেনে নিয়েছিল। এখন বুঝি ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়নি। আমার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও পার্সী পরস্পরের বলাধান করেছে। দুটোই সমমূল ভাষা—ইন্দোয়ুরোপীয় হচ্ছে সেই আদিমূল। সমমূল বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণ সুবিদিত।

ভোজের শেষে পয়ঃপরমান্ন আসে। তাতে পেস্তা বাদাম কিশমিশ বেমানান হয় না—স্বাদ বাড়ায়। আর ভোজমধ্যে কালিয়া কোর্মা ভোজনকে

মহাতোজব করে তোলে। দুটোকে মিলিয়ে আমি উত্তর জীবনে অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদগন্ধ পেয়েছি! হাঁ, আমার বিদেশী ভাষার প্রথম শিক্ষা-গুরুর এই বিধর্মী বিদ্যার্থী লাভের দিনটি বেশ মনে আছে। এক শুভ অপরাহ্নে তিনি দাদার সম্মুখেই একখানা 'ফার্সীকী পহলী কিতাব' আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে গেলেন—মাঝে মাঝে আসব, তালিম নেবে। দাদার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আদাব আরজ করছি।' —বলেছি তখন বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। দাদার মুখে স্মিতহাসি। আমার প্রথম পার্সী শিক্ষক ইনি—নাম ছিল মুহ.ম্মদ ফিরোজ্ আহ.মদ। পরে বুঝেছি নামের মহিমা তাঁর ছিল। ফিরোজ বিশেষ্য, মানে আলো। আহ.মদ বিশেষণ, মানে প্রশংসাযোগ্য। বিশেষ্য বিশেষণের বিপর্যয়ের রীতিটি ইংরেজী-বাংলার বিপরীত। এদিকে আরবী, পার্সী, ফরাসী মিতালি ক'রে চলে—আগে বসে বিশেষ্য, পরে বসে বিশেষণ। আমি এই ভাষার তারিফ যোগ্য উচ্চারণের আলো পেয়েছিলাম আমার এই ওস্তাদের কাছে—আমার মেহেরবান মু'আল্লেম্। আমার সাফ জবানের তিনি খুব প্রশংসা করতেন। এই কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ ক'রে আমি তাঁর স্মৃতি তর্পণ করছি। প্রবেশিকায় উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্র শিক্ষকের ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল। মনে হয় এই ভাষা প্রেমটা মনের গভীরতম অংশে মুদ্রিত হ'য়ে ছিল। প্রবেশিকার উত্তরযুগে কলেজে অধ্যয়নকালে সবই প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। তখন ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, চার দিক থেকে আমার কেশাকর্ষণ ক'রে চলেছে। ঘাড় ফেরাব কোন দিকে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সকলের আশানুরূপ ফল করতে হবে তো!

মধ্যজীবনের উন্মেষ কাল পর্যন্ত আমি ঢাকায় জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক (১৯৩৫-১৯৪৭)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর মুহ.ম্মদ শহীদুল্লাহ্.র স্বল্পায়ু প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলাম। ঢাকা উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের এক সভায় তিনি নিজে থেকে আমার করমর্দন ক'রে বলেছিলেন—'আপনি আমার ছেলে সফী উল্লাহ্.র ভক্তিভাজন অধ্যাপক; আপনি আমার সঙ্গে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারেন।' সলজ্জভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁর হাত ধরেই কৃতার্থের আনন্দ নীরবে জ্ঞাপন করলাম। আজ তিনি জন্নতবাসী। এই বহুভাষাবিৎ অধ্যাপককে আমার এই পরিক্রমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সানুনাসিক উচ্চারণ-ভঙ্গিমা ফরাসী ভাষাকে অত্যন্ত সজীব ক'রে তুলতো; মনে হ'তো আমি কোন জাত-ফরাসীর মুখে ফরাসী শুনছি। সখ্য-সম্বন্ধের দুরতিক্রম অন্তরায় ছিল আমাদের বয়স; তবু কেন যেন তিনি আমাকে প্রায় বয়স্য ক'রে তুলেছিলেন। তাঁর সুসজ্জিত পাঠাগারে তিনি সমাসীন। তখন তিনি 'সলিম উল্লা' হলে'র অধ্যক্ষ (Provost)। দুজনে পাশাপাশি বসে ঋগ্‌বেদের পুরুরবা-উর্বশী সংবাদ আলোচনা করছি। তিনি সোল্লাসে বললেন—'এই দেখুন ঋষিরা মেয়েদের ঠিক চিনে ফেলেছিলেন। —"ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালা-বৃকাণাং হৃদয়ান্যেতাঃ"—১০।৯৫।১৫। বুঝেছেন, নারীর সঙ্গে মিতালি নৈব নৈব চ। ওদের হৃদয় অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সালাবৃক—মানে হিংস্র নেকড়ে বাঘের হৃদয় ওদের' এই বলেই উচ্চহাসি। আমি এখনও সে হাসির আওয়াজ শুনি। তারপর চললো 'সালাবৃক' শব্দের পাঁচ খোলা। সালাও যা' শালাও তাই। সালা আবার শালবন। তারপর বোঝালেন বৈদিক যুগের 'র' 'ল' 'শ', 'স' ধ্বনিগুলির পরিবর্তন-রীতি, ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা শেষে মুখে স্মিতহাসি। বললেন—'শালবনের বৈয়াঘ্র গোত্রারাই তো বধূ হয়ে শালা বা গৃহবাসিনী হন। স্বভাব যাবে কোথায়? ওই আমাদের সেই কথাই রইলো—দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?' তাঁর উচ্চারণে বেশ পরিশীলিত এবং মার্জিত দেবভাষার ভঙ্গিমা। চোখবুজে খানিকক্ষণ ভাবছিলাম। সংস্কৃত নিয়ে সসম্মানে (with Honours) উত্তীর্ণ এঁকেই না কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে সংস্কৃত ছেড়ে দিতে হয়েছিল! তখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বেদ পড়ান। তিনি কিছুতেই কোন বিধর্মীকে বেদ পড়াবেন না। স্যার আশুতোষ তখন উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন।—'ইতো ব্যাঘ্রস্ততস্তটী' একদিকে বাঘ, অন্যদিকে তটের নীচে অগাধ জল। যাবেন তিনি কোন দিকে? একদিকে দৃঢ়সঙ্কল্প পণ্ডিতের পদত্যাগ, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বজনীন শিক্ষার অধিকার। আশুতোষ শহীদুল্লাহ্‌কে সস্নেহে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন-খোলা বিভাগের ছাত্র হ'য়ে যাও—বিভাগের নাম "তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব"। গ্রীক, লাতীন, প্রাচীন পার্সীর সঙ্গে বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করতে পারবে।' তাই শহীদুল্লাহ্‌

ক'রেছিলেন। আমাদের শিক্ষাগুরু সুনীতিকুমার তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ শহীদুল্লাহ্‌র নাম আমাদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতেন।

প্রায় ভুলে যাওয়া পার্সী ভাষা ও সাহিত্যের সেবা নতুন ক'রে শুরু হ'লো ঢাকায় এই বহু ভাষাবিৎ অধ্যাপকের কাছে। তখন আমার পড়তে হয়েছিল একখানা উপাদেয় পার্সী সাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ—বরকত্‌ উল্লা সাহেবের "পারস্য প্রতিভা"। আজ ভাবি, বড় উপভোগ্য দৃশ্য হতো সেটা। প্রায় রবিবার বিকেলেই সেই ঘটনা ঘটতো। এক যবন পণ্ডিত সংস্কৃত দর্শনের সঙ্গে তৌলন পন্থায় ওমর, জালাল, হাফিজ. আলোচনা করে চলেছেন, আর তাঁরই সম্মুখে এক কাফের স্কন্ধে উপবীত ধারণ ক'রে তাঁর হাতে দেওয়া দিলখুশ শরবৎ আকণ্ঠ পান করে চলেছে। একদা তিনি তাঁর উপদেশের অমোঘ কুঞ্চিকা আমার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিলেন। 'তুমি আরবী পার্সী আর কিছু তুর্কী শব্দ ভাণ্ডারে প্রবেশ কর, অভিধান তোমাকে পথ দেখাবে। তোমার সর্বদা সঙ্গী থাকবে একখানা 'আমদনামা', যাকে সংস্কৃতে বলা চলে ধাতুরূপ কল্পদ্রুম। শব্দরূপে পার্সী অত্যন্ত সহজ; শুধু কতগুলো উপসর্গ (Preposition) এবং অনুসর্গ (Postposition) জানা থাকলেই যথেষ্ট। সঙ্কেত পেয়ে দেখলাম পার্সী সংস্কৃত থেকে কত সহজসাধ্য! জানার পিপাসা ছিল এবং কখনো রণে ভঙ্গ দিইনি। জীবনের প্রশস্ত রণাঙ্গনে মৃতের মত বাঁচায় কি লাভ? এ সত্যটা বুঝেছিলাম। 'মুরদৌকী তরহ্‌ জীয়ে তো ক্যা খা.ক জীয়ে'! কারণ, তাদের তো সুবহ্‌ হোতী হৈ, শাম হোতী হৈ, জিন্দগী ইয়ুন তমাম হোতী হৈ।—দিন যায়, রাত আসে, নিদ্রার আঁধার নামে। বয়স গড়িয়ে চলে বৃথা। আমি ডক্টর সাহেবের সাদর নির্দেশ তড়ি ঘড়ি পালন করেছিলাম। আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে নানা ভাষার মূল্যবান অভিধান আর ব্যাকরণ প্রধান অংশ জুড়ে আছে। রণ-ভঙ্গে অনভ্যস্ত ১৯৪৭ সালে বাস্তুত্যাগী হ'লো নানা চিন্তায়। পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে ইরানী সাহিত্য ও উর্দু সাহিত্যের অনুশীলন অব্যাহত রেখে চলেছিলাম। এই সময় ডক্টর হরেন্দ্র চন্দ্র পাল লিখিত পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস ও উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস এই নিত্যযাত্রী অধ্যাপকের নিত্যসঙ্গী। অধ্যাপক পাল আমার বন্ধু হয়েছিলেন; কিন্তু নিবাসের দূরত্ব নিবন্ধন আমরা

আশানুরূপ ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। যতটুকু পেয়েছিলাম তার ঋণ স্বীকার করছি।

বিধাতার অদৃষ্টপূর্ব বিধান অনেক সময় অভাবিত বর নিয়ে আসে। কলকাতা বাসকালে আমার কাছে শুধু একটি মানুষের জন্যই পার্কসার্কাস মহাতীর্থে পরিণত হয়েছিল। পারস্য সাহিত্যের সূফী কবিদের যুগ যে কোন সাহিত্য রসিককে উতলা করে তোলে—আমাকেও ভুলেছিল। সামান্য একটু অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে আলোতে আলোময় ক'রে তোলার কৌশল জানতেন কবি পররেজ. সাহিদী। এঁকে আমি তখন সাহিত্য-গুরু ক'রে গ্রহণ ক'রেছিলাম। ডক্টর সাহিদী ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু-ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যক্ষ। সব্যসাচীর মত তাঁর পার্সী ও উর্দু সাহিত্যে সমান দক্ষতা। তিনি আজ মরহুম মগফুর। অবিস্মরণীয় হ'য়ে আছে তাঁর ভাবমূর্তি। কেন জানিনে, তাঁকে দেখলে আমার রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু বিহারীলালের কথা মনে পড়তো। যেন সেই ভাব-ভোলা মূর্তি কানে কানে বলছে—

এ ভুল প্রাণের ভুল
মর্মে বিজড়িত মূল—
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী।
এ এক নেশার ভুল
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী॥

কবির সঙ্গে আমার বৈঠক হ'তো প্রায়ই সন্ধ্যার পর—কচিৎ রবিবার সকালে। একদিন তাঁরই একটি শে'র আবৃত্তি ক'রে আকাশে তাঁর সাকী ও শরাবের রহস্য উন্মুক্ত করলেন। বললেন, দেখছেন না, নীল আকাশে সাকী চাঁদের পাত্রখানা উল্টে ফেলেছে—শরাব সব উছলে প'ড়ে তারা হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

অব রঙ্ নহীঁ রাতকা কালা সাকী।
হৈ নূরসে পুর চান্দ্ কা পিয়ালা সাকী।
তারা বনকর চটক্ গয়ী বুন্দীন্।
সাগির তো নহীঁ, তুনে উছালা সাকী॥

কবির চোখ ভাবে ঢুলু ঢুলু। আমি বললাম, চাঁদের শূন্য পাত্র নূরসে পুর। কবি! আমাকে তার থেকে একটু আলোর ঝলক দিন। পার্সী সাহিত্যের

বিস্তৃত প্রামাণিক ইতিহাস ইংরেজী ভাষায় চাই। কবি চোখ বুজেই বললেন—Literary History of Persia—E. G. Browne. আমি ভাষাটাকে ঘষে মেজে চকচকে করতে তখন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের School of Languages-এর ছাত্র। ডক্টর শিবলী আমাদের পার্সী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। আমার সতীর্থ ছিলেন ১০।১২ জন ইসলামী ইতিহাসের গবেষক। একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিতও আমাদের সঙ্গে কিছুদিন পড়েছিলেন। দীর্ঘ কয়েক বৎসর Browne পড়ে আমার পরিক্রমাকে সার্থক করেছি। এতেও আমার পিপাসা মেটেনি। ইতিহাস অংশে Browne অতুলনীয়; কিন্তু তাঁর রস সংবেদন সুষ্ঠু নয়। এইজন্য খুব বড় বড় কবি সম্বন্ধে (ফেরদৌসী এক উদাহরণ) তাঁর মন্তব্য তর্কাতীত নয়। আর একদিকে এই মহাগ্রন্থ অপূর্ণ। Browne হিন্দুকুশ অতিক্রম ক'রে ভারতে ঢুকলেন না। তিনি বলছেন—আর আমি এগোব না। যাত্রা এখানেই শেষ; কারণ আমি লিখলাম পারস্য দেশের পার্সী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ভারতে তার ছায়াপাত আমার দ্রষ্টব্য নয়। এই মহাপণ্ডিত কিন্তু জানতেন মুঘল যুগে ইরান ছেড়ে দলে দলে কবিরা ভারতে এসেছেন। তার পূর্বে সুলতানী যুগেও ভারতে রাজভাষা ছিল পার্সী এবং ভারতে রীতিমত পার্সী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন চলেছিল। ইরানে বসে হাফিজ শীরাজী সানন্দে বলছেন—আমার আজ খুশীর সীমা নেই। শুনেছি ভারতের কলকণ্ঠ শুকরা (কবিরা) আমার মিছরীর দানা ভাঙতে শুরু ক'রেছে। Browne কি অনুভব করলেন না। বাবরের রক্তধারায় সকলেই কবি? স্বয়ং বাবর উঁচুদরের কবি, পণ্ডিত হুমায়ূনও কবি। এমন কি নিরক্ষর শাহ্ আকবরও কবি-ভাবে বিভোর। আকবরের সভা থেকে আরম্ভ ক'রে শেষ মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজসভা পর্যন্ত সকল সভাই কবিতায়, রসসমীক্ষায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সমালোচনায় এবং সঙ্গীতে গম গম ক'রে উঠতো।

মুঘল যুগের পার্সী গীতি কবিতার ছোট্ট একখানি ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থ আমাকে দিয়ে মৌলানা আজাদ কলেজের পার্সী বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর আবদুস্ সোভান আমার প্রভূত উপকার করেছিলেন। বহুশ্রম স্বীকার করে আমি কিছু কিছু মূল পার্সী রচনা সংগ্রহ ক'রে সেই বই কাজে লাগিয়েছিলাম। এই গ্রন্থের প্রায় এক চতুর্থাংশ প্রবন্ধ ক্রমশ প্রকাশ ক'রে আলেখ্য

সম্পাদক অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্র ঘোষাল আমাকে তাঁর নিবিড় স্নেহপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার পরিক্রমায় মুঘলযুগের অংশ পড়ে পড়ে শুনিয়েছি একদা যদুনাথ সরকারের ছাত্র অধুনা ইস্‌লামিক ইতিহাসের মহাপণ্ডিত ডক্টর জগদীশনারায়ণ সরকারকে। তাঁর গ্রন্থাগারে পাঠনিরত আপন-ভোলা নির্বিকারচিত্ত অধ্যাপকটিকে আমার চোখে আমি ঋষির মত দেখেছি। আমি তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করতে পেরেছি অনুভব ক'রে নিজেকে ক্ষণে ক্ষণে ধন্য মনে করেছি।

সর্বশেষে একজন আত্মীয়ের কথা না বললে আমি প্রত্যবায়-গ্রস্ত হ'ব। এ মানুষটি তখন অবসরপ্রাপ্ত এবং বৃদ্ধ। এঁর নাম কিশোরীমোহন মৈত্র। এঁর সেকালের গুরু ছিলেন হরিনাথ দে, যাঁর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। আমাদের টালীগঞ্জ বাসভবনের অনতিদূরেই কিশোরীবাবু থাকতেন। সম্বন্ধও আবিষ্কৃত হ'লো; অতিরহৎ মানুষটি এই ক্ষুদ্রের বৈবাহিক। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ কোনদিনই দুর্লভ নয়। গুরু হরিনাথের নির্দেশে সেই যুগে তিনি দুটো ভাষা ও সাহিত্যে এম্ এ ডিগ্রী নিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সে দুটি ভাষা—আরবী এবং পার্সী। তাঁর কর্মস্থল হয় লাহোর। তাঁর সারাজীবন কাটে লাহোর কলেজে ঐ দুটি ভাষারই অধ্যাপকরূপে। আমি দেখেছি পাঞ্জাবী ও পুশতো ভাষা তিনি বলে চলতেন সিংহবিক্রমে—বায়ুস্তর বিকম্পিত ক'রে দিয়ে। উর্দু তাঁর মাতৃভাষা বাংলার চেয়েও উজ্বল হ'য়ে ছুটতো। বৈবাহিক আমাকে শক্ত ক'রে ধরলেন, বা বলা চলে আমি ধরা দিয়ে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করলাম। বেহেশ্‌ত্ তখন যেন আমার হাতের মুঠোয়। তাঁর পড়ার ঘরে বসেই তাঁর মধুঝরা আবৃত্তি শুনে আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত হ'লো—

"অগর ফেরদৌস বর্ রু-এ-জমীনস্ত্।
হম ইনস্ত্, হম ইনস্ত্ রো হম ইনস্ত্।"

ভূতলে যদি স্বর্গ থাকে সব এইখানে, এইখানে, এইখানে—বলেই আপন বক্ষে তর্জনীসঙ্কেত করলাম। তিনি বললেন, তার মানে? উত্তর দিলাম 'আপনাকে যে এখানেই পেয়েছি নিজের ইষ্টতম 'কিমপ্যিদ্রবাম্' 'দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্'—স্বর্গের ঠিকরে পড়া এক টুকরো। বৈবাহিকের গায়ের রং ছিল যেন পরিপক্ক সফরী কদলী বা মর্তমান কলা। তাঁর মুখ লজ্জায়

তখন দুখে আলতায় হ'য়ে উঠলো। কথাটার মোড় ঘুরিয়ে তিনি বললেন—'সব ওই দিল দিয়েই বুঝে নিও। দিল খুশ তো সব খুশ। দিলখুশ হ'লে তাজমহল তাজমহল—নৈলে একগাদা পাথর। স্বপ্নের জিনিসকে স্বপ্নের রং মাখিয়ে দেখো। দেখা স্পষ্ট হ'লে তাকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করবে। ছন্দের ঘুঙুরের আওয়াজ ছন্দের ঘুঙুরেই তুলবে—গানাকা জবাব গানামেঁ দেনা চাহিএ।' আমি আজও তাঁর আদেশ পালন ক'রে চলেছি। তিনি আজ বহুদিন আমাকে ছেড়ে তাঁর সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেছেন। এক প্রভাতে গিয়ে দেখি, মৈত্র মহাশয় মুক্ত পদ্মাসনে ব'সে ঈশোপনিষৎ পাঠ করছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্' তিনি তাঁর মন-গড়া অর্থ শোনালেন—কারও ধনে লোভ ক'রো না। আপন সম্পদ্ দিয়ে-থুয়ে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে যাও। তোমার সম্পদ দিয়ে (১) প্রয়োজন, (২) আরাম, (৩) বিলাস—সব ক্রয় ক'রে যাও, ভোগ কর; নৈলে তোমার সম্পদ পরের হাতে পড়বে। 'ধনং কস্য চিৎ' তখন সে আর তোমার থাকবে না। সম্পত্তি বিনষ্ট হয় না, শুধু হাত বদলায়। একটি প্রাচীন চীনা ode মনে ছিল আমি বৃদ্ধের অভিনব pragmatic ব্যাখ্যার অনুকূলে আবৃত্তি করলাম…

> 'You have wine and food.
> Why not play daily on your lute?
> By and by you will die
> And another will take your place.

বৃদ্ধ সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন—There you are.

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম। উপনিষদ্ তো পড়ছেন। সর্বোপনিষৎ-সার শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রপত্তিযোগ বা আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে সূফীদের ফানা বা আত্মোৎসর্গে আত্মসংহার মিলিয়ে নেবেন, দেখবেন স্বাদ-গন্ধে তফাৎ নেই। 'সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' যা, 'জব ব্রাসি.লকো খ্বাহীশ্ হো তব হাস্তীকো ফানা করনা'। ওই একই কথা। মিলন বাসনা যদি জাগে মনে, নিজেকে দেবে। কোরান শরীফ থেকে আমার অপটু আরবী উচ্চারণে কিছু আবৃত্তি ক'রেছিলাম। তার মর্ম—'তোমরা আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাবে (১০।৫'। আমার শুভাশুভ কর্মফলদাতা

একমাত্র আল্লাহ্। আমার উপর আদেশ—যাঁরা আত্মসমর্পণ করে তাঁদের শামিল হও (১০।৭৩)।

আমার অনভ্যস্ত আরবী উচ্চারণেও বিজ্ঞ মনীষী বিরক্ত হ'লেন না। তাঁর চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তিনি বললেন—ঠিকই বলেছ, কোন বিরোধ নেই। আমাদের গুরুমস্তিষ্ক যখন এই তত্ত্বটি বুঝতে পারবে, তখন সব বোঝা হয়ে যাবে। অধ্যাপক মৈত্র কয়েক বছর আমাকে জীবন-রসায়নে উজ্জীবিত করে রেখেছিলেন। মনে হয় আমার মনোজগতে এক rejuvenation ঘটে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হয়, আমি কি তাঁর হাতে অমৃত পান করতাম—ইরানীরা যাকে বলত "আব-ই-হয়াত্"? ওই সময় আমি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ক'রেও আমার ঈপ্সিত কর্ম নিয়ে তন্ময় হ'য়েছিলাম। সে কথা কে জানে? আমার অন্তর্যামী জানেন, যিনি 'স্বরূপে অতিসূক্ষ্মমদর্শনম্ স্থিতং সর্বশরীরেষু সাক্ষিরূপমদর্শনম্'—আর কেউ নয়।

আনন্দরূপম্ অমৃতং আমার কাছে রসরূপে ঝলকে ঝলকে বারংবার দেখা দিয়েছে ব'লেই আমার দীর্ঘজীবনটা এতদূর টেনে আনতে পেরেছি। আমি স্বীকার করব, আমার কৈশোরের প্রেমময়ী যে আমারই মধ্যে আমি হ'য়েছিল তা' বুঝতে একটু দেরী হ'য়েছিল। যেদিন সত্যটা ধরা দিল সেইদিনই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অস্ফুটস্বরে মনে মনে কথা বললাম—

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা র'য়েছো নীরব শয়ন' পরে—
প্রিয়তম হে! জাগো জাগো জাগো॥

আমার পরিক্রমার প্রতিটি কেন্দ্রে আমি তাকেই অনুভব ক'রেছি। তার ঘোমটা সে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়েছে। আমি তাকে সকলের সম্মুখে আজ জাহির ক'রে ধন্য হচ্ছি। বাহির থেকে পুরস্কার ও তিরস্কার আমার উপর সমানবেগেই বর্ষিত হ'য়েছে। বেদ-বেদান্ত যাঁদের বিদ্যাস্থানে নিষ্কলুষ হ'য়ে বিরাজমান, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষের বাণী যাঁদের রসনাগ্র নর্তকী—তাঁরা এই স্খলৎপাদ সতীর্থ ও সহকর্মীর জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ ক'রেছেন। আমি কিন্তু তখন দেখে চ'লেছি আমার একদা স্বীকৃতা, দীর্ঘকাল অনাদৃতাকে। তার পরিপূর্ণ উচ্ছল যৌবনের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তখন বলছি, "তুমি

শ্রী ? তুমি এত সুন্দরী !" যদি আবার দেখাই দিলে, তবে অনুগ্রহ ক'রে তোমার সৌন্দর্যের প্রভামণ্ডল একবার নয়নগোচর করাও।—"জমালত্ হা-এ-হুসনত্ রা রসীদন্ আরজু. দারম্।" ফেরদৌসী, হাফিজ., জলাল, জামীর রং নিয়ে তোমার জমালত্—তোমার প্রভামণ্ডল তৈরী ক'রে তুলে ধরো। আমি প্রাণভ'রে তাই দেখি।

যিনি বিশ্বাতিগ থেকেও বিশ্বানুগ শক্তিতে আমাদের দিয়ে প্রাণের ঢেউ তুলেছেন, তাঁর শেষ আহ্বান আসার মুহূর্তে আমার চিৎশক্তি যদি সচল থাকে, তবে এই প্রার্থনা করব—আমাকে দিয়ে যদি তুমি নতুন খেলা খেল তবে প্রকাশাত্মযতির বিম্বপ্রতিবিম্ব বিবরণের সঙ্গে শেখ অত্তারের বিহঙ্গ-সংবাদ নামক আত্মদর্শনের রূপক-গ্রন্থখানা (মূনতি. কু.ৎত.য়র) আমার হাতে দিও। ওমর চিৎশক্তির রূপান্তরসিদ্ধি বা Metamorphosis-এ আস্থাবান ছিলেন। সাতত্যে'র (Continuity) অত্যান্ত ধ্বংস তিনি বিশ্বাস করতেন না বলেই তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলেন—আমার জীর্ণ কঙ্কালের মাটি দিয়ে নতুন পাত্র গড়ে আমার হাতে দিও প্রভু। জানি, খৈয়ামবংশের ওমর তোমারই আদেশে তখন আর এক ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে তার নতুন খেলা শুরু করবে।

মধ্য এশিয়ার কোন কোন দেহতত্ত্ববিৎ দার্শনিক জীবন-রহস্যের বৈজ্ঞানিক দিক অনুসন্ধান ক'রেছিলেন এবং ব্যাধি ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে আবু-আলী-বিন সীনা (সংক্ষিপ্ত রূপ ইবন্ সীনা, ফেরেঙ্গী উচ্চারণে অভিচেন্না) এবং তাঁর রচিত "শিফা" বা রোগ ও প্রতিকার নামক গ্রন্থখানা উল্লেখযোগ্য। ওমর তাঁর জীবনের শেষ কয়টা দিন এই গ্রন্থ খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন। হাঁ, ওই সার্বভৌম জ্ঞানী বা হ.কীমরা বলেছেন—মানব দেহের অন্তর্বহা ও বহির্বহা রক্তধারা নাড়ীতন্ত্রীকে প্রতিনিয়ত স্পন্দিত করায় যে জীবন-স্রোতের খেলা চলেছে আসলে সে মহাজীবনেরই এক ক্ষণিক প্রকাশ। প্রতিদিনের নিদ্রা যেমন মৃত্যুর টুকরো টুকরো ইশ্‌তিহার, প্রাত্যহিক জীবন সঞ্চালন তেমনি অদৃশ্য অনন্ত চিৎশক্তিরই দৈনন্দিন বিজ্ঞাপন মাত্র। কিন্তু একটা কথা, যে আধারে খণ্ড চৈতন্যের দৈনন্দিন খেলা চলছে সেই দেহ এবং দেহধর্মগুলি কদাচ তুচ্ছ নয়। এ কথা ঠিক, এই দেহ-তট কালেরই ধর্মে মহাসমুদ্রের আঘাতে বা হাতছানিতে ধ্বসে

পড়বে। ওমর বলেন, তাতে ক্ষতি কি? সেদিন ভয়ে কাঁপব না। তোমার আঁচল ধরে অভিমানে বলতে পারি 'এর প্রয়োজন কি ছিল?' ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখে সবটুকু মিটিয়ে যাব। দুঃখ নেই, হারায় না তো কিছুই—শুধু রূপান্তরের সিলসিলা। ওমর কি নাইট্রোজেন চক্রের আবর্তন বুঝেছিলেন? তিনি বলেন "চিন্তা কি? আবার চলবে আর এক খেলা।" খেলাগুলো অবশ্য প্রায় একরকম। চার দিকে অবারিত অনন্ত অসীম—তারই বুকে ঢেউএর ওঠা আর পড়া। মূলে একটা দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছাশক্তি আছেই। উপনিষদ্ বলবে, এটা তার 'ঈক্ষা' বহুরূপে বিভক্ত হওয়ার 'ঈক্ষা'। এ পৃথিবীতে কিছুই একরূপে পড়ে থাকে না। এই যে আপাত-দর্শনে অসংখ্য জড়বস্তু, তারাও চৈতন্যে স্পন্দিত। বস্তু ও চৈতন্যের স্বরূপ-ভেদ নেই, শুধু প্রকাশে বৈচিত্র্যের অবভাস। 'ধরলে পরে জ্ঞানের আলো মিশায় গিয়ে ওঙ্কারে'।

একটি কথা, পারস্য সাহিত্য ও দর্শন কিন্তু এই ভোগের উপকরণকে তুচ্ছ করেনি। কারণ, বস্তু ও চৈতন্যের রূপান্তর-সিদ্ধ ঐক্য এক পরমাশ্চর্য উপভোগ্য সূত্রবন্ধন। কিন্তু ভোগে বাধা কোথায়?

মধ্যযুগের মধ্য এশিয়ার হকীম বা সার্বভৌম আচার্যদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের দেশের তন্ত্র ও দ্বৈতাদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নেই। Arthur Avalon-এর তন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়ে এই বিষয়ের উপসংহার করি:

"To neglect or to deny the needs of the body, to think of it as something not divine, is to neglect and deny that greater life of which it is a part, and to falsify the great doctrine of the unity of all and of the ultimate identity of Matter and Spirit"—Commentary of "The Serpent Power"—ষট্চক্রনিরূপণম্ by Arthur Avalon.

প্রায় এক যুগের পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থখানার উপযুক্ত প্রকাশকের কথা ভাবতে ভাবতে অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম। বার্ধক্যের অভিশাপগুলির মধ্যে দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা এক দুরতিক্রম ব্যাধি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ আমাকে দুশ্চিন্তা-মুক্ত করেছে। যার সদিচ্ছায় এ কাজ ত্বরান্বিত হ'য়েছে তার কাছে আমার ঋণের কথা চিন্তা করলে ভাবি, ইদম্ ঋণার্ণম্।

এ ঋণ শুধু ঋণই বাড়িয়ে গেল। আমি পরম স্নেহভরে উপাচার্য শ্রীমান্ ডক্টর রমারঞ্জনকে স্মরণ করছি।

মুদ্রণ কার্যের সমগ্র ভার গ্রহণ ক'রে শ্রীরথীন্দ্র পালিত আমাকে উৎসাহে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁর দায়ের অধিক ক'রেছেন। আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ। আমি শ্রীমান্ করুণাময়ের করুণাও কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। শ্যেন-সম যার নিরীক্ষা, সেই কুশলী সংশোধক আমার জন্য পাতার পর পাতা প্রুফ দেখে বইখানাকে নির্দোষ করার চেষ্টা করেছে। আমার বই বলেই তার আগ্রহ। শ্যামানন্দ সান্যাল আমার পরম স্নেহভাজন। এবার আমাকে তার স্নেহের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়েছে। আমার প্রাক্তন ছাত্র কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উপাধ্যায় শ্রীমান্ কল্যাণীশঙ্কর ঘটক এই পুস্তকের 'নির্দেশিকা' নির্মাণ করে বইখানার অপরিহার্য অঙ্গ সংযোজন ক'রেছে। তাকেও আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অকৃপণ শ্রম জিজ্ঞাসু পাঠকের উদ্দেশে সমর্পণ করলাম। আমি 'দোলাচল চিত্তবৃত্তি'—'আপরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ-বিজ্ঞানম্'।

শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

প্রসঙ্গ—পার্সী বর্ণমালার উচ্চারণ এবং বাংলায় লিপিকরণ

প্রাচীন পার্সী ও মধ্যযুগীয় পার্সীর স্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে ইরানের ভাষা আরবী প্রভাবে বেশ খানিকটা রূপান্তর প্রাপ্ত হ'লো। শুধুমাত্র শব্দভাণ্ডার সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে যে, পার্সী তখন আরবীর নানা ধ্বনিসমূহে সমাকীর্ণ। আরব জাতির মুখে তাদের সেমীয় ভাষা ব্যঞ্জন ধ্বনিতে বহুরূপে ভূয়িষ্ঠ ও গরিষ্ঠ ছিল। যে ধ্বনিগুলি সংস্কৃত ও বাংলায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন ধ্বনিগুলির পার্সী ভাষায় ছড়াছড়ি। সব বর্ণের নিখুঁত উচ্চারণ আমাদের অনভ্যস্ত কণ্ঠে দুরুচ্চার্য। তথাপি এ বিষয়ে অবহিত না হ'লে পার্সী ভাষা তার বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারে না। বঙ্গলিপিতে সে সব রূপান্তর দুঃসাধ্য। অস্বাভাবিকতা বুঝাবার জন্য অক্ষরের নীচে বা পার্শ্বে বিন্দু বা নুকতার সাহায্যে, কোন কোন স্থলে একাধিক ধ্বনি সংযুক্ত ক'রে দুরুচ্চার্যকে যথাসম্ভব বিশুদ্ধির কাছে টেনে আনার চেষ্টা হ'য়েছে।

তেত্রিশ প্রকার ধ্বনি সমষ্টিতে পার্সী অক্ষরমালা নিবদ্ধ। এই বর্ণমালাকে সংক্ষেপে 'আলিফ্-বে' বা 'আলিফ্.বা' বলা হয়। আদ্যক্ষর দুটিই সমগ্র বর্ণমালার সূচক—যেমন শুধু সংক্ষিপ্ত 'অ আ ক খ' বললেই বাংলার স্বরসমষ্টি এবং ব্যঞ্জনসমষ্টি বোঝা যায়, ঠিক তেমনই। বিশেষ লক্ষণীয়, সংস্কৃত বা বাংলার মত পার্সী স্বরবর্ণের বাহুল্যে সজ্জিত নয়। পার্সীতে মাত্র তিনটি স্বর, তাও দীর্ঘ উচ্চারণে। তারা যথাক্রমে আলিফ=আ, ওয়াও=ও বা উ, ইয়ে=য় বা এ অথবা ঈ। এর মধ্যে ওয়াও কখনো অর্ধস্বর-অর্ধব্যঞ্জন র ইং w। ইয়েও তাই—স্বর-ব্যঞ্জন মিশ্রিত সংস্কৃতধ্বনি 'য' ইং y। হ্রস্ব স্বরগুলি বোঝান হয় সঙ্কেত চিহ্ন দিয়ে। ঐ তিনটির সঙ্কেত চিহ্ন – ֿ ـ নাম জ.বর, জে.র, পেশ। সর্বদা তাও লেখা হয় না; বুঝে নিতে হয়। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, পার্সীতে সংস্কৃত-বাংলার মতো সংবৃত 'অ' ধ্বনি নেই; উচ্চারণ সর্বদাই বিবৃত। মুখটা পুরো হা ক'রে হ্রস্ব বা দীর্ঘ আ, মুখটা বুজে অ' নয়।

ব্যঞ্জন বর্ণ বিষয়ে বলা চলে পার্সীতে কণ্ঠনালীয় খ. এবং কণ্ঠনালীয় ঘ. ছাড়া মহাপ্রাণ বর্ণ নেই। সেইজন্য বাংলা লিপিতে নুকতা দেওয়া অনাবশ্যক বলে মনে হ'য়েছে। এদের উচ্চারণ হলকী বা glottal, সংস্কৃত বা বাংলার এ রকম উচ্চারণ নেই। মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির অভাব পার্সীর আর এক বিশেষত্ব।

অনুনাসিক মীম ও নূন্ উচ্চারণে ম এবং ন আছে। এরা কখনো পূর্ণভাবে কখনো সংক্ষিপ্তভাবে উচ্চারিত হয়। দন্ত্য বর্গের 'ত' এবং শিস্‌ধ্বনির এবং তালব্য 'জ' কারের বহু বৈচিত্র্য আছে। আমরা নুকতা দিয়ে বা যুক্ত ব্যঞ্জনে তা বুঝিয়ে দিয়েছি। জ কারের বৈচিত্র্যই সর্বাধিক। কখনো 'জ' যুক্ত, কখনো আলগা যেমন ই° z। কখনো pleasure এর জ ধ্বনি. কখনো তালব্য দ এর জ এ রূপান্তরণ। আমাদের সংকেত সর্বদাই নুকতা। হ ধ্বনি সাধারণ এবং অসাধারণ-ঐ হল্‌কী বা কণ্ঠনালীয়—যাকে লেখা হ'য়েছে 'হ'।

একটি বিচিত্র ধ্বনি কণ্ঠনালী পথে বায়ুপ্রবাহকে রুদ্ধ ক'রে নীচে ঠেলে এনে উচ্চারিত হয় আ'য়েন my aunt বলতে যেমন হয়—দুটি ধ্বনি মধ্যে একটা অবরোধ। একে অবরুদ্ধ ধ্বনি বলা যায়। 'ফ' কদাচ মহাপ্রাণ স্পর্শরূপে নেই—সর্বদাই উষ্মীভূত ইংরেজী flower শব্দের—'f'।

পার্সী ভাষায় শব্দ মধ্যে কোন ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঘটাতে দুবার ব্যঞ্জনটি লেখা হয় না। দ্বিত্ব বোঝাতে শুধু ব্যঞ্জনের উপর ʷ এই চিহ্নটি দেওয়া হয়। একে বলে 'তশদিদ'। 'হমাম' শব্দের মধ্যে মা'র উপর তশদিদ্! কাজেই উচ্চারণ হবে 'হাম্মাম্'=স্নানের ঘর। আমরা বঙ্গাক্ষরে ব্যঞ্জনদুটিকে সংযুক্ত করতে বাধ্য হ'য়েছি।

এই পুস্তকে বহু বিচিত্র ধ্বনি প্রকাশ করতে বহুতর ক্লেশ স্বীকার ক'রে বিষয়টি আরও জটিল করি নি। আমরা শুধু নুকতা (.) বা তলবিন্দু অথবা পার্শ্ববিন্দুর সাহায্য নিয়েছি। জীম, জে, জে (pleasure স্মরণীয়) জাল, জাদ, জোয়—এইসব ধ্বনিতে এক জীম জ ভিন্ন সর্বত্র জ.। নুকতা বুঝাবে ঠিক বাংলার উচ্চারণটি হবে না—একটু হেরফের করতে হবে। বলা বাহুল্য আরব প্রভাবিত ইরানেই—উচ্চারণ-অনুগত অক্ষরমালা স্বীকৃত হ'য়েছিল। আরবীতে বহু বিচিত্র ধ্বনি। 'আ'রব' কথার একটি অর্থ 'বাক্‌পটু'। আরব তার ভাষায় বড় গর্ব অনুভব করত। এমন গর্ব ভারত ক'রেছে, গ্রীস ক'রেছে, রোম ক'রেছে। গ্রীকো রোমান জগতের barbāros, barbarrus শব্দ দুটি এবং ভারতের বর্বর এবং ম্লেচ্ছ শব্দ দুটির তাৎপর্যই তাদের আপন আপন ভাষা প্রেমের গরিমা প্রখ্যাপনে যথেষ্ট হবে।

পার্সীর ',' বা রেধ্বনি সম্বন্ধে একটি কথা। রে একক থাকলেও দ্বিরুচ্চারিত ধ্বনি—ইংরেজী 'irresistable' এর র ধ্বনির মত গড়ান ধ্বনি। 'রে'কে সরলভাবে 'র' লেখাই হ'য়েছে। ',' কে ধ্বনি অনুরোধেই কখনও উ, ও, কখনও র বা রো লেখা হ'য়েছে।

সূচীপত্র

প্রাচীন পার্সী ভাষা দরী

এবং

প্রাচীন পার্সী সাহিত্য

পার্সী ভাষায় তিনটি সুস্পষ্ট স্তর আছে। স্তরভেদে তিন প্রকার ভাষার বাহন স্বীকার ক'রে পার্সী সাহিত্যও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। প্রথম স্তরের ভাষা প্রাচীন পার্সী ভাষা বা দরী ভাষা। এই ভাষায় নিবদ্ধ সাহিত্য প্রাচীন পার্সী সাহিত্য। দ্বিতীয় স্তরের ভাষা মধ্যযুগের পার্সী বা পহ্‌লবী ভাষা। সেই স্তরের সাহিত্য মধ্য-যুগের পার্সী সাহিত্য। তৃতীয় স্তরের ভাষা আধুনিক পার্সী বা ফার্সী ভাষা। এই স্তরের ভাষা-নিবদ্ধ সাহিত্য আধুনিক পার্সী সাহিত্য বা ফার্সী সাহিত্য। ভাষার দিক থেকে এই তিনটি যুগ সুস্পষ্ট এবং বিলক্ষণ।

প্রাচীন পার্সীর দুটি রূপ বা দুটি উপভাষা। (১) হখামনীশীয় (Achaemenian) সম্রাটদের উৎকীর্ণ ভাষা। (২) প্রাচীন পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার ভাষা (অ উচ্চারণ আ)। দুটি উপভাষাই—অর্থাৎ প্রাচীন পার্সী ভাষা সংস্কৃতেরই মত প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ভর ভাষা (inflected language)। তখন পারস্যের রাজধানী পারসিপোলিস। Alexander এই রাজধানী বিধ্বস্ত করে দিলেন—খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে, 331 B.C.। ইরানে হ'লো গ্রীক প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী যুগের শাসক এল পার্থিয়রা। ওরা মূলে শক শ্রেণীর আর্য, কিন্তু অত্যন্ত গ্রীক-প্রভাবিত। গ্রীকো-পার্থিয় মিলিত শাসন পাঁচ শ' বছরের বেশি স্থায়ী হয় নি। এর পর আবার সাচ্চা ইরানী সাসানীয়রা শাসন রজ্জু ধারণ করে। তখন ইরানী ভাষা ও সাহিত্যের হয় পুনর্জাগরণ। পার্সী ভাষা তখন দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে। এই পহ্‌লবী পার্সী তখন সেমীয় প্রভাবে বেশ খানিকটা বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠেছে। এর পর আসে ইসলাম বিজয়। ভাষার আরম্ভ হ'লো তৃতীয় স্তর। সেমীয় আরবী ভাষার প্রভাবে

পার্সী হ'লো একটি পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণধর্মী ভাষা—Analytical language। স্মরণযোগ্য খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে খলিফা—'খলিদা-অল্-মুতাবকিল' (847-861)-এর সময় আরবীদের দ্বারা অগ্নি-উপাসক ইরানীরা চরমভাবে নির্যাতিত হয়। অনেকে ইরানের পূর্বদিকে পার্বত্য কোহিস্তানে আত্মরক্ষা করে, অনেকে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় পায়।

এইবার মানচিত্রে পারস্য দেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। এর উত্তরে কাসপিয়ান সাগর, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর, পূর্বে আফগানিস্তান এবং পশ্চিমে তুর্কীস্তান এবং ইরাক। যে কালে পারস্য বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল, সেকালে এর সীমা অবস্থাভেদে বড় বা ছোট হ'য়েছে। রাজধানীরও কত পরিবর্তন হ'য়েছে। নাম করতে পারি (১) পার্সিপলিস (২) এক-বাটানা (যা আধুনিক হামাদন) (৩) এস্‌ফাহান (৪) এখনকার রাজধানী তেহ্‌রান। সমগ্র পারস্য দেশটাকে পার্বত্যভূমি বলাই ভাল। উপত্যকা, অধিত্যকা, মালভূমি এবং মরুভূমিতে পূর্ণ এর রূপ। পশ্চিম ও পূর্ব ইরানের মধ্যে দুরতিক্রম্য শুষ্ক মরুভূমি অনিবার্যভাবে দুই প্রান্তের ভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির করে দিয়েছিল। ইরানের পূর্বদিকের নাম 'কোহিস্তান' (Land of mountains)। একটা কথা মনে পড়ল। এখান থেকে একদা ভারতে প্রচুর আঙ্গুর আসত। লোকে সেগুলিকে বলতো 'কোস্তানী'। কুহ্‌, অপরিচিত বিদেশী শব্দ। জনসাধারণ গরুর স্তনের মত সেগুলিকে দেখে নাম দিলে 'গোস্তনী।' অমরকোষে দেখুন, আঙ্গুর বাচক শব্দগুলি হচ্ছে—"মৃদ্বীকা গোস্তনী দ্রাক্ষা স্বাদ্বী মধুরসেতি চ।" গোস্তনী লোকনিরুক্তি বা 'Folk etymology'র ফল।

এই বিচিত্র দেশ—মালভূমিতে ঠাণ্ডা রাত্রি আর গরম দিনের দেশ—ইতিহাসের আদিপর্বে, কল্পনামিশ্রিত অর্ধ-ঐতিহাসিক যুগে, আর্যজাতির অতিপ্রিয় দেশ ছিল। আদিম ইন্দোয়ুরোপীয় জাতির বিশ্লিষ্ট এক শাখা এই বিচিত্র দেশকে মাতৃভূমি করেছিল। অথবা ভুল বললাম। আর্যদের মধ্যে বহু শাখা ছিল। ওরা নিজেদের একটি অখণ্ড নামে অভিহিত করত। সে নাম 'আর্য', আমাদের পরিচিত সংস্কৃত শব্দ 'আর্য'। বৈদিক যুগের সমকালীন পারস্যদেশের অবেস্তা ধর্মগ্রন্থের যুগে

প্রচলিত নামটি ছিল—অইরিয়ান (অ=আ) এই শব্দ থেকেই বিবর্তিত রূপ ইরান। অইরিয়ান>অইরান>এরান ইরান—(ই দীর্ঘ উচ্চারণ)। এই প্রাচীন ইরান দেশের কুক্ষিগত ছিল বল্খ্ (Baotria) সুঘ্ধ (Sogdiana) এবং খ্বারজম। আফগান এবং কুর্দিস্তানীরা ইরানীজাতি। পার্সী আফগান মানে Shooter। ওরা চিরকাল তীরন্দাজ গোলন্দাজ ভিন্দিপালন্দাজ। বর্তমান যুগের এই প্রাচীন নাম 'ইরান' আবার প্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন সমগ্র দেশের নাম ইরানদেশ। গ্রীক, ইহুদী, সিরীয়, আরবরা দেশ ও জাতিটাকে বলেছে পার্স-পার্সী। আরবদের মুখে 'প' আসে না, তারা বলেছে ফার্স-ফার্সী। ('ফ' উষ্ম উচ্চারণ ইংরাজী 'f')

কিন্তু যা' বলছিলাম, আর্যরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। একটি সম্প্রদায় ছিল পার্স-পর্শু বা পরশু অস্ত্রধারী (পর্শু পরশু দুইই সংস্কৃত)। অপর একটি কি অস্ত্রধারী জানিনে, কিন্তু বড় গর্বিত—মত্ত (√মদ্ ধাতু); ওরা মিদীয়—গ্রীকরা বলতো Medes। অপরটি ধরিত্রীর সন্তান বলেই নিজেদের পরিচয় দিতো—পৃথা-নন্দন পার্থিয়। ওরা মূলে শক নামে আর্য শ্রেণীর। √শক্ শক্তৌ। পার্সী শখস্=মানুষ। এই তিনটি জাতির নামে দেশের আঞ্চলিক নাম হ'য়ে গেল—Persia, Media এবং Parthia। জাতির নামেই দেশের নাম হয়। তৎপর একটি অত্যন্ত-স্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করি। গোষ্ঠীর একটি জাতি সংখ্যালঘু হলেও আপন গুণবলে নিজেকে মুখ্য ক'রে অপরকে গৌণ ক'রে দেয়। Angles, Jutes, Saxons একসঙ্গে Breton-এ ঢুকেছিল; দেশটা কিন্তু হ'লো Angle-land বা England। পার্স, মিদীয়, পার্থিয়রা মিলে মিশে গেল। দেশের নাম হ'লো পার্স—গ্রীকদের Persia এবং ভারতীয়দের পারস্য। পার্স মিদীয়ের মিলন কুরুসের সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। আবার এটাও পরীক্ষিত ঐতিহাসিক সত্য, অস্ত্রের প্রতীক দিয়ে জাতির নাম দাঁড়িয়ে যায়। পর্শু অস্ত্রধারীরাই পার্স। মধ্য য়ুরোপে একদা জার্মনিক বা টিউটনিক জাতিদের মধ্যে একটি শাখা ছিল, যারা পরিচিত হ'লো Saxon বলে। কেন? না তারা Seax (ছোরা) অস্ত্রধারী ছিল। এরা ছিল Knifeman; এরা চতুর্থ শতকে অন্য দুই

দলের সঙ্গে Breton-এ যায়। ইংলণ্ডের প্রাচীন ভাষা এদের নামাঙ্কিত 'Anglosaxon'। জার্মান Franka মানে Javelin অস্ত্র বা বর্শা। Frank জাতি ছিল Javelin-man। এদের নামেই দেশের নাম হ'লো France। 'Frank' নামে এই জার্মানজাতি পঞ্চম শতকে ওই দেশের গলদের পরাজিত ক'রে দেশের নাম দেয় 'France'।

শাখায় শাখায় উচ্চারণ-ভেদ হয়, ভাষায় একটু আধটু পরিবর্তন হয়। বৈদিক ভাষায় দেখুন, কেউ বলতো অগ্নিমীডে, কেউ বলতো অগ্নিমীলে। ধাতু কিন্তু √ঈড্ (স্তুতিঅর্থ)। যাঁরা ছিলেন "বহ্বৃচাধ্যেতৃ সম্প্রদায়" তাদের মুখে শোনা যেতো ঈলে। ওঁরা অনেক ঋক্ পাঠ করতেন বলেই কি বকতে বকতে জিহ্বার এই জড়তা ? যাক্, আসল কথায় আসি, প্রাচীনকালে ইরান দেশে স্পষ্টত দুটি ভাষা সম্প্রদায় ছিল। একটি পশ্চিমা, অপরটি পূরবিয়া। বর্তমানের ইরাক ঘেঁষা পশ্চিম অংশে ছিল পার্সরা। মনে রাখতে হবে তখন মিদীয় ও পার্সরা এক জাতিতে পরিণত হ'য়ে নাম নিয়েছে পার্সী। মিদীয়দের মধ্যে জরথুশ্ত্র নামে ধর্ম-প্রবক্তা আবির্ভূত হন। তাঁর পূর্বদিকের অভিযানে বল্খীদের মধ্যে তাঁর খুব সমাদর হয়। এইখানে রাজা বিশতাস্প্‌কে (গুশ্তাস্প) তিনি আপন নীতি-ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই ধর্ম অল্প-দিন মধ্যেই ইরানের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে ছড়িয়ে যায় এবং সুদীর্ঘ-কাল সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ধর্মের গাথাগুলি সুপ্রাচীন। এই প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ অবেস্তা নামে পরিচিত। অভি√অস্ নিষ্পন্ন অভিস্তা >অবিস্তা >অবেস্তা (অ=আ)। Alexander-এর ধ্বংসলীলায় সেই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র বিনষ্ট হলেও স্মৃতিবাহিত হ'য়ে হ'য়ে চলে। গ্রীকদের পর পার্থিয়রা ইরান শাসন করে। এর পর আসে সাসানীয় বংশের প্রতিষ্ঠা। এই বংশের প্রথম দলপতি সাসান ; তাঁর ধমনীতে খাঁটি ইরানী রক্তধারা। সাসানের পৌত্র আর্দশীর ইরানকে পার্থিয় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত ক'রে খাঁটি পারসীক জাতির দেশে পরিণত করেন। দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর পর আসে নবজাগরণের জোয়ার। স্মৃতিবাহিত অবেস্তা সঙ্কলিত হয়। কালের ব্যবধানে ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটলেও ধর্ম-গ্রন্থ এবং স্মৃতিবাহিত—এইজন্য এ ভাষাকে আমরা প্রাচীন ভাষা বলেই

গ্রহণ করতে পারি। 'অহুর মজদা', ইরানের শ্রেষ্ঠ দেবতা, আবার ফিরে প্রতিষ্ঠিত হন। আর্দশীর-পুত্র শাপুর ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রান্ত। তিনি রোম সম্রাট ভ্যালেরিয়ানকে পরাজিত ক'রে শৃঙ্খলিত ক'রে এনেছিলেন। এই সময় ইরানের মুখের ভাষা দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে। তার নাম পহ্লবী—মানে সম্মুখের ভাষা। ধর্মগ্রন্থের ভাষা কিন্তু প্রাচীন পারসীক ভাষার পূর্বী রূপ। প্রাচীন ইরানের এই ভাষা বৈদিক ভাষার সঙ্গে মিতালী করে চলেছিল। চলাই স্বাভাবিক—আর্যের যে দুই শাখা ইরানী ও ভারতী।

এইবার ইরানের পশ্চিমী ভাষারূপে প্রাচীন পার্সী ভাষার পরিচয় দিই। মিদীয়-পার্সীর মিলিত জাতি পার্সীদের রাজা ছিলেন কুরুস্, পার্সীরা বলে খোরাস্, গ্রীকরা বলতো Cyrus-কুরুস্। এই বংশ হখামনীশীয়। হখামনীশ প্রাচীনকালের পার্সী দলপতি। এই বংশ গ্রীক ভাষায় Achaemenid। ধর্মে এঁরা জরথুশ্ত্রীয়—তাঁরা অহুর মজ্দার উপাসক। অহুর মজ্দার সংস্কৃত প্রতিরূপ অসুরমেধা। তিনি হলেন স্বধা আত্মানং-ধত্তে। নিজেই নিজের স্রষ্টা। এই 'স্বধাই' পরবর্তী পার্সী ভাষায় হয়েছে 'খোদা'। স্ব>খ্ব, যেমন স্বাপ (নিদ্রা)>খাব।* যেকালের কথা বলছি তখন কুরুর সিংহাসনে বসেছেন তাঁর ভাই Cambyses, সংস্কৃত প্রতিরূপ কম্বোজীয়, পার্সীরা বলে 'কম্ব্যোজিয়'। তিনি মিসর অভিযানের পর পথে মারা যান। তখন 'গৌমাত্' নামে এক মিথ্যাচারী (impostor) নিজেকে কুরুর পুত্র 'বরদিয়্' বলে পরিচয় দিয়ে সিংহাসন দাবী করে। সেই অবকাশে খাঁটি হখামনীশীয় বংশের এবং কুরুর খাঁটি জ্ঞাতি দারয়বউস (সংস্কৃত প্রতিরূপ ধারয়দ্বসু) এখানে ধৃ—√ধার পার্সীর দার এবং বসু অপিনিহিতির ফলে বউস। সেই দারয়বউস সবিক্রমে এসে গৌমাত্কে নিহত করেন। এই ঘটনার চিত্র উৎকীর্ণ আছে নক্শ-এ-রুস্তমে বেহিস্তুন গিরিগাত্রে। গৌমাতের বুকে দারিয়ুসের পা। গ্রীকরা

* ঐতিহাসিকরা বলেন, কুরুস্ খ্রীঃ পূঃ ৫৩০ সালে ইরান সীমান্তে বহ্লীক দেশে প্রবেশ-মুখে অসভ্য উপজাতীয়দের দ্বারা নিহত হন। কম্বোজীয়কে অনেকে বলতে চান কুরুসের পুত্র। Cambyses মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদে ভুগতেন বলে, তাঁকে বলা হয়েছে Morose Youngman। ৫২৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তিনি মিসর জয় করলেন, ফারাও ব'লে অভিনন্দিত হলেন। কিছুদিন পর ইরানে ফিরে করলেন আত্মহত্যা।

বলেছে Darius—এখনকার ইরানীরা বলে দারিয়ুস—চিত্রটির মধ্যে মধ্যে পদদলিত শত্রু হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। দশজন বিদ্রোহী শৃঙ্খলিত হ'য়ে আছে এবং দারিয়ুসের মাথার উপর আছেন অহুর মজ্দা। এখানে বাণমুখলিপিতে* দারিয়ুসের সদর্পবাণী প্রাচীন পার্সীর পশ্চিমারূপ। জরথুশ্‌ত্রের ধর্মভাষা প্রাচীন পার্সীর পূর্বী রূপ। এই দুই রূপের উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ দিয়েই এ অধ্যায় শেষ করব।

প্রাচীন পার্সীর এই পশ্চিমী ও পূর্বী উপভাষায় ধ্বনিগত পার্থক্য তো ছিলই, শব্দ ও শব্দার্থগত পার্থক্য, এমন কি বাক্য-সজ্জাগত পার্থক্যও কম ছিল না। গ্রীক ঐতিহাসিক Herodotus বলেন, কুকুর অর্থে পশ্চিম অঞ্চলের মিদীয়রা বলতো আপাকা অবেস্তায় অর্থাৎ পূর্বী ভাষায় এই অর্থের শব্দটি স্পান্। সংস্কৃত প্রতিরূপ সহজলভ্য শ্বান্ (শ্বন্ শব্দ)। গ্রীকরা এই অর্থে বলতো কুওন (ও দীর্ঘ উচ্চারণ)। শব্দটি আমার ধ্বন্যাত্মক বলে মনে হয়, যেমন পরবর্তী সংস্কৃত কুক্কুরঃ যা দ্রাবিড় শব্দ কুর্‌কুর। এই পূর্বী স্পান্ এবং পশ্চিমী আপাকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শব্দ ওই পশ্চিমাঞ্চলের পার্সীতে ছিল 'সক'-saka। এর থেকেই আধুনিক ফার্সী ভাষায় 'সগ্'। অবেস্তায় করা অর্থে ধাতু ছিল √কর্ কিন্তু প্রাচীন পার্সীতে (পশ্চিম) ধাতুটি √কুন্। আধুনিক ফার্সীতে কর্ এবং কুন্ দুইয়েরই উত্তরাধিকার ঘটেছে। অবেস্তায় বলা অর্থে ধাতু হচ্ছে—(১) √আওজ্ √ এবং √বচ্। বচ্ ধাতুর সংস্কৃতে বিভিন্ন পরিণতি ঘটেছে বক্তুম্, বচন, বাচনিক, উক্ত, ইত্যাদি। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের প্রাচীন পার্সীর ধাতুটি ছিল √গউব্, আধুনিক ফার্সীতে √গুফ্‌তন্। সংস্কৃত ভাষায় আমি অর্থে সর্বনাম অহম্—অবেস্তায় অজম্ কিন্তু পশ্চিমী প্রাচীন পার্সীতে অদম্।

জরথুশ্‌ত্র যার প্রবক্তা সেই অবেস্তীয় ধর্ম ছিল ন্যায়-নীতি-সদাচার-সর্বস্ব। বেদিতে অগ্নি জ্বলত, বহ্‌রাম্ অগ্নি (ব্রহ্মাগ্নি) উপাসকের কাছে দেখাও দিতেন। অহুর মজ্‌দার চিত্র উৎকীর্ণও হ'তো কিন্তু প্রাচীন পারসীক জাতি মন্দির গড়ে মূর্তির পূজা করতো না। প্রতিবেশী

* তীরগুলি নানা সজ্জায় নানা অক্ষর হ'য়ে ভাষা হ'য়ে গড়ে ওঠে। এই রীতি সেমীয় জগতের আবিষ্কার।

তুর্কমেনিয়ার অধিবাসী তুরানীদের ইরানীরা ঘৃণার চোখে দেখতো। প্রতিবেশী ভারতীদেরও তারা বিদ্বেষ করতো। Maxmuller দেবাসুর সংগ্রামের এক চমকপ্রদ উল্লেখ করেছেন। √দিব্ দিপ্তার দীপ্তিশালী ভারতীয় দেব ইরানে হ'লো দ-এ-ব (demon) এবং দানবার্থক ভারতীয় অসুর হ'লো ইরানের শ্রেষ্ঠ দেবতা অহুর। এটা উভয় জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিবাদের ফলেই ঘটেছে। কারণ ঋগ্‌বেদের একটি প্রাচীন মন্ত্রে দেখি, (সবিতৃসূক্ত) সবিতা বা সূর্যকে বলা হচ্ছে 'অসুর'। সায়নাচার্যের বিশ্লেষণ হচ্ছে অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইতি 'অসুর'। ঠিকই তখন শব্দটির ছেদ হবে অসু—র। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাসুবোধে ছেদ ঘটেছে—অ-সুর—দেব—ভিন্ন=দানব। 'সবিতৃসূক্ত' প্রমাণ করে শ্রেষ্ঠ দেবতাকে অসুর বললে একদা আর্যদের জাত যেতো না। কাজেই ভট্ট মোক্ষমূলার এ বিষয়ে অভ্রান্তদর্শী। আর একটি উদাহরণের লোভ হচ্ছে। আগে বৌদ্ধভারতে, এখন সমগ্র ভারতে বুদ্ধ'র স্থান চিন্তা করুন। ইরানীরা এই 'বুদ্ধ' থেকে 'বুৎ' শব্দ ক'রে অর্থ করেছে মূর্তি, পুতুল এবং সে ভাষায় বুত্ পরস্তি বা পুতুল পূজা নিন্দনীয় কার্য। বুদ্ধমূল বুতের দুর্গতি দেখুন। য়ুরোপে দেখুন একদা ইংরেজ-ফরাসীর দ্বন্দ্বের ফলে কি বিচিত্র দুটি শব্দ তৈরী হয়েছে। কর্তব্যকর্মে ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়া ইংরেজী ভাষায় 'French-leave' ফরাসী ভাষায় এতাদৃশ কর্মটি হচ্ছে 'কঙ্গা আঙ্গ্‌লে' মানে English-leave। দুটি বাক্যাংশের মধ্যে পরস্পর বিবদমান দুটি জাতি পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করেছে। এমন আরও শব্দ আছে।

আর এক অসুরের কথা বলি, সে হচ্ছে অসুরজাতি Assyrian। হখামনীশীয় সম্রাট কুরুস্—আর্যকুরু খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অসুররাজ্য এ্যাসেরিয়া এবং ব্যাবিলোনীয়া ধ্বংস করে' পশ্চিম দিকে মেসোপোটামিয়া পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত করলেন। ক্ষমাশীল কুরু ব্যাবিলন বিধ্বস্ত করেও সেখানকার মন্দির বা দেবমূর্তিগুলিতে হাত দিলেন না, বরঞ্চ সেগুলি সসম্মানে প্রত্যর্পণ করলেন। দু' হাজার বছরের বেশি গড়িয়ে গেল, ভারতের আর একটি খাঁটি আর্য শিবাজী ভোঁসলে—মহান্ ছত্রপতি ক্ষাত্র চরিত্র দেখালেন। মোগলরাজ্য ছারখার করেও মসজিদ

ভাঙলেন না, কোরানশরীফের অবমাননা করলেন না, সে পবিত্র গ্রন্থগুলি তাঁর অনুচর মুসলিম সৈন্যদের হাতে সসম্মানে প্রত্যর্পণ করলেন। যা বলছিলাম, সেই ক্ষত্রিয় কুরু আবার পূর্বদিকেও সাম্রাজ্য বাড়ালেন—ভারতের সিন্ধুনদ পর্যন্ত। তাঁর উত্তরাধিকারী দারিয়ুস সে সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। গান্ধার অর্থাৎ রাওয়ালপিণ্ডি এবং কাশ্মীর দমন ক'রে তিনি সেই সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেছিলেন। দারিয়ুসের বেহিস্তুন লিপি পড়বার আগে এ কথাটা জেনে রাখা ভাল। আমি বিস্মিত হই ইরান ও ভারতের চিন্তা ও ব্যবস্থার এবং আচরণের ঐক্য অথবা সামঞ্জস্য দেখে।

প্রাচীন ভারতে ষোড়শ জনপদ প্রসিদ্ধ ছিল তার মধ্যে রাজতন্ত্রী দেশও ছিল, গণতন্ত্রী দেশও ছিল। রাজতন্ত্রী জনপদের মধ্যে পাঁচটি ছিল প্রধান। (১) কাশী, রাজধানী বারাণসী (২) কোসল, রাজধানী অযোধ্যা পরে শ্রাবস্তী (৩) মগধ, রাজধানী পর পর গিরিব্রজ, রাজগৃহ এবং পাটলিপুত্র (৪) বৎস, রাজধানী কৌশাম্বী (এলাহাবাদের কাছে) (৫) অবন্তি, রাজধানী উজ্জয়িনী। অহুর মজ্‌দার কৃপায় হখামনীশদেরও ষোলটি জনপদ ছিল। তার মধ্যে দূরতম ছিল হপ্তহেন্দু (সপ্তসিন্ধু)—আমাদের এই ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল—যেখানে সিন্ধুনদ তার পাঁচটি উপনদী ও শাখানদী নিয়ে প্রবাহিত এবং যেখানে ছিল একদা বৈদিক-যুগের স্রোতস্বতী—'মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।' নীচে ষোলটি ইরানী জনপদের নাম উল্লেখ করছি। কতকগুলি আমি চিনতে পারব—কতকগুলি আমার অজানা।

(১) ঐর্যান ব্‌-এ-জো—এটি আর্যের বীজস্থান বা সন্ধিস্থল ইরান—উৎকৃষ্ট নদী 'দাইত্য' এর তীরবর্তী আধুনিক আজারবায়জান। (২) সুখ্‌ধ্‌ (Sogdiana) (৩) মোউরু (৪) বাখ্‌দি (৫) নিসায় (নসা—খোরাসান) (৬) হারোয়ু (হিরাট) (৭) ব-এ-কেরেৎ (সং বিকৃত—Bactria বহ্লীক কাবুল। তুলনীয় বর্‌কো, সং বৃক। এমন স্বরভক্তি প্রাচীন পার্সীতে স্বাভাবিক। (৮) উর্ব (তুস—তুসের পাখীরাই হিমাচল অঞ্চলে যায়—তাদের পালক-রোমে তুষ হয়) (৯) বেহ্‌রকান (গুরগান) (১০) হর্‌-হ্‌-বৈতি (১১) হা-এ-ত্‌-মেন্ত্‌ (১২) রঘ্‌ (তেহরানের

কাছে) (১৩) হৃথ্র (শত্রুরাজ্য ? আধুনিক শর্গ বা জর্গ বোঝাবার কাছে) (১৪) বরেন্ (১৫) হপ্ত্-হেন্দু (১৬) রণ্হা—প্লাবিত দেশ যেখানে মানুষদের মাথা নেই ; নিশ্চয়ই কবন্ধ নয়। এর অর্থ হচ্ছে ওদেশে রাজা বা দলপতি নেই।*

এই ভূমিকা অংশদ্বারা ইরানী ভাষার দুটি উপভাষার রূপ বোঝার ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'লো। সে দুটি উপভাষা পূর্বেই বলেছি (১) শুদ্ধ প্রাচীন পার্সী যা হখামনীশীয়দের উৎকীর্ণ লিপিতে প্রকাশিত (২) অবেস্তীয় পার্সী, যা জরথুশ্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে প্রকাশিত।

প্রথমে অবেস্তার বিশেষ পরিচয় দিই—আমরা জেনেছি কুরুসের বহু পূর্ববর্তী রাজা 'বিশতাস্প'-এর দীক্ষা থেকে নতুন শক্তি লাভ ক'রে জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম ইরানের পূর্বী ভাষাকে বাহন ক'রে ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। তাদের ধর্মগ্রন্থ 'অবেস্তা' বহুদিন স্মৃতিবাহিত হ'য়ে পার্থিয় রাজা Vologesis I এর সময় (51-78 A.D.) প্রথম সঙ্কলিত হ'তে থাকে এবং এই সঙ্কলন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সাসানীয় রাজত্বে তৃতীয় শতকে। বর্তমান অবেস্তা চারটি ভাগে বিভক্ত

(১) যস্ন অংশে আনুষ্ঠানিক দিক রয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন দেবদূত ও দৈবশক্তির উদ্দেশ্যে স্তব আছে। এতে সাতাশটি পরিচ্ছেদ আছে। পরিচ্ছেদগুলির নাম 'হাইতি' বা 'হা'। এই অংশেই অর্থাৎ 'যস্ন' 'হা' Hā অংশেই আছে অবেস্তার 'গাথা', যা নাকি প্রাচীনতম রচনা।

(২) বিস্পরদ্—'করদে' নামে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি আছে এবং যস্ন অংশের মত স্তবস্তুতিও আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে বিস্পরদ্ যস্ন অংশের পরিপূরক।

(৩) বেন্দিদাদ্—ফার্গার্দ নামক নানা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বেন্দিদাদ্ কথাটির অর্থ অপদেবতার বিরুদ্ধে মন্ত্রসমষ্টি। বি-দ-এ-ব-দাত, 'দ-এ-ব' বা দানবের বিরুদ্ধে প্রদত্ত মন্ত্র ও অনুষ্ঠানাদি। এতে

* ঐতিহাসিকরা বলেন, Darius মাসিদোনীয়া জয় ক'রে বর্তমান বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। এমনকি ডানিয়ুব নদী অতিক্রম ক'রে রুশীয় উপজাতি শকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন।

শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, জপ ও তপস্যার নানা পন্থা নির্দিষ্ট আছে। এতে অহুর মজ্‌দার উৎকৃষ্ট সৃষ্টির পরিচয় এবং পাশে অহ্‌রিমানের অপকৃষ্ট সৃষ্টির পরিচয় আছে। অবেস্তার বেন্দিদাদ্‌ অংশই মুখ্য অংশ।

(৪) যশ্‌ত—স্তব এবং প্রার্থনা। বোঝা যায় যস্‌ন যশ্‌ত শব্দ দুটি একই মূল থেকে এসেছে। সংস্কৃত প্রতিরূপ √যজ্‌ ধাতু যজ্ঞ করা, প্রার্থনা করা। এই যশ্‌ত থেকেই আধুনিক ফার্সী যজদ্‌। আধুনিক পার্সী কবিতার উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"রুজী বস্‌ খুর্‌রম্‌ অস্ত, মর্‌গীর অজ বামদাদ্‌।
হীচ বাহান ন মানদ যজদ্‌ কাম এ-তূ দাদ্‌॥"

'যজদ্‌' অর্থ ইষ্টদেব অর্থাৎ ভগবান, যার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়।

এ ছাড়া একটি ক্ষুদ্র সঙ্কলনের কথা বলা প্রয়োজন। নবীন পাঠকদের জন্য সাসানীয় দ্বিতীয় শাপুর (310-379 A.D.) এই সঙ্কলন করিয়েছিলেন, নাম "খোরদ্‌ অবেস্তা" (ক্ষুদ্র > খোরদ-বিপর্যয়লব্ধ)। এতে সূর্য, চন্দ্র, মিথ্র, অপ্‌, বহরাম-অগ্নি (ব্রহ্মাগ্নি) পঞ্চগাহ এবং সিরুজ (ত্রিশ দিন) সম্বন্ধে স্তব আছে। ভারতীয় হিন্দুদেরও আছে।

" ওঁবসন্তায় নমস্তুভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যশ্চ শরৎ-
সংজ্ঞ ঋতবেচ নমঃ সদা।
হেমন্তায় নমস্তুভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাস সংবৎসরেভ্যশ্চ
দিবসেভ্যো নমো নমঃ॥

অবেস্তার একটি স্তব—

মজ্‌দাও সখারে মইরিশ্‌তো যা জী বাবেরে জোই পইরীচিথীত্‌।
দএবাইশ্‌ চা মশ্যাঈশ্‌ চা, যা চা বরেশইতে অইপীচিথীত্‌।
হ্বো বীচিরো অহুরো, অথা নে অঙ্‌হত্‌ যথা হ্বো বসত্‌॥

যস্‌ন ২৯-৪

[অহুর মজ্‌দাই একমাত্র স্তবের যোগ্য। এ পর্যন্ত যা কিছু মানুষ এবং দেবগণ করেছে এবং ভবিষ্যতে তারা যা' করবে—তিনিই, সেই অহুর মজ্‌দাই সে সকলের বিচার করবেন। কেউ তাঁর ইচ্ছার প্রতিরোধ করতে পারবে না।]

অন্য আর একটি,—

হবনীম্ আ রতূম্ আ হওমো উপাইত্ জরথুশ্ত্রম্।

আত্রম্ পইরি-য়ওজ় দথন্তম্ গাথাস্‌চ স্রাবয়ন্তম্॥ যস্‌ন ৯

[অতি প্রত্যূষে হওম জরথুশ্‌ত্রের কাছে এলেন—যিনি অগ্নির বেদির চারদিক পরিক্রম করছিলেন এবং মুখে মুখে গাথা শোনাচ্ছিলেন।]

এইবার ইরানের পশ্চিম অঞ্চলের সেই প্রাচীন পার্সী বা দরী ভাষার পরিচয় দিই। সেই নকশীরুস্তমের বেহিস্তুন গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ দরিয়ুসের দর্পিত বাণী—

বাণমুখ লিপিতে হসন্ত লেখার পদ্ধতি ছিল না বলে, স্বরান্ত করে লেখা হচ্ছে। অনেক শব্দকেই অন্ত্যস্বর মুক্ত ক'রে পড়তে হবে।

অদম্ দারয়্‌বউশ খ্‌শায়থিয় ৱ়জ়র্ক খ্‌শায়থিয় খ্‌শায়থিয়ানাম খ্‌শায়থিয় দহ্যানাম ৱিস্‌পজ়নানাম খ্‌শায়থিয় অহ্যায়া বূমিয়া ৱ়জ়র্কায়া দূরই অপিয়, বিশ্‌তাস্পহ্যা পুথ্র হখামনিশিয়, পার্স পার্সহ্যা পুথ্র, অরিয় অরিয়চিথ্র॥

কত সহজে এই অনুশাসন সংস্কৃত হয়ে যায় দেখুন—

অহম্ ধারয়দ্‌বসুঃ ক্ষত্রিয়ঃ বজ়্রকঃ (মহান্) ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ানাম্ ক্ষত্রিয়ঃ দস্যূনাম্ (বৈদিক দস্যু অর্থে জনগণ) বিশ্বজনানাম্, ক্ষত্রিয়ঃ (অর্থাৎ রাজা) অস্যাঃ ভূম্যাঃ বজ়্রকায়াঃ (অর্থ বৃহৎ ভূখণ্ডের) দূরস্য অপি (দেশস্য) (অহম্) বিস্তাপস্য পুত্রঃ হখামনীশীয়ঃপার্সঃ পার্সস্য পুত্রঃ আর্যঃ আর্যচিত্রঃ (চিত্র অর্থ বংশ) (আর্যবংশীয়)।

আমি দারিয়ুস্ ক্ষত্রিয় এবং মহান্, আমি ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়। আমি দস্যুর অর্থাৎ জনগণের ক্ষত্রিয় (রাজা)। আমি বিশ্বজনের রাজা। আমি রাজা এই সম্মুখবর্তী বিস্তীর্ণ ভূমির এবং দূরবর্তী (দেশের) আমি বিশ্বতাস্পের পুত্র হখামনীশীয়। আমি পার্স জাতি (খাঁটি) পার্সীর পুত্র আমি আর্য এবং আর্যচিত্র অর্থাৎ আর্যবংশীয়।

মধ্যযুগের পার্সী ভাষা পহ্লবী

আমরা ব'লে এসেছি—পার্সী ভাষার ইতিহাসে সুস্পষ্ট তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। খ্রীঃ পূঃ ৫৫০—খ্রীঃ পূঃ ৩৩০—হখামনীশীয় যুগের প্রাচীন পার্সী। এর নিদর্শন হখামনীশীয় নরপতিদের বাণমুখ লিপিতে ঘোষণা। দারিয়ুসের (DARIUS) প্রসিদ্ধ ঘোষণাটি আমরা উদ্ধৃত করে আলোচনা করেছি। এই প্রাচীন ভাষাকে বলা হয় দরী। কেউ বলেন দারিয়ুসের নামেই ভাষা দরী। কেউ কেউ অন্য ব্যাখ্যা দেন। তাঁরা বলেন, পার্সী ভাষায় 'দর' মানে ভিতর এবং 'দর' মানে দরজা। যে ভাষা খাস ইরানের ভাষা, তাই প্রাচীন ভাষা দরী। অথবা ইরানের চতুর্দ্বারে আবদ্ধ খাস ইরানী ভাষাই দরী।

জীবন্ত ভাষার অবিরাম গতি। এই দরী ভাষা রূপান্তরিত হ'ল। এই রূপান্তর ঘটেছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা এই রূপান্তরে অবশ্যই সাহায্য করেছিল। গ্রীকদের হাতে পারস্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। ভাষার দিকেও পরিবর্তন আরম্ভ হ'ল। ঘটনাটি বলি। প্রাচীন যুগের ইতিহাসে দুটি মহান্ জাতি পরস্পর বিবদমান এবং যুধ্যমান ছিল—গ্রীক ও পারসী। পার্সীদের হাতে গ্রীকনিগ্রহ (থার্মপলির যুদ্ধ স্মরণীয়), গ্রীক পরাভব, সাচ্চা গ্রীকের হৃদয়ে তুষানল জ্বালিয়ে রেখেছিল। প্রতিশোধের সুযোগ উপস্থিত হ'ল আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়ে। গ্রীকরা বলতো 'আলেকসান্দার'। পার্সীরা আরম্ভের ব্যঞ্জনলোপ ঘটিয়ে, 'আলে' অংশ ছেড়ে দিয়ে এবং 'স' 'ক' এর বিপর্যয় ঘটিয়ে বলতো সাকন্দর—সেকন্দর, কখনও বা 'ই' স্বরাগমে ইস্‌কন্দর। এই গ্রীক দিগ্‌বিজয়ী হলেন ক্রমে শাহ সেকেন্দর বা ইস্‌কন্দর, যিনি ইরানের অধিপতি। ত্রিশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর দাপট সইতে পারল না সেদিনের দুনিয়া—এমনি তাঁর রণনৈপুণ্য এবং সৈন্য চালনায় দক্ষতা। গ্রানিকাস নদীর

তীরবর্তী যুদ্ধে এশিয়া মাইনর গেল। কিছুদিন পরে গেল সীরিয়া। ঈসাসের যুদ্ধে পারস্য সম্রাট্ তৃতীয় দারিয়ুসের সৈন্য হ'ল পর্যুদস্ত। তার পর ক্রমাগত পতনের ইতিহাস—টায়ার, ফিলিস্তিন, পরিশেষে ঈজিপ্ট, যাকে আরব দুনিয়া বলতো মিসরাইম। ইস্কান্দার ফিরে উল্টে খাস পারস্য ধরলেন। বাবিলন ও সুসার পতনে দারিয়ুস সন্ত্রস্ত হলেন। সর্বশেষের ঘটনা হখামনীশীয় সম্রাটদের সেই সাধের রাজধানী ইস্তখর্ যার সর্বজনবিদিত নাম পারসিপলিস্—পারস্যের দিল্, সেই সৌধনগরী হ'ল অগ্নিদগ্ধ। পারস্য-সাম্রাজ্যের দিল্ ও দৌলত অধিকার ক'রে আলেকজাণ্ডার হলেন সেকেন্দর শাহান্ শাহ্। শোনা যায়, বিজয়োৎসবের পানাতিরেকে উন্মত্ত সৈন্যদের এই জঘন্য কার্য একটা উদ্দাম অবস্থার ফল। রুচিসম্পন্ন নিষ্ঠুর-দয়াল সেকেন্দরের উৎসাহ কদাচ এই কার্যে ছিল না। সেদিন সৈন্যেরা উন্মত্ত হয়ে জেরাক্সেসের (Xeraxes) এথেন্স দগ্ধ করার জবাব দিয়েছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩৩১ থেকে দুশ বছর চলে ইরানে গ্রীক অধিকার। সেকেন্দরের মৃত্যুর পর পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যের ভার পেলেন সেনাপতি সেলিউকস্ নিকেটর; সুতরাং দীর্ঘদিন ইরানে 'সেলুকিদ্' রাজবংশ রাজত্ব করে। এই সময় ইরানী ভাষায় যেমন একদিকে গ্রীক প্রভাব আসে, তেমনি আর একদিকে আসে সামী প্রভাব (Semitic influence)। ভৌগোলিক দিক থেকে তখন ইরান জড়িয়ে পড়েছে সেমীয় দুনিয়ার সঙ্গে। আর্যগ্রীকের বিস্তৃত সেমীয় রাজ্য ঐতিহাসিক সত্য; সুতরাং সেমীয় প্রভাব দুর্লঙ্ঘ্য। এইভাবেই সেই প্রাচীন বিশুদ্ধ দরী ভাষা রূপান্তরিত হয়ে চলেছিল। প্রায় দুশ বছর এই অবস্থা চলার পর খ্রীঃ পূঃ ১৪০ সালে এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। পার্থিয়া নামে জনপদ ছিল ইরান দেশেই। এর অবস্থান ব্যাকৃট্রিয়া বা বহ্লীকের দক্ষিণে এবং পার্সিপলিসের উত্তরে। এই ক্ষুদ্র জনপদের এক সাহসিক বীর 'মিথরিদাতেস' দুর্বল সেলুকিদ্ রাজ্য বিধ্বস্ত করে দেন। ইনি ইরানী, তাঁর নামের মিথ্র (সং° মিত্র) অংশ তাই প্রমাণ করে। এই বিজয়ী বীরের রাজ্য পর্থব্। ভাষাতত্ত্বের বিধানেই এই নাম ক্রমে হয়ে দাঁড়ায় পহলব্। (থ>হ, বিপর্যয়ে পহ্রব্>পহ্লব্)। রাজারা নিজেদের বলতেন পহ্লবান (Pahlawan) শব্দটি বিশুদ্ধ পার্সী—অর্থ কুস্তগীর বা বীর। এই

পহ্লবীজাতি (দক্ষিণ ভারতের পল্লবরা নয়) ক্ষত্রিয় জাতি বলে মনু-সংহিতায় স্বীকৃত—'বহ্লীকাঃ পহ্লবাশ্চৈব,'। জানিনা কি কারণে মনু, 'ল'কে 'ন' করেছেন। এরা এবং 'শকরা' ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং ভারত থেকে দূরবর্তী বলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারবর্জিত—এই বৃদ্ধ মনুর সিদ্ধান্ত। মহাভারতেও পহ্লবীদের কথা আছে। এরা সগর কর্তৃক বিজিত হয়েছিল এবং শ্মশ্রু-ছেদের নিষেধে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল—তাই দাড়ি রাখতো।

আসল কথায় আসা যাক। প্রাচীন পার্সী গ্রীকশাসনে রূপান্তরিত। রূপান্তরিত ভাষা একদা পহ্লব্ শাসনে নাম নিল পহ্লবী। কেউ বলেন দেশের নামে, কেউ বলেন জাতির নামে ভাষার নাম হ'লো পহ্লবী। এই পহলবী ভাষাই মধ্যযুগের ভাষা। বৈদিক সংস্কৃত বিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত হয়েছে। তা আবার বিবর্তিত হয়ে হয়েছে ভারতীয় আধুনিক ভাষা। ঠিক একই ধারায় প্রাচীন পারসী হয়েছে পহ্লবী—শেষে তাই থেকে হয়েছে আধুনিক পার্সী বা ফার্সী। আভিধানিক Steingass 'পহ্লব জবান্' অর্থ দিয়েছেন Pehlevi language। সুতরাং পহ্লব্ দেশের ভাষা পহ্লবী অথবা পহ্লব্ জাতির ভাষা পহ্লবী হচ্ছে মধ্যমস্তরের পার্সীভাষা। Olshausen বলেন, মিথ্ চিথ্ (সং মিত্র, চিত্র) আধুনিক পার্সীতে হয় মিহ্র, চিহ্র। মিথ্র চিথ্র>মিহ্র, চিহ্র। সেইভাবেই পরথব>পরহব>পহ্লব। পরথব নাম ছিল বলেই Parthia, আরবীরা বলে ফহলব্। পহ্লব বর্তমানের সেই স্থান, যেখানে আছে ইস্ফ্হান, রায়, হমদান, নহ-বন্দ এবং আজারবায়জানের কতক অংশ। অধিবাসীরা ইরানী হতে পারে, তুরানীও হতে পারে। মজার ব্যাপার, ফেরদৌসী শাহ্নামায় এই জাতটার কোন প্রাধান্যই দেন নি। তিনি ওদেশের রাজাদের বলেছেন উপজাতীয় সর্দার, তাঁর ভাষায় খুদে রাজা—মুলূকুত তয়াইফ্। মাত্র একটি পৃষ্ঠায় এই অশিক্ষিত বর্বরদের কথা বলে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। তথাপি বলব, আমাদের বহু ভাগ্য ফেরদৌসী একটি ভাষা হিসেবে পহলবীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতে, তহ্মুরথ্ দিব-বন্দ্ অর্থাৎ দানবের বন্ধনকর্তা তহ্মুরথ্ প্রায় ত্রিশটি ভাষা জানতেন এবং লিখতেও পারতেন। ত্রিশটি ভাষার মধ্যে প্রধান হচ্ছে রুমী (গ্রীক), তাজী (আরবী), পার্সী, হিন্দী

(ভারতীয় ভাষা), চীনী (চীনাভাষা) এবং পহ্লবী। তহ্মূরথ্ ছিলেন (সং তথামূর্ত)—জমশীদের পূর্বপুরুষ। জমশীদ অবেস্তার 'যিম' এবং হিন্দুভারতের যম। কাজেই (Yima) ফেরদৌসীর জমশীদকে অনৈতিহাসিক বিশুদ্ধ কাল্পনিক পৌরাণিক পুরুষরূপে গ্রহণ করাই ভাল।

গ্রীক প্রভাবমুক্ত ইরানের পূর্ণ জাগরণের ইতিহাস সাসানীয় যুগে। তবু ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, পারথবী শাসন সুনিশ্চিতভাবে ইরানে জাতীয় ভাবের একটি তরঙ্গ তুলেছিল। অন্তত তারা বিবর্তিত ভাষাকে চিরদিনের জন্য তাদের নাম-চিহ্নিত ক'রে দিতে সমর্থ হয়েছিল। পারথবী, পহলবী ভাষা—পার্সীর দ্বিতীয় স্তরের ভাষা।

পার্সী সাহিত্যে এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে। ভাষা প্রাচীন খোলস ছেড়ে নবরূপ গ্রহণ করেছে সত্য, কিন্তু কোন সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়নি ; অন্তত তার কোন নিদর্শন নেই। সমৃদ্ধ সাহিত্যের জন্য কালের ভাটি স্রোত বেয়ে আরও একটু অগ্রসর হতে হবে। পহ্লবী শাসন বেশ দীর্ঘ কালই ছিল—তিনশ বছরের কিছু উপরে। ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে সাসান নামক এক দলপতির পৌত্র এক নতুন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলেন। এঁর নাম পহ্লবীতে আর্তখ্শীর—সংস্কৃত প্রতিরূপ দাঁড়ায় ঋতক্ষীর। প্রাচীন পার্সীতে অর্তখ্শত্র সংস্কৃত প্রতিরূপ ঋতক্ষত্র। গ্রীকভাষায় এই নাম Artaxeraxes। ইনি ছিলেন পাপক বা বাবকের পুত্র। ইরানে আধুনিক ইরানী ভাষায় ইনি 'আর্দশীর'। ইনিই সর্বশেষ পারথিয় সম্রাটকে পরাজিত ক'রে সাসানীয় সাম্রাজ্য এবং সাসানীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সগৌরবে পনেরো বছর রাজত্ব করেন (২২৬-২৪১ খ্রীস্টাব্দ)। হখামনীশীয় সম্রাটদের কায়দায় উৎকীর্ণ এঁর একটি শিলালিপির প্রতিরূপ রোমান হরফে দিচ্ছি—

"Patkarī Zanā Mazdayasn Bagī Artakhshatr, Malkān Malkā Airān Minū Chitrī Min Yaztān Barā Pāpakī Malkā"

বাংলা অনুবাদ দাঁড়াবে—এই হচ্ছে তাঁর মুদ্রার ছাপ, যিনি মজদা উপাসক স্বয়ং দিব্য পুরুষ আর্তখ্শতর, যিনি ইরানের রাজার রাজা এবং যিনি দেবজন্মা দিব্য বংশোদ্ভব, রাজা পাপকের পুত্র।

এই বংশের আর একজন প্রসিদ্ধ সম্রাট্ শাহ্পুর (খ্রীস্টাব্দ ৩০৯-

৩৭১)। তারপর অবিস্মরণীয় নামটি করতে হয় নৌশেরবান্ (খ্রীষ্টাব্দ ৫৩১-৫৭৯)। এঁরই রাজত্বের শেষভাগে অদূরে মরুরাজ্যে ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন হজরত মুহম্মদ,—যাঁর নবধর্ম ভবিষ্যতে ইরানের ভাষা ও সাহিত্যকে নতুন ছাঁচে গড়ে তুলবে। সে আলোচনা পরে। আধুনিক পার্সী ভাষায় নৌশেরবান্ অর্থ ন্যায়নিষ্ঠ। এর অপর অর্থ ব্যক্তিবাচক জিব্রাইল নামক দেবদূত। পহ্লবী ভাষায় এই নাম "অনিশীরবান্"। সংস্কৃত প্রতিরূপ দাঁড়াবে অনাশী-রবঃ, মানে অমৃতস্বর "of immortal voice"। এই বংশের সর্বশেষ নরপতি হলেন খুসরো পরবেজ (খ্রীষ্টাব্দ ৫৯০-৬২৭)। এঁর রাজসভায় ছিলেন গায়ক কবি 'বারবদ্'—আরববাসীরা বলে 'বাহলাবদ' অথবা 'ফাহলাবদ'। ইনি বাজাতেন বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র চঙ্গ ও বারবুদ্। তাঁর সুরে এবং বাদ্যে সাসানী মজলিস্ মশ্গুল হয়ে থাকত। এঁর প্রসিদ্ধি সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। প্রায় চারশো বছর পরেও কবি শরীফ-ই মুজল্লিদী গুণগান বলেছেন—সাসান রাজভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠধন বারবদ্—একথা সুনিশ্চিত। তাঁর কথার অনুবাদ—

"সাসান রাজের রাজকোষ আর সামান কুলের ভাণ্ডার।
শ্রেষ্ঠধনের রক্ষক বুঝি বারবদ্ ছাড়া নেই আর।"

পহ্লবী ও আধুনিক পার্সীতে কালের ব্যবধান থাকলেও রূপের ব্যবধান বেশি নেই। শাহ্পুরের রাজত্বে কেউ ঘুমিয়ে পড়লে হাজার বছরের নিদ্রাভঙ্গে সে শেখ সাদী ও হাফিজ ঠিক বুঝতে পারত, কিন্তু প্রাচীন পার্সীর শেষযুগে ঘুমিয়ে পড়ে শত বছরের নিদ্রাভঙ্গেও পহ্লবী ভাষা ঠিক ঠিক বোঝা মুশ্কিল হত। একটি উদ্ধৃতির বঙ্গানুবাদ আগে দিয়ে ক্রমশ আধুনিক পার্সী থেকে পহ্লবীতে উজান যাত্রা করছি—

বকারের ছেলে আর্দশীর লিখে গেছেন, রুমী (গ্রীক) ইস্কন্দরের মৃত্যুর পর শহর ইরানে দুশ' চল্লিশজন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইস্ফ্হান ও পারস্ ও ধারে কাছের জায়গাগুলো আর্দবান সর্দারের হাতে ছিল। বাবক ছিলেন শাসক এবং পারস্যের অধিকর্তা।

একে আধুনিক পার্সীতে রূপান্তরিত করলে দাঁড়াবে—

বকার্ নাময়ি আর্দশীর বাবকান্ ইদুন্ নবিশ্তহ্ অস্ত্ কেহ্ পস্ অজ মরগ্-ই-ইসকন্দর রূমী শহর-ই-ইরান্ ২৪০ কৎ খুদায়ি বুদ্। ইসফ্হান

র ফারস্ র কেনারাহা এ আশ্ নজদীকতর ব-দস্ত্-এ-আর্দবান্ সর্দার বুদ্। বাবক্ মরজুবান্ র শহর-দার-এ-ফার্স বুদ্।

এটির পহ্লবী রূপ—

পহ্কার নামকী আর্তখ্শীরী পাপকান্ অতুন্ নপিস্ত অস্ত জ কুপস অচ্ মরগী অলক্সান্দর অরূময়িক ইরান শসর ২৪০ কূতক্ খুরতায়ী বুধ্। অস্প্হান্ অর পারস্ অর কুস্তীহায়ী অ রীশ্ নজদীকৃতর্ পহ্দস্তী আরদ্বান সরদার্ বুধ, পাপক মরজবান্ অর্ শসর্-দারী পারস্ বুধ।

ঘোষীভবন, অক্ষরলোপ, শিষধ্বনির হকারীভবন, অল্পপ্রাণীভবন—এই কয়টি ভাষাতত্ত্বের বিধান সম্বল করেই একে আধুনিক পার্সীতে রূপান্তরিত করা যায় এবং সহজে অর্থ বোঝা যায়। এইজন্যই বলেছি পহ্লবী ও ফার্সীতে ব্যবধান অতি সামান্য।

এইবার আমাদের আলোচনার সারসঙ্কলন করি। পার্সী ভাষার ও সাহিত্যের তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়।

(ক) হখামনীশীয় যুগ বা প্রাচীন যুগ। খ্রীঃ পূঃ ৫৫০-খ্রীঃ পূঃ ৩৩০। এইসময় বাণমুখলিপিতে যে রাজকীয় ঘোষণাগুলি পাওয়া যায়, তাই এযুগের সাহিত্যিক নিদর্শন, আর পরবর্তী সাসানীয় যুগে সঙ্কলিত হলেও অবেস্তার ভাষাও প্রাচীনযুগীয় পার্সী। কারণ ধর্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে ভাষার রূপান্তর অবাঞ্ছিত এবং চিরকাল অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীন পার্সী দরী ও গাথিক ভাষায় অবশ্যই উপভাষাগত পার্থক্য ছিল।

(খ) সাসানীয় যুগের পার্সী পহ্লবী মধ্যবর্তী স্তরের পার্সী ভাষা। রচনা ও ব্যবহার সময় খ্রীঃ ২২৬-৬৫২। এই যুগের রচনা-নিদর্শন—শিলা ও মিনারে উৎকীর্ণ লিপি, পদক ও মণি তথা সীলমোহর ও মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি। পহ্লবী সাহিত্যের পরিমাণ অন্তত হিব্রু Old Testament এর সমান সমান। এই সাহিত্য পূর্ণমাত্রায় জরথুশ্ত্রীয় এবং সামগ্রিক-ভাবেই প্রায় ধর্মসম্বন্ধীয়। এই ভাষাকে তার 'হুজবারেশ' থেকে সঙ্কেতমুক্ত ক'রে পড়লে দেখা যাবে এই ভাষা আধুনিক পার্সী থেকে কিঞ্চিৎ পুরাণলক্ষণাক্রান্ত। একথা মনে রাখতে হবে এই ভাষা সর্বদাই আরবী প্রভাব বর্জিত। 'হুজবারেশ' পরে ব্যাখ্যা করা হবে। আশ্চর্য

এই ভাষা আরবদের ইরান জয়ের পরেও শতবর্ষ পর্যন্ত (আদি খালিফাদের সময় পর্যন্ত) অব্যাহত গতিতে ইরানে চলেছিল।

(গ) আধুনিক ফার্সী বা মহম্মদীয় যুগ খ্রীষ্টাব্দ ৯০০ থেকে চলেছে। আরবের ইরান জয়ের পর থেকেই এর সূত্রপাত। সে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে নিবদ্ধ হবে।

এইবার পহ্‌লবীর বিশিষ্ট লিখন পদ্ধতি হুজবারেশ সম্বন্ধে আলোচনার সূচনা করে প্রসঙ্গ শেষ করি। বলা বাহুল্য, এ লিখন পদ্ধতি সামী প্রভাবেই ঘটেছিল। লিখব সেমীয় লিপি, পড়ব ইরানী ভাষা; এমনি এক ঘূর্ণীমনে এর জন্ম। মনের ভাব প্রকাশেই লিপির উদ্ভব। এ লিপি যেন মনোভাব প্রকাশের গুপ্তি—an art of concealing thought—a unique philological puzzle.

আমাদের সময়ের লিপিকৌশল দিয়ে জিনিসটা পরিষ্কার করা যাক। আমরা অনবরত এই সঙ্কেত চিহ্নগুলি ইংরেজিতে লিখে যাচ্ছি—i.e., e.g., &, Q.E.D., O.K. ইত্যাদি—এগুলি কোনটা লাতীন, কোনটা মার্কিন অপভাষা। পড়ে যাই কিন্তু বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় যথাক্রমে—that is, for example, and, proved, all right। ঠিক একই নিয়মে, পহ্‌লবী লিপিতে লিপিকর লিখতো সেমীয়-শব্দ 'মলকান্-মলকা', লোকে পড়তো 'শাহান্ শাহ্'—বিশুদ্ধ ইরানীশব্দ, যার প্রাচীন রূপ ছিল দরী ভাষায় খ্‌শায়থিয় খ্‌শায়থিয়ানাম্—সংস্কৃত প্রতিরূপ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ানাম্। লিখতো বিস্রা ও লহ্‌মা (মূলে দুটিই আরামাইক বা সামী শব্দ) পড়তো গোশ্‌ত ও নান্—বিশুদ্ধ ইরানীশব্দ, যার অর্থ মাংস ও রুটি। পহ্‌লবীর এই হুজবারেশ পদ্ধতি যেন ভাবলিপি (idiogram), অক্ষরলিপি নয়—"Symbols appealing directly to the intelligence without invoking aid from the auditory sense. এই মায়াক্ষরে বা logogram দিয়ে আক্কাদীয়রা লিখতো। অসুররা (Assyrian) লিখতো আক্কাদীয় প্রতীকে, পড়তো নিজের ভাষায়। এই সাঙ্কেতিক পদ্ধতি হুজবারেশ। তাকে ব্যাখ্যা ক'রে যখন পহ্‌লবী ভাষায় পুনশ্চ লেখা হ'ত তখন তাকে বলা হ'ত পাজেন্দ্, যার অর্থ

'পুনশ্চ ব্যাখ্যা'। সাসানীয় যুগের শেষভাগে এই জটিল প্রক্রিয়া জনপ্রিয়তা হারায় এবং বিশুদ্ধ পহ্লবী লিপিই অনুসৃত হয়।

পহ্লবীর রচনা ছিল বহু। নষ্টাবশিষ্টও কম পরিমাণ নয়। ঘোষণা, বিনয়, উপদেশ, ধর্মসম্বন্ধীয় আচার ব্যবহার, আধ্যাত্মিক বিষয়, রাজকীয় ইতিবৃত্ত—এবং সর্বশেষে গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ—এই পহ্লবী সাহিত্যের সম্পদ।

হুজবারেশ ও পজন্দ

এক একবার মনে হয় পহ্লবী তার আর একটি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। পহ্লবী মানে নাগর ভাষা (urban language). এটি ভাষার এক মার্জিত রূপ. যাকে বলা চলে Kunst Sprache, ভাষার সুসাধিত অলঙ্কৃত রূপ। অথবা এমনও হতে পারে, বাতিলের উল্টোটাই পহ্লবী। যা কোলের কাছে বা নিকটবর্তী তাই পহ্লবী। ভাষার মধ্যমস্তরে পহ্লবীই কোলের ভাষা, কাছের ভাষা। তারপর নবীন ভাষা এল, সেও কাছের ভাষা বলে, তাকেও কেউ কেউ পহ্লবী বলেছেন। একটি নজির তুলব। ১২০৭ খ্রীস্টাব্দে যাঁর জন্ম, সেই সূফী-শ্রেষ্ঠ কবি জলাল উদ্দীন রূমী (বল্খী) আধুনিক পার্সীকে বলেছেন 'জবান-এ-পহ্লবী'। "মসনবী ও মানবী ও মৌলবী। হস্ত কুর্‌বান্ দর্ জবানে পহ্লবী"—আমার পহ্লবী জবানে (ফার্সীতে) আছে কোরানের তত্ত্ব এবং স্বর্গীয় ভাবরাজ্য।

মধ্যম স্তর অতিক্রম করে ফার্সী বহু বৈদেশিক ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হ'ল। তখন গ্রীক-এরামিক ছাড়াও দুর্দান্তভাবে আরবী-প্রভাবিত হয়েছে ইরানী ভাষা। সব চলিত ভাষাতেই বিদেশী প্রভাব থাকে। আধুনিক জমজমাট পার্সীতে এমন উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যাতে বিশেষ্য, বিশেষণ, কৃদন্ত বিশেষ্যগুলি আরবী, কিন্তু বাক্যের গঠনপ্রণালীটি পার্সী এবং তাতে সর্বনাম, সহকারী ক্রিয়া আবশ্যিকভাবে পার্সী। যেমন উর্দু

ভাষায় আরবী পার্সী তুর্কী শব্দের যতই ঝঙ্কার থাক, ক্রিয়ারূপে সে আবশ্যিকভাবে হিন্দোস্তানী। এইজন্য সে নিঃসন্দেহে ভারতীয় আর্যভাষা —ইরানী তুরানী আরবী তুর্কী গোষ্ঠীর ভাষা নয়। একটি মৌলিক ভাষা সব ছেড়েও সর্বস্ব ছাড়ে না। একটি ইংরেজী উদাহরণ নেওয়া যাক। "I regard this expression of opinion as dangerous"—এখানে I, this, of এবং as—এই চারটি কথা খাঁটি ইংরেজী শব্দ, অপরগুলি বৈদেশিক। যথা—regarder ফরাসী, expressum, opinio—এ দুটি লাতীন এবং dangerous শব্দটি একদিকে লাতীন dominium (feudal authority) অপরদিকে প্রাচীন ফরাসী dangier (absolute-power)—এই দুটির সংমিশ্রণজাত। ভাষায় এমন মিশ্রণ স্বাভাবিক; কিন্তু Haug তাঁর "Essay on Pāhlavi"-তে বলেন, পহ্লবীতে সেমীয় উপাদান সত্ত্বের সীমা অতিক্রম করেছে, সে ভাষা আরামীয়-পার্সীর মিশ্রণের ফলে জোড়কলম শব্দে এতই কণ্টকাকীর্ণ।

লেখা অর্থে 'য়েক্তিবুন্' আরবী, খাঁটি পার্সী নপিশ্তন্ (পহ্লবী) বা নবিশ্তন্ (আধুনিক ফার্সী)। দুটি জুড়ে গিয়ে পহ্লবী হ'ত 'য়েকতিবুন্-তন্'। মানুষ অর্থে মরদুম্ পার্সী, সেমীয় শব্দ ঐ অর্থে আছে 'গবরা'। পহ্লবীতে লেখা হ'ত 'গবরা-উম্'। অসুর ভাষায় পিতা ছিল 'অব্'। পহ্লবীতে পিতা অর্থে লেখা হ'ত—অবিতর, যার মধ্যে আছে অসুরীয় অব+প্রাচীন পার্সীর পিতর্-জাত ইত্র্। আধুনিক পার্সীতে অবশ্য পেদর। আধুনিক পার্সীতে একটি শব্দ নেওয়া যাক। ক্রিয়া 'পিনদা-শতন' অর্থ বিচারবুদ্ধি করা। এতে কত ঘুরপাক আছে একবার দেখুন। পহ্ল্বীতে লেখা হত শুধু 'পরন'—প অর্থ হেতু for+হানা অর্থ in this। তার সঙ্গে তেহাই এল আধুনিক পার্সীর দাশ্তন্—ধারণ করা to possess। (এই ধাতুর Aorist বা সামান্যরূপে হয় 'দার'। ঠিক সংস্কৃতের প্রতিরূপ—√ধার।)

আমরা আগেই বলেছি এই পহ্লবীর হুজবারেশ বলে এক পদ্ধতি ছিল। তাতে লেখা হ'ত বিদেশী ভাষা কিন্তু পড়ার সময় পড়া হ'ত ইরানী প্রতিরূপ। লেখা হ'ত লহম্ পড়া হ'ত গোশ্ত্। এইজন্য পহ্লবী নামকে ভাষা-দ্যোতক না ক'রে অনেকে করেন পদ্ধতি-দ্যোতক। হুজবারেশ

খেলত এই মায়ার খেলা। আমরাও কি অনেক জায়গায় হুজবারেশ পদ্ধতিতে চলি না? লিখি লাতীন ভাষার সাঙ্কেতিক রূপ, কিন্তু পড়ি ইংরেজি। উদাহরণ দিচ্ছি—i.e. লাতীন id est সংস্কৃত ইদম্ অস্তি, পড়ি ইংরেজি that is ; e. g. লাতীন exempli gratia—আমরা পড়ি কিন্তু for example ; লিখি লাতীন Q. E. D. Quod erat demonstrandum পড়ি কিন্তু, which was to be proved ; লিখি লাতীন ibid ibedem পড়ি in the same place—আজকালকার পণ্ডিতেরা বলেন তথৈবচ। আজকাল O. K. সবাই লেখে, তাতে অনেকেই বলেন all right, আসলে ওটা মার্কিনী অপভাষা oll korrect।

হুজবারিশের আর এক নাম আদ্যক্ষর লোপে জবারিশ বা জবারিশন। ভাষার এই রীতিসম্বন্ধে Browne বলেন,—"the peculiarities of pahalawi lay almost entirely in the script and they disappeared when it was read aloud." ওরা লিখত 'লী' পড়ত মরা [মন্+রা—আমাকে], আধুনিক পার্সী মন্ (আমি) এসেছে এই ভাবে—প্রা° পা° অদম্-অবে° অজম্। এর সম্বন্ধ-কারকে ছিল 'মনা'—তারই তির্যক কারক-রূপ oblique case মন্। দ্বিতীয় শাপূরের (৩০৯-৩৭৯ খ্রীঃ) মুদ্রায় উৎকীর্ণ ছিল 'মলকান মলকা' লোকে পড়ত শাহান-শাহ্।

এই যে এক লেখা, অন্য পড়া এতে ভাষা হয়ে উঠেছিল দুর্বোধ্য। এইজন্য কালক্রমে এর খাঁটি পার্সী ভাষায় বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। তখন পহ্লবী পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে পুনশ্চ অবেস্তিক লিখন এবং পঠন চলতে লাগল। এরই নাম পজন্দ। পার্সী √জবারিদন অর্থ পুরাতন বা বাতিল হয়ে যাওয়া। এই বাণীভঙ্গী 'জবারিশ' পুরণো হ'লো বলেই পজন্দ এর প্রয়োজন হ'লো। পজন্দ বা আদ্যক্ষর লোপে জন্দ হ'লো ব্যাখ্যান বা বিশ্লেষণ। ব্যাখ্যান সহ অবেস্তাকে বলা হয় জন্দ অবেস্তা—মানে পহ্লবী লিপিতে লিখিত অবেস্তার পুনশ্চ বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে অবেস্তা কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও বুঝে নেওয়া যাক। দরী ভাষায় অবস্তাম্>পহ্লবী অবিস্তাক্, আরবী ভাষায় অবস্তাক্। মনে হয়, ইন্দো-ইরানীয় রূপ ছিল—উপস্তা, সংস্কৃত প্রতিরূপ 'উপস্থা'=

নিকটবস্তু বা আশ্রয়বস্তু। অন্য আর একটি সংস্কৃত শব্দ 'ধর্ব' ঠিক এই অর্থে প্রযুক্ত হয়।

ইরানের উপর আরবের জয় একদিকে সুফল প্রসব করেছিল। মনে এক, প্রকাশে ভিন্ন, লিখন পদ্ধতির জটিলতা মুক্ত হ'লো ইরান। ইরান আরবী লিপি গ্রহণ করল, মহম্মদীয় ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মনে প্রাণে আরবী হ'তে অবশ্যই সে পারল না। মনে হয় এখনও সে পারে না। ইরানের ঐতিহ্যের একটি বিশ্ববন্দিত কৌলীন্য আছে। ইরান জয়ের সময় আরব মরুভূমির বেদুইন্ দস্যুমাত্র। সাহিত্য তার কী বা ছিল? ইরানকে উপহার দেবার উপযুক্ত কিছুই ছিল না। তবু আরব ইরান জয় করেছিল—এবং ভালমন্দ মিশ্রিত ফল নিশ্চিতই ফলেছিল। ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তার আলোচনা অবশ্যই করব। এখানে পহ্লবী সাহিত্যের একটা রেখাচিত্র দেওয়ার চেষ্টা করি।

পহ্লবী সাহিত্যের নষ্টাবশিষ্ট অংশমাত্র ইরানে রক্ষিত আছে। বলা বাহুল্য, কিয়দংশ নবম শতক থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘদিন যাবৎ অগ্নি-উপাসক জরথুশ্ত্রীয়দের দ্বারা আরব সাগরের পরপারে ভারতে আনীত হয়েছিল। এইবার কয়েকটিমাত্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম করি,—মিনারে, পদকে, গিরিতে, গুহায়, মণিতে উৎকীর্ণ লিপিগুলির কথা পূর্ব অধ্যায়েই বলে এসেছি। এইবার গ্রন্থের নাম দিতে চাই।

(১) "দীন্ করত্" বা ধর্মের কার্য। এই সুবৃহৎ গ্রন্থে জরথুশ্ত্রীয় ধর্মের কি যে নেই, তা বলা দুষ্কর। বিধি, নিষেধ, আচার, অনুষ্ঠান, আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ এবং আখ্যানভাগে পরিপূর্ণ এই মহাগ্রন্থ।

(২) "বুন্দ-হীশন্" বা ভূমিদান। এতে আছে অহুর মজ্দার সৃষ্টি এবং অহরীমনের প্রবল বিরোধিতা—অনেকটা দেবাসুরের সংগ্রামের মত।

(৩) দাতিস্তান্-ই-দিনিক বা ধর্মীয় মতবাদ। গ্রন্থকার মানুশ্চীহার, ইনি ছিলেন পার্স ও কিরমানের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত।

(৪) শিকন্দ্-গুমানিক বিজার। এর অর্থ সন্দেহ নিরসন বা ব্যাখ্যান। গ্রন্থখানা নবম শতাব্দীর রচনা। এতে আছে প্রতিপক্ষ

হিব্রু, খ্রীষ্টান, মানীধর্ম তথা ইসলাম ধর্মের সঙ্গে বিচারমল্লতা এবং উপসংহারে জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা।

(৫) দিনা-ই-মাইনোগ খিরদ্‌ বা ধীশক্তির বিচার-বিবেচনা। গুনে গুনে বাষট্টি প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জরথুশ্‌ত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠা।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি সবই ধর্মসংক্রান্ত। এইবার পার্থিব বিষয়ে এসে পহ্‌লবী সাহিত্য দেখা যাক।

(১) কার্ণামাক্‌-ই-আর্তখ্‌শত্র-ই পাপকান্‌। পাপকের পুত্র, সাসানের পৌত্র আর্দশীরের কাহিনী।

(২) অর্দ বিরাফ নামক্‌—এটি এক অপূর্ব সুন্দর গ্রন্থ। ইস্‌কন্দার রুমীর বিজয়াভিযান—গ্রীকশাসন, পরিশেষে সাসানীয় পুনরভ্যুত্থান, এবং তৃতীয় শতকের ধর্মীয় পুনর্জাগরণ; সব কিছুর সুস্পষ্ট ইতিহাস। এখানে বর্ণিত চিন্বৎ সেতুর সঙ্গে ইসলাম ধর্মের 'শিরাত্‌' সেতুর সাদৃশ্য বড় কৌতুকাবহ। এই সেতু চুলের চাইতেও শরু এবং তরবারির চাইতেও ধারাল। এই সেতু মনে রেখেই Lord Byron তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিমায় বলেছিলেন—

"By Alla! I would answer 'Nay'!
Though on Al-Sirat's arch I stood,
Which totters o'er the fiery flood,
With Paradise within my view,
And all its Houries beckoning through—"

Byron, The Giaur, lines 482-86

(৩) অপর একটি গ্রন্থ হচ্ছে 'খুধায়্‌-নামক' আধুনিক পারসীতে নামটি হবে 'খোদা-নামা' History of Masters—এটির সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নেই। খোদা দুনিয়াদারীর খোদা, -শাহ্‌। কাজেই বইখানা রাজপঞ্জী।

(৪) সর্বশেষ একখানা বই-এর উল্লেখ এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য। বইখানা মূলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল—নাম পঞ্চতন্ত্র, রচয়িতা—বিষ্ণুশর্মা। সেখানকার করটক দমনক অংশে পহ্‌লবীতে অনুবাদিত হয়। নাম হয়—'কললগ্‌-দমনগ্‌'। পরে এই গ্রন্থ পহ্‌লবী থেকে

আরবীতে অনুবাদিত হয়ে নাম গ্রহণ করে—কলিলহ্-দিমনহ্—উচ্চারণ কলিলা-দিমনা।

একটি নতুন ধর্মপ্রবক্তা ও তাঁর সংক্ষিপ্ত ধর্মমত এবং সেই ধর্মের একটুখানি ঝলক দিয়ে মধ্যমস্তরের পার্সী পহ্লবী সাহিত্যের আলোচনা শেষ করব। এই নবধর্ম প্রবক্তার নাম 'মানী'। ইনি রক্তে ইরানী হলেও জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাবিলনে ২১৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই ধর্ম য়ুরোপে 'Manichaeism' বলে পরিচিত। এই ধর্মে বিশ্বাসীদের ফার্সী কথায় বলে মান্বীয়ান্। 'মানী' সে যুগের শ্রেষ্ঠ সমন্বয়বাদী। তিনি প্রতিধর্মেই সারবস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন মনে হয়। সেইজন্য তাঁর মতবাদে জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয়। পরিপূর্ণ যতির জীবনই তাঁর আদর্শ। তপস্যাই সিদ্ধিপ্রদ। তিনি বুঝেছিলেন এই সংসারে আলো ও অন্ধকারের ন্যায় পরমতত্ত্ব ও পার্থিব বস্তুর নিত্যদ্বন্দ্ব চলেছে। একটি সৎ অপরটি অসৎ, বুঝে চলতে হবে। যোগ ও তপস্যাই সেই উপলব্ধির উপায়।

কোনও মান্বীয় ধর্মাবলম্বীর একটু রচনার নিদর্শন মিলেছে তুর্কীস্থানের তুরফান শহরে। রচনা ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের। কবি বলছেন ফিরিশ্তারা আবির্ভূত হন বিশ্বপতির 'পয়গাম্' নিয়ে। তাঁরা দিব্যকান্তি, আনন্দময় ও শৌর্যশালী। মূল কবিতাটি উদ্ধৃত করি—

পিরিস্ত্গান্ রোব্শনান্ ফিরহ্গান্ কিরদ্গরান্।

বঘান্ তহমান্ 'অরদ' মেহেরসপেন্দান্ ইস্তারদানদ্ হিয়ারান্ জুরমন্দান্॥

ফিরিশ্তারা (দেবদূত) আলোময়, আনন্দময়, সর্বশক্তিময় (ঈশ্বরকল্প)। তাঁরা শৌর্যময়, তাঁরা সূর্যসম, প্রেমদাতারূপে দাঁড়িয়ে বলছেন—জোরমন্দ্ ইয়াররা অর্থাৎ ক্ষমতাশালী বন্ধুরা।

এইবার পারসী ভাষার আদি ও মধ্যযুগের আলোচনার ছেদ এখানেই টানতে পারি। আমরা দেখেছি প্রাচীন পার্সীর অঞ্চল ভেদে দুটি রূপ (১) প্রাচীন পার্সী—দরী (২) প্রাচীন পার্সী—অবেস্তীয় গাথা। তারপর মধ্যমস্তরের পার্সী যার নাম পহ্লবী। এই দুটি পদ্ধতি (১) হুজবারেশ যাতে মনন ও প্রকাশে আসমান জমীন ফারাক (২) দুর্বোধ্য হুজবারেশের বিশ্লেষণময় ভাষা যার নাম পাজন্দ। প্রথমস্তরের ভাষাতেও উপভাষা

অবশ্যই ছিল। মিদীয় উপভাষার নিদর্শন মেলে নি, তবে উপভাষাটি ছিল। এমনই শকভাষার অস্তিত্বও স্বীকার করতে হবে। মধ্যমস্তরে এসে শকভাষার নিদর্শন পাই খোতানী (Khotanese), যাতে একদা বহু বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদিত হয়। এ ছাড়া ছিল তুরফানী—তুরফান অঞ্চলের ভাষা, এবং সোগ্‌দীয়—সোগদীয় অঞ্চলের ভাষা।

আরব কর্তৃক ইরান-বিজয়

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, সাসানীয় রাজত্বের সমকালীন সাহিত্য হুজবারেশ থেকে মুক্ত ক'রে পাজেন্দ প্রণালীতে পড়লে যে ইরানী ভাষার পরিচয় মিলে তাই হচ্ছে পহ্‌লবী। এই পহ্‌লবীতে নিবদ্ধ সাহিত্য একান্তভাবে ধর্মনির্ভর। জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্মের সমবেত প্রার্থনা, যজ্ঞ, যজ্ঞবেদী, নানাবিধ আচার এবং অনুষ্ঠানের দিশা দেখায় এই সাহিত্য। অবশ্য কিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক রচনাও ছিল। সেলুকিদ সাম্রাজ্যে যে ভাষা নানাপ্রকার সামীপ্রভাবে কণ্টাকাকীর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, সেই ভাষা সাসানীয় যুগে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে বিশুদ্ধ হ'য়ে উঠল। কিন্তু ভাষার এই শুদ্ধাচার চিরকালীন থেকে যেতে পারে না। কোন দেশে কোন ভাষার ভাগ্যেই তা ঘটে নি। ইরান আরব কর্তৃক বিজিত হ'ল ;—আরবী-পার্সী-মিশ্রণ তখন ভাষা ও সাহিত্যকে এক নবদিগন্তে টেনে নিয়ে গেল। আরব তখন নব-প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মে উদ্দীপ্ত। আল্ ফখ্‌রীর প্রমাণ অনুসারে বলা চলে, আরবের ইরান-জয় ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই সময় শেষ ইরানী সম্রাট যজ্‌দ্‌দি গির্দ (যজ্‌দ্‌-গ্রাহী বা আপ্তেশ্বর) ইরান থেকে পালিয়ে খোরাসানে যান।

আমরা যখন আধুনিক পার্সী বা ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য বলি তখন মুসলিম পারস্যের ভাষা ও সাহিত্যই বুঝি। তাতে লিপি আরবী। সুতরাং 'রুদগী'র মতো সহস্র বৎসরের পুরাতন কবিকেও আমরা আধুনিক পার্সী সাহিত্যের কবি বলব। এতে কিছুমাত্র ভুল হবে না,

যেমন ভুল হয় না, শেক্‌সপীয়রকে আধুনিক ইংরেজী ভাষার লেখক বললে। ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু তা অপরিচয়ের তিরস্করিণীতে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায় নি। ফার্সী ভাষার হাজার বছরেও পরিবর্তন প্রায় হয়ই নি—এ কথার উল্লেখ আমরা প্রাচীন পার্সী ও পহ্‌লবী ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে একবার করে এসেছি। মূল ইরানী ভাষায় অবশ্যই উপভাষাগত পার্থক্য ছিল, কারণ সাম্রাজ্যটা ছিল বিস্তীর্ণ। ওই উপভাষাগুলির বিবর্তনে পশ্চিমে কুর্দিস্তানী, পূর্বে আধুনিক পুশতো, মাকরানী ও বালোচী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ ক'রেছে। তাছাড়া মূল ভূখণ্ডের ভাষাতেও সামান্য হলেও উপভাষাগত বৈলক্ষণ্য কিছু কিছু চিরকালই ছিল। বিষয়টি স্পষ্ট করতে আমরা হমদানী বা লুরী উপভাষায় রচিত একটি সঙ্গীত থেকে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করছি। এর কবি, অন্তত হাজার বছর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, নাম তাহির-ই-উরিয়াঁ।।

"চি খুশ বি মিহরবূনী অজ় দূ সরবী
কি যক্ সর মিহরবূনী দরদ-ই-সরবী।
অগর মজনু দিল-ই-শূরীদাই দাশ্‌ত
দিল-ই-লয়লা অজ় উঁ শূরীদা-তর বী॥"

প্রেমনামক অনুভূতি যদি যুগপৎ দুটি মাথা থেকে আসে, তবে কী আনন্দ! একতরফা ভালবাসা শিরঃপীড়া। যদি বল, মজনু প্রেমার্ত হৃদয় ধারণ করেছে, তবে বলি, লয়লার হৃদয় অধিকতর প্রেমার্ত ছিল। এ ভাষা সম্পূর্ণরূপে ফার্সী, তবু লক্ষণীয় ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য—বুবদ ক্রিয়ারূপ বী, মেহেরবানী মিহরবূনী। আরও একটু অগ্রসর হচ্ছি—

"মগর শের উ পলঙ্গী আয় দিল আয় দিল
ব মু দা'ইম বি-জঙ্গী আয় দিল আয় দিল!
অগর দসতুম ফুতী, খূনত বি-রিঝুম্
বি-বিনুম তা চি রন্‌গী, আয় দিল আয় দিল!

'ওরে হৃদয়! তুই নিশ্চয় সিংহ কি নেকড়ে, (একটা কিছু হিংস্র স্বভাবের নিশ্চয়ই) আমাদের সঙ্গে নিত্য চলেছিস লড়াই করে। তোকে ধরতে পারলে চূর্ণ ক'রে ফেলতাম (ফত্-চূর্ণকরা) এবং তোর রক্ত ঝরিয়ে দিতাম; শেষে দেখতাম ওরে হৃদয়! তুই কোন রঙের

রঙ্গীন।' হায় মন! হায় মন! এখানেও সেই উপজাবাগত 'উ' প্রবণতা। ব-মা-বমু। বিনম্‌ রিজম্‌ বিনুম্‌ রিঝুম্‌।

আরব বিজয়ের ইতিহাসে আসা যাক। বাইজেনটিয়াম কৃষ্ণসাগরের প্রবেশের মুখে। এশিয়া ও য়ুরোপের সন্ধিস্থলে এ নগর প্রতিষ্ঠিত করেছিল গ্রীকরা। পরে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'লো রোমানদের। রোমসম্রাট Constantine একে পুনর্গঠিত ক'রে নাম দিলেন কনস্টান্টিনোপল। বর্তমানে এটি 'ইস্তাম্বুল'। পশ্চিম এশিয়ার এই সন্ধিস্থলের জন্য একদা প্রচুর রক্তপাত হ'য়েছে। যুধ্যমান ছিল ইরানী আর তুরানী জাতি। এই দুটি জাতি দীর্ঘ দীর্ঘকাল অহি-নকুল সংগ্রাম ক'রে মরেছে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া দলিত মথিত হয়েছে। কখনো তুর্কীর জয়, কখনও ইরানের জয়, কিন্তু বিজিত দেশগুলির ভাগ্য থেকেছে একই প্রকার—তারা হয়েছে লুন্ঠিত, হৃতসর্বস্ব এবং পরিণামে চরম দারিদ্র্যে অভিশপ্ত। আর বিজয়ী তুর্কী ও ইরান? তাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত এসেছে বিলাসিতা, অকর্মণ্যতা। শাসককুলে এসেছে স্বৈরাচারের সর্বনাশা অভিশাপ। এইবার ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হ'লো।

আরবের মরুরাজ্যে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একজন মানুষের জীবন যাত্রা শুরু হ'লো। দুঃখ, দুর্দশা, নির্যাতন, পীড়নের অভিজ্ঞতা নিয়ে নিয়ে তিনি খাঁটি কর্মী এবং পরিণামে বুদ্ধির উপরে যে বোধি, সেই বোধির বলে দিব্যদর্শী নেতায় পরিণত হলেন। ক্রমশ অবস্থা তাঁকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। তিনি অনুপ্রাণিত হ'য়ে যা দর্শন করেছিলেন, অকপটে তাই লোকসমক্ষে প্রচার করলেন। ফল হ'লো আশাতীত। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত আরব এক ধর্মের বাণীতে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হ'লো। দুঃখ পেলে অনুভব ক'রো, এক আল্লার কোমল স্পর্শেই তা দূরে যেতে পারে, সুখ পেলে উপলব্ধি ক'রো, তিনিই সর্বসুখের দাতা, তিনিই করুণাময়, তিনিই সর্বশক্তিমান্—তিনিই সকলের উপরে—

"ও ইঁ আমসাকিল্লাহো বে সুসরে, ফা লা কশিফা লাহু ইল্লাহু
ওইঁ আম সাক বে খয়ের, ফাহুয়া আলাকুল্লে শয়ীঁ কদীরা।"
আল্লা হু রহমান রহীম, আল্লা হু আকবর॥"

এই নব ধর্মের উদ্গাতা বললেন—সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখে নির্ভীকভাবে কর্ম কর; কর্মফলদাতা স্বয়ং ঈশ্বর। সাম্য ও সৌভ্রাত্রই জীবন। এর ফলে সপ্তম শতাব্দীর আদর্শভ্রষ্ট খ্রীষ্টধর্ম, ক্ষয়িষ্ণু অগ্নিউপাসক জরথুশ্ত্রীয় ধর্ম, এবং আত্মকলহে দুর্বল য়িহুদী ধর্ম কোন প্রতিরোধ করতে পারল না। হজরত মহম্মদের পর যাঁরা প্রকৃত খলিফা—'খোলফায়ে রাশেদীন্' —সেই খলিফা চতুষ্টয়ের জীবন ছিল সর্বকালের সর্ব মানুষের আদর্শস্থল। আরবের মানুষরাও তৈরী হ'য়েছিল সেদিন বিলাস ও বাহুল্য-বর্জিত জাতিরূপে—আচরণে সদানন্দ, আলাপে সুরসিক; কিন্তু সে জাতি অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং বাধার সম্মুখে নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন।

না, তখনও ইরানে প্রাচীন ধর্মগুলির মুলোচ্ছেদ হয় নি। প্রথমদিকে বিধর্মীর উপর জুলুমও ছিল না। বিধর্মীদের এক প্রকার ঢালাও কর দিতে হ'ত, তার নাম 'জিজিয়া'। এই করের তাৎপর্য বলছি। মুসলমান হলেই নিত্য এবং নৈমিত্তিকরূপে এই পাঁচটি কর্ম অবশ্য করণীয়, যার নাম 'ফরজ'—নমাজ, রোজা, জাকাত, হজ এবং জিহাদ। প্রার্থনা, উপবাস, নিত্যদান, তীর্থদর্শন এবং প্রয়োজনে ধর্মযুদ্ধ। এই পাঁচটির কোন একটিও বিধর্মীর উপর কর্তব্যরূপে আরোপিত হ'ত না বলেই এই রাজনীতিক কর। ইসলাম ধর্মে ধর্মনীতি ও রাজনীতি আলাদা নয়—স্মরণ রাখা ভাল। জিজিয়া শব্দটি আর্মানী শব্দ, আরবীও নয়, পার্সীও নয়। আর্মানী শব্দটা 'গজীৎ'। আর্মানী মসগীত্ হয়েছে আরবী মসজিদ্ আর গজীত্ হয়েছে জিজিয়া।

এই বিজয়ের মহা আড়ম্বরেও সাহিত্যের দিকে, রাজ্য পরিচালনার দিকে, রাজস্বের বিধি বিধানের দিকে আরবের দেবার কিছুই ছিল না। ওরা এ সব বিষয়ে বিজিত ইরানের সাহায্য নিয়েছে। ভাষা সম্বন্ধে অবশ্য আরবের দম্ভ ছিল খুব। 'আরব' শব্দের একটি অর্থই হচ্ছে সেই জাতি, যে ভাষার দিকে দরাজ—eloquent। তারা অন্যান্য ভাষাকে দরিদ্র মনে করত। আত্মসচেতন জাতিগুলির এই প্রকার ভাষার অহঙ্কার থাকে। গ্রীকরা অগ্রীকদের জানতো 'Barbaros' বা অস্পষ্টভাষী অসভ্য বলে। ভারতীয় আর্যরা তাদের দেব-ভাষার বড়াই নিয়ে একদা অন্য ভাষা ব্যবহার করার নিষেধ জারী করেছিল—'ন

ম্লেচ্ছতবৈ নাপভাষিতবৈ' ম্লেচ্ছ কথা বলো না, অপভাষা ব্যবহার ক'রো না। যাক এ কথা স্বীকার করি, আরবীভাষার শব্দভাণ্ডারে অজস্র শব্দ আছে। বড় বেশি আছে। তাই বুদ্ধিমান আওরঙ্গজেব একদা খেদ করেছিলেন—'আমার শৈশব এবং বাল্য আরবী শব্দের ব্যূহে না কাটালে—কোন ক্ষতি হোত না'—"He learnt Arabic, wasting—as later he complained—the precious hours of his youth—in the dry, unprofitable and never-ending task of learning words"—Aurangzeb, Elizabeth D'oyley.

যে যুগের কথা বলছিলাম সে যুগে সাহিত্য ও চিন্তার রাজ্য থেকে ইরানকে দেবার কিছুই আরবের ছিল না। তারা ধর্ম দিয়েছিল একথা সত্য। আর এ কথাও সত্য নবযুগের পার্সীভাষা আরবীভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে বলিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দুইয়ের মেশামেশি হয়ে গেল। এমন হওয়াই স্বাভাবিক। যে পার্সীভাষা ইতিপূর্বেকার বিদেশী সেলুকিদ শাসনে আরামাইক উপাদানে বিমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল আবার তাতে সিরীয় ও কল্‌দীয় উপাদানেরও অভাব ছিল না—কারণ ও দুটি ভাষা আরামাইকে সর্বদা বিচ্ছুরিত হোত; সেই ইরান এখন ভাষায় আরবী পোশাক পরে ফেলল। এইবার আরবী রীতিতে, আরবী লিপিতে, আরবী মিশ্রিত পার্সীভাষার নতুন আবর্তন আরম্ভ হ'লো। এই যুগের নাম ইসলামী যুগ।

অতঃপর আমরা এই ইসলামী যুগের সাহিত্যের পরিচয় দিতে অগ্রসর হচ্ছি। এই ইসলামী যুগেও মাঝে মাঝে ইরানী কবিদের ইচ্ছা হয়েছে তাদের মাতৃভাষার বিশুদ্ধ রূপ তাঁরা উপাসনা করবেন। কিন্তু সমতলের গঙ্গাধারাকে কি কখনো পাহাড়ের চূড়ায় তোলা যায়? ভাষা যখন ভিতরের মন এবং বাহিরের জিহ্বাকে কব্‌জা করে ফেলে, তখন পুরাতনে ফিরে যাওয়া যে কী কষ্টসাধ্য কৃত্রিম যুদ্ধ, তা আমরা জানি। আমরা কি আর কখনো বিশুদ্ধ তৎসম, তদ্ভব এবং দেশি শব্দের সাহায্য নিয়েই বাংলায় কথা বলতে পারব? সিদ্ধাচার্যরা সহস্রবৎসর পূর্বে যা পেরেছিলেন, আমরা তা পারিনে। আমাদের কথার মধ্যে অনিবার্য বেগে আসবে পার্সী-আরবী তুর্কী পর্তুগীজ ইংরেজী শব্দমালা। শুধু

তাই নয়, আমাদের কথার মধ্যে এসে যাবে ইংরেজী কায়দা, ইংরেজী প্রসাধন। আমাদের শব্দভাণ্ডার তো বাংলা, পার্সী ও ইংরেজীতে ভরপুর। একাদশ শতাব্দীতে ইরানী কবি ফেরদৌসী চেয়েছিলেন তাঁর শাহ্‌নামা রচনা করবেন বিশুদ্ধ পার্সী শব্দ দিয়ে, তাতে কোন বিদেশী উপাদানের স্পর্শও থাকবে না। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন অনেক শব্দ নিতে যেগুলি পার্সী হলেও সূক্ষ্মসন্ধানে বিদেশী-মূল শব্দ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

এই প্রসঙ্গে পার্সীতে ব্যবহৃত কতগুলি বৈদেশিক শব্দ তুলে ধরতে চাই। এই শব্দগুলি আরবীর মধ্য দিয়ে পার্সীতে এলেও মূল তাদের অন্যত্র—আরবে নয়।

(১) পার্সী—আবনুস মূলে গ্রীক ebenos, গ্রীক eben মানে পাথর। পাথরের মত শক্ত কালো কাঠ। শব্দটি আফ্রিকার মনে হয়, কারণ 'হাব্‌স' আরবীতে আবেসেনীয়া। পার্সী আবনুস ইংরেজী Ebony.

(২) পার্সী কইসর Caesar ছাড়া কিছু নয়। রোমান সমরনায়ক স্বৈরী Caius থেকে সীজর। জার্মান কথা Kaiser, গথিক—Kaisar, রুশী Czar.

(৩) আল্‌কীমীআ বা শুধু কীমীআ আরবী এবং পার্সী শব্দ। গ্রীক Alchemy ইংরেজী Chemistryর মূল। শব্দটি মূলে মিসরের 'খেম'। ওরাই প্রথম অন্য ধাতুকে সোনায় আনতে চায় এবং জীবন-রসায়ন তৈরী করতে চায়। ইন্দ্রজালের রাজ্য ছিল Egypt.

(৪) গ্রীক কথা ছিল Kanōn মূলে যার অর্থ অবক্র সরল দণ্ড—তাই শাসনদণ্ড। এর থেকে আরবী এবং পারসীতে কানূন্।

(৫) গ্রীক কথা diadēma—dia = round, dēom = bind রাজ-মস্তকে আবদ্ধ সূত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার, সর্বশেষে ইংরেজী diadem—রাজমুকুট। শব্দটি পার্সীতে গতি নিয়েছিল দীহীম রূপে।

(৬) আর্মানী শব্দ গজীত্‌ হয়েছিল আরবী পার্সীতে জিজ়িয়া।

(৭) আরবী পার্সী তিলসম্—গ্রীক telein অর্থ মন্ত্রপূত-সূক্ষ্মফলপ্রদ বস্তু—ইংরেজী Talisman.

(৮) 'দীনার' আরবী পার্সী-এর পুরাতন রূপ 'দিন্নার'। শব্দটি লাতীন Denarius.

(৯) আরবী ফার্সী—সন্দাল চন্দন কাষ্ঠ বা চন্দন। মূলে ভারতীয় শব্দ 'চন্দন'—এরও মূল মনে হয় দ্রাবিড় ভাষায় আছে। দক্ষিণ ভারতের জিনিস এটি—আধুনিক তামিল চান্তু (cāntu) চন্দনবৃক্ষ। রুমী দুনিয়া ভারত থেকে এই জিনিস নিয়েছিল। লাতীন 'সন্দালুম', ইংরেজী sandal (wood).

এই ইসলামী যুগের সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে হ'লে প্রাচীন ইরানী সংস্কারগুলি নিয়ে থাকলে চলবে না। আমার বক্তব্য, এই নব যুগের পারসী সাহিত্য নবধর্মের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে গেল। মুসলিম ধর্মশাস্ত্র, সুবিস্তৃত সেমীয় পুরাণ কাহিনী এবং মুসলিম আচার-আচরণের জ্ঞান এবং প্রয়োজন স্থলে অভিজ্ঞতাকে সোপান ক'রে এই সুবিপুল সাহিত্যভাণ্ডারে প্রবেশ করতে হয়; নতুবা মর্ম উদ্‌ঘাটন অসম্ভব। এই সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে, সমগ্র পশ্চিম এসিয়া এবং পূর্ব এসিয়ার ইতিহাস, মিসর (Egypt) ও পশ্চিম য়ুরোপের ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে সিন্ধু-নদের অপর তীরের এই সুবিপুল ভারতবর্ষ। দুনিয়ার একটা বৃহৎ অংশ, তার রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন এই সাহিত্যের সঙ্গে অনিবার্য-ভাবেই সংপৃক্ত হয়ে গিয়েছে। দিগ্‌বিজয় ও লুণ্ঠন, সংগ্রাম ও সন্ধি, বিদ্রোহ ও শান্তি, সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নির্মম নিষ্ঠুর রক্তপ্লাবন অনেক কিছুই বিজড়িত এই সাহিত্যের ইতিহাসে। এই প্রসঙ্গে সুন্নী উম্মাইদ ও শীআ আব্বাসীয় খলিফাদের সাম্প্রদায়িক লড়াইর কথা মনে আসছে; আর মনে আসছে—ইরানের উপর দিয়ে—তুর্কী ও মঙ্গোলদের লুণ্ঠন ও তাণ্ডবের কথা এবং বাগদাদে শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল্ মুস্তাসিমের সপরিবারে নিধনের কথা। এক কথায় সুদীর্ঘকাল ও সুবিপুল দেশ সংবদ্ধ হ'য়ে আছে এই তৃতীয় পর্যায়ের পারসী সাহিত্যের সঙ্গে।

এহো বাহ্য। ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল থেকে দার্শনিক বলয়রেখা, আকাশের ইন্দ্রধনুর মত আমাদের অভিভূত করে রাখে। এক সময় ইরানে সূফী ধর্মের প্লাবন এসেছিল। প্রথমশ্রেণীর বহু কবি তাঁদের কাব্য সাধনা এবং অধ্যাত্ম সাধনার সমন্বয় করতে পেরেছিলেন। মনন ও

অধ্যাত্ম চেতনার দিক দিয়ে সে যুগ সত্যই অতুলনীয়। সে সাহিত্য প্রেমের টানে উপচে পড়া মাধুর্যের পরিপ্লব। সে সাহিত্যের কবি বলেন—মজহাব-এ-ই'শ্‌ক দারম্‌—আমার ধর্ম একটি, সে ধর্মের নাম প্রেম, আমি সেই ধর্ম ধারণ করি। সেই কবি আবার বলেন—আমার ভালবাসার এই পৃথিবী ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতে চাইনে। "বরতর অজ় গরদূঁ মোকাম-এ-আদম অস্ত"। মানুষের বাসস্থান—এই মাটীর পৃথিবী স্বর্গ থেকে বড়। আর এক প্রেমের সাধক সগর্বে বলেছিলেন—সাম্প্রদায়িক মোল্লারা কোরানের অস্থিপঞ্জর নিয়ে কুকুরের মত লড়াই করছে, আমি সুখী ; আমি কোরানের মগজটা তুলে নিয়েছি। হাড়গুলি কুকুরের সম্মুখে নিক্ষেপ করেছি। 'মন্‌ জ় কোরান মগ্‌জ় রা বরদাশতম্‌, উস্তখোয়ান্‌ পেশে সগান্‌ আনদাখ্‌-তম্‌"। ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য এই সুফী সাহিত্য। এই সাহিত্যে প্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা। দিব্য প্রেরণা সেখানে সুরা, প্রেমের গুরু সেখানে সাক়ী, বিষয় সেখানে অপার্থিব প্রেম-সম্ভোগ।

এই নবধর্ম কোরানের বাণীর প্রতিকূল কিছু নয়। তার আচারে এবং আচরণে যে বিদ্রোহ আভাসিত হ'য়ে ওঠে, রহস্যের আবরণ উন্মুক্ত হ'লে তা নির্বিরোধ শান্তি এবং আনন্দে লয় প্রাপ্ত হয়। সর্বশক্তিমান প্রেমময় আল্লা তা'লায় আত্মসমর্পণের নাম 'ফানা' ; সেই ফানাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। সে আসে প্রেমের মধ্য দিয়ে। এই নব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম উন্মেষ আরবে, তার প্রসার ইরানের মধ্য দিয়ে দূর দিগন্তে বিস্তৃত হ'ল। মনে হয় তার শেষ পরিণাম এই ভারতবর্ষে। আল্‌বার, বৈষ্ণব এবং আউলিয়াদের গ্রন্থিবন্ধনে সে পরিণাম বড় মধুর, বড় সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছিল।

আরবে ইরানে দ্বন্দ্ব ও মিলন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আরবজাতির ইরান বিজয়ের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সূত্র ধরে সেই বিজয়-কাহিনীর মূল তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করেছি। ইরানী ভাষা ও সাহিত্য আরবী শব্দমালায় এবং আরবের

নবধর্ম ইসলামের ভাবধারায় পরিপুষ্ট হ'তে থাকল। কিন্তু স্মরণ রাখা ভাল, নদীর জলধারায় স্রোতের প্রতি-স্রোত থাকে। মানুষের ভাবধারাও প্রকৃতির এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে যেতে পারে না। আঘাতের প্রতিঘাত আসে, প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকে। ইরানের পুরাতন ধর্ম গেল, অনুষ্ঠান গেল, লিপি গেল—নতুন ভাবনার উদ্দীপনা পুরাতনের সমাধি রচনা করে দিল। কথাগুলো যতো সহজে বলা যায় তত সহজে বুঝলে বিপদের সম্ভাবনা। মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার অনেক নীচে বিপরীত জলস্রোতের ক্রিয়া চলছে লোকচক্ষুর অগোচরে, কিন্তু তার শক্তি কি প্রচণ্ড!

আমাদের সিদ্ধান্তের পথে সামান্য কিছু ইতিহাসের আলোকচিত্র দেখে নেওয়া ভাল হবে। হজরত মোহম্মদের পরে এলেন পর পর চারজন খাঁটি খলিফা—খুলফায়ে রাশেদীন্—(১) হজরত আবুবকর সিদ্দীক্, (২) হজরত ওমর ফারুক্ (৩) হজরত ওসমান্ গনী (৪) হজরত আলী। এর পরবর্তী খলিফা মাবেয়া নিজ ভুজবলে ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম সাম্রাজ্য যতই বিস্তৃত করুন, তিনি ছিলেন রাজা—ঠিক খলিফা বা ধর্মনায়কের আদর্শ তার মধ্যে খোঁজা ব্যর্থ হবে। তিনি আপন পুত্র এজিদকে বুঝিয়ে দিলেন—তার সিংহাসন লাভের দুটি বড় কণ্টক—বড় দুশমন হবে হজরত আলীর পুত্রদ্বয় হাসান ও হোসেন। এজিদের পাপচক্রের কথা সকলেরই জানা আছে, যার শেষ হয়েছিল কারবালা প্রান্তরের করুণ কাহিনীতে। প্রকৃত প্রস্তাবে মাবেয়া খিলাফৎকে আ'মরত্ বা আমীর চক্রে পরিণত করে যান। এই প্রবাহের নিকৃষ্ট উদাহরণ দ্বিতীয় ওয়ালেদ। তার চালচলনে নিত্যবিধির* নিত্যস্খলন ঘটেছে—অথচ তিনি খলিফা—'ধর্মগুরু'। এই সময় একটা রক্ষণশীল অতিনৈতিক (Puritan) আন্দোলন মদিনা ও মক্কায় আরম্ভ হয়। এই আন্দোলন দামাস্কাসের বিলাসিতা ও শূন্যগর্ভ অহঙ্কারের বিরুদ্ধে। সে কথা অনেক পরে আসবে। আপাতত দুটি বিবদমান আরবী বংশের ইতিহাস বলা প্রয়োজন। এর ভেতর থেকেই জন্ম নিয়েছিল আরবের

---

* পঞ্চবিধি নমাজ, জাকাত, রোজা, হজ ও জেহাদ।

বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিক্রিয়া। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবার উম্মায়ী ও আব্বাসী। যার আরম্ভ মাবেয়া থেকে, সেই উম্মায়ী খলিফারা প্রতিষ্ঠা পান প্রথম ; কিন্তু ত্রিশ বছরেই এ বংশ উৎখাত হয়। আব্বাসীরা তাদের পরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। উম্মায়ী খলিফা 'হেশামের' সময় (খ্রীঃ ৭২৪-৪৩) একটি পারস্যতনয় 'য়াসর' আপন ইরানী আভিজাত্যের বড়াই করেছিল বলে হেশাম তাকে জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে হত্যা করেছিলেন—ছোট মুখে বড় কথা! 'যাসর' বলেছিল রাজরক্ত আমার দেহে, আমার পূর্বপুরুষ খুসরো, শাপুরের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা ছিলেন সংগ্রামে সিংহ—তাঁদের বিক্রমে কাঁপত তুর্কীরা, গ্রীকরা।—হে রাজন্! যদি জানতে চান আমার বংশের পরিচয়, তবে বলি—'রাজরক্ত বয়ে যায় আমার শরীরে,—আমার কুল তামাম দুনিয়ায় অতুলনীয়—আমি ইরানী।' 'যাসর' জলে ডুবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই উদ্ধত উত্তরের জবাব পেয়েছিল। সাধারণ ইরানী অহঙ্কার করলে আরবীরা বলতো—'জানি জানি! বিচিলির ব্যবসা করতো তোদের বাপ-দাদারা—ক'বছরেই তোরা রেশমী জামা গায়ে দিয়ে, সোনালী বুটিদার চাদর উড়িয়ে চলেছিস। তোদের মেয়েরা সুর তুলে রোদে বসে জলের চাকা ঘুরাতো—আজ তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়া ইরাকী শাড়ী পরে বড়াই করছে।

একজন অন্ধ ইরানী কবির ভাগ্য শুনুন। ৭৮৪ সালে তাঁর প্রাণদণ্ড হ'লো। অপরাধ তিনি স্বাধীন-চেতা এবং অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং সত্য কথা স্পষ্টভাবে বলেন। তিনি কোন অহঙ্কারী আরবীকে বলেছিলেন—তোমরা দুনিয়াজয়ী, এ অহঙ্কারের কোন মূল্য নেই। পৃথিবীটা কালো—আর অগ্নি উজ্জ্বল। অগ্নির জন্ম থেকেই অগ্নি পূজা পেয়ে এসেছে। অন্ধকার পৃথিবীও সেই অগ্নির তেজেই আলোকময়।

এই গল্পগুলি বলার উদ্দেশ্য—ইরান নবধর্ম গ্রহণ করলেও তার স্বাজাত্যবোধ কখনও লুপ্ত হয়নি। খিলাফতের দ্বন্দ্বে ইরান অংশ গ্রহণ করেছিল সাফল্যের সঙ্গে। উম্মায়ী ও আব্বাসী দ্বন্দ্বে ইরান কর্তৃক আব্বাসীদের সাহায্য অবিস্মরণীয়। আবদুল্লাহ আব্বাস থেকে এই রাজবংশের আরম্ভ ব'লে এঁরা আব্বাসী খলিফা। সংখ্যায় ছিলেন পর পর সাঁইত্রিশ জন। আব্বাসের পরবর্তী খলিফা মনসুর দামাস্কাস থেকে

রাজধানী সরিয়ে আনলেন বাগদাদে। বাগদাদ এখন ইরাকে হ'লেও, তখন ছিল ইরানের অন্তর্গত। ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মরুভূমির একপ্রান্ত সিরিয়া থেকে চলে এল অপর প্রান্তে—পারস্যে। দামাস্কাস থেকে খাঁটি মেসোপোটামিয়ার দোয়াবে, তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের সন্ধিস্থলে বাগদাদে রাজধানী নির্বাচন ভবিষ্যৎ ইতিহাসের প্রথম সংকেত। পারস্যের সাসানীয় শাসকদের রাজধানী ছিল এই বাগদাদ। ধীরে ধীরে আরবী শাসকদের মধ্যে সেই প্রাচীন সুলতানদের জাঁকজমক যেন নবজন্ম লাভ করলো। সেই পুরাতন ইরানের আদর্শে ইরানী, তুরাণী ও আরবী ওমরাহ তৈরী হ'তে লাগল। ইরানী কায়দায় সৈন্য গঠন চললো। মক্কা আর মদিনা শুধু তীর্থস্থান হয়ে রইল। আরবী ভাষাটি বেঁচে রইলো ঠিকই, কারণ ভাষাটি মধুর, সঙ্গীতময় কাজেই কবিত্বের সহায়ক। আর আরবী কোরানের ভাষা—ধর্মের ভাষা। কিন্তু এইবার প্রতিস্রোতের পালা। আরবী ভাষায় পার্সী ভাষার প্রভাব হ'লো দুর্বার। আরবের শাসনকর্তারা আদর্শ করলেন বাইজেনটিয়াম ও পার্সী সুলতানদের শাসন পদ্ধতি। পূর্বের খালিফাদের সাক্ষরতা কোন অপরিহার্য গুণ ছিল না। কিন্তু ইরানের সাসানী যুগেও 'দবীরী' বা 'লিখনজ্ঞান' প্রশংসার বিষয় ছিল। আরবে সাক্ষর জ্ঞানের চাইতে প্রশংসাযোগ্য ছিল উপস্থিত বুদ্ধি ও সমস্যা-সমাধানে দ্রুততা এবং তৎপরতা। প্রজার সঙ্গে রাজার ছিল অব্যবহিত সম্বন্ধ। মুখের কথা শুনে তখনই বিচার শেষ। এইবার এল গ্রীকোরোমান এবং সুলতানী আমলাতন্ত্র। রাজা শুনবেন বজীরের কথা। প্রজারা বহু দূরবর্তী। অনেকেই এই 'বজীর' শব্দটাকে আরবী √'বিজ্‌র্' ধাতু-নিষ্পন্ন করেন। এই ধাতুর অর্থ ভার বহন করা। সঙ্গতিও আছে—কারণ রাজ্যের ভার বহন করেন বজীর; আসলে এটি পার্সী কথা এবং পদটিও সুলতানী আমলাতন্ত্রের। পহ্‌লবী বা মধ্যযুগের ইরানী কথা ছিল 'বি √চির্', সংস্কৃত প্রতিশব্দ বি√চর্। বিচির্ আর বিচার অর্থ, বিবেচনামূলক বিনিগমন অর্থাৎ decision after deliberation. লাতীন decidēre, de = away, coedere = to cut, বিরুদ্ধ পক্ষ শাতনের পর একতর পক্ষপাতিনী যুক্তির প্রতিষ্ঠা।

কয়েকটি পার্সী শব্দের আলোচনা করে দেখাব কেমন করে তারা

সহজে আরবী শব্দভাণ্ডারে লব্ধপ্রবেশ হয়েছে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, এই ইরানী শব্দগুলির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় আর্য অর্থাৎ সংস্কৃতের সাজাত্য রয়েছে। (১) পার্সী 'সতূন্' যার অর্থ স্তম্ভ, সে নিশ্চিতভাবে সংস্কৃত 'স্থূনা' শব্দের সগোত্র। মেরুদণ্ডকে বলা হয় 'সুতূনি ফকর' মানে জ্ঞানের বা চিন্তার দণ্ড। তন্ত্রশাস্ত্রের ইড়াপিঙ্গলা সুষুম্না বলয়িত মেরুদণ্ড এবং কুলকুণ্ডলিনী স্মরণ করুন। এই 'সতূন্' আরবী ভাষায় গিয়ে হ'য়েছে 'ইস্তুবানহ'। পার্সী 'পলাস্' মোটা খসখসে বস্ত্র। তুচ্ছার্থে 'পল' সংস্কৃতে আছে, অর্থ তৃণ। এই পলাস আরবী ভাষায় 'বলাস্'। আরবী 'বলা' আবার তুচ্ছার্থে বাংলায় 'বালাই' হ'য়েছে। বালাই—জঞ্জাল। রত্ন গহ্বরে থাকে, তা সমুদ্রগর্ভেই হোক আর মেদিনীগর্ভেই হোক। পার্সী রত্ন হ'লো গরহর (লেখা হয় গাওহর) এই গর্ভ>*গর্হ>গরহর আরবী ভাষায় জরহর। √দস্ ধাতু শ্রান্ত হওয়া অর্থে ঋগ্বেদে প্রযুক্ত। দস্ত দসিত—দুই রূপই পাণিনিস্বীকৃত। পার্সী দশ্ত মানে মরুভূমি বা বিস্তীর্ণ মাঠ। আরবীতে এই শব্দ দস্ত্—প্রান্তর বা মরুভূমি. পার্সীর 'হাত' অর্থে 'দস্ত' নয়। পার্সী—পঞ্জগান্ থাবাগুলি আরবী ফন্জিজান। পার্সী কমানগার ধনুর্ধর আরবীতে কমন্জর্। পার্সী কারবান (Caravan) আরবী কইরবান্। প্রতি স্রোতে পার্সী আরবীকে প্রভাবিত করেছে।

বাগদাদের সর্বোত্তমশাসক হারুন-উর-রসীদের আমলাতন্ত্র, বিলাসিতা ও ন্যায় বিচার—সকলদিকেই অসমোর্ধ্ব। মুসলিম সম্প্রদায়ে সৌর বৎসরের প্রথমদিন নবরোজ সগৌরবে ফিরে এল। এটি ছিল বসন্তের উৎসব। শুধু তাই নয় ফিরে এল 'মিহ্রজান্' বা শারদ-উৎসব এবং 'রামিশ্ত্' বা বিশ্রামের পর্ব। এ সবই মুসলিম জগতে ইরানী প্রথার নবজাগরণ। শুধু পোশাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণে নয়, জ্ঞান বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তায়ও এল নতুন উদ্দীপনা। সুতরাং আব্বাসী শাসনকে অনেকেই জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের দিক থেকে 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দিয়েছেন। আরবের অশিক্ষিত মরুপ্রান্তরের অশ্বারোহী জাতিকে নবচেতনা দিয়ে প্রথম দীক্ষা দিয়েছিলেন পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ। সে জাতির দ্বিজত্ব লাভ হোল আর একবার পারস্যের

সংস্পর্শে এসে। আরবী বদবী (badaw) বেদুইন বা মরু-কান্তারী ভুরঙ্গী জাতি দেখতে দেখতে সাহিত্যের আসরে নব-রঙ্গী হয়ে উঠলো। আরবের উপর পারস্যের বিজয় এইখানে 'হম ইন্ অস্ত্'। এই বিজয় যখন সমাপ্ত হ'লো তখন ইসলামধর্ম নিয়েও ইরানীরা আরবী কায়দায় বলতে পারতো—

'লা হুকুমা ইল্লা' লিল্লা'—হে বিজয়ী আরব সন্তান! ভেবে দেখেছ কি—সালিশী একমাত্র আল্লার হাতে? তিনিই সব ফয়সালা করে দেন —সব সমাধান সেইখানে। আর কারও একতিয়ার নেই মধ্যস্থতার। মনে রেখো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। হজরত বংশে জন্ম নিয়েছ বলেই তোমরা উচ্চ আসন দাবী করোনা। ইসলাম জন্মের আভিজাত্য মানে না. ইসলাম মানে বিশ্বাসের আভিজাত্য (কুরানশরীফ—৪৯-১১ সুরা)।

এই নবজাগরণে শিক্ষিত সমাজ অনুধাবন করলো একমাত্র আরবের ইতিহাস এবং ধর্মগুরুর কুলুজী জানলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না, প্রতিবেশীর ইতিহাসও জানতে হবে। জানতে হবে পারস্য, গ্রীস্, এই-থিয়োপিয়া এবং মিসর। ভূগোল ও ভূতত্ত্বও জানতে হবে। ফলে দেখতে পাই, এই সময় থেকে 'ভ্রমণ' শিক্ষিতের অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হ'লো। এ ভ্রমণ অলস ভ্রমণ মাত্র নয়—এ ভ্রমণ জিজ্ঞাসায় প্রণোদিত —'ফি তলবী ইল্ম্'। তিলবি ইল্ম্ মানেই শিক্ষার্থী। আমরা পরে শেখ সাদী প্রসঙ্গে দেখব—তিনি সেকালের বিশ্বপর্যটন করে ফেলেছিলেন, শুধু পদব্রজে। এ সম্বন্ধে বিশ্বাস ছিল, জ্ঞান-ব্রজ্যা কখনো নিষ্ফল হয় না। দেবদূতেরা পাখা মেলে তাকে সর্বদা রক্ষা করেন। দেখা যায় মিসরে ক্রীতদাস ছাড়া পেলেও মিসর ছাড়তে চাইত না, যতদিন সেখানকার জ্ঞান তার পূর্ণ না হোত। মানুষ ভাবতে শিখলো—লিখিত না হলে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মুখস্থ বিদ্যারও বিনাশ ঘটে; কিন্তু লিখিত বিষয় চিরস্থায়ী। কিতাব হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাফিজ (Recorder)। বিচার করে চলতে হবে। দুনিয়াভর সব-জান্তার মেলা বসেছে। দেখছো না?

হর কসী চিজী হমী গূয়দ্ জি তির রায়-ই-খ্বীশ্।
তা শুমন্ আয়দ্ত কূ কুস্তায় বিন লুকান্তি॥

প্রত্যেকেই দেখাবে, সে সব জিনিস জেনে স্বয়ং জ্ঞানের রাজা হয়েছে। এমন ভাবে তারা চলবে যাতে মনে হবে সে বুঝি লুকার পুত্র কুস্তা। [লুকা এবং তার ছেলে কুস্তা সর্ব বিদ্যার অধীশ্বর ছিল।]

এইবার রাজত্বটা ধীরে ধীরে আরবের হাত থেকে ইরানে চলে যাওয়ার পালা। আব্বাসী খলিফা মামুনের জননী ছিলেন ইরানী। মামুনের ইরানী-প্রীতি প্রসিদ্ধ ছিল। তাহের নামে সেনাপতি মামুনকে সব যুদ্ধে সাহায্য করে ৮১৯ সালে পূর্ব দিকের শাসনভার প্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর 'তাহের' পুত্র তল্‌হা নিজেকে খোরাসান রাজধানীতে স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। এই সাম্রাজ্য (১) তাহেরী সাম্রাজ্য। এর পর (২) সাফারী সাম্রাজ্য, ৮৬৮-৯০৩। সাফারী সম্রাটরা ইরাক, ফারস্‌, খোরাসান, সীস্তান্‌ ও তাবারিস্তানে রাজ্য বিস্তৃত করেন। এর পর অভ্যুদিত হয় (৩) সামানী সাম্রাজ্য। এই সামানী সাম্রাজ্যেই আধুনিক পারস্য সাহিত্য সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লো। সামানীরা সুপ্রাচীন ইরানী রক্তের আভিজাত্য দাবী করতেন। খুবই স্বাভাবিক তাঁরা পার্সী ভাষা ও সাহিত্যের প্রেমিক ও উৎসাহদাতা হবেন। সামানীদের রাজধানী ছিল 'বোখারা'। এঁরা পার্সী ভাষাকেই রাজভাষা বলে ঘোষণা করলেন। ক্রমে ক্রমে আরও দুটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই পূরবীয়ারা বাগদাদের খলিফাদের উপর খবরদারী করতেন। এ বড় কম কথা নয়। কিছুকাল এই ভাবে কাটে। তার পর একটি ঐতিহাসিক পুরুষ তার প্রচণ্ড শক্তি ও অধিনায়কোচিত গুণ নিয়ে অভ্যুদিত হন। তিনি গজনার সুলতান মহ্‌মুদ। তার রাজসভায় কবি ও কাব্যকলার কথা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় হবে।

এখন প্রাক্‌ গজনবী-যুগের সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি। সামানী রাজদরবারে পার্সী সাহিত্যের ও পার্সী কবিদের সমাদরের কথা বলেছি। জনৈক কবি ছিলেন আবু শকুর বলখী। আবু শকুর নাম এবং তিনি বলখ্‌ এর অধিবাসী বলে বলখী। তিনি ছিলেন মসনবী কবিতায় ওস্তাদ। মসনবী হ'লো দুটি চরণে বিভক্ত কবিতা। ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ এবং বীরত্বের বর্ণনা—এই জাতীয় পয়ার ছন্দে ফোটে ভাল। প্রেমের জন্য 'রুবাই' আর বীরত্বের জন্য ও গভীর

জ্ঞানগর্ভ চিন্তা প্রকাশের জন্য 'মসনবী'। আবূ শকূর যা বলছেন তার তাৎপর্য হচ্ছে—অল্পজ্ঞানে আড়ম্বর বেশী হয়। 'গণ্ডুষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে' সংস্কৃতে একটি প্রবাদ বচন। গভীর জ্ঞানে মানুষ নীরব হয়ে যায়। হিন্দী চলিত কথা আছে—'ইলম নহী তো উভল ঘনা'—জ্ঞান নেই, কিন্তু বড় বেশি উত্‌লে ওঠে। বলখী শকূর এই ভাবের নিন্দা করে নিজেকে 'নাদান্' বা মূর্খ বলে বিঘোষিত করেছেন।

"তা বদান্ জা রসীদ্ দানিশ্-এ-মন্।
কে বদানম্ হমী কে নদানম্।"

আমার এইটুকু মাত্র জ্ঞানের উন্মেষ হ'য়েছে যে, আমি বুঝতে পারছি যে আমি 'নদান'—নীরেট মূর্খ।

শকূর বলখীর আর একটি মসনবীতে হিতোপদেশের কথা মনে হয়। 'পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্। উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায়, ন শান্তয়ে।' সাপকে নিত্য দুধ খাওয়ালে সাপের বিষ অমৃত হয় না। শকূর বলখী বলছেন—ঢেলে দাও তুমি বিষবৃক্ষের মূলে স্নেহ-সার আর মিষ্টি দুধ, দেখবে তেতো ফলের গাছ তেতো ফলই দিচ্ছে। কোন দিনই দেখবে না সে মিষ্টি ফল দেয়।

দরখ্‌ত-এ-কে তল্ খশ্‌ বুবদ্ গবহরা।
অগর চরব ব শীরীন্ দিহী মরউ-রা॥
হমান্ মীবহ-এ-তলখত্‌ আরদ্ পদীদ্।
অজ উ চরব বো শীরীন্ ন খ্বাহী মজীদ্॥

শকূর বলখীর আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। মহান্ পুরুষের মহৎ জীবনের পরিচয় কি কখনো পেয়েছ? দেখবে সে-জীবনে জুগুপ্সার কিছু নেই। সে জীবন পবিত্র। সাধু সত্যের অম্লান জ্যোতিতে নিত্য ভাস্বর। দেখবে বিনয় কাকে বলে, উপলব্ধি করবে মানুষের হৃদয় কত কোমল হতে পারে। সাধারণে তাই তিনি অসাধারণ, ভূলোকে তাই তিনি লোকোত্তর। তিনি পৃথিবীতেই থাকুন, আর স্বর্গেই থাকুন তার কোন তুলনা নেই।

খিরদ্‌মন্দ্‌ দানদ্ কে পাকী ব শর্ম্।
দরুস্তী ব রাস্তী ব গুফতার এ-নর্ম্॥

খুরদ্ খুয়্ পাকান্ চুন্ খুয় মলক্।
চি অন্দর্ জমীনী চি অন্দর্ ফলক্॥

সামানী যুগের আর একটি কবির নাম করি—আবুল হাসান্ শহীদ বলখী। এঁর মধ্যে সুফী ভাবধারার স্ফুরণ হয়েছিল। তিনি জেনেছিলেন দুঃখের পরপারে আনন্দের নিত্য উৎস আছে। অন্ধকারেই অন্ধকারের শেষ নয়—জ্যোতি আছে 'তমসঃ পরস্তাৎ'। জ্ঞানই অনন্ত শক্তির উৎস। দুঃখ তিমিরের অবসান হয় জ্ঞানে। আগুন জ্বলে ওঠার আগে ধূমই তো দৃষ্টিগোচর হয়। আগুন জ্বলে উঠলে আর কালো থাকে না। সব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই জাহান (পৃথিবী) অন্ধকারেই থাকতো যদি জ্ঞানের আলো ফুটে না উঠতো। ইদং অন্ধতমং কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্। যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং নদীপ্যেত। আবুল হাসান্ বলখীর কথাতেই বলা যাক্—

অগর গম রা চুন্ আতিশ দূদ বুদী।
জাহান্ তারীক বুদী জাবীদান্॥
দরীন্ গীতী সরাসর গর বগরদী।
খিরদমন্দ্ ন ইয়াবী শাদমান্॥

খিরদমন্দ্ ন ইয়াবী শাদমান্—মহাজ্ঞানী অল্পে তুষ্ট নন। 'নাল্পে সুখমস্তি' 'ভূমৈব কেবলম্'।

আমার কেবলই মনে হয়, জ্ঞানের কোন দেশ কাল নেই। তাই প্রাচীন ভারতে আর প্রাচীন ইরানে ভাবের এই মিলন সূত্র।

সামানী সাম্রাজ্যে আবু আবদুল্লাহ্ জফর বিন মহম্মদ রূদকী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। রূদক্ নামক স্থানে জন্ম হেতু তিনি রূদকী। তাঁর বিশেষত্ব এই, তিনি সকল প্রকার কবিতার রূপকলায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কবিতার নানা রূপ বা form আছে। এখানে সেগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া চলে। মসনবীর কথা বলা হয়েছে—যেগুলি couplet. কিত্বাহ্ পদ্যাংশ। কসীদ—স্তুতি বা প্রশংসা। রুবায়ী চতুষ্পদী। গজ়ল হচ্ছে গীতিবন্দনা বা ode। তিনি সকল রূপে দক্ষ কবি। গানে কিন্নরকণ্ঠ। যন্ত্রসঙ্গীতে অতুলনীয়। তাঁর প্রিয় বাদ্য যন্ত্র ছিল চঙ্গ্। তিনি ছিলেন নস্র্ বিন আহম্মদ এর সভাকবি। এঁরই অনুরোধে তিনি 'কলীলাও

দিমনা'র তর্জমা করেন কবিতায়। 'কলীলাও দিমনা' হচ্ছে পঞ্চতন্ত্রের 'করটক ও দমনক' কথা। এর জন্য তিনি চল্লিশ হাজার 'দিরহাম' পারিতোষিক লাভ করেন।

একবার সম্রাট পাত্রমিত্র সহ প্রবাসে যান। পাত্রমিত্রের আত্মীয়রা স্বজনবিরহে কাতর হ'য়ে রূদকীর শরণাপন্ন হন। রূদকী তখন রাজ-সন্নিধানে থেকেও প্রিয়জন বিরহের বেদনা উপলব্ধি করেন। সেই ক্ষণে তিনি চঙ্গ বাজিয়ে একটি স্বরচিত করুণ সঙ্গীত গান করেন। তার ফল ফলে অতি দ্রুত। সম্রাট্ পাদুকা পায়ে না দিয়েই অশ্বারোহণে রাজধানী বোখারার দিকে ধাবিত হন।

কবি গেয়েছিলেন, মুলিয়ানের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাস বয়ে আসছে। এর সঙ্গে আসছে প্রিয়জনের বিরহ বেদনা। বোখারা তুমি সুখে থাক—চিরজীবী হও—'আয় বোখারা! শাদ্ বাশ ব দীর জী।' বোখারার ফলের বাগান আর সবুব তরুর তনিমা আমাদেরকে 'অন্যথাবৃত্তিচেতঃ' ক'রে তুলেছে। মেঘদূতের বিরহ বেদনা আমাদের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেয়—

'ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীর স্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রি বাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি।

রূদকীর সুভাষিতগুলিও চমৎকার—সময়কে দেখ। সব সময় সুখের। "আমার দুঃখের সময়"—এই বলে কেঁদো না, দেখো—তোমার চাইতে দুঃখী—তোমার সময়টুকু চাইছে।

—ব রূজ-এ-তূ আরজূমন্দ্ অস্ত্। দুঃখের অভিঘাতে ভেঙ্গে প'ড়ো না। যা আসার আসে, যা যাওয়ার যায়—'রফৎ আন্ কে রফৎ, ও আমদ্ আন্ কে আমদ্', কাজেই কেঁদো না। "রৌ তা কিয়ামৎ আয়দ্ জারী কুন। কঈ রফতহ্ রা ব জারী বাজ আরী॥" কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কাঁদলেও যা গেছে তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না।—এমন সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়, সুখদুঃখে এমন নির্লিপ্ত, উদাসীন দার্শনিক মনোভাব, সকল যুগে, সকল দেশেই অভিনন্দনের যোগ্য।

ইরানী সাহিত্যে আধুনিক যুগ

আমরা আমাদের পার্সী সাহিত্যের পরিক্রমা আদি ও মধ্যযুগের বৃত্তরেখায় ধীরে ধীরে পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ করে এসেছি। এইবার আমরা আধুনিক যুগের সীমারেখায় উপনীত হয়েছি। কালটিকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ বলা চলতে পারে। ভারতবর্ষেও এমনই এক সময়ে প্রাকৃত যুগ থেকে ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক যুগে বিবর্তিত হয়ে এসেছিল। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের মধ্যযুগীয় ভাষা তার পুরাতন খোলস মুক্ত করে দিয়ে আধুনিক যুগের নব নির্মোক ধারণ করেছিল। ভাষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে প্রায় সমকালেই আধুনিক মারাঠী, পাঞ্জাবী, ব্রজভাষা, বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলির অভ্যুত্থান ঘটেছিল। পার্সী ভাষায় তেমনভাবে বিবর্তন ঘটেনি। ইংরেজী ভাষায় গত তিনশ' বছরের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে, পার্সীতে হাজার বছরেও তেমন পরিবর্তন ঘটতে পারে নি। এ কথাটার সত্য পরীক্ষিত হ'তে পারে। নবম শতাব্দীর রূদগীর রচনা হাজার বছর পরেও আজ পার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকের অত্যন্ত সহজে বোধগম্য হতে পারে, কিন্তু হাজার বছর পূর্বের বাংলা সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না। ইংরেজীর ক্ষেত্রেও তাই।

অতি সংক্ষেপে আবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে পার্সীর তিনটি যুগ—

(ক) হখামনীশীয় রাজাদের শিলালিপির প্রাচীন পার্সী ও অবেস্তার জরথুশ্‌ত্রীয় গাথার ভাষা (খ্রীস্টপূর্ব ৫৫০-৩৩০)।

(খ) আলেকসান্দার বা ইস্‌কান্দার শাহের সময় পারস্যের অব্যবস্থিত অবস্থা। এ ঘটনা খ্রীস্টপূর্ব ৩৩৩ সালের পর, পাঁচশ' বছর ধরে একাদিক্রমে ঘটে চলেছিল। এ সময় সর্বপ্রকার সাহিত্যের দৈন্য এসে পড়েছিল। (সময়সীমা খ্রীঃ পূঃ ৩০০ থেকে খ্রীস্টীয় সাল ২০০)।

(গ) সাসানীয় বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে চারশো বছর ধরে পার্সীর মধ্যযুগ (খ্রীঃ ২২৬—৬৫১)। পার্সী ভাষার মধ্যযুগের ভাষার নাম পহ্‌লবী।

এই (গ) চিহ্নিত পহ্‌লবী ভাষাই প্রাচীন পার্সীর খাঁটি ধর্মপুত্র এবং এই প্রবন্ধে আলোচ্যমান আধুনিক পার্সীর জনক। কিন্তু মনে রাখতে হবে ধর্মান্তরিত জনক। কারণ ইতিমধ্যে আরবকর্তৃক পারস্য বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে। আরবীর ভাবধারা ও ভাষার রক্তপ্রবাহ এই নবীন পার্সীতে প্রবেশ করেছে।

এই যুগেই পারস্য সাহিত্যের নবকলেবর, নবজাগরণ বা রেনেশাঁস। পাঁচশো বছরের গ্রীক সম্বন্ধ গোটা ইরানদেশে বাইরের স্তরেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল, মর্মস্থলে কদাচ প্রবেশ করতে পারেনি ; কিন্তু আরব শুধু ধর্মে নয়, নানা দিকেই অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থ, যার নাম কোরানশরীফ। বিশ্বের খ্রীস্টান সম্প্রদায় বাইবেলকে ভাষান্তরিত করে মাতৃভাষায় পড়ে থাকে, তাতে কেউ ধর্মভ্রষ্ট হয় না। মূলের হিব্রুভাষা বা পরের গ্রীকভাষা কোন শাসনের তর্জনী সঙ্কেত করে না। কিন্তু মুসলমান তার কোরানশরীফকে ভাষান্তরিত করে উপাসনা করতে পারবে না। ধর্মের ক্ষেত্রে বিশ্ব-ইস্‌লাম-ঐক্য এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐশ্বরিক বাণীকে বিকৃত করা যায় না। 'কুল হুবা ইল্লাহু আহাদ' 'Qul Huwa 'llahu Ahad' "বল, তিনি আল্লাহ্, তিনি অদ্বিতীয়". এ কথার বক্তা স্বয়ং আল্লাহ্। আল্লার ভাষাকে অন্য পোশাক পরাবে কে ?

হিন্দুর আচারে, অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রকে ভাষান্তরিত করা চলে না। তা হ'লে ধর্ম রক্ষা হয় না। নারায়ণের স্নানমন্ত্র পড়তে হবে—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।' —এই মন্ত্রকে ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষা করতে হবে। 'অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়, যমৃষয়স্ত্রৈবিদা বিদুঃ'—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র হচ্ছে ঠিক ঠিক অনুষ্ঠানে ঠিক ঠিক স্মরণ। তার অদল বদল চলে না, একটি বর্ণেরও নয়। তাকে ভাষান্তরিত করা দুঃস্বপ্নেরও অতীত। 'স্বস্তি নো ভবন্তো ব্রুবন্তু'—এই বাক্যকে এই ভাবেই বলতে হবে। "আপনারা 'স্বস্তি' 'স্বস্তি' বলুন"—এমন করে বললে আর্যভারতী সমাজ মানবে না।

যা বলছিলাম, ধর্মের মধ্য দিয়েই পারস্যের সাহিত্যে আরবীয় অনুপ্রবেশ ঘটল। রাজকীয় শক্তির জবরদস্তিতে নয়—এ কথাটা পূর্বের অধ্যায়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছি। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে কবি ফেরদৌসী আচমন করে সঙ্কল্প করলেন 'আমার রচিত শাহ্‌নামা হবে অনন্যা—পার্সী ছাড়া অন্যভাষা প্রয়োগ করব না।' তিনি যে পারবেন না, তা যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক ভূমিকাতেই বুঝে নিতে পারতেন। ভূমিকাতে তিনি বলছেন--

বসী রঞ্জ বুরদম্‌, বসী নামাহ্‌ খ্বানদম্‌।
জ় গুফ্‌তার-ই-তাজ়ী উ অজ় পহ্‌লু-আনী॥

'অনেক কষ্ট করেছি, যথেষ্ট ইতিহাস পড়েছি। আরবী সূক্তি ও পহ্‌ল-বী প্রবচন সব কিছুকেই সমাদর করেছি।' সুতরাং জ্ঞানবৃদ্ধ কবি! তুমি আরবীভাষা ঢুকাতে বাধ্য। এত প্রবচন সূক্তি ব্যর্থ হবার নয়; কাজেই পার্সীর সযত্ন লালনেও আরবীর হাসি কান্না স্বভাবের নিয়মেই এসে পড়বে। ফেরদৌসীর সঙ্কল্পবাক্যে বীতশ্রদ্ধ আরব সন্তানের ভ্রূকুটি-রেখা উল্লাসে মিলিয়ে যাবে। সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠবে—

আল হামদু লিল্লাহী 'ল্লাহী খলকা ল্লিসানা
আরবিয়া আহসানা মিন্‌ কুল্লিলিসান্‌॥

—এস আমরা গুণগান করি আল্লাতালার যিনি এই ভাষার স্রষ্টা, এই দেবভাষা আরবী যা' সকল ভাষার সেরা ভাষা।

ফেরদৌসীকে পরিচিত করার পূর্বে সুলতান মাহ্‌মুদকে সম্মুখে আনতে হবে। ৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্তানের (পূর্বনাম বহ্লীক) অন্তর্গত গজনাতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। আলিফ্‌তেগিন্‌ নামে এক ভাগ্যান্বেষী তুর্কী এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন আমাদের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত সামানী রাজবংশের একজন গোলাম বা ক্রীতদাস। ৯৭৭ সালে তাঁর আবার একজন ক্রীতদাস সবক্‌তেগিন তাঁর জামাতা হয়ে বসলেন এবং পরে গজনার সিংহাসনে বসলেন। এঁরই পুত্র ভারত বিখ্যাত বীর সুলতান মহমুদ—E. G. Browne-এর ভাষায়, 'ক্রীতদাসের যে ক্রীতদাস মহ্‌মুদ তারই ঔরসজাত পুত্র।' তিনি সিংহাসনে বসেন

৯৯৮ খ্রীস্টাব্দে। এ এমন একটা কাল, যখন বাগদাদের আব্বাসী খিলাফত্ বিনষ্ট হতে চলেছে। হারূন্-উর-রশীদ্ ও তাঁর পুত্র আল মামূনের গৌরবময় রাজত্বের অবসান হয়েছে এবং খিলাফত্ অগ্রাহ্য করে মধ্য এশীয়ায় স্বাধীন হবার পালা শুরু হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোঙ্গোলরা শেষ আঘাত হানবে আব্বাসী খিলাফতের উপর। সেই দুরন্ত অভিযানে বাগদাদ হবে লুন্ঠিত এবং খলিফা তাঁর সমগ্র পরিবার সহ নিহত হবেন। অসভ্য এই মোঙ্গোলজাতি। তারা এসেছে, সব ওলট পালট করেছে, তারা সব পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে, হত্যা করেছে, লুণ্ঠন করেছে এবং সবশেষে সরে পড়েছে। পার্সী ভাষায় লেখা আছে—'আমদন্দ্', উ কুন্দন্দ্, উ সূখতন্দ্, উ কুশতন্দ্, উ বুরদন্দ্, উ রফতন্দ্।'

হাঁ, সেই স্বাধীন হবার পালা। এই পালায় উঠল সামানীবংশ, গজনবীবংশ। এঁরা একের পর এক সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেললেন। এই সময়ে তুর্কী আলিফ্তেগীন গজনবী বংশ প্রতিষ্ঠিত করলেন। এলেন পরবর্তী সবক্তেগীন এবং তাঁর পুত্র মহমুদ 'সুলতান'। 'সুলতান' এই আরবী কথার অর্থ সূর্য, গৌণার্থে সার্বভৌম শক্তিধর তেজস্বী নরপতি। মোঙ্গোলেরা এসব ক্ষেত্রে হ'তো খাকান বা স্বল্পাক্ষরে 'খান্'। মোঙ্গোল সর্দার তেমুজীন উপাধি নিয়েছিলেন—'জঙ্গীজ্‌ খান্' যার অর্থ সার্বভৌম বিজেতা। এর আগে নরপতিরা উপাধি নিতেন মালিক, আমীর বা মীর অথবা ঈস্পহ্বদ। গর্বিত সুলতান উপাধি ধারণ করলেন সর্বপ্রথম মহমুদ। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা 'সুলতান'কে সংস্কৃতের চন্দন পরিয়ে করেছিলেন—'সুরত্রাণ'।

সুলতান মহমুদ ভারতে সতেরো বার লুণ্ঠনকারী রূপে দেখা দিয়ে ইতিহাসে বহুনিন্দিত হ'য়েছেন। তাঁর স্বর্ণ তৃষ্ণাও ভয়ঙ্কর। লুকোনো সোনা আছে বলে তিনি নিজ হাতে সোমনাথ শিবলিঙ্গ চূর্ণ করেছিলেন—কাউকে দিয়ে করান নি; যদি সোনা বেহাত হয়ে যায়! যাক সে কথা। মহমুদের চরিত্রে আর একটি দিক ছিল। তিনি স্বয়ং সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-সাধকদের আশ্রয়দাতা। লোকে বলে তাঁর রাজসভায় কমসে কম চারশো জন কবি, গুণী এবং পণ্ডিত ছিলেন। একথা অতিরঞ্জিত হ'লেও

খানিকটা সত্য। তিনি বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী। তাঁর রাজসভা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-শোভিত জ্যোতির্বলয়ের মতোই সুন্দর ছিল। সভায় ছিলেন উনসরী—যিনি স্বয়ং রাজকবি। বহু উল্লেখযোগ্য নামের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—ফররুখী সীস্তানী, অস্জদী, গজালী, মিনূচিহ্রী, আলবেরুনী এবং স্বয়ং কবি ফেরদৌসী। এ বিষয়েও E. G. Browne কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন মাহমুদ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে অন্য রাজসভাগুলির 'পণ্ডিত-কুলাপহারী'—'A great kidnapper of literary men.' অবশ্য-স্বীকার্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আবূ আলী ইব্ন্ সীনা (সংক্ষিপ্ত আবিচেন্না) এবং ঐতিহাসিক মহাপণ্ডিত আলবেরুনী সম্বন্ধে তিনি এই রকম দলভাঙ্গানো কাজই করেছিলেন। আবি চেন্নাকে কব্জা করতে পারেন নি। আলবেরুনী ধরা দিয়েছিলেন। 'চাহার মকালা' নামক গ্রন্থে এর বিস্তৃত বিবরণ আছে। খারজম বা খি্বার শাসনকর্তা মামুন বিন মামুনের সভা থেকে তিনি এই দুটি রত্ন হরণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন—অতি সাবধানে, সুকৌশলে।

আলবেরুনীর আসল নাম 'আবূ রায়হান'। আলবেরুনী তাঁর সাহিত্যিক ছদ্ম নাম, যাকে বলে তখল্লুস বা nom de plume। আলবেরুনী অর্থ বৈদেশিক, 'the foreigner'। বেরুনী ভারতে এসে প্রায় সর্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। সমাজ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত, দর্শন—সবদিকেই তিনি বৈদেশিক হয়েও অসমোর্ধ্ব। তাঁর 'INDICA' গ্রন্থ জগদ্‌বিখ্যাত। এই গ্রন্থের সম্পাদক—Dr. Sachau উপক্রমণিকায় বলেছেন—'আমাদের এই বৈজ্ঞানিক যুগেও যদি কেউ উপযুক্ত সহায়ক নিয়ে অগ্রসর হয় তথাপি আলবেরুনীর সমকক্ষ হ'তে পারবে না।' সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, বিজ্ঞানী দার্শনিকের এই মহাগ্রন্থে প্রভূত জ্ঞান, নিপুণ পর্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, পরধর্মে আশ্চর্য সহিষ্ণুতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় ও বলিষ্ঠ প্রকাশের পরিচয় আছে। আলবেরুনীর জন্ম খি্বায়, মৃত্যু গজনীতে সাল ১০৪৮। তাঁর বয়স তখন ৭৫ বৎসর।

এইবার কবি ফেরদৌসীর কথা। পার্সী প্রবচন আছে—যদিও হজরত বলেছেন—'লা-নবীয়া বা'দী'—আমার পর আর নবী নেই, তথাপি সাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। কাব্যের ক্ষেত্রে সত্যদ্রষ্টা নবী আরও

তিনজন আবির্ভূত হয়েছিলেন। (১) মহাকাব্যের ক্ষেত্রে ফেরদৌসী (২) গজলে সা'দী আর (৩) কাসীদায় আনোয়ারী।

ফেরদৌসী এলেন অপরিচিত এক রাজসভায়। সত্যমিথ্যা বিচার না করে' লোভনীয় গল্পটি বলছি।—রাজকবি উনসরী, কবি অসজাদী ও কবি ফাররুখী খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে গল্প করছিলেন। এমন সময় সেখানে দেখা দিলেন নীশাপুর থেকে এক নবাগত। পথশ্রান্তের ধূলির ভস্মাবরণে বোঝা গেল না—ওর মধ্যে কোন্ আগুনটা জ্বলছে। রাজকবি বিনয়-বচনে বললেন, 'ভাই সাহব! আমরা রাজসভার কবি। কবি না হোলে এখানে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসা চলবে না। একটি সমস্যা পূরণ করে আপনার কবি-শক্তির পরিচয় দিলেই আমাদের দলে ভিড়ে যেতে পারেন, নচেৎ নয়। ফেরদৌসী আগ্রহী, সুতরাং সম্মতি জানালেন। তখন একে একে তিন কবি কবিতার তিন চরণ ব'লে চতুর্থ চরণের জন্য ফেরদৌসীর দিকে তাকালেন। উনসরী শুরু করলেন—'তোমার কপালে আছে চাঁদের চাঁদিমা'। আসজাদী জুড়ে দিলেন—'পরাজয় মানে গুল তোমার কপোলে॥' ফারুরুখী এগিয়ে দিলেন—'তোমার নয়নপক্ষ্ম শূল সম বিঁধে'। ফেরদৌসী বিনীতভাবে বললেন—'সে ব্যথার শান্তি নাই শীতল প্রলেপে?' থামলেন না, রসিকতা করে ইতিহাসের নজীর দিলেন—শূলের জোর আঘাত; গীবের বর্শাও পোশনকে এত জোরে আঘাত করতে পারে নি। কবিরা খুশীতে চেঁচিয়ে উঠলেন—দো বারাহ্, ইরশাদ্, ইরশাদ্! স্বয়ং রাজকবি উনসরী নবাগত কবিকে সুলতানের কাছে পরিচিত করিয়ে দিয়ে বললেন—শাস্ত্র, ইতিবৃত্ত ও কবিশক্তিতে ইনি অতুলনীয়। মহামান্য সুলতান দকীকীর অসম্পূর্ণ শাহ্‌নামা এঁকেই সম্পূর্ণ করতে আদেশ করুন।

'শাহ্‌নামা' অর্থ রাজন্যবর্গের ইতিহাস। ফেরদৌসী ষাট্ হাজার মিত্রাক্ষর পয়ারে 'গয়ুমর্থ্' থেকে জমশীদের সুবর্ণ যুগ অঙ্কিত করেছেন। পার্সীতে 'জাম-এ-জমশীদ্' প্রবাদ বচনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জমশীদের জাদুপাত্রে দুনিয়ার সব কিছু দেখা যায়—মানুষের সকল বাসনা বিম্বিত হয় জমশীদের পাত্রে। এ কথার তাৎপর্য—জমশীদের কাল মানুষের সব বাসনা পূর্ণ করেছিল। কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যে বিশালাপুরী বা

উজ্জয়িনীকে স্বর্গেরই এক টুকরা বলেছেন, যেখানে সকল বাসনা পরিপূর্ণ হ'তে পারে। অজ্ঞাতনামা কোন কবি শাহ্‌জাহানাবাদের দেওয়ানী খাসকে বর্‌ রু-এ-জমীন্‌ এক টুকরা ফেরদৌস বলেছেন। সেইরকম নন্দন রাজ্য ছিল জমশীদের রাজ্য ; তাই জাম্‌-এ-জমশীদ হ'য়েছিল প্রবাদ বচন। ফেরদৌসী এই রাজত্বকালের মধ্য দিয়ে এলেন ইরানীরক্তের পুনর্জাগরণযুগে —সে রাজারা সাসানীয়। তারপর শাহ্‌নামা সমাপ্ত হ'লো আরব কর্তৃক ইরান জয়ের মধ্য দিয়ে। এই জাতীয় মহাকাব্যখানা ইরানীদের প্রাণে নবজাগরণের জোয়ার তুলেছিল। স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমের অমর কাব্য এই শাহ্‌নামা। এই মহাগ্রন্থ মহাভারতের মত বিশাল। মহত্বাৎ ভারবত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে। মহাভারত কেন ? না মহত্বের জন্য এবং বিশালতার জন্য। মহাভারতে কি নেই ? ইতিহাস, সমাজ, দেশপ্রেম, দর্শন, বিত্ত, বৈভব, বৈরাগ্য সব নিয়ে এই মহাগ্রন্থ। শাহ্‌নামাও তাই। রাজশক্তি, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বাধিকার চিন্তা, গ্রহণ বর্জন, ত্যাগ তিতিক্ষা— সর্বশেষে পরম ঔদাসীন্যের বিজয়গাথা এই শাহ্‌নামা। মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের উপদেশে লোকোত্তর মহিমা আছে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সে উপদেশ উজ্জ্বল শিখরে দীপ্যমান। শাহ্‌নামা সর্বত্র প্রসঙ্গ বজায় রেখে অমূল্য উপদেশ বিতরণ করে গেছে।

রাজানুরোধে ফেরদৌসী শাহ্‌নামায় হস্তক্ষেপ করলেন। পারস্যের আদিতম উৎস থেকে নির্গত হয়ে চললো কাব্যধারা গোমুখী নিঃসৃত জাহ্নবীধারার মত—স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন, অকৃত্রিম অনায়াস ভঙ্গিমায়। এ সবকয়টি বৈশিষ্ট্যই শাহ্‌নামায় আছে। সুলতান মহমুদ প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'প্রত্যেক চরণের জন্য আমি তোমাকে একটি ক'রে স্বর্ণমুদ্রা দেবো কবি ! প্রতিশ্রুতিভঙ্গ হবে না।' কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে গেল। শাহ্‌নামার সেই করুণ সমাপ্তির কথায় আমরা পরে আসব। আমরা আগে দেখেছি সুলতানের স্বর্ণতৃষ্ণা মাঝে মাঝে তাঁকে ক'রেছে নীচ, আত্মবিস্মৃত, অত্যন্ত লঘুচেতা। তিনি এসব ক্ষেত্রে নিজেকে ভুলে গিয়ে অবিশ্বাস্যরূপে খেলো হ'য়ে যেতেন। এই ঘটনার প্রায় পাঁচশো বছর পর কবি জামী বলেছেন—

গুজশ্‌ত্‌ শওকত্‌-ই-মহমুদ্‌ উ দর ফসান ন-মান্দ্‌
জুজ্‌ ইন্‌ কদর, কি ন-দানিস্ত্‌ কদর-ই-ফেরদৌসী।

সুলতান মহমুদের ইজ্জত বল আর মহত্ব বল তা একটি ঘটনার আঘাতেই ঝরে পড়ে গেল। তার ঐশ্বর্যের গরিমা আর রইলো না। সঙ্কুচিত হয়ে গেছে মহমুদের কদর। যে ফেরদৌসীকে কদর জানাতে পারলো না, তার আবার কদর কি? ইতিহাস নির্মমভাবে নির্লজ্জ সুলতানের আচরণের জবাব দিয়েছে। সে কাহিনী আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বলব।

গজনবী যুগ—সুলতান মাহমুদ ও ফেরদৌসী

গজনীর শাসনকর্তারা মূলে ছিলেন আমীর বা মীর। তাঁরা আইনত ইরানের অধীন ছিলেন, বলা চলে—সামন্ত নৃপতি। কিন্তু মাহমুদের কথাই আলাদা। তিনি একচ্ছত্র, স্বাধীন এবং ধারণ করলেন গৌরবান্বিত উপাধি 'সুলতান' (খ্রীঃ ৯৯৮)। আফগানীস্তানের এক ক্ষুদ্র রাজ্য 'গজনা'—এখানকার লোকে বলে গজনী। ফেরদৌসী শাহ্‌নামায় ইরানী রাজবংশের ইতিবৃত্ত দিয়ে গিয়েছেন। সেই রাজবংশের রক্তধারার সঙ্গে নিজরক্তধারার দূরতম সম্বন্ধ দেখাতে পারলেও পরম গৌরবের বিষয়—এই ছিল বোধ হয় সুলতান মাহমুদের অব্যক্ত বাসনা। এই জন্য তিনি সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন কবিকে। সেটা ব্যর্থ হয়েছিল। দিগ্‌বিজয়ী সুলতানের সেটাই বিধাতা-নির্দিষ্ট পরাজয়। আমরা উদ্ধৃত করেছিলাম—

'গুজশ্‌ত শাওকাত্‌-ই-মহমুদ উদর ফসান ন-মান্দ্‌
জুজ্‌ ইন্‌ কদর, কি ন-দানিস্ত্‌ কদর-ই-ফেরদৌসী।'

মানীর প্রতি সমাদর অভ্যুদয়ের সুনিশ্চিত সোপান। এখানে ব্যর্থ হয়ে আত্মগরিমার কলকল্লোল তুলেও কত শক্তিধর বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যায়—তার ইয়ত্তা নেই। সুলতান মাহমুদের অদৃষ্টে তাই ঘটেছে। অনেক গুণের গুণী হয়েও এক ভুল কাজের জন্য আজ পৃথিবীতে তিনি

রক্তপিপাসু লুণ্ঠনকারী মাত্র। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা গেল দিগ্‌বিজয়ী সুলতানের ধমনীতে আছে ক্রীতদাসের না-পাক খুন। সেখানে খানদানী খুন খোঁজা বেহুদা হয়রানি।

এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে গজনীর অভ্যুদয়ের কাহিনী বিবৃত করা প্রয়োজন। 'খলিফা' অর্থ উত্তরাধিকারী—স্বয়ং হজরতের সূত্রধার। এই সূত্রধার নির্বাচিত হয়েছে সর্বপ্রথম স্বয়ং হজরতের ইচ্ছাদ্বারা, তারপর জনগণের নির্বাচন দ্বারা, কখনো বা হজরতের পবিত্র রক্তধারার গৌরবেও খলিফা হওয়া সম্ভব হয়েছে। উম্মায়ী বংশের খলিফাদের রাজধানী ছিল দামাস্কাসে—এটা পরিপূর্ণ আরব রাজ্য, বর্তমান ইরাকের পশ্চিমে। পরবর্তী আব্বাসী খলিফারা রাজধানী সরিয়ে আনেন বাগদাদে। এটা আরব রাজ্যে হলেও একেবারে ইরানের কোলঘেঁষা। কালক্রমে আব্বাসী খলিফা মামুন বসলেন বাগদাদের সিংহাসনে (খ্রীঃ ৮১১)। মামুনের মা ছিলেন ইরানী। মামুনের মাতুলকুলের প্রতি দরদ ছিল অসামান্য। তাহির নামে এক ইরানী সেনাপতি মামুনের বিজয় অভিযানের সর্বদাই অপরিহার্য সহায়ক ছিলেন। অসীম স্নেহ তাহিরের প্রতি সম্রাট মামুন পোষণ করতেন। তাহির ক্রমশ পূর্ব ইরানের কর্তৃত্বভার লাভ করেন। তাঁর প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব ইরানে এবং তুরানে। তাহিরের পুত্র 'তল্‌হা' পিতার মৃত্যুর পর খোরাসানকে রাজধানী করে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই বংশই (১) তাহেরীয় বংশ।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বংশ, (২) সাফারীয় বংশ। এই বংশের সাম্রাজ্য অব্যাহত ছিল সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে—ইরাক, ফার্স্‌, খোরাসান, সীস্তান, তাবারিস্তান।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বংশ, (৩) সামানীবংশ (খ্রীঃ ৮৭৪—১০০০)। এ পর্যন্ত চলেছিল ইরানীদের অব্যাহত গৌরবান্বিত ইতিহাস। সামানীদের অহঙ্কার—প্রাচীন ইরানী রাজবংশের ধারক বাহক তাঁরাই। তাঁদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। এঁদের রাজধানী ছিল 'বোখারা', তুর্কীস্তানে। আরব সাগর ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই বোখারা, বর্তমানে U.S.S.R.-এর

অন্তর্ভুক্ত। এঁরা সদর্পে ঘোষণা করলেন ফার্সী ভাষাই রাজভাষা। আরবী ভাষা অস্তমিত হতে চলল। এর পরের দুটি রাজবংশের উল্লেখ মাত্র করব—(৪) জীয়ারীয় বংশ এবং (৫) বোয়রীয় বংশ।

এই পঞ্চশাখায় বিভক্ত ইরানী রাজবংশের পর উল্লেখ করতে হবে (৬) গজনবী বংশ। আলেফতেগীন>সবকতেগীন>তার পুত্র সুলতান মাহমুদে আমরা সরাসরি নেমে এলাম। গজনী আফগানীস্তানে, সুলতান মাহমুদ সাক্ষাৎ রাজরক্ত থেকে বিচ্যুত। অথচ মাহমুদের মত শক্তিধর সে যুগে কেউ ছিলেন না। এমন অমিত শক্তিধর সুলতান রাজসভায় আশ্রয় দিয়েছেন অমিতশক্তিধর এক কবিকে—তিনি ফেরদৌসী। ফেরদৌসী তো আসল নাম নয়—এটি তাঁর 'তখল্লুস্' বা ছদ্মনাম। তিনি আবুল কাসিম হুসন বিন্ আলী তুসী। তিনি তুসের অন্তঃপাতী 'রজান' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (খ্রীঃ ৯৪১)। এই স্থানের এক বাগিচার নাম ছিল 'ফেরদৌস'। এই থেকেই তখল্লুস্ 'ফেরদৌসী'। তিনি ৩৫ বছর বয়সে শাহ্নামায় হস্তক্ষেপ করেন। আরও ৩৫ বছরের চেষ্টায় তাঁর কাব্য সমাপ্ত হয় (মতান্তর ২৫ বছর)। যেভাবেই হোক ফেরদৌসী তখন বৃদ্ধ। কবির একটি ছেলে ছিল—তার ঘটে অকালমৃত্যু। আর একটি কন্যা, যার জন্য কবির কত স্বপ্ন! প্রভূত ব্যয়ে জাঁক করে তাঁর বিয়ে দেবেন। এই জন্য কবির অর্থ পিপাসা। তাই তাঁর রাজসেবা। মনে করেছিলেন সুলতানের প্রতিশ্রুত অর্থ তাঁর বাসনা পূরণ করবে। তিনি ভেবেছিলেন 'শাহনামা' তো রাজকণ্ঠেরই উপযুক্ত। তিনি এই মালা দিগ্‌বিজয়ী বীর সুলতানের কণ্ঠেই পরিয়ে দেবেন। রাজকবি উন্‌সরীর সহায়তায় তিনি সুলতানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মত সপ্তখণ্ডে বিভক্ত ষাট হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ পীনপিনদ্ধ এই মহাগ্রন্থ অভিনন্দিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু পরিণামে অভিশপ্ত হ'লো। সুলতান প্রতি শ্লোকের জন্য একটি করে স্বর্ণ মুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ঈর্ষা প্রত্যাশার মূলোচ্ছেদ করে দেবার ক্ষমতা রাখে। মাৎসর্যের বিষদশন দংশনের জন্য সুযোগ খোঁজে। পুরস্কার দূরে থাক্, রাজসভায় ফেরদৌসীর ধর্ম বিশ্বাসের মূল্যায়নই প্রথম বিবেচনার বিষয় হ'লো। কবিকে অতি সহজে তাঁর

লেখা থেকেই 'শিয়া' প্রতিপন্ন ক'রে তার উপযুক্ত শাস্তি দাবী করা হ'লো। পুরস্কার নয়, তিরস্কারই বুঝি কবির ভাগ্যলিপি—এ সন্দেহ অনেকের মনেই রেখাপাত করল। একটু কোমল-হৃদয়ের সভাসদরা বললেন—মেহেরবান্ সুলতান! মেহেরবানী করে ষাট হাজার দিনারের (স্বর্ণমুদ্রা) পরিবর্তে ষাট হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দেবার ব্যবস্থা করুন। ওই যথেষ্ট। হায় দিনার ও দিরহামে যে বিস্তৃত ব্যবধান। ধাতু দুটি পৃথক, জর ও সীম। আবার শুধু স্বর্ণ ও রৌপের পার্থক্য নয়,—পার্থক্য যে আত্ম-সম্মানের, সেটা কারও মগজে ঢুকল না। কবি ফেরদৌসী ঘৃণা ভরে ওটা প্রত্যাখ্যান করলেন কৌশলে। তিনি সভাভঙ্গের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সভাভঙ্গে সুলতান অন্তঃপুরে গেলেন, এদিকে কবি সেই সমগ্র অর্থ টাই সকলের মধ্যে অস্বাভাবিক দরাজহস্তে বিতরণ করে নিঃশেষ করে ফেললেন। এদিকে ভয়ও আছে। রাজরোষের পরিণাম তো মৃত্যু। কবি সকলের অগোচরে অন্তর্ধান করলেন। আফগানীস্তানের গজনী ছেড়ে তিনি আত্মগোপন করলেন ইরানের সুদূর পশ্চিমে অবস্থিত বাগদাদে। সেখানকার 'বোরয়িয়' সম্রাট বাহাউদ্দৌলা তাঁকে আশ্রয় দিলেন। এখানকার নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব আশ্রয় পেয়ে তিনি কোরানে বর্ণিত য়ুসুফ ও জুলেখার প্রেম অবলম্বনে রচনা করলেন তাঁর কাব্য 'য়ুসুফ ও জুলেখা'। এখানকার আশ্রয় থেকেই তিনি তীব্র শ্লেষেভরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত করলেন সুলতান মাহ্‌মুদকে। সেই অংশ শাহ্‌নামায় সংযোজিত মহাকাব্যের ক্রোড়সর্গ (appendix)। সামান্য কিছু উদ্ধৃত করি।—

'জ় বদ-গুয়র বখ্‌ত-ই-বদ্ আমদ্ গুণাহ্'। আমার অদৃষ্টের দোষ এসেছে ঈর্ষাক্লিষ্ট বদজবানীদের পাপ থেকে। দুঃখ এই, সম্রাট নিন্দুকের নিন্দার মূল সন্ধান করলেন না।

'হুসদ্ বুরদ্ বদ্‌গুয় দর কার-ই-মন্।'—আমার এই সুমহান্ গ্রন্থে, আমার এই দুশ্চর তপস্যার কার্যে ওরা বহন ক'রে এনে মিশিয়ে দিল (হুসদ্) ঈর্ষার বিষ, আর নিন্দার বাণী।

'তব্‌হ্ শুদ্ বর শাহ্ বাজার-ই-মন্। সুলতানী বাজারে আমার গুণের 'মন্দা' ঘটে গেল। (এ দুঃখ রাখার আমার জায়গা নেই।)

তবু অদৃষ্ট নিয়ে ক্রন্দন নয়। ফেরদৌসী প্রতিশোধ নিতে জানেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে 'হজু' (তীব্র শ্লেষ) জুড়ে দিলেন।

'অগর শাহ্‌রা শাহ্‌ বুদী পেদর
ব সর বর নিহাদ মরা তাজ-ই-জর।'

যদি এই সুলতানের সত্যকার কোন সম্রাট্‌ পিতা হতেন তবে আমার মাথা-বরাবর ভূষণ হ'য়ে চলে আসত সোনার মুকুট।

'ব গর মাদর-ই-শাহ্‌বানু বুদী।
মরা সীম ও জর তা ব জানু বুদী।'

যদি ওঁর মা সত্যই হতেন কোন রাজদুহিতা, তবে আমার জানু পর্যন্ত সোনা ও রূপোর ঢিবি গড়ে উঠতো। তা এ ক্ষেত্রে গোলামের যে গোলাম তার পুত্র দ্বারা সম্ভব হ'লো না। তার জন্য দুঃখ নেই; কারণ রাজবংশের দৃষ্টি আর গোলাম-বংশের দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য তো থাকবেই। সামানী বংশের গোলাম আলেফতেগীন, তার গোলাম সবক্‌তেগীনের ঔরসজাত পুত্র সুলতান মাহ্‌মুদ। এই ঐতিহাসিক তথ্য শাহ্‌নামায় পাঠক চিরকাল মনে রেখো।

যতোই আজব কাণ্ড হোক্‌ সুলতান মাহমুদ এই স্পষ্টবাদী কবিকে কোতল করার অবকাশ পেলেন না। সে কি বোরয়িয় সাম্রাজ্যের বাধা? তার সঙ্গে অন্য কিছুও আছে। সে তার দুরন্ত জিগীষা। যে স্বর্ণ রৌপ্য-তৃষ্ণা বছরের পর বছর ধরে সুলতানকে মশগুল ক'রে রেখেছিল—সেই ভারত অভিযানই সুলতানকে সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। প্রতি বছর বর্ষাশেষে তিনি সসৈন্যে ভারত অভিযান করেছেন। সমগ্র শীত ঋতু ধরে নরহত্যা ও লুণ্ঠন চলেছে। গ্রীষ্মের খরতাপ বেড়ে উঠলেই তিনি স্বদেশে ফিরে আরাম ও আনন্দের দিন যাপন করেছেন। আবার শরতে অভিযান। সবশুদ্ধ তিনি সতেরো বার ভারত লুণ্ঠন করেছেন। পেশোয়া থেকে কনৌজ পর্যন্ত উত্তর ভারত থেকে দ্বারবতী পর্যন্ত সে নৃশংস হস্তের আঘাত পেয়েছে। সর্বশেষ লুণ্ঠন তাঁর সোমনাথ মন্দিরে। প্রতি বর্ষ শেষে গজনী সোনা ও রূপায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মণি মাণিক্যের রোশনী তাঁর রাজসভাকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। সেখানে সামান্য এক কবির কথা তার মনের কতটুকু অধিকার করতে পারে?

অথচ গজনীর সুলতান নিজেও কবি। তাঁর কাব্য কথায় বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে সুলতান শেষ শয্যায় অশরণের শরণ জগদীশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে যেদিন এই পার্থিব জীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করতে পারলেন, সেদিন তিনি আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে ঠিক কথাগুলিই বলেছিলেন।

"আমার কোশমুক্ত তরবারির অগ্রভাগের মৃদুস্পর্শে শত্রুর হৃৎস্পন্দন থেমে যেতো, দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি আমার (mace) দণ্ডাঘাতে চূরমার হয়ে যেতো। জিগীষার দুরন্ত তাড়নায় দেশ থেকে দেশান্তরে উল্কার মতো ছুটে গিয়েছি। প্রতিটি আক্রমণে উদ্যত হয়ে অনুভব করেছি—আমি 'সুলতান', সূর্যসম আমি অসামান্য, আমি অভূতপূর্ব। 'সুলতান' এই নামের ভূষণ কদাচ ব্যর্থ নয়।

... ...

"আজ বুঝি—রাজা আর প্রজায় কোন পার্থক্য নেই। কবরের মাটিতে জীর্ণ নরকপাল দেখে কি কেউ রাজা ও তাঁর ক্রীতদাসের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখাতে পারে? এ বাজারে সব একদর।......কিন্তু বড় দেরীতে এ তত্ত্ব আমি বুঝেছি। যার একটি অঙ্গুলি হেলনে হাজার হাজার দুর্গ মুহূর্তে ভূমিসাৎ হয়ে যেতো, বর্শার সূচ্যগ্র স্পর্শে প্রতিদ্বন্দ্বীর জমাট ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো, আজ মৃত্যুর দ্বারে বসে সে ভাবছে—এক খোদাই কায়েম, বাকী সব ঝুট—এই জগৎটা জগদীশ্বরের, আর কারও নয়।"

একথাগুলি সুলতান মাহমুদেরই উপযুক্ত। কিন্তু দাওলাত্‌শাহ বলেন —এগুলির কবি নাকি সেলজুকীয় যুগের সন্‌জর। আবার একথাও শোনা যায়, সুলতান দুঃখে বলে গিয়েছিলেন. 'আমাকে কবরে দিও আমার হাতখানা চিৎ করে। আমি অর্থপিপাসু গ্রহণী মুদ্রায় হাত শুধু চিৎ করেছি। হাত উপুড় করে কাউকে কিছু দিতে পারলুম না।'

কিন্তু যা' বলছিলাম। অঘটন চিরকালই ঘটে থাকে। সাংবৎসরিক সময় বিজয়ী রণক্লান্ত, পথশ্রান্ত সুলতান ফিরছেন ভারত থেকে উত্তর আফগানিস্তানের নিজবাসভূমি গজনীতে। পথে বিদ্রোহী রাজার দুর্গ। তিনি একটু থেমে হুকুম পাঠালেন, 'প্রভাতে আমার রাজসভায় আমাকে

কুর্ণিস করে আমার হাতে খিলাত্ গ্রহণ করবে।' দূত এই বার্তা তাকে জানিয়ে ফিরে আসছে। দূর থেকে তাই দেখে সুলতান উজীরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাবছি দূত কি বার্তা নিয়ে আসছে। উজীর বললেন—আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা হ'লে—'রণক্ষেত্রে গদা আর অসিযুদ্ধে—নেবে পরিচয়।' সুলতান চেঁচিয়ে উঠলেন—'উজীর এ কার রচনা? আমার দিল খালাস করে কে এই কথা বলেছে?'

উজীর খ্বাজা মঈমনদী মাথা নীচু ক'রে বললেন—সেই কমবখ্ত আবুল কাসিম ফেরদৌসীরই এই মনোবিশ্লেষণ। আজ জলভরা মেঘে বিদ্যুৎ খেলে গেল। পাষাণ দ্রবীভূত হ'লো। অতীতের ঘটনাগুলো আজ দিগ্‌বিজয়ীকে অনুতাপে দগ্ধ করতে লাগল। 'উজীর আমি দুঃখিত। আমি সত্যদ্রষ্টা কবিকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে পারিনি। দুর্মুখদের কথায় বিচলিত হ'য়ে সত্যভ্রষ্ট হয়েছিলাম। উজীর চলো রাজধানীতে গিয়ে ষাট হাজার দিনার কবির কাছে পাঠিয়ে দিই।'

সুলতান প্রতিশ্রুত অর্থ পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু তাঁর রক্ষীরা রজানের দ্বারদেশে উপনীত হ'য়ে দেখতে পেলো বৃদ্ধ কবির শবদেহ বহন করে জানাজা গৃহ থেকে নিক্রান্ত হচ্ছে। কবির স্নেহের দুলালী কন্যা সে অর্থ স্পর্শও করলো না। অর্থ যেমন এসেছিল তেমনি ফিরে গেল রাজধানীতে।

সেদিন খোরাসান প্রদেশে তুসের অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র গ্রাম রজানে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। ধর্মান্ধ এক প্রচারক মৌলবী মুসলমান সমাধি ক্ষেত্রে ফেরদৌসীর শবাধার নামাতে দেবে না, কারণ ফেরদৌসী 'রাফিজী', ধর্মদ্বেষী। মৌলবী বক্তৃতায় সে কথা স্পষ্ট করে দিলো। ফেরদৌসী শাহনামায় জরথুশ্‌ত্রীয় রাজাদের জয়গান কি করেন নি? অহুর মজদার উপাসকরা কি বিধর্মী নয়?—না, শেষে ফেরদৌসী কবরে মাটি পেয়েছিলেন। দাওলাত্‌শাহ্ বলেন যে তাঁর সময় পর্যন্ত (খ্রীঃ ১৪৮৭) তুসের সে পবিত্র কবরে বহু দর্শনার্থী ভিড় করত। শোনা যায় সেই মৌলবী সেই রাত্রিতে স্বপ্নে দেখেন ফেরদৌসী ফেরদৌসে উপনীত। ধর্মান্ধ মৌলবী স্বপ্নেই প্রশ্ন করেছিলেন—এ অসম্ভব সম্ভব হ'লো কি করে? দিব্যদেহী ফেরদৌসী উত্তর করেছিলেন তাঁর শাহনামার ভাষাতেই, 'আমি ধর্মে ধর্মে বিরোধ দেখিনি। ঈশ্বরের অদ্বিতীয় সত্তা আমি মনে

প্রাণে অনুভব করেছি। ঊর্ধ্বে অধোলোকে সব কিছুতেই তিনি। খোদা! আমি তোমার সত্তা অনুভব করেছি···কিন্তু তোমার রহস্য বুঝিনি—
"Thine Essence I know not, Thy being I know."

ফেরদৌসীর শাহ্‌নামা

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তাতার, তুরান, তুর্কি—এই শব্দগুলি সুস্পষ্ট ক'রে নেওয়া ভাল। তাতার দেশ, তাতার জাতি। তুরান দেশ, তুরানী জাতি। তুর্কি জাতি, তুর্কিস্থান দেশ। এরা সমার্থক শব্দ। পার্সীতে তুর্কমান্, তুর্কিস্তান, তুরান একই দেশ বোঝায়। পারস্যবাসীর কাছে এরা অসভ্য ও বর্বর রূপে পরিচিত ছিল। ইংরেজীতে Tartar এবং Tatar এই উভয়শব্দ বিচারে Webster তাতারকেই সঙ্গততর রূপ বলে গ্রহণ করেছেন। প্রথমে তুর্কিরা ছিল খ্বারজম (বর্তমান খিবা) ও চীনের মধ্যবর্তী বিরাট ভূখণ্ডে বিস্তৃত এক দুর্ধর্ষ জাতি। মধ্য এশিয়ার এই তুর্কি বা তাতারেরা একদা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উত্তপ্ত ক'রে তুলেছিল। তুর্কিরা দাবী করতো জাফেতের পুত্র তুর্ক থেকে এই বংশের উৎপত্তি। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, এরাই শক নামে এক ইন্দো-ইরানীয় জাতি। এই জাতি গ্রীকদের কাছে পরিচিত ছিল 'Skuthes' ব'লে। এরাই সীদীয় জাতি, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'Scythians'।

এই যাযাবর জাতি প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সীস্‌তানে। এই সীস্‌তান বর্তমানে ইরানের অন্তর্ভুক্ত। এই সীস্‌তানই (সংক্ষিপ্ত সীস্তান) শকস্থান ছিল। স্বভাবধর্মে এরা দুর্ধর্ষ এবং নির্দয় হ'লেও এদের দৈহিক সৌন্দর্য ছিল, ভাষায় ঐশ্বর্য ছিল এবং ছিল শিল্পকলার সমুন্নত আদর্শ। তুর্ক ধীরে ধীরে অর্থান্তরিত হ'য়ে সুন্দর অর্থে পর্যবসিত হয়। মধ্য যুগের ইরানী কবি হাফিজ শিরাজবাসিনী তুর্কীর, মানে সুন্দরীর বখাল্-এ-হিন্দ্, অর্থাৎ কালো তিলের জন্য, (হিন্দ=কালো)

সমরকন্দ ও বোখারার তামাম দৌলত বখশিস্ করতে চেয়েছিলেন। তুর্কির সৌন্দর্য বুঝুন। আর একদিকে তুর্ক্ ভয়ঙ্কর। তুর্ক-ই-চীন—ভয়ঙ্কর চীনা। ইংরেজী প্রবচন স্মরণ করুন 'To Catch a Tartar'—বিপজ্জনক মানুষের পাল্লায় পড়া। পার্সীতে তুর্ক-ই-আদব মানে অভদ্রতা। ওটা পরিত্যাগ করাই ভাল; সেই জন্য 'তুর্ক দাদন' মানে পরিত্যাগ করা। এই সূত্র ধ'রে কথা এল—'তুর্ক-এ-মহব্বত্' যার অর্থ ভালোবাসার চরম বিচ্ছেদ।

'হ্যায়্ মন্‌জুর তুর্ক-এ-মহব্বত্
লেকেন শর্ত্ এহী হ্যায়্
'কভী ন ইয়াদ্ আয়েগী

তোমার আরজ মঞ্জুর করি, বিচ্ছেদে সীমা টানি।
একটি শর্ত মোটে—
তোমার মুরতি স্মরণের পটে, ওগো নিরুপমা সখি!
যেন না ফুটিয়া ওঠে।

আবার ইতিহাস অনুসরণ করি। শক জাতিকে অনার্য বলার দুঃসাহস কারও নেই; কারণ আগেই বলেছি—এই জাতি ইন্দো-ইরানী জাতির এক শাখা। শেষে এই জাতির সঙ্গে আর্যেতর জাতি মোঙ্গোলদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই সাঙ্কর্য ছিল খুবই স্বাভাবিক। এদের বিস্তার মোঙ্গোল দেশকে সুস্পষ্ট ভাবে স্পর্শ করেছিল। এই প্রকার জাতি-সাঙ্কর্যে অর্থাৎ মোঙ্গোল-তুর্কির মিশ্রণে মুঘলজাতির উৎপত্তি ঘটে। মুঘলদের আর্য আদল খানায় মোঙ্গোল ছাপ অনেক ঐতিহাসিক পুরুষের তসবীরে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ভারতের তৃতীয় মুঘল সম্রাট শাহ আকবরের চোখ দুটি দেখবেন।

চীনের সীমান্তবাসী শকজাতির একটি শাখাকে চীনারা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জানতো 'তু-কিউ' ব'লে। কারো কারো মতে এই 'তু-কিউ' থেকে তুর্কি শব্দের উদ্ভব। এই তুর্কি জাতির আবার তিনটি শাখা বিশেষ প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক ঘটনার করণ-কারণে এই শাখাত্রয় সত্যই সমুজ্জ্বল। প্রথম—সেলজুক শাখা, দ্বিতীয়—ওথমানি শাখা, তৃতীয়—মুঘল শাখা।

এর প্রত্যেকটি শাখার শাসনকালে পার্সী সাহিত্যের প্রভূত অনুশীলন হয়েছিল পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ায়, তথা আমাদের এই ভারতবর্ষে।

আমার পূর্ব প্রবন্ধে অভিপ্রেত ছিল শাহ্‌নামা মহাকাব্যের সোহ্‌রাব রুস্তমের কাহিনী। সীস্তানী ইরানী রুস্তম্ একদা ভাগ্যদোষে বিড়ম্বিত তুরানী সোহ্‌রাবের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে বাধ্য হ'য়েছিল। তারা কেউ জানতো না যে, তারা পিতা পুত্র। সেই করুণ কাহিনী আছে ফেরদৌসী রচিত শাহ্‌নামায়। গল্পটি শুনুন—

রুস্তম্ ইরানের দিগ্‌বিজয়ী বীর। অবসর সময় বীরেরা মৃগয়ায় যান। রুস্তম্ মৃগয়ায় গিয়ে পথশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন একেবারে তুরানের সীমান্তে। ইরান তুরানে চিরকাল যুদ্ধই নিয়ম ছিল, শান্তি ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম। এ ঘটনা ঘটে ব্যতিক্রমের কালে। রুস্তম্ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাঁর প্রিয় অশ্ব রাক্‌শ্ অদূরে চরে বেড়াচ্ছিল। তুরানী তস্করেরা সুযোগ বুঝে রাক্‌শ্‌কে চুরি করে নিয়ে গেল। নিদ্রাভঙ্গে রাক্‌শের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে রুস্তম্ হাজির হন তুরানেরই অন্তর্ভুক্ত সামেনগান রাজ্যের সামন্ত রাজার দরবারে। স্থানটি আধুনিককালের আজার বাইজান। সামন্ত রাজা পরম আদরে অভ্যর্থিত করেন এই দিগ্‌বিজয়ীকে। সেখানে রাজারই অনুরোধে তিনি রাজকন্যা তাহেমিনার পাণিগ্রহণ করেন। জাত-যোদ্ধার ধমনীতে যে রক্তস্রোত সে দীর্ঘ বিশ্রাম বরদাস্ত করে না। ঘনিয়ে আসে স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদকাল। রুস্তম্ যে সেনাপতি! যুদ্ধের আহ্বান তাকে আবার ইরানে নিয়ে যায়। যাওয়ার পূর্বে অন্তঃসত্বা তাহেমিনাকে তিনি তাঁরই নামাঙ্কিত এক কবচ দিয়ে যান; ব'লে যান,—'পুত্র হলে তার বাহুতে বেঁধে দিও।' কথা সামান্য, কিন্তু তার ঘটনার বিস্তার হ'য়ে ওঠে জটিল হ'য়ে।

সামেনগান থেকে ইরানে যথাকালে সংবাদ যায়—তাহেমিনার কন্যা হ'য়েছে। আসলে বাপ ছেলেকে মার কোল শূন্য করে কেড়ে নিয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় এই মিথ্যা রটনা। তাহেমিনা পুত্র সন্তানই প্রসব করেছিলেন। এই সন্তানই 'সোহ্‌রাব',—তরুণ বয়সেই যার বীরত্বের খ্যাতি দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাপ্‌কা বেটা বাপকেও বীরত্বে

হাড়িয়ে গিয়েছিল। ও দিকে রুস্তম্ জানলেন তাঁর জীবন ব্যর্থ হ'লো। জীবনের বীরত্ব-বৈভব শূন্য বলে মনে হ'লো। অপর দিগন্তে দুরন্ত বালক অজস্র প্রশ্নবাণে মাকে জর্জরিত ক'রে শেষে জেনে নিলো বিশ্ববন্দিত বীর রুস্তম্ তার পিতা। জোয়ান পুত্রের পিতার কাছে বীরত্বের মধ্য দিয়ে পরিচিত হওয়ার বাসনা জাগলো। এই তরুণ ইতিমধ্যে তুরানরাজ আফ্রাসিয়াবের অনেক লড়াই ফতে ক'রে দিয়ে তাঁর বৃত্তিভোগী প্রিয় সেনানী হ'য়েছে।

বহু দিন পর আবার ইরান-তুরানে শক্তি পরীক্ষা। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তরুণ সোহ্‌রাব একটি সৈন্যদলের অধ্যক্ষ। কিন্তু পিতাপুত্রের সাক্ষাতের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। রুস্তম্ আজ পরিণত প্রৌঢ়। নবীন ইরানরাজ প্রৌঢ়দের অবসর নিতে বাধ্য করেছেন। এটা সৈনিক শিবিরের নিয়ম। প্রৌঢ়রা সমর, শিবিরের কোন কাজে থাকে না—চলে যায় যবনিকার অন্তরালে। যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ। সৈন্য শিবির প্রস্তুত। রাত্রিতে সোহ্‌রাবের চোখে ঘুম নেই। তিনি শুনেছেন রুস্তম্ তাঁর বৃদ্ধ পিতার সেবায় অবসর প্রাপ্ত জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে যাচ্ছেন দূরে, বহু দূরে ইরান-আফগানিস্তান সীমান্তে সীস্তানের জাবুল অঞ্চলে। পুত্রের হৃদয়ে হঠাৎ একটা আশার তরঙ্গ মাথা তোলে। 'আমি যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করি তবুও কি বাবা আসবেন না বিজয়ী পুত্রকে আলিঙ্গন করতে!'

'I seek one man, one man, and one alone—
Rustam, my father ; who I hope, should greet,
Should one day greet, upon some well-fought field,
His not unworthy, not inglorious son.'

—Matthew Arnold

কিন্তু, দুটো জাতির দলগত লড়াইয়ে তো একক বীরত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। হাঁ, একটি পথ আছে। আমি যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইরানের শ্রেষ্ঠ বীরকে আহ্বান করি? রুস্তম্ স্বয়ং এলে তো কথাই নেই; যদি নাও আসেন, নিশ্চয় শুনবেন তিনি পুত্রের বীরত্ব-খ্যাতি। স্নেহালিঙ্গনে নিশ্চয় তিনি কৃতার্থ করবেন পুত্রকে; নিশ্চয়, নিশ্চয়। এইবার হৃদয়যুদ্ধে বিজয়ী সোহ্‌রাবের ললাট-রেখা মিলিয়ে গেল। চাঁদের মত উজ্জ্বল

হ'য়ে উঠলো তার মুখ। হায় অভিশপ্ত পুত্র! সে তো জানে না, পিতা 'কন্যার পিতা' এই প্রত্যয় নিয়ে বহু দিন নির্বিকারে বসে আছেন। প্রথম যৌবনে রুস্তমের মনে যে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবের বেদনা জেগেছিল আজ সেও স্তিমিত। এ রাজ্যে রুস্তমের ছেলের কথা কেউ কোন দিন বলেও নি, শোনেও নি। শুধু কি তাই? সামেনগানীরাও এ রহস্যের কিছুই জানে না। সত্য জানে শুধু তাহেমিনা আর স্বয়ং সোহ্‌রাব। অদৃষ্টের গ্রন্থি বন্ধন আরও জটিল হ'য়ে চললো।

আজ রাত্রি শেষে যুদ্ধ হবেই। যুধ্যমান দুই শিবির অক্সাস নদীর অপর পারে তৈরী হ'য়ে আছে। গ্রীসে প্রসিদ্ধ Oxus বা Bactrus নদীর আর্য ভারতে নাম ছিল বক্ষু, আরবে 'জৈহুন' আজকের আমুদরিয়া। এটাই বহ্লীক নদী। এই দরিয়া হিমালয় পর্বতমালার পামীর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হ'য়ে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে সেকালের তুরান আর একালের সোবিয়েত রাশিয়া নামক সংযুক্ত রাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল দিয়ে। এরই তীরবর্তী নগর খিবা, সমরকন্দ, বোখারা মধ্যযুগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত স্থানগুলি। Oxus বা আমুদরিয়া শাহ্‌নামায় উল্লিখিত হয়েছে 'মাওরাঁন্নহর্' ব'লে, যার দুটি শব্দই আরবী এবং অর্থ 'নদীর তীর'। তাতার রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত 'সামেনগান' এর সামন্তরাজ-দৌহিত্র আজ তাতার রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে মাওরাঁন্নহরে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে তার পিতা তাকে স্নেহালিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে।

রাত্রির অন্ধকার ক্রমশ অস্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। কলকল শব্দে ব'য়ে যাচ্ছে বক্ষু নদীর উন্মত্ত জলস্রোত আরল সাগরের দিকে। খল জল তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় বুঝি নিষ্ঠুর নিয়তির ছবি দেখিয়ে চলেছে; কিন্তু সব এখনও অস্পষ্ট অন্ধকারে ঢাকা। কেউ জানে না, সে কি ভয়ঙ্কর! পিতাও নয়, পুত্রও নয়। হাঁ একটি কথা। আজ ইরানী শিবিরের অদূরে রুস্তমও শিবির ক'রে আছেন। বড় বড় সেনাপতিরা অবসর নিয়েও যুদ্ধের তামাশা দেখতে আসেন। রুস্তমের শিবির সেই জন্য। সোহ্‌রাব বদ্ধপরিকর। সে চায় দ্বৈরথ সমর। যে খুশী আসুক। যদি জয় হয়, মনস্কামনা পূর্ণ হবে। যদি মৃত্যু হয়, ক্ষতি নেই। আর খোদা! মৃতের তো কোন কামনা বাসনা থাকে না, দুঃখ কি!

ইরানী ও তুরানী সৈন্যরা উদ্যত বর্শাফলকে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। অশ্বক্ষুরধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে রণাঙ্গন। উজবেগী, খোরাসানী, তুর্কমানীরা শেষ আদেশের জন্য প্রস্তুত। তুরানের ইজ্জত রক্ষা করতে হবে। এদিকে সীস্তানী, শিরাজী, তাব্রিজী, এস্ফাহানীরাও মরণ আলিঙ্গনের জন্য প্রস্তুত। এমন সময় তুরানী সর্বাধিনায়ক 'পেরানবিসা' সম্মুখে এগিয়ে এসে তুরানীদের ইঙ্গিতে সংযত করলেন; আরও একটু এগিয়ে এসে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন—

'ফেরুদ! ইরানের সেনাপতি! শোন, আজকের মত সন্ধি হোক, কাল প্রভাতে তোমরা যোগ্য বীর নির্বাচন করে দিও। তার সঙ্গে দ্বৈরথ সমর হবে আমাদের পক্ষের সোহ্‌রাবের। নিরর্থক সৈন্য নিধনে কোন পক্ষেরই লাভ নেই।' ঘোষণার পর তুরান শিবিরে উল্লাসের ধ্বনি উঠলো: কিন্তু ইরান শিবির একেবারে নিস্তব্ধ। যোগ্য বীর কোথায়? বহু কষ্টে, বহু সাধ্য সাধনায় রুস্তমকে রাজী করান গেল। কিন্তু রুস্তমের কঠিন শর্ত। তিনি এই বালকের সঙ্গে লড়াই করবেন আত্মপরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখে। অত্যন্ত সাধারণ থাকবে তাঁর পোশাক। তাঁর স্বর্ণমুকুট, তাঁর নিজের চর্মবর্ম, দস্তানা—কিছুই থাকবে না। খবরদার! কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়, বালকের সঙ্গে লড়ছে ইরানের প্রথিতযশা অপ্রতিদ্বন্দ্বী রুস্তম্। বলুন, 'মঞ্জুর'। সিপাহীসালার রাজী হলেন। ফেরুদ, গুদ্‌রোজ, জোআরা, ফেরাবুরজ্—সকলেই রাজী; কারণ তাঁরা অনন্যোপায়। বিধাতা এই সুযোগে তাঁর ঈপ্সিত শেষ বাঁধনটি শক্ত করে দিলেন। এ বাঁধন অব্যর্থ—

But I will fight unknown, and in plain arms;
Let not men say of Rustum, he was matched
In single fight with any mortal man.

—Matthew Arnold

যিনি চিরকাল ইরানের ইজ্জত রক্ষা করে এসেছেন সেই রুস্তমের পক্ষে নিশ্চেষ্ট উদাসীন থাকা অসম্ভব। এই জন্যই তিনি মানতে বাধ্য হলেন এই অসমদ্বন্দ্ব এবং আত্মসমর্পণ করলেন এই বিরূপ সঙ্ঘটনায়। রুস্তমের মর্মস্থলে যে একটি কথাই আছে—বতন্ সবার আগে।

'চু ইরান্ ন বাশদ্ তন্-ই-মন্ মবাদ্।'

যদি ইরানের অস্তিত্ব না থাকে, তবে আমার এই দেহ যেন না থাকে।

'কেশ্‌বর্ ব দুশ্‌মন্ দহীম্' ? আমার এই স্বদেশ কি আমি শত্রুর হাতে তুলে দেবো ? জান কবুল—

'হম্ সর্ বে সর্ তন্ বকুশতন্ দহীম্'—

তার আগে আমার গোটা মাথা দেহ থেকে বিচ্যুত করে আমি আত্মঘাতী হব। ইনি সেই রুস্তম্—এই যুদ্ধে তিনি উদাসীন দ্রষ্টা হয়ে থাকবেন কি করে ?

ফেরদৌসী শাহ্‌নামায় সোহ্‌রাব রুস্তমের তিন দিনের যুদ্ধ বিবরণ দিয়েছেন। প্রথম দর্শন মাত্রই প্রৌঢ়ের হৃদয়ে অজ্ঞাতপূর্ব পিতৃস্নেহ জেগে উঠেছিল। বালক ! কেন এই নিশ্চিত মরণ যুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছ ? এস আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ কর। Matthew Arnold এর ভাষায়—

'O thou young man, the air of Heaven is soft,
And warm, and pleasant ; but the grave is cold.
Heaven's air is better than the cold dead grave.'

পুত্রের দিক থেকে শুধু একটা জিজ্ঞাসা—তুমি কি রুস্তম্ নও ? উত্তরে কিন্তু প্রৌঢ়ের কণ্ঠ কাঁপে না, 'পাগল ! রুস্তম্ আসবে বালকের সঙ্গে লড়াই করতে ! সে এখন জাবুলে পিতৃপরিচর্যায়, জাবুল অনেক দূরে।' দুদিন পরাজিত রুস্তম্ লজ্জায় আনতশির। আজ তৃতীয় দিনের যুদ্ধে সোহ্‌রাব পিতার চিন্তায় অন্যমনস্ক। মহাভয়ঙ্কর সেনাপতির রুদ্রকণ্ঠে চীৎকার শোনা গেল—'তুমি যাকে চেয়েছ আমি সেই—বালক ! আত্মরক্ষা কর।' সোহ্‌রাবের কাছে সব মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অসতর্ক মুহূর্তে—

'সোবক্ তীগ-এ-তীজ অজমীয়ান্ বর্ কশীদ্।
বর্ পুর-এ-বীদার্ দেল বরদবীদ্॥'

রুস্তম্ বিদ্যুৎ গতিতে শানিত কৃপাণখানা খাপ থেকে খুলে পুত্রের দিকে হুঁশিয়ার দৃষ্টি রেখে বুকে বসিয়ে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে দিলেন। মুমূর্ষু বালক কেঁদে বললে—'তোমার উদ্ধার নেই। তুমি যেখানেই আত্মগোপন কর—নক্ষত্রের দূরলোকেই হোক্, আর সমুদ্রের অতল অন্ধকারেই হোক্

—আমার পিতা রুস্তম্ এই অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেনই।" ওদিক থেকে উত্তর আসে—রুস্তমের তো পুত্র নেই—সে তো এক কন্যার পিতা। 'না! কখনো না—এই দেখ তাঁরই নামাঙ্কিত কবচ।' অন্ধকার, অন্ধকার সব অন্ধকার। সম্মুখেও জৈহুন্ নদীতে ততক্ষণ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষের রাজ্যের এই হাহাকারে তো নির্মম প্রকৃতির বুকে কোন রূপান্তর হ'লো না! Matthew Arnold-এর নিরুপম ভাষায়—

But the majestic river floated on,
Out of the mist and hum of that low land,
Into the frosty starlight, and there moved,
Rejoicing··· ···

এসব ক্ষেত্রে ফেরদৌসী শুধু ঘটনার বিবরণ দিয়ে নিরস্ত থাকেন না। তিনি দার্শনিক ভাব ও ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে যান এবং জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হন। যাকে তর্কশাস্ত্র কব্জা করতে পারে না, সেই সমাধানহীন রহস্যকে অদৃষ্ট শক্তির অমোঘ বিধান বলে তিনি গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন, সে রহস্যরাজ্যে মানুষের জ্ঞানগবেষণা নিষ্ফল হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায় বিশ্বের সনাতন নিয়ম-চক্র। জীবনের এই নিষ্ঠুর দিকটি প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যিকরাও দেখেছিলেন। থীব্‌সের রাজা লাইয়ুস্ পুত্রের হাতে মৃত্যুর বিভীষিকায় নিজপুত্রকে জন্মের পরক্ষণেই হাতপা বেঁধে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করেও অদৃষ্ট-বিধান থেকে রক্ষা পেলেন না। আর তার পুত্র ওয়েদিপুস শত চেষ্টা করেও মাতৃ-সঙ্গমের নিষ্ঠুর বিধান থেকে নিস্তার পেলেন না। নিয়তিচক্র এমনই অমোঘ, এমনই ক্রুর। সফোক্লিস্ সেই নিষ্ঠুর চিত্র দেখিয়েছেন। ফেরদৌসী দেখিয়েছেন পুত্রঘাতী পিতার অসহায় চিত্র। এ চিত্র বড় করুণ, সবার চোখেই জল আসে। এ নিয়মের রাজ্যে অনিয়ম কেন আসে? বিচারের রাজ্যে কেন আসে অবিচার? ফেরদৌসী বলেন, আমাদের বিচার-বুদ্ধি এখানে পরাভব মানে। এ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কোনদিন কারও দৃষ্টি অগ্রসর হতে পারেনি। অদৃষ্টের দুয়ার একবার বন্ধ হ'লে মাথা কুটলেও আর তাকে খুলতে পারবে না।

যদি খোলে তবে সে অবস্থায় আর কিছু পাওয়া যায় না। যদি কিছু থাকে সেও অদৃষ্ট জগতে মরণ সমুদ্রের পরপারে, যা কিছুতেই আমরা দেখতে পাই না। সেও এক মাওরা-ন্নহর—Across the River. শোক করো না। মৃত্যু যদি প্রতি মুহূর্তে তার ধ্বংসলীলা না করে যেতো, তবে এই পৃথিবী জীর্ণতার বীভৎস স্তূপে পরিণত হয়ে যেতো। নিত্য নূতন এসে এই পৃথিবীকে শুচি-শুভ্র ক'রে নব নব ভাবে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারতো না। শোক ক'রো না।—

'In Destiny's sight Youth and Age are as one',

তুমি অসহায় জীব। খামোশ—শুধু চুপ করে থাকো। তোমার খামোশী হোক খোদার নৈবেদ্য—

'That silence is best, for God's servant art thou.'*

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের পাঠকেরা ফেরদৌসীর অজস্র উপদেশ বিতরণকে বরদাস্ত করেন নি। আমাদের বিচারে শাহ্‌নামার উপদেশের আতিশয্য নেই। প্রসঙ্গ এলেই জ্ঞানবৃদ্ধ কবি তাঁর জ্ঞানের আলোক দিয়ে ঘটনা ও বস্তুপুঞ্জকে আলোকিত করেছেন। এ ব্যাপারে শাহ্‌নামায় কুত্রাপি অপ্রাসঙ্গিক জবরদস্তি নেই। নীতিকথার অযাচিত ভারনিক্ষেপ পাঠককে পীড়িত করে না বলেই বিশ্বাস করি। উপদেশের অধিকার অর্জিত হয় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিশ্চিত লোক থেকে। মহাপ্রাজ্ঞ ফেরদৌসী—তাঁর জ্ঞানের আলোক দিয়ে দীপাবলী সাজিয়েছেন। সে রোশ্‌নীতে ভ্রান্ত পথিক পথের সন্ধান পেয়ে বলে, 'মোশ্‌কিল আসান।' মহাভারতের শান্তিপর্বে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেবেরই মহোপদেশমালা গাঁথার অধিকার ছিল। ফেরদৌসীর শাহ্‌নামাকে আমরা উপদেশের বজ্রচূর্ণে গ্রথিত এক বিরাট কালজয়ী শিল্পসৌধ ব'লে মনে করি। মনে হয়—শাহ্‌নামা—বর্ ফিকির ইমারত্-এ-কদীম্।

এইবার শাহ্‌নামার ছন্দের কথা। এই মহাগ্রন্থ আগাগোড়া হ্রস্ব-দীর্ঘের একটানা ওঠা নামায় একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছে—এমন কথা পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ার হাল জমানার সমালোচকরা বলে থাকেন। এই ছন্দের নাম

---

* অনুবাদ (E. G. Browne)

'মুতকারিব'। লঘু গুরু গুরু ক'রে সাজান তিনটি পূর্ণ পর্বের পর লঘু গুরুর একটি খণ্ড পর্ব।

চু ঈ রান্। ন বা শদ্। ত নে মন্। ম বাদ্

আগাগোড়া শাহ্নামায় এই ছন্দপ্রবাহ বয়ে চলেছে। রামায়ণ মহাভারতে ছন্দবৈচিত্র্য থাকলেও বহু বহু অংশের অনুষ্টুভ ছন্দে কারও কর্ণপটহে আঘাত লেগেছে বলে শোনা যায়নি। মেঘদূতের আদ্যন্ত মন্দাক্রান্তা তো বিরহবেদনার প্রমূর্ত ও অপ্রতিহত ছন্দ। বিরক্তিকর দূরে থাক সেই ছন্দই আগাগোড়া অপরিহার্য মনে হয়। লাতীন কবিদের সেরা কবি Virgil প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একছন্দে Aenid রচনা করেও কোন যুগের নিন্দাভাজন হননি। দুহাজার বছর ধরে তাঁর যশ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তাঁর ষট্পর্বিক ছন্দ (Hexametre) তাঁর মহাকাব্যের সুমহৎ ছন্দ। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি আচার্য গোবর্ধন একমাত্র আর্যা নামক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ তাঁর সাতশ' শ্লোকে প্রবাহিত করেছেন। অন্ধ্র নৃপতি হাল রচনা করেছিলেন গাথাসপ্তশতী একই ছন্দে। কোন কবি এর জন্য বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হন নি।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল—আমরা যখন কাব্য পাঠ করি, তখন ছন্দ পাঠ করি না। উদ্ধৃত "চু ঈ রান্ ন বাশদ্"কে ছন্দ-লয়ে যেমনই সাজাই পাঠক্রম একটু অদলবদল হয় অর্থেরই অনুরোধে, তখন ছন্দ অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা, অর্থ বিষমচ্ছেদ পরিহার ক'রে, অর্থেরই স্পষ্টতা সাধন ক'রে চলেছে। অক্ষরের নির্দিষ্ট ঝোঁক কাটা কাটা ক'রে আমরা নিজের কানেও দিই না, পরের কানেও তার আঘাত দিতে চাই না। অর্থ ছন্দের দাসত্ব করতে চায় না ব'লেই ছন্দকে সে আতিশয্যে বেড়ে উঠতে দেয় না।

আমি গোটা মাথাটা দেহ বিচ্ছিন্ন করে আত্ম বিনাশ করব।

হম সর্ বেসর্ তন্ বকুশ্তন্ দহীম্।

আবৃত্তিতে এমনই শ্রুতিগোচর হওয়া প্রয়োজন। এমন পড়বো না—

হ ম সর। বে স র তন্। বকুশ তন্। দহীম্

সে যুগের রাজবংশমালায় যুদ্ধের কথাই তো বেশী থাকবে। অতীতের ইতিহাস তো সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত। শাহ্নামা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংগ্রাম-সূত্রে গাঁথা। এই সংগ্রাম-সূত্রে ফুল হ'য়ে ফুটেছে ফেরদৌসী অঙ্কিত চরিত্র-

সমূহের জ্ঞানগর্ভ নৈতিক উপদেশ। কাইখসরু ও গোদরুজ, জাল ও রুস্তম্, দারা ও ইস্কন্দর, বুজুর্গমহর ও নৌশীরবানের কাহিনী অংশ সেই উদ্যান-বাটিকার সুরভি কুসুম। সেই সব অংশের সূক্তিমালার সামান্য অংশ তুলে ধরছি—

'ন বাশদ্ হমী নীক্ ব বদ্ পায়দার।
হমাঁ বিহ্ কি নীকী বু বদ্ ইয়াদ্গার॥'

এ ভূমণ্ডলে ভালই হোক বা মন্দই হোক, কিছুই চিরস্থায়ী হ'য়ে থাকে না। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য যে, সমগ্রতায় আমরা উত্তমেরই উপাসক। তাকেই চিরকাল স্মরণে ধরে রাখতে চাই।

আবার দেখ, তোমার মালমুলুক, দীনার বা গ্রাম-গঞ্জ এমন কি আকাশছোঁয়া উঁচু প্রাসাদ কোন কাজে লাগে কি? ফেরদৌসীর ভাষায়—

'হমাঁ গনজ-ই-দীনার ব কাখ্-ই-বুলন্দ্।
ন খাহদ্ বুদন্ মর্ তুরা সূদ্-মনদ্॥'

স্মরণ কর ফরীদূনের কথা, তিনি তো কোন ফররুখ ফিরিস্তা ছিলেন না। তাঁর দেহের উপাদানে ছিল না খ্শ্ক্ বা অম্বর (Amber)। তিনি আজও বেঁচে আছেন মানুষের স্মৃতিতে, বিরাজ করছেন আপন মহত্বে। এস, তুমিও দান কর, শুধু দিয়ে যাও (দিহিশ্), মানুষ তোমাকে ফরীদূনের মত স্মরণ করবে।

বৃদ্ধ মনু তাঁর ধর্মশাস্ত্রে বলে গিয়েছেন 'নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌ব্রূয়াৎ' কেউ কিছু জিজ্ঞাসা না করলে, কথা বলবে না। ফেরদৌসী বলছেন—প্রয়োজনে কথা বললেও 'কূতা' গোয়িদ্ ব মা'নী-বসী' সংক্ষেপে অর্থ-গুরু কথা বলবে। Silence is golden, তুমি শুধু আপন জ্ঞানের সাম্রাজ্য বাড়িয়ে যাও। জীবন বড় চঞ্চল, অতি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এ পৃথিবী অতিথি-খানা।

তথাপি তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবনে এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখো, দেখবে পৃথিবী বৈচিত্র্যে ভরা। বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ মিছিল করে চলেছে। মানুষ উপাদানে এক, তবে এ বৈচিত্র্য কেন? ফেরদৌসী রক্ত ও পারিপার্শ্বিকতার (heredity and environment) প্রশ্ন তুললেন না। তিনি নীচের ধাপে নেমে এসে একেবারে প্রত্যক্ষবাদীর উত্তর দিলেন—

'দিল-এ-হরকসী বন্দয়ি আরজ্ অস্ত্।
বাজাউ হরকসী, বা দিগর্ গুনাহ্, খ্ অস্ত॥'

প্রত্যেকের মন বিশিষ্ট বিশিষ্ট কামনার নিগড়ে বাঁধা। আবার শোন! এই বিভিন্ন কামনার রং লেগে লেগে চরিত্রগুলি বিচিত্র হয়ে উঠে। Shakespeare হ'লে এই কামনার উগ্রতায় বন্দী চরিত্রকে দেখে বলতেন ওর নাম Passion.—এটাই রোমানদের Passio, সেটাই সংস্কৃতে পাশঃ। তান্ত্রিকরা বলবেন জীব মাত্রেই পাশবদ্ধ, পাশমুক্ত হলেই শিব।

"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ।"

ফেরদৌসী যে কতবড় সূক্ষ্মদর্শী মানবপ্রেমিক তা ভাবলে আজকের পৃথিবীর অনেকে বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। ফেরদৌসী বুঝেছিলেন ভাবের দুনিয়াটাকে দুই টুকরো করলে দেখা যাবে একটা 'সৎ' আর একটা 'অসৎ'। ইরানীদের রক্তের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের এই সৎ ও অসতের চিন্তা আছে। বলা বাহুল্য, ফেরদৌসী 'Universal good' স্বীকার করেন। একথা মনে রাখতে হবে, আপেক্ষিকবাদের চিন্তাধারা তখন অবশ্যই 'অজ্ঞাত ভুবন-ভ্রূণ' মধ্যে ছিল। ফেরদৌসী বিশ্বাস করেছিলেন, সেই সদ্‌বস্তুকে সকলে সমভাবে চাইলেই এই পৃথিবীর পটপরিবর্তন ঘটে যাবে।

'ব খো হরকসী দর জাহান্ দীগরস্ত্।
তূরা বা উয় আমীজশ্ অন্দর্ খোরাস্ত্॥'

যদি চরিত্র নিয়েই এই পৃথিবীতে ভাববৈষম্যের নিত্য কলহ, তবে চেষ্টা কর সৎ মিশিয়ে মিশিয়ে বিষম চরিত্রের সংশোধন। এই সতের জাগরণে হবে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। এই বিশ্বজনীন ভাব-উন্মেষের মধ্য দিয়ে সাম্য 'পায়দার' হবে। যুদ্ধের উন্মাদনা আর থাকবে না। ফেরদৌসী 'One World' এর স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা জানিনে, তবে যুদ্ধ নামক হিংসার প্রহসনকে থামিয়ে তিনি সাম্যাবস্থার ধ্যান করেছিলেন।

'তূ রা বা উয় আমীজশ অন্দর খোরাস্ত্'।

ফেরদৌসী বলতে চান মানুষের অবিবেকের ফলই যুদ্ধ নামক বিজিগীষা। মানুষ যে সেই পরম জ্ঞানস্বরূপ খোদারই এক টুকরা তা সে বিস্মৃত হয় ব'লেই যুদ্ধ ঘটে। মহতো মহীয়ানের স্বরূপ মানুষ বিস্মৃত হয় বলেই স্বার্থের সংকীর্ণতায় ঘটে থাকে যুদ্ধ। এটা পরিহার করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য নয়।

মধ্যযুগের ঈশ্বর বিশ্বাসী এক কবির মূল চিন্তাধারার সঙ্গে পরমার্থে সংস্কার-বর্জিত এক আধুনিক সৈনিক কবির চিন্তাধারার সেতুবন্ধন ক'রে আমার এই অধ্যায় শেষ করছি। প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত Wilfred Owen এর কবিতাগুলি তাঁর মৃত্যুর পর এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রকাশিত হ'য়ে সে যুগের মানুষকে নতুন চিন্তার পথ দেখিয়েছিল। Owen চিরকালের জন্য যুদ্ধের রক্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে দিতে চেয়েছিলেন—

"Then, when much blood had clogged
their chariot wheels,
I would go up and wash them from sweet wells,
Even with truths that lie too deep for taint."

সেলজুক যুগের ভূমিকা ও ওমর খইয়্যামের পরিচয়

পূর্বয়ুরোপের শেষপ্রান্তে নব রোমান সাম্রাজ্যের নতুন রাজ্য ছিল বাইজানতিয়াম। এই রাজ্যের সমুদ্রোপকূলে ইয়োরোসিয়ার ঠিক সঙ্গমস্থলে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্য সাগরের ঠিক সন্ধিস্থলে শেষ পর্যায়ের রোম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—নাম কনস্তান্তিনোপোল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইতিহাস-বিশ্রুত প্রথম-খ্রীষ্টান রোমসম্রাট্ কনস্তান্তাইন। কালটা ৩০০ খ্রীস্টাব্দ। পাঁচশো বছরের মধ্যে সেই রোমান সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। এই সময় ৮০০ সালে রোমানরা বাগদাদের খলিফার সঙ্গে সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। আর একবার দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বাইজানতিয়াম লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিল। তখন এসিয়া মাইনর বা রুমী দুনিয়া থেকে মুসলিমরা বিতাড়িত হয়েছিল। ক্রীট ও সাইপ্রাসেও মুসলিম অধিকার বিলুপ্ত হয়েছিল। রোমানরা তিন শতাব্দীর আরব দাসত্ব থেকে সিরীয়াকেও বিমুক্ত করল। এটাই

বোধ হয় নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ শিখার সর্বশেষ জ্বলে ওঠা। এইবার রণস্থলে এল মধ্য এসিয়ার রুশীয় অঞ্চল থেকে ইসলামে নবদীক্ষিত তুর্কী জাতি তাদের উন্মত্ত প্রচণ্ডতা নিয়ে। স্বভাবে যাযাবর, হৃদয়বৃত্তিতে নৃশংস, মনোজগতে অসংস্কৃত এবং নাগরিক জীবনে অনভ্যস্ত এই জাতির আদিম লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের অকর্ষিত ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের বীজ অনায়াসে প্রাণপ্রাচুর্যে এমনই বর্ধিত হ'লো যে, আরবের ক্ষেত্রে যে ধর্ম-প্রচার কোন জবরদস্তির আতিশয্য গ্রহণ করেনি, এই সেলজুক তুর্কীদের ক্ষেত্রে সেই ধর্ম অতিক্রন্ত বর্বর নৃশংসতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। সেই হিংসা-স্রোতে আর্মেনিয়া গেল, কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূলের রাজ্যগুলি তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ল (১০৩০ খ্রীঃ)। বিধর্মীর প্রতি আরব জাতির যে সহিষ্ণুতা ছিল এই তুর্কীদের তা একেবারেই ছিল না। এরই অনিবার্য পরিণাম পশ্চিমে য়ুরোপের ক্রুসেড্ এবং পূর্বে ভারতবর্ষে বল ও কৌশলে ধর্মান্তরীকরণের সুদীর্ঘ ইতিহাস। বাইজানতিয়ামও সেই হিংসার কবলে পড়ে সর্বশেষে কনস্তান্তিনোপোলের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সেই একই ঐতিহাসিক সত্য উৎকীর্ণ করে গেল। সহস্রাধিক বর্ষপূর্বের এক খ্রীস্টান কনস্তানতাইন্ প্রতিষ্ঠিত মহানগরী আর এক রোমসম্রাট্ কনস্তানতাইনের সময় চতুর্দশ শতকে মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বী ওসমানী তুর্কী দ্বিতীয় মহম্মদ দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। চারটি নামের কি অপূর্ব সাংকেতিক তাৎপর্য! দুই মহম্মদ ও দুই কনস্তান্তাইন!

তুর্কীদের একটি শাখা সেলজুক—একথা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি। সেলজুক একটি ব্যক্তি-নাম। সেলজুকের পিতা তুকাক্ সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তুর্কী ভাষায় তুকাক মানে ধনুক। এই দুর্ধর্ষ সংগ্রাম-প্রিয় জাতি তুর্কিস্থান থেকে নেমে এসে বোখারা ও সমরকন্দের ঈষৎ উষ্ণ আবহাওয়ায় তাদের অস্থায়ী শীতাবাস স্থাপন করতো। এই ভয়ঙ্কর জাতিকে সুলতান মাহ্মুদ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োজিত করতে গিয়েই পরিণামে বিপদ ঘটিয়েছিলেন। কথায় আছে—'যে দরজা বন্ধ করতে পারবে না, সে দরজা কখনও খুলতে যেও না। যে আগুন নেবাতে পারবে না, তাকে ফুঁ দিয়ে জ্বালিও না। যে সর্বনাশা তীর আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না, তাকে নিয়ে খেলা করতে যেয়ো না।'

মহা বুদ্ধিমান্ সুচতুর ও বহুদর্শী হয়েও সুলতান মাহমুদ বোকার মত বন্ধ দরজা খুলে, ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালালেন এবং তারই মধ্যে সর্বনাশা বাঘ নিয়ে খেলা শুরু করলেন। সেই বিষাক্ত বাণে তার বংশ উৎখাত হয়ে গেল। তুর্কী বংশের 'তুঘ্রিলবেগ' সুলতান্ মাহমুদের পুত্র মাসুদকে সিংহাসন-চ্যুত করে নিজে সিংহাসনে বসলেন। মহাসমারোহে তার নামে 'খুত্‌বা' পাঠ করা হ'লো (১০৩৮ খ্রীঃ)। এইবার তুঘ্রিলের নেতৃত্বে তুর্কীদের বাগদাদ লুণ্ঠনের পালা শুরু হ'লো। খিলাফৎ বিধ্বস্ত হ'লো (১০৫৫ খ্রীঃ)। স্মরণযোগ্য বাগদাদে তখন আব্বাসী খিলাফৎ, উম্মায়ী নয়। আব্বাসীরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। সেলজুক তুর্কীরা শিয়াবিদ্বেষী কঠোর সুন্নি মুসলমান।

বিপ্লব সর্বদা অবিমিশ্র অশুভ নিয়ে আসে না। অশুভের মধ্য দিয়ে কখনো কখনো শুভের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীন যুগে গোটা য়ুরোপে এক ধ্বংসের তাণ্ডব চ'লেছিল। ক্ষীয়মান রোমান সাম্রাজ্য আত্মরক্ষায় অসমর্থ। সেই সুযোগে উত্তরে জলদস্যু 'বাইকিংরা' (Viking) এবং মধ্য য়ুরোপের হিংস্র Goth ও Visigothরা তাণ্ডব শুরু করল। Vandal দস্যুরা তো য়ুরোপ ছেড়ে উত্তর আফ্রিকাকেও উত্তপ্ত ক'রে তুলেছিল। Jutes, Angles এবং Saxon-দের কৃপাণ গোটা ব্রিটেনকে পদানত ক'রে দিল। তুর্কো-মোঙ্গল জাতির হুন দস্যুরা আবার এইসব টিউটনদের দূরে হটিয়ে পশ্চিম য়ুরোপ পর্যন্ত এগিয়ে গেল। এইসব ধ্বংসলীলার মধ্য থেকেই য়ুরোপে নবজাতীয়তাবোধের স্ফুরণ ঘটেছিল। বর্তমান য়ুরোপের দেশ ও জাতিগুলির সমুত্থান এরই কারণ-সম্ভূত। শিথিল আত্মসম্বিৎ দুঃখের মধ্য দিয়েই জমাট বেঁধে সুদৃঢ় জাতীয়ভাব গড়ে তোলে।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় সুবিশাল মুসলিম দুনিয়া পরস্পর হিংসা বিদ্বেষে জর্জরিত হ'য়ে খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে পড়েছিল। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারস্যও তার অখণ্ডতা হারিয়ে ফেলেছিল। মুসলিম দুনিয়ায় ঐক্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্ধর্ষ শক্তির নতুন ক'রে প্রয়োজন হ'য়েছিল। সেই শক্তি এসেছিল সেলজুকদের মধ্য দিয়ে। তারা একে একে পারস্য, মেসোপোতামিয়া, সিরীয়া এবং এশিয়া

মাইনরের দুর্বল রাজশক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত ক'রে দিয়ে নিশ্চিত ভাবে একপ্রকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে দিল। সেই ঐক্যের ছবি সেকালে দেখা দিয়েছিল আফগানিস্তানের পশ্চিম প্রান্ত থেকে ভূমধ্য সাগরের উপকূল পর্যন্ত। কনস্তান্তিনোপোলের পতনের জন্য যতই দুঃখ হোক, সেও এক শুভ প্রভাতের সূত্রপাত ক'রে দিল। রোম সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় রাজধানী য়ুরোপ এসিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যার ভাণ্ডার চূর্ণ বিচূর্ণ হ'লেও সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারীরা পশ্চিম য়ুরোপে ছড়িয়ে প'ড়ে তাদের প্রতিভার আলোক জ্বালিয়ে দিলেন। মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপ গ্রীকোরোমান জ্ঞানের আলোকে জ্বলে উঠলো। এই জাগরণের নাম মধ্যযুগীয় সুপ্তি থেকে পুনরুত্থান—ফরাসী ভাষায় রেনেশাঁস।

সেলজুক বংশলতিকাকে উপেক্ষা ক'রে আমরা কয়েকটি মাত্র নাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করব। সেলজুকের পুত্র ইসরাইলকে সুলতান মাহমুদ সাত সাতটি বছর ধরে বন্দী ক'রে রেখেছিলেন শুধু আতঙ্কে। সুলতান তাঁরই একদা-অনুগ্রহপুষ্ট ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—'প্রয়োজন হ'লে তুমি সঙ্কেত পাঠিয়ে কতটি তুর্কী জমা ক'রে দিতে পার? উত্তর হ'লো, 'সুলতান! একটি তীর ছুঁড়ে দিলেই এক লক্ষ তরুণ তুর্কী মুহূর্তে হাজির হবে। আর যদি সুলতান! আমার ধনুকটা পাঠিয়ে দিতে পারি, তবে এক্ষুনি ছুটে আসবে দু-লক্ষ তুর্কী।' এহেন বিপজ্জনক শুভানুধ্যায়ীকে বাইরে রাখা যায় না বলেই মাহমুদ তাকে সপুত্রক কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। ইসরাইয়েলের পুত্র কুতলমিশ কারাগার থেকে কৌশলে পালিয়ে বাঁচল। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর সুযোগ বুঝে ইসরাইলের ভ্রাতুষ্পুত্র তুগ্রিল বেগ প্রথম নীশাপুরে আধিপত্য বিস্তার ক'রে খোরাসান পর্যন্ত ধাওয়া ক'রলেন এবং সুলতান-পুত্র মা'সুদকে পরাজিত ক'রে গোটা ইরানে তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। খোরাসান রাজধানী হ'য়ে শতাব্দীর উপর সেলজুক শক্তির কেন্দ্র হ'য়ে রইল। তুগ্রিলের ভ্রাতুষ্পুত্র আল্প্ আরস্লান সিংহাসনে বসে তাঁর অপ্রতিহত শক্তির পরিচয় নানাভাবে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি আজ মরুর ধুলায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছেন কিন্তু

একদা তাঁর উচ্চ শির আকাশস্পর্শী হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর সম্বন্ধে পাথরে উৎকীর্ণ আছে—

'সর-এ-অল্প্ আর্স্লান দীদী জি রিফ'ত্ রফ্তা ব বর গর্দূঁ ॥

বি-মরবা আ তা বি খাক অন্দর সর-ই অল্প্ আর্স্লান দীদী।'

তিনি আজ বিস্মৃতির রাজ্যে চ'লে গেলেও তাঁর প্রধানমন্ত্রী—'নিজাম উল মুলক'—আবু আলী আল্ হাসান বিন ঈশাক তাঁর অবিস্মরণীয় জনহিতকর কার্যগুলির মধ্যে আজও বেঁচে আছেন। নিজাম উল মুল্‌ক ছিলেন বহু গুণের আধার, স্বয়ং পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কদরদান। বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেই যুগের অবিনশ্বর কীর্তি। এছাড়াও তিনি এস্‌ফ্হানে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন একটি মহাবিদ্যালয়। বাগ্দাদে নিয়ে এসেছিলেন ধর্মশাস্ত্রে প্রবক্তা আবু হামিদ মুহম্মদ আল গজালীকে। লোকে বলতো 'লা নবীয়া বা'দী', কথাটি বাদী হ'য়েছে নৈলে মাওলানা গজালীকে দ্বিতীয় পয়গম্বর বলা যেতো। এই গজালী ছাড়া মহামন্ত্রী তাঁর পরমবন্ধু, আবাল্যবন্ধু ওমর খইয়্যামকেও এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এসেছিলেন। আর্স্লান তখন জীবিত ছিলেন না। কাজেই মহামন্ত্রী আর্স্লান-পুত্র মালেকশা'র সঙ্গে ওমরকে পরিচিত করিয়ে দিলেন। নিজাম উল মুল্‌ক নিজেও রাজকার্য পরিচালনার দর্পণ স্বরূপ একটি মহাগ্রন্থ রচনা ক'রে গিয়েছেন। সে গ্রন্থের নাম—'সিয়াসত্‌নামা'।

সেলজুক বংশে অবিস্মরণীয় নাম 'মালেকশাহ'। মাত্র আঠার বছর বয়সেই তিনি বিশাল সেলজুক সাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। এই বিদ্যোৎসাহী সুলতান গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশাল মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মানমন্দিরে গবেষণার জন্য নিযুক্ত হন সেই বিশ্রুতকীর্তি পণ্ডিত, যিনি আজ শুধু একজন কবিরূপে প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছেন। তাঁর নাম 'ওমর খয়্যাম্'। 'ওমর' নাম, 'খয়্যাম্' কৌলিক উপাধিজ্ঞাপক তখল্লুস্ বা ছদ্মনাম। তাঁর পূর্বপুরুষ তাঁবুর ব্যবসা এবং তাঁবু মেরামত করতো বলেই এই বৃত্তিজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক উপাধি 'খয়্যাম্'। ওমরকে আরবরা জানত 'খয়্যামী' বা খয়্যাম্ বংশ সম্ভূত পণ্ডিত ব'লে। ওমরের মানমন্দিরের গবেষণার সহায়ক ছিলেন

আরও দুজন (১) আবুল মুজাফ্ফর (২) ময়মুন্ মজীব। সুলতান মালেকশাহ্ চেয়েছিলেন একটা নতুন সাল প্রবর্তিত করতে, তাঁরই নামে 'মালেকশাহী' বা 'জালালী' সাল। তার শুভারম্ভ হবে ১০৭৯ সালের ১৫ই মার্চের নবরোজ থেকে। এই সালের মাসগণনায় ব্যবহৃত হবে সৌরমাস, চান্দ্রমাস নয়।

১৮৯৭ সাল পর্যন্ত ইরানে কবি ওমরের কোন প্রামাণিক সংগ্রহগ্রন্থ বা প্রামাণিক জীবনচরিত ছিল না। জীবনচরিত নামে ছিল কতগুলো লোক-সমাজে প্রচলিত গালগল্পের সংগ্রহমালা। এগুলিতে থাকতো রোমান্টিক গল্পের ছড়াছড়ি। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি Tennyson-এর অকৃত্রিম বন্ধু, পার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ Fitzgerald কর্তৃক অনুবাদিত ওমরের রুবাইয়াত্ সারা য়ুরোপে এবং আমেরিকায় নতুন ভাবের প্লাবন আনে। তার একটা কারণ এই অনুবাদ আক্ষরিক না হ'য়ে ভাবানুবাদ হ'য়েছিল এবং এই কারণেই তা অতি সহজে অকৃত্রিমতার রং-এ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় কারণ, তখনকার পশ্চিম দুনিয়া অতি সহজে ওমরের প্রত্যক্ষদর্শন ও অজ্ঞেয়বাদিতাকে সমগ্র হৃদয় দিয়ে সানন্দে বরণ করেছিল। ওদিকে ভালেনটিন ঝুকোভ্স্কি (Valentin Zhukovski) রুশ ভাষায় নিবন্ধ রচনা করলেন— 'Umar Khayyam and the Wandering Quatrains'। কিন্তু তখন রুশভাষা য়ুরোপে অনাদৃত ভাষা। এদিকে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডক্টর E Denison Ross রুশীয় নিবন্ধটি ইংরেজীতে অনুবাদ ক'রে দিলেন—(Journal of the Royal Asiatics Society 1898, Vol. XXX pp 349-366)। এই প্রবন্ধটি তিনি Fitzgerald এর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশিত করেন। এর টীকা ও টিপ্পনী সংযোজন করেন Mrs H. M. Batson। এটা ঠিক ১৯০০ সালের ঘটনা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ওমরের (ক) জার্মান সংস্করণ Friedrich Rosen, ১৯২৮ খ্রীঃ। (খ) Edward Heron Allen, ইংরাজী অনুবাদ, খ্রীঃ ১৮৯৮। (গ) নওল কিশোর প্রকাশিত লক্ষ্ণৌরী সংস্করণ, (ঘ) Omar Khaiyyam By Dr. Arthur J. Arberry,

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ১৯৫২। (৬) স্বামী গোবিন্দতীর্থ প্রকাশিত The Nectar of Grace. *

আশ্চর্যের বিষয় ইরানে ওমরের কবিরূপে স্বীকৃতি ছিল না। Awfi (আরফী) ছিলেন সেকালের প্রথমস্তরের সাহিত্যের ইতিহাস লেখক। তিনি নীরব। অতি প্রসিদ্ধ দৌলতশাহ ১৪৮৭ সালে তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস শেষ করলেন। এর আগে দ্বাদশ শতকে লিখিত সমরখন্দী নিজামী আবাদী লিখিত 'চহার মক.ালা' গ্রন্থে ওমর কবি ও কাব্য অধ্যায়ে স্থান লাভ না করে' স্থান লাভ করেছেন জ্যোতিষী ও বৈজ্ঞানিকদের অধ্যায়ে। অবশ্য সেখানে ওমরের অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ গণনায় নানা প্রশংসা করা হয়েছে। নীশাপুরে এই কবির সমাধিক্ষেত্র বর্তমান আছে। এই প্রতিভাদীপ্ত মানুষটির ছিল আশ্চর্য স্মরণ শক্তি। তিনি এসফাহানে যা একবার পাঠ করতেন, তা নীশাপুরে গিয়ে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিতে পারতেন। ঝুকোভ্স্কির ভ্রাম্যমান রুবাই-তত্ত্বে একথার বিশ্লেষণ আছে যে, ওমর ছিলেন অতীত ভাবপ্রবাহের ধারক এবং বাহক। এই তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা এই প্রসঙ্গে অনেক শা'য়রের শা'য়রীর ছায়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমি প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম দিচ্ছি—

আবদুল্লাহ্, আনসারী, আবিল খয়ের, আনোয়ারী, আসজাদী, অত্তার, ফকরউদ্দীন রাজী, ফিরদৌসী, গজালী, জলাল-উদ্দীন রুমী, কমাল-উদ্দীন সমালী, নাসীর-উদ্দীন তূসী এবং সর্বোপরি আবু-আলী-বীন সীনা, ইতিহাসে যিনি অবিচেন্না ব'লে পরিচিত। এখানে শুধু একটি কথা বলতে চাই, তা হচ্ছে ওমরের মৃত্যুর কয়েকশ' বছর পরে সঙ্কলিত রুবাইগুলির উপর নির্মম ব্যবচ্ছেদ চালিয়ে সত্য উদ্ধার সর্বদা অভ্রান্ত নাও হ'তে পারে।

একথা সত্য দশম শতকের বোখারী অবিচেন্নার কোন কোন কবিতার

---

* অধ্যাপক Arberry সম্পাদিত রুবাইয়াতের আদর্শ হস্তলিখিত Cambridge-এ রক্ষিত ত্রয়োদশ শতকের পুঁথিখানাই প্রাচীনতম বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল। সুখের বিষয় দ্বাদশ শতকে লেখা হস্তলিখিত পুঁথিখানা সম্প্রতি সূফি কবি ওমর আলী শাহ্ এর গৃহ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

মর্যানুসরণ করে চলেছে ওমরের কোন কোন কবিতা। Fitzgerald তাঁর সঙ্কলনে এমন একটি রুবাই দিয়েছেন যা অবিচেন্নার রচনায় সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। আমরা Fitzgerald প্রদত্ত ওমরের রুবাই ইংরেজীতে শোনাই—

'Up from Earth's center through the Seventh gate
I rose, and on the throne of Saturn sate,
And many a knot unravelled by the road,
But not the Master-knot of Human Fate'.

ওমরের নিজের কথায়—করদম্ হমাহ্ মুশকিলাত্ গরদূন্ রাহিল্… … হরবন্দ্ কশাদহ্ শুদ্ মগর বন্দ্-এ-আজল্।—পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু হ'য়েছিল। অনন্ত শূন্যের সপ্ত তোরণ অতিক্রম ক'রে অবশেষে বৃহস্পতি বরুণের রাজ্য ঘুরে শনিচক্রের দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত রত্ন-সিংহাসনে বসেছি। সারাপথ শুধু জীবনরহস্যের গ্রন্থি খুলে খুলে এসেছি। কিন্তু শোন বন্ধু! প্রাণ খুলে সত্য কথা বলি—মৃত্যু রহস্যের মহা-গ্রন্থি কিছুতেই খুলে দেখাতে পারিনি। মহাকালের বক্ষে, মহাশূন্যের অনন্ত-বিস্তারে, মহাজীবনের মাল্যসূত্রে এই একটি সুকঠিন রহস্যপূর্ণ গ্রন্থি, যার ভোগ আছে, পরিচয় নেই।—Whinfield-এর আক্ষরিক অনুবাদে 'Yea, every knot was loosed save that of Death. Ethe-জার্মান ভাষায় অনুবাদ ক'রেছেন—'Geolöst war jeglich Band—nur eines blieb ungelöst-des Todes Band'!

ওমরের রচনায় অবিচেন্নার ভাবরাজির ছায়াপাতের কথা প্রসঙ্গেই বলছি। অবিচেন্নার জ্ঞানসাম্রাজ্যের অবধি ছিল না। ধর্মশাস্ত্র কোরান, ভারতীয় পাটীগণিত, গ্রীক জ্যামিতি, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, আধ্যাত্মিক প্রেমসাধনার রহস্য—বিশেষ করে সূফী সাধনা—অবিচেন্না সর্বত্র বিচরণ করে সার্বভৌম পণ্ডিত হয়েছিলেন। সামানী রাজপুত্র নূহ্ বিন মনসূরকে কঠিন রোগ থেকে মুক্ত ক'রে তিনি রাজগ্রন্থাগারে লব্ধ প্রবেশ হ'য়ে বলেছিলেন—আমার জীবন ধন্য। আমি এমন সব গ্রন্থ দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি লোকে যার নামও শোনে নি।

খইয়াম ওমরও ছিলেন অবিচেন্নার মত বহুদর্শী পণ্ডিত। অনেকেই ওমরকে জানতেন, তিনি 'আচার্য', 'দার্শনিক' এবং 'সৃষ্টি' রহস্যের 'মার্মিক'

পার্সী কায়দায় বলতে গেলে 'দস্তুর', 'কয়লসুক্' ও 'হুজ্জতুল্ খলক'। কিন্তু, গোঁড়া মুসলিমদের হৃদয়ে লালিত, চির-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের রাজ্যটাকে কবিতার মধ্য দিয়ে নাড়া দিতে গিয়েই, আমার মনে হয়, সেকালের পণ্ডিত বিচারকদের সাহিত্য-বিচারে ওমরের প্রতি উপেক্ষা এসেছিল। তাঁরা তাঁকে একজন মৌলিক বিজ্ঞানবিৎ এবং অসাধারণ গণকরূপে স্বীকার করলেও মহাপণ্ডিত এবং মহাকবিরূপে স্বীকৃতি কিছুতেই দিতে চান নি। ওমরও ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের প্রতি বিদ্রূপের বাণ ছুঁড়ে দিয়েছেন। সুচতুর ব্যঙ্গবিদ্রূপে ওমর ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। একটি প্রচলিত গল্প বলছি।

নীশাপুর কলেজের মেরামতি চলছে। গাধার পিঠে পিঠে ইঁট আসছে। একটি গাধা ওমরকে দেখে কিছুতেই কলেজ-প্রাঙ্গণে ঢুকবে না —কেবল এদিক ওদিক করছে। ওমর বললেন, "এস লজ্জা কি? এখানেই তো তুমি আর এক জন্মে অধ্যাপক ছিলে। কবে যে তুমি হারিয়ে গেলে বন্ধু! মানুষ তোমার কথা ভুলেই গেল। এখন আবার এসেছ; কিন্তু একেবারে গোল্লায় গেছ। তোমার আগেকার শানিত নখগুলি জোড়া লেগে লেগে খুর হ'য়ে গেছে। আর তোমার চিবুকের নূর উল্টে গিয়ে লেজের গোছা হ'য়েছে। তুমি কি জায়গাটা চিনতে পারছ না? জানি, আজ এখানকার অধ্যাপকদের দেখে তোমার লজ্জা লজ্জা লাগছে। তাই না?

'আয় রফতা বো বাজ আমদা, বলহুম্ গোশতা—
নামত্ জি় মীয়ান্-ই-নাম্হা গুম্ গশতা।
নাখুন্ হমা জমা' আমদা বো সুম্ গশতা
রীশ্ উজ় পস্-ই-কূন্ দর আমদা দুম্ গশতা॥'

মনে হয়, এই সব জন্যই মৌলবী মোলানা, কট্টরপন্থী উলেমা ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে উপেক্ষিত ছিলেন 'গিয়াসুদ্দীন আবুল ফতাহ, উমর-বিন-ইব্রাহিম্'। এই হচ্ছে খয়্যাম্ ওমরের পুরো নাম। এদের মধ্যে কেউ কেউ ওমরকে অসুখী দার্শনিক, নাস্তিক, তুচ্ছ বস্তুবাদী, অজ্ঞেয়বাদের বিলাসতিমিরে আচ্ছন্ন, কৃপার পাত্র বলে উপহাসমিশ্রিত করুণা প্রদর্শন করেছেন। কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হ'য়ে ব'লেছেন, ওমর যা দেখিয়েছেন তা

হচ্ছে ভ্রান্তি ও অসঙ্গতির বেতাল প্রদর্শনী। সূফী নাজমুদ্দীন রাজীর এই অভিমত। দুঃখের বিষয় যে জলালউদ্দীন রূমী একথা বলার সাহস রেখেছিলেন –

আমি কোরানের মগজ তুলিয়া জ্বালাই মোমের বাতি।
হাড়গুলি নিয়ে কুকুরের দল, উঠিছে কলহে মাতি।

[মন্ জ কোরান মগ্‌জ রা বরদাশতম্/উস্তখোয়ান্ পেশ-এ-সগান্ আনদাখতম্]

সেই আবর্জনামুক্ত সত্যের প্রেমিক, সূফীশিরোমণি জলালুদ্দীন্-ও ওমরকে গ্রীক দর্শন-রাজ্যের একজন ভ্রান্ত পথিক বলে নিন্দা করে গেছেন।

অজ্ঞেয়বাদ পলায়নী বৃত্তির কৌশল নয়। বিশ্বজগতের পরমতত্ত্ব মানব-জ্ঞানের অনধিগম্য এই হচ্ছে অজ্ঞেয়বাদের তাৎপর্য। বৈজ্ঞানিক Thomas Henry Huxley Agnosticism কথাটি চালু করেন। তিনি 'অজ্ঞাত ঈশ্বরে'র উদ্দেশে পূজাবেদী সম্বন্ধে St Paulএর উক্তি থেকে এই কথার রূপ দেন। গ্রীক দার্শনিকরা জ্ঞানদ্রষ্টাকে বলতেন Gnostic তার বিপরীত কথা Agnostic. অজ্ঞেয়বাদের কুলীন তাপসদের নাম ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে—Hume, Kant, Comte, Spencer, পরমসত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার না ক'রে কেবল তাকে জ্ঞানের অতীত বলাও অজ্ঞেয়বাদিতা। নাসদীয় সূক্তও তাই। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম— ? —এ প্রশ্নও ঐ জিজ্ঞাসা থেকে আসে।···· ক ইহ তচ্চিকেতৎ ?—বৈদিক ঋষির অজ্ঞেয়বাদিতা। কাজেই ঈশ্বরবিশ্বাসী ওমরের অজ্ঞেয়রাজ্যের তথ্য সম্বন্ধে সরল অকপট উক্তিকে কদাচ ভ্রান্ত পথিকের প্রলাপ ব'লে উপহাস করা চলে না।

পরবর্তী সূফীরা অবশ্য ওমরের কাব্যে সূফীতত্ত্বের আভাস আবিষ্কার করেছেন ; কিন্তু একথা সত্য, সূফীতত্ত্বের যে রহস্য সাদী-হাফিজ-অত্তার-রূমীর কাব্যধারায় প্রচ্ছন্ন থেকেও পাঠকের হৃদয়কে মৃগনাভির সৌরভের মত উন্মত্ত করে তোলে, ওমরের রুবাইয়াতে কখনো তার স্পর্শ অনুভব করা যায় না। ওমর-বিন-ইব্রাহীম বহুদর্শী, জ্ঞানের রাজ্যে তিনি প্রায় সার্বভৌম, গণিতবিজ্ঞানে তিনি প্রায় অভ্রান্ত, ব্যঙ্গবিদ্রূপের শাণিত প্রহারে তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু সূফীর প্রেম উন্মাদনায় কিছুতেই তিনি

পাঠককে উন্মত্ত করে তুলতে পারেন নি। তাঁর কাব্য পাঠককে ভাবায়, চিন্তা করায়, ধ্যানে নিমগ্ন করে দেয়; কিন্তু আনন্দাতিশয্যে উন্মত্ত করে তুলতে পারে না। জগৎ ও জীবনের ধ্যানে নিমগ্ন এই ঋষি-কবির কাব্য-পরিচয় আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে দিতে চেষ্টা করব। এখানে শুধু তাঁর জীবনের শেষ কটি দিনের একটু কথা বলছি।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে তিনি আবু 'অলী বিন সীনা বা অবিচেন্নার শিফা বা 'আরোগ্যতন্ত্র' পড়ছিলেন। এই গ্রন্থের একটি বিশেষ অধ্যায়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। এই অংশে অবিচেন্না বহু এবং একের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই অংশে এসে ওমর স্বপ্নাবিষ্টের মত বলতেন—'আয় খোদা'! আমি তোমাকে শুধু আমার খণ্ডিতজ্ঞানের আলোকেই দেখে গেলাম। সীমার দীবার ভেঙ্গে দিয়ে তুমি তো বান্দাকে অসীম রাজ্যের ছবিটি দেখালে না। আমার জীবনের সব চাইতে বড় দুঃখ র'য়ে গেল এইখানে,—ফা গফরলী ফান মা'রফতী য়াক্ রসীলতী-আলীক্। দর্শনশাস্ত্র চিরকাল বলে এসেছে subjective perception বিষয়ের সত্তারূপ থেকে আমাদের সর্বদাই বঞ্চিত করে চলেছে। একদা ভারতবর্ষে ভাট্ট মীমাংসকরাও বিষয়কে শুধু জ্ঞাততা-লিঙ্গক অনুমান বলে ঘোষণা করে' আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এত বড় একজন দার্শনিক কবিকে সাধারণ স্তরের একজন অজ্ঞেয়বাদী বলে' এবং তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বপ্নাবিষ্টের অসংলগ্ন প্রলাপ ব'লে উপহাস করে' তাঁর দেশের ঐতিহাসিকেরা তাঁর প্রতি অমর্যাদা করে গিয়েছেন। ওমর তাঁর সমসাময়িক সমাজে অপাংক্তেয় হ'য়ে গেলেন Metempsychosis-এর তত্ত্বাভাস দিতে গিয়ে। গ্রীক দর্শনের এবং হিন্দু দর্শনের আত্মার দেহান্তর-সংক্রমবাদ সে সমাজ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে। এদিকে আধুনিক দুনিয়া শুধু তাঁর রুবাই নিয়ে মত্ত হয়ে উঠেছে। আধুনিক জগতে যার উচ্চতম প্রশংসা, সেই গণিত-জ্যোতিষ-বলাহিত দর্শনের একজন নিষ্ঠাবান প্রবক্তা-রূপে ওমরের যোগ্য মূল্যায়ন এখনও বোধ হয় দূরে আছে।

ওমর খইয়্যামের রুবাইয়াত্

যখনকার কথা বলছি, তখন ইংল্যাণ্ডে নর্ম্যান বিজয় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সুলতান মাহ্‌মুদের বংশধরগণ গজনী থেকে বিতাড়িত হ'য়ে পাঞ্জাবে আশ্রয়গ্রহণ করেন। পূর্ব ভারতে বল্লালসেনের পিতৃদেব বিজয়সেন সগৌরবে সিংহাসনে সমাসীন। সেই সময়টায় মধ্য এসিয়ায় মধ্য বয়সী অধ্যাপক, সার্বভৌম জ্ঞানের অধিকারী ওমর খইয়্যাম নীশাপুর মহাবিদ্যালয় থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। এই অবসর গ্রহণ বয়সের সীমা অতিক্রম করার জন্য নয়, মতবাদে এবং জীবন ও জগৎ দর্শনে সহকর্মী অধ্যাপকদের সঙ্গে সগোত্রতা রক্ষা করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছিল না। এই সময়টাই তিনি সূফী মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি, মহাজ্ঞানীর বিচার বুদ্ধি এবং পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণপদ্ধতি কখনো সূফীতত্ত্বের ভাবোচ্ছ্বাসে বিলুপ্ত হ'য়ে যায় নি। এই জন্য তাঁর রুবাইগুলিতে জ্ঞানের উপায় এবং উপকরণের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ আমাদের সর্বদা সজাগ ক'রে রাখে; আঁখির জলে এবং প্রেমের বন্যায় আমরা দুকূল হারিয়ে বসি না। গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও দর্শনের পণ্ডিত কখনো দিশেহারা বা উদ্‌ভ্রান্ত হন না। সৃষ্টিকর্তাকে প্রেমময়রূপে, ভালোবাসার একমাত্র বিগ্রহরূপে ধারণা ক'রেও ওমর খইয়্যাম উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন না। সৃষ্টির পরিহাসের মধ্যে কি তাৎপর্য, তাই তিনি খুঁজে বেড়ান এবং সমাধানহীন সৃষ্টি প্রহেলিকার জন্য তাঁর কাছে আহত অভিমানের নানা প্রশ্ন তোলেন। লক্ষণীয় বিষয় এসব ক্ষেত্রে তিনি দীন-ই-ইসলামের আশ্রিত। কুরান্ শরীফের মহাবাণী তাঁর বহু প্রশ্নের সরণি নির্মাণ করে চলে; কিন্তু সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি কোন ধর্মশাস্ত্রেই পান না। উদাহরণরূপে আমরা একটি রুবাই উদ্ধৃত করছি—

রুকী কে শরদ্ ইজস্‌সমা 'উন্ শক্‌কত্।
উন্দম্ কে শরদ্ ইজরজ্‌মুন্ কদরত্ ॥
মন্ দামন্-এ-ত্ বগীরম্ অন্দর্ সো'এলত্
গ্‌য়েম্ স্বরম্ আ ব আইয়া জন্ কিন্ কোত্তেলত্ ?*

যেদিন এই মহাকাশে চরম বিশ্লেষ ঘটবে এবং মহাসৃষ্টির সব কিছু টুকরো টুকরো হ'য়ে যাবে, প্রাণের সকল চেষ্টা আঁধারের ঘন ঘটায় এলো মেলো হ'য়ে যাবে, সেদিন তোমার আঁচল ধ'রে জিজ্ঞাসা করব—হে আমার প্রেমময় প্রভু! তুমি এই পাপের খেলা কেন খেলেছিলে?

কি কঠিন সংযম তাঁর চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল, আজও অনেকে সেই ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ খবরটি জানার অবকাশ পান নি। 'ওমর আলীশাহ্ বল্‌খী' নামে প্রসিদ্ধ এক সুফী কবি ও ইতিহাস-প্রেমিক সেই ইতিবৃত্তের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ওমর খইয়্যাম সুলতান আলপ্ আর্সলানের জনৈক আমীরের কন্যাকে ভালবেসেছিলেন। তার নাম ছিল 'হালিমা বেগম'। হালিমা যে বাগ্‌দত্তা এই ঘটনা পরে জানা যায়। ওমর ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির উত্তুঙ্গ শিখরে ব'সেও তার পাণিগ্রহণে অন্তরে ও বাহিরে কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল অসংযম প্রকাশ করেন নি। তাঁর মানস সুন্দরী হয়তো কাব্যের দুর্জ্ঞেয় পর্দায় শুধু কখনো কখনো অস্পষ্ট ছায়াপাত ক'রে গেছে —'Khayaam's fame has survived various unfounded charges of crime and perversity.' [Omar Ali-Shah—Historical Preface to Robert Graves's Rubaiyyat of Omar Khayaam.]

তিনি যে একদা সূফী মতের চত্বরে পদসঞ্চার করেছিলেন সে ইতিহাস সকলেই জানেন। একটি রুবাই এই তথ্যকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে। কোন আধ্যাত্মিক গুণীর কাছে ওমর তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর নির্দেশ চাইলেন। সেই গুণী শেখ কবিকে বিষয় ঠিক ক'রে দিলেন। বৎস; নান, রওগান ও গন্দুর (রুটী, ঘি ও ডুমুর) নিয়ে কাব্য গাথা

---

* এই বিশ্ব কি চিরস্থায়ী? কোটি কোটি নক্ষত্রলোক ও নিহারিকাপুঞ্জ নিয়ে দৃষ্ট এবং অপরিদৃষ্ট বিশ্ব ক্ষয়ের পথেই চ'লেছে। 'Neutrino' বলে অতি ক্ষুদ্র পরমাণুরও দেহ আছে, এবং ক্ষয়ও আছে। মূলের যে সূক্ষ্মতম, তার ক্ষয় থেকেই অনুমান করা চলে—এ বিশ্ব ক্ষয়ের দিকে বা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বিস্তার ক'রো না, জমীন, জর ও জেনানা (মাটী, সোনা এবং মেয়েছেলে) নিয়েও কাহিনী গাঁথার প্রয়োজন নেই। তুমি ছোট বিষয় নাও—লিখতে লিখতে বুঝতে পারবে, সে কত মহৎ। মসী, মস্যাধার, অক্ষর কিছুই খুঁজতে হবে না। সব পাবে, সব তোমার হৃদয়ে। বিষয় জেনে নাও—'শরাব'। সেই নিয়ে যাবে তোমাকে এই পৃথিবীর পুরাতন সংগ্রাম থেকে মানস ভোগের তুরীয় লোকে।

Graves-এর অনুবাদের ভাষায় রুবাইটি শুনুন—

'Already at Creation I stretched out
For Pen and Tablet, also Heaven and Hell;
But prudently my Teacher warned me: 'Pen,
And Tablet, Heaven and Hell, lie in yourself.'

আমি এই মহাসৃষ্টির দুর্জ্ঞেয় রহস্যে হাত বাড়িয়ে লেখনী চাইলাম, কলক অনুসন্ধান করলাম। জানতে চাইলাম স্বর্গ ও নরকের বার্তা; কিন্তু আমার শেখ—দানেশমন্দ, বিচক্ষণ অধ্যাপক চতুর চাহনি নিক্ষেপ করে আমাকে বললেন—'ওমর! যা চাও, মনের মধ্যেই তুমি সব পাবে—কলম, কাগজ, জন্নত ও জাহান্নাম—সব। শরাব খাও, যার চুমুকে চুমুকে চমক।

সেই চুমুকই দিয়েছিলাম—

'খয়াম অগর জবাদহ্ মস্তী খুশ্ বাশ্,
বালা লহ্ রুখী অগর নশস্তী—খুশ্ বাশ্।
চূন্ আখির্ কার নীস্ত্ খোআহর্ বুদন্,
অন্গার কেহ্ নীস্তী চূ হস্তী খুশ্ বাশ্॥

দেখি, ভেতরে কথা ফুটছে—খয়াম্; যদি সুরায় মাতাল হয়ে থাক তবে খুশী থাক। যদি কোন চাঁদবদনীর সঙ্গ পেয়ে থাক তবে খুশী আছ। যখন এখানে কোন কাজ আর থাকবেই না, তখন সংকল্প নাও এই সকল নাস্তির মধ্যেই অস্তি ফুটিয়ে তুলবে। খুশী থাক।

এমন একটা ভাবের তুরীয় লোকে তিনি সমাধান-হীন প্রশ্নগুলির মীমাংসার চেষ্টা করেছেন। সব সমস্যার সমাধান তিনি পান নি। মৃত্যু-রহস্য এবং এই ধরার বুকে বারবার আসা যাওয়ার তাৎপর্য তিনি বোঝেন

ব. বি./পারস্য সাহিত্য/৫৬-৬

নি। দার্শনিক অকপট ভাবে তা' বার বার স্বীকার করেও গেছেন। কোন কোন খয়্যামীর ব্যাখ্যাতা কিছুতেই মানতে রাজী নন যে, তিনি দেহান্তরসংক্রান্তি তাঁর বিজ্ঞানবুদ্ধি দিয়েই অনুভব করেছিলেন।

গ্রীক দার্শনিকরা দেহান্তর সংক্রমবাদ বা 'metem psychosis' (passing of the soul) বিশ্বাস ক'রেছিলেন। এতত্ত্বে স্বীকৃতি না দিলে খয়্যামীর রুবাইগুলি প্রাণ হারাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। মহাপ্রকৃতির মূলরূপে চিৎশক্তির ধারণা অলস কল্পনা বা রহস্যবাদীর অচিন্তনীয় তত্ত্বমাত্র নয়, শারীরবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষিত সত্য। শারীর-শাস্ত্রীরা জড় প্রকৃতির মধ্যে চেতনা পর্যবেক্ষণ ক'রে ক'রে মূলের চেতনা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। এঁরা বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের শূন্য থেকে নিরন্তর হাইড্রোজেন সৃষ্টি পরম্পরা বা পদার্থবিজ্ঞানীদের মহাশূন্য থেকে অকারণে অনুপরমাণু সৃষ্টির তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক Wald প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেই দৃষ্টিশক্তির ক্রিয়াবিক্রিয়ার তত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে এই চিৎশক্তির ইন্দ্রজাল স্বীকার করেছিলেন। বিজ্ঞানীরা যেখানে চেতনাকে ঘাতপ্রতিঘাতের স্বয়ংক্রিয় প্রত্যাবর্তন শক্তি মাত্র মনে করেন—শারীর-শাস্ত্রীরা সেখানে থামতে চান না। তাঁরা বলেন সর্বত্র এক চেতনার খেলা ঘটছে। নক্ষত্রমালাও প্রাণেরই স্পন্দনে স্পন্দিত (Living organism)—তাঁরা প্রাণ পায় এবং প্রাণ হারায়। তাদের জ্বলে ওঠা এবং নিভে যাওয়া চেতনার আবির্ভাব এবং তিরোভাব। মানুষ হাইড্রোজেন পুড়িয়ে পুড়িয়ে বাঁচে, নক্ষত্ররা সেই হাইড্রোজেন গলিয়ে দিয়ে দিয়ে বাঁচে। অঙ্গার অক্সিজেন এর সঙ্গে মিশে প্রাণ তৈরী করে। সিলিকন্ নামক অস্থির পরমাণু আবার অক্সিজেন-এ মিশে মিশে পাহাড় তৈরী ক'রে চলে। আদিতে আছে এক চেতনারই স্পন্দন। বিশ্বের বিচিত্র রঙ্গশালায় প্রাণেরই খেলা চলেছে রূপ থেকে রূপান্তরে, আবির্ভাবে এবং তিরোভাবে। মহাবিজ্ঞানী ওমর খইয়্যাম এই প্রকার এক ভিত্তির উপরই তাঁর অনুভূতি-গুলি সাজিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা তারই আস্বাদনে প্রবৃত্ত হই।

খার ইকহ্ বস জের পায়ে হর জেরা নীস্ত্।
জুলফ্ সনমে ও আবরু-এ-খানা নীস্ত্।

হর খশত্‌ কেহ্‌ বর কন্‌গরহ্‌ আয়ব নীস্ত্‌
আঙ্গুশ্‌ত্‌ ও জের-ই-যো সর সাতা নীস্ত্‌॥

পায়ের তলে জমিন যাহা কাঁটায় ভরা আজকে এই।
যে রূপসীর অলক ভুরু. এই জগতে সে আজ নেই।
ইমারতের উচ্চ বাহার হাতছানিতে বলছে যেন,
'উজীর-শা'র আঙ্গুল-শির গর্বে তোলা', আমায় চেন।

অন্যত্র তিনি বলছেন—অনুভব করার চেষ্টা করবে, যেখানে আজ নানা রঙ্গের গোলাপবাগ সেখানে বা আছে কত শাহের জমকালো সমাধি। কালো জমিনে গজিয়ে ওঠা নরম কচি কন্দলী-কুসুম হয়তো সূচনা করছে কোন লাবণ্যময়ীর নরম দেহ, যা কত নাজুক হাতের স্পর্শ পেয়ে কত না দরদে প্রোথিত হয়েছিল। আবার দেখ—

হর সবজ় কে বর কিনার-এ-জুয়িরুস্ত্‌ অস্ত্‌।
গুয়ী কি জ় লব এ-ফিরিশ্‌ত খূয় রুস্ত্‌ অস্ত্‌।
পা বর সর-এ-সবজ়হা ব খ্বারী ননহী;
ক-আন্‌ সবজ় জ় খাক্‌-ই-মাহ্‌ রূয়ি রুস্ত্‌ অস্ত্‌॥

নদীর তীরে সবুজ আভা ওই যে লতা দুলছে বায়।
কোন রূপসী কতই সাধে কবর থেকে তুলছে তায়।
পায়ের চাপে গুড়িয়ে দিয়ে পথিক! তুমি চলবে নাকো,
মাটির বুকে নিরুপমার অধর-শোভা ভাবতে থাকো॥

কুমোরের পুতুল গৃহে একদিন ঢুকেছিলাম। দেখি, একতাল মাটিকে সে কি নির্মমভাবে ডলেপিশে চলেছে। বিশ্বাস করো বন্ধু! আমার কানের ভেতরে যে কান আছে সেখানে পুতুলের ক্রন্দন শুনলাম—'কীগ্‌রী দোস্ত্‌! একটু আস্তে আস্তে হাত চালাও। আমিও যে একদিন তোমারি মত রক্তমাংস মেদমজ্জার দেহ নিয়ে বর্তমান ছিলাম, আজ আমার এই মাটির রূপ।'

ওমরের চিন্তাজাল আরও দূরে প্রসারিত হয়। বিধাতাও আমাদের পুতুল করে এই দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছে। পুতুল নাচের খেলার শেষে তিনি পুতুলগুলোকে অনস্তিত্বের অন্ধকার সিন্দুকে নিক্ষেপ করছেন—

'Let me speak out, unallegorically:
We are mere puppets of our Master, toys
On the Table of Existence, one by one
Flung back in the toy-box of Non-existence'

ওমরের নিজের ভাষায়—

অজ রূয় হকীকী নি অজ রূয় মজাজ।
মাল অবৎগানীম্ ব ফলক ল অবৎ বাজ;
বাজী চি হমী কুনীম্ বর নু ত্'বজুদ্';
রফ্তীম্ ব সন্দুক-এ অদম্ য়ক বাজ॥

রূপক নহে, সত্য কথা বিধির খেলা বলছি আমি,
পুতুল হ'য়ে খেলার তরে ধরার বুকে আমরা নামি।
খেলার শেষে সেই বিধাতা নিঠুর হাতে মোদের ভরে
আঁধার-ঘেরা তোরঙ্গ্ মাঝে, আর জানিনে তাহার পরে।

কিন্তু দূর থেকে একটা অস্পষ্ট আভাস যেন ভেসে আসে। অপ্রবুদ্ধ মনে স্মরণ হয় যেন চলেছি, কেবলি চলেছি। পুরাতনের বেড়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে নতুনের খেলা শুরু হয়। জীবন তো একটা চিৎশক্তি। শক্তির কি শেষ আছে? তার রূপান্তর হয়, কিন্তু বিনাশ অসম্ভব। আমি খয়াম্, তাঁবুর ব্যবসা আমাদের চোদ্দ পুরুষের ব্যবসা—আমার দেহটাই তো তাঁবু, কিন্তু তাঁবুর ভেতরে আছেন রাজা। অণু হলেও এক বিরাট চেতনার অংশ। সেই রাজাধিরাজের হুকুমে এই তাঁবুর ভাঙ্গাগড়ার খেলা চলে।

Khayaam, your mortal carcase is a tent,
Your soul, a Sultan; and your camp, all Time.
The groom called Fate maps out to-morrow's march
And strikes the tent when, Sultan-like, you move.

খয়াম শোন, তোমার দেহ তাঁবুর বোঝা,—ছড়ান আজ:
ভিতরে তার খেলে বেড়ায় রাজার রাজা মাথায় তাজ।
নিয়ত্ নোকর তাঁর হুকুমে আজের তাঁবু গুটিয়ে চলে।
আর এক মাঠে নতুন ক'রে কালের খেলা খেলবে ব'লে।

সবই সত্য ; কিন্তু অনন্ত কালের বুকে আমার এই আসা যাওয়ার মানে বুঝলাম না।

দৌরী কেহ্ দর উ আমদন ৰো রফতন্-ই-মাস্ত্,
উ রা নি বদায়ৎ নি নিহায়ত্ পয়দাস্ত।
কস মী ন জনদ্ দমী দর ইন্ মানী রাস্ত ?
কীন্ আমদন্ অজ় কুজা, ৰো রফতন্ ব কুজাস্ত।

আকাশের ঘূর্ণিপাকে আসা যাওয়া নিয়ম বেশ।
ঘোরা ফেরার যাত্রাপথে কোথায় আদি কোথায় শেষ ?
প্রাণজগতে দমের খেলা অর্থহীনের অর্থ ভাবো।
প্রকাশ আর অপ্রকাশের তত্ত্বকথা কোথায় পাবো ?

জ় আবরদন্ এ-মন্ ন বুদ গরদূঁরা সুদ :
ৰো জ় বুরদন-এ-মন্ জাহ্ ৰো জলালশ্ নফজ়ুদ্।
বো হীচ্ কসী নী জ় দো গুশম ন শূনদ ;
কাবরদন্ ৰো বুরদন্-ই-মন্ অজ় বহর চিস্ত॥

আমার আসা, হাসির খেলা—ধরার তাতে কোন বা লাভ ?
আমার চোখে মরণ নামে—খোদাতালার এ কোন্ শাপ ?
কান শোনেনি কারুর কাছে গুপ্ত কথার মর্মসুর।
চোখ দেখেনি, মা'লুম কোথা আলোর মত মৃত্যুপুর ?

এটাই তো ওমরের কাছে বড় প্রশ্ন মনে হয়েছিল। কঠোপনিষদে বালক নচিকেতা মৃত্যুর কাছেই মৃত্যুর স্বরূপ জানতে চেয়েছিল এবং অক্ষর-ব্রহ্মের তাৎপর্য বুঝেছিল। কাপিল দর্শন কোন্ যুগে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে এক সূক্ষ্মতম মহাপ্রকৃতির স্থূল পরিণাম এই জগৎ, কিন্তু তা' জড় ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রূপ, রস, আলোর তরঙ্গ, ভাবের এই বিচিত্র খেলা, অর্থহীন নয়। একজনের জন্যই হচ্ছে—সে আমি—সে চৈতন্যরূপী পুরুষ। জগতের আদিতেও যা, অন্তেও তাই। চেতন পুরুষ ও জড় প্রকৃতির অনন্ত খেলা। ক্রমবিসারী জগৎ আবার একদিন চরম সংকোচে —সেই সূক্ষ্মতম প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয়ে যাবে। আবার আরম্ভ,

আবার শেষ। এই সাংখ্যতত্ত্ব জ্ঞান তাপস ওমরের জানা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলনতীর্থ জান্দ-ই-শাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের অনুবৃত্তি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়েও চলেছিল। সেখানে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনেরও অধ্যাপনা অসম্ভব কিছু ছিল না। ওমরের পূর্ববর্তী পরিব্রাজক মহাজ্ঞানী আলবেরুনী ভারতীয় শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন।

ওমর খইয়্যাম দার্শনিক কবি। তিনি ভাব-তন্ময়তায় বোধির রাজ্যে অনেক কিছু অপরোক্ষানুভূতির বিষয় করেছেন। একটু আগেই তার পরিচয় দিয়ে এলাম। তিনি তাঁর ক্রমোদ্‌ভিদ্যমান অস্তিত্ব স্বপ্নময় অবস্থায় অনুভব করেছেন। কিন্তু মৃত্যুর প্রশ্নে প্রচলিত শাস্ত্রগুলিকে স্বীকার করেছেন বলে মনে হয় না।

When falcon-like, I darted from my world
Of mystery, upward and upward flying,
No sage stood there to greet me with the truth ;
So back I dived by the same narrow door.

এখানে ওমর নির্মম প্রত্যক্ষবাদী। একটু কাব্যের চারুকলার মধ্যে এখানে প্রবল প্রত্যক্ষবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু জড় বল, আর যাই বল—এই সৃষ্টির চমক আছে। সাংখ্য যোগীর কাছে এই পৃথিবী শুধু নয়, এই বিশ্বটাই মহারঙ্গশালা, তাতে রঙ্গময়ী মহাপ্রকৃতি নৃত্য করে চলেছেন। কালিদাস প্রকৃতিকে 'পুরুষার্থ-প্রবর্তিনী' বলেছেন এবং পুরুষকে 'উদাসীন' বলেছেন। ওমর বলেছেন—অনন্ত জীবন ভরে' এই সৃষ্টির রঙ্গশালায় নৃত্যকলা দেখেও তো চেতন পুরুষের বাসনার শেষ হ'লো না। একে ছেড়ে তো আমরা যেতে চাই না—

In agitation I was brought to birth
And learned nothing from life but wonder at it ;
Reluctantly we leave, still uninformed
Why in the world we came, or went, or were.

জীবনের চমকটা কিন্তু ওমর বেশ ঘটা করেই অনুভব করেছেন। আমাদের সেই কথা—ওর চুমুকে চুমুকে চমক।

বলছিলাম—প্রচলিত কোনো ধর্মশাস্ত্রে সমাধানের শেষ কথা তিনি পান নি। মহাভারতে আছে ধর্মরূপী বকের 'কোন্‌টি খাঁটি পথ' এই প্রশ্নের জবাব যুধিষ্ঠির দিয়েছিলেন—'শ্রুতি বা বেদ ভিন্ন ভিন্ন কথা বলে—এক কথা তো কেউ বলে না। শ্রুতির অনুসরণ করে' স্মৃতিগুলিও নানা মতের কারবার করে। এমন কোনও মুনি দেখলাম না, যিনি ভিন্ন কথা না বলেছেন। আমি দেখছি—এই সমস্যাজর্জরিত জ্ঞানের জগতে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' ওমর খইয়াম যেন পরীক্ষা নিরীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে একই সুরে কথা বলছেন—

Some ponder long on a doctrine and belief,
Some teeter between certitude and doubt.
Suddenly out of hiding leaps the Guide
With : 'Fools, the way is neither that nor this'.

কেউ বা ভাবে তত্ত্বকথা, কেউ বা মানে পরম ধন।
শরীয়তের বিধি বিধান, সেলাম ক'রে অনুক্ষণ।
অনিশ্চিত দোলায় দুলে কারুর প্রাণে জাগছে ভয় ;
পরম গুরু হাঁক দিয়েছে—'বাঁধানো পথ কারুর নয়'॥

অনিশ্চয়ের অন্ধকারে, জীবনমৃত্যুর ধ্রুবসত্যে এই পৃথিবীর—এই মহাপ্রকৃতির রঙ্গশালায়, এই জীবনের পাওয়াটাকে অস্বীকার করে লাভ কি? এটা তো নগদ। নগদ সিন্দুকে রেখে সুদের চিন্তা করো না। অতীত অতীত, ভবিষ্যৎ অনাগত। নগদটা হাত ভ'রে তুলে নাও—

রুজ়ী কি গুশত্‌ অস্ত্‌ অজ় উ ইয়াদ মাকুন্‌।
ফরদা কি নিয়ামদ্‌ অস্ত্‌ ফরিয়াদ মাকুন্‌।
বর নামদ্‌ বো গুজ়শত্‌ বুনিয়াদ্‌ মাকুন।
হালী খুশ বাশ, উ উমর বরবাদ্‌ মাকুন॥

অতীত যাহা ভেবো না আর, অনাগতের ভাবনা পিছে।
হবার যাহা ঠিক হবে তা, অভিযোগের কারণ মিছে।
অতীতে আর ভবিষ্যতে ভিত্‌ গ'ড়ো না, গুণীর গুণী !
বর্তমান খুশীর কথা তোমার মুখে আজকে শুনি॥

'অসারে খলু সংসারে দ্বে এব মধুরে ফলে। কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ।' এই অসার সংসারে দুটি মাত্র মধুর ফল আছে। তৃতীয় লোভনীয় বস্তু আর নেই। একটি কাব্য-সুধাপান, অপরটি অভিরূপ সঙ্গম। ওমরের কাছে আনন্দের উপকরণ তিনটি—(১) একগোছা সরস কাব্য (২) রঙ্গীন সুরা (৩) 'অবলা চ কোমলা'। বস্! চতুর্থী নোপপদ্যতে—

A gourd of red wine and a sheaf of poems
A baro subsistence, half a loaf, not more
Supplied us two alone in the free desert :
What Sultan could we envy on his throne ?
এক পেয়ালা রঙ্গীন সুরা, কাব্য গোছা মোদের হাতে ;
জান বাঁচাতে একটু রুটি মিলিয়ে নেবো তাহার সাথে।
সে দেশের সে মরুর বালু—হোক না কেন শূন্য স্তন ;
শাহান শা'র সকল সুখ, তুচ্ছ করি সিংহাসন।

এটাই ওমরের কাছে Eternal Trinity—আনন্দের ত্রিমূর্তি। এই TRIO জীবনের মহাসঙ্গীত। এটাই এই পৃথিবীর নগদ পাওয়া। বাকী সব ঝুট। মন ভুলানো স্বর্গের ছবি শাস্ত্র থেকে আমার কাছে তুলে ধরো না।

They say that Eden is bejewelled with houris ;
I answer that grape-nectar has no price
So laugh at long-term credit, stick to coin,
Though distant drums beguile your greedy ear
কেউ বলেছে—বেহেস্তটা পরী-হুরী-সমুজ্জ্বল।
আমার কাছে আঙ্গুর-সুধা সবার সেরা, তোরাও বল।
দূরের খাব্ তুচ্ছ করে' নগদ যেটা সেটাই তোল।
দূরের ঢাকে শুনিস না রে কান-জুড়ানো মধুর বোল।

কিছু না, কিছু না, দুনিয়ার দর্শন শাস্ত্রগুলি জীবনের তত্ত্ব একটু একটু দেখেছে। "দুঃখত্রয়াভিঘাত" থেকে মুক্ত করে' আদর্শ জীবনস্বাদ আবার কেউ দিতে পেরেছে নাকি ? মানব জীবনের সাধ্য নয় পূর্ণতা স্পর্শ করা।

জীবনে সুখ আছে, দুঃখ আছে। কালিদাস বলবেন—জীবনের চক্রনেমি সুখ ও দুঃখকে কখনো উপরে, কখনো নীচে নিয়ে আবর্তিত হ'য়ে চলেছে—এইজন্য কেবল দুঃখ, কেবল সুখ কারও জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকে না।—'কস্যাত্যন্তংসুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা। নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥' কালিদাসের কথা ব্যক্তিজীবনের খণ্ডরূপের কথা। ওমর মহাজীবনের মাল্যবন্ধন বিপুল দেশে এবং অনন্ত কালের বক্ষে মেলে ধরেছেন—

Life passes. What is Balkh ? What is Baghdad ?
The cup fills—should we care whether with bitter
Or sweet ? Drink on ! Know that long after us
The moon must keep her long—determined course.

জীবন চলে, বাহ্‌লীক আর কোথা বা তোর বাগদাদ ?
প্রাণের পাতে মিষ্টি ওঠে, কোথাও শুধু তেতোর স্বাদ।
থামবে না তো কোথাও তাহা, চলবে সে যে পথের শেষ।
আমরা যাব, আকাশ পথে চাঁদের আলো থাকবে বেশ॥

আজ বিদায়ের পালা ঘনিয়ে এসেছে। স্মরণে জাগছে সৃষ্টিক্ষণে আমার স্রষ্টা ধীরে ধীরে বর্ণবিন্যাস করে আমার কানে কানে বলেছিলেন 'মুহব্বত্'—মীম্ হে. বে, তে এই চতুরক্ষরী মহামন্ত্র। তারপর বর্ণগুলিকে আমার দিলের চৌকোয় একটি একটি করে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ওখান থেকে দিলের একটি অংশ কেটে নিয়ে একটি চাবী তৈরী করে আমার হাতে দিয়েছিলেন—তমাম কুফ্‌ল কেলীদ 'The Master Key'—বিশ্বতালককুঞ্চিকা। হৃদয়ের চাবি দিয়েই হৃদয়ের দুয়ার খোলে এবং দ্রুত খোলে। "হম্‌রা হম্, হম্ অন্দর গির্দ্"। আবর আমদ্ রো বাজ্ সর-এ-সবজহ্ গুয়িস্ত্। বে বাদাহ্ আর ঘোয়ান্ নমী আয়ীদ্ জীস্ত্। মেঘ ফসলের মাথায় জল ঢেলে বলে দিয়েছে ; বাতাস ছাড়া লাল ফুলের বাহার দোলে না। প্রাণের উপাদানে প্রাণ আসে। একথা ঠিক হলেও, জানবে প্রেমহীন জীবন নিষ্ফল।—amor vincit omnia—প্রেমই বিশ্বজয়ী।

পাপ কি কিছু করে গেলাম ? তাও জানিনে। আল্লাহ্ তা'লা তো অমানবীয় দৃঢ়তায় আমাকে গড়েন নি। আমিতো একতাল মাটি ছাড়া

আর কিছু নই। তিনি জানেন দুঃসাধ্য দৃঢ়তা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অথচ তিনি আদেশ করেন 'পাপ থেকে বিরত হও'। এ কেমন আদেশ? এর তাৎপর্য কি 'তুমি হেলতে পারো, পড়ে যেও না'। সে কি 'Lean, but never fall'! তুমিই যখন সৃষ্টিকর্তা, তখন দোষ দেব কাকে? 'কসীরা চেহ্ গোনহ্ আফ্রীনন্দহ্ তুয়ী।' জানিনা খোদা! তোমার অভিপ্রায়। আমার অখ্যাতি তো যাকে বলে 'আর্শ ও ফর্শ', একেবারে খোদার সত্তা থেকে মানুষের ফরাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল।

'বদনামী মন্ জু আ'রশ ও কুরসী বগজশ্ত্।'—সত্য কথা শোন, মোটের উপর আমার জীবনে আনন্দ নেই; আমার যে সহধর্মিনী নেই—পর পর শরাব পাত্র পেলেও আর আনন্দ আসে না।

'ফী আলজুমলাহ্ খুশী নীস্ত্ অগর দস্ত্ দাস্ত্।
মদ কাসহ্ পয়াপই কেহ্ আ রূশ্ বগজশ্ত॥

তবু আমার হৃদয় কাঁদে 'সুরা দাও, ইলম্ দাও'—আমি প্রেরণা চাই, আমি জ্ঞান চাই, শিখতে চাই, শেখাতে চাই। শোন বন্ধু, এই প্রার্থনার পর আমার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে পেয়ে গেলাম 'আলিফ'। আমার হৃদয় বললে—'বস' ঐ যথেষ্ট। 'লা ইলাহা ইল্লালাহ্'। আর কি? 'আল্ বকারাহ' অংশের প্রথম দুটি বাণী কণ্ঠে এল—

(১) বেস্মিল্লাহ্ আলরহমান্ আল রহীম্—ঈশ্বরের নামে বলছি তিনি করুণাময়।

(২) আলিফ্ লাম্ মীম্, তিনটি নাম চিরস্মরণীয়—আল্লাহ্, তাঁর প্রেরিত দূত জেব্রাইল এবং পয়গম্বর মোহম্মদ।

আলিফ আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ঃ আমি যে ইনসান্—এই মহাসৃষ্টির প্রেমিক, আমার ধর্ম যে ইসলাম্, আত্মসমর্পণ। এর চাইতে বড় কথা আর কি আছে? 'আমীন্' তথাস্তু। এই প্রার্থনা, আমার সূক্ষ্ম দেহ যেন উর্দ্ধগামী হয়। তখন—

কঙ্কালের চূর্ণগুলি গুঁড়িয়ে নিয়ে মাটির মাঝে,
সেই মাটিতে পাত্র গড়ে শরাব ঢেলে তোমার কাজে,
পানোৎসবে ধন্য হবো আবার হবে যাত্রা শুরু।
নতুন খেলায় মাতিয়ে তুলে ধন্য ক'রো প্রেমের গুরু॥

শোন বন্ধুগণ: যাওয়ার আগে উচ্চকণ্ঠে বলে যাই—আমি খোদার প্রশস্তিতে কাব্যগাথা গাঁথিনি।

খোদ'র তারিফে মুক্তার মালা গাঁথে নি ওমর সত্য বাণী;
তাহার ভুরুতে পাপের পরাগ নজরে পড়িবে একথা মানি।
রোজ কেয়ামতে জানিবে তথাপি জাহির হইবে এ মগফুর[১]
খোদার কসম্, ওমর সেধেছে ইলাল্লাহ[২] প্রাণের সুর।

তোমাকে কখনো ভুলেও আমি জীবনে 'দুই' বলিনি। তুমি আমার জ্ঞানের রাজ্যের দুর্ভেদ্য প্রাকার ভেঙ্গে দিয়ে আমাকে সবটুকু দেখালে না। সে তোমারই মর্জি। যেটুকু জ্ঞান দিয়েছিলে তাই দিয়ে যেটুকু বুঝেছি, তাই বলেছি। আমার জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচরে অনেক কিছু রয়ে গেল। তুমিই তো সর্বময় কর্তা। জানাও নি, জানি নি। বিদায়। এ আসর ভেঙ্গে দাও প্রভু।

আল্লাহ্, ইনসান, ইসলাম, আমীন্ সব কটি কথাই আরবীতে আলিফ দিয়ে শুরু 'আলিফ' আসার এই তাৎপর্য। যোগীদের অযত্ন জপ অজপারমত ওমরের আলিফ্. নাসিকায় অনবরত ধ্বনি হচ্ছে 'হংস', যার মানে অহংস: আমিই ব্রহ্ম এর নাম অজপা যার অর্থ যত্নের বিনা জপা। যোগীরা এই মত প্রচার করেছেন প্রতিদিন ২১,৬০০ বার এই অজপা চলছে। প্রশ্বাসে হং নিশ্বাসে সঃ। এই অজপায় চলে প্রাণের খেলা। জপ ফুরিয়ে গেলেই পরমায়ু সমাপ্ত—মুসলিম বিশ্বাস করে হৃদযন্ত্র নিয়ত আল্লাহ্ এই ধ্বনিতে স্পন্দিত হয়ে চলেছে এবং দুই কান বন্ধ করলে মগজের নিরন্তর 'হু' ধ্বনি স্বয়ংক্রিয় পন্থায় শ্রুতিগোচর হয়।

১। মগফুর—খোদার কাছে ক্ষমাপ্রাপ্ত।

২। ইলাল্লাহ্—এক ঈশ্বর, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

['ওমর আলী শাহ্ আফগানী' ওমর খইয়ামের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই লেখা দ্বাদশ শতকের প্রাচীনতম পুঁথি আবিষ্কার করেছেন। সেই প্রামাণিক পুঁথির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন আধুনিক ইংরেজ কবি 'Robert Graves'। এই প্রবন্ধে ইংরেজী তর্জমা সেই ইংরেজ কবির।]

সূফী সাহিত্যের প্রথম যুগ
ও বাবা তাহির উরিয়ান্ (১১শ শতক)

এইবার পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে সূফী কবিদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করার সময় হয়েছে। যে কারণে আমরা ওমর খইয়্যামকে একজন পুরোমাত্রার সূফী কবি বলিনি তা পূর্বের প্রবন্ধে বলা হয়েছে। যা কিছু সূফী তত্ত্বে উদ্ভাসিত তা ওমরের শেষ জীবনের রচনা বলে অনুমিত হ'য়ে থাকে। ওমর ছিলেন মস্ত বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক। দার্শনিক মতবাদে তিনি অজ্ঞেয়বাদী। অথচ সময় সময়, বিশ্বাসের আলোকশিখায় জগৎ ও জীবনের এক নিয়ন্তৃ-শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যুৎস্ফুরণের মত তাঁর চিত্তকে আলোকিত করে দিয়ে যেতো। তাঁর সেই বিশ্বাসের রাজ্যে স্রষ্টা কিন্তু এক ভিন্ন একাধিক হ'তে পারে নি। তাঁর জীবনের শেষ কথাও তাই। তখন তিনি অবিচেন্নার 'শিফ' গ্রন্থের 'এক, না একাধিক' নামক পরিচ্ছেদে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে ছিলেন। সেইক্ষণে তিনি বলেছিলেন 'আল্লাহ্'! আমি তোমাকে আমার জ্ঞানের সীমা দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করেছি। সে সম্পূর্ণ কিনা তা তো জানিনে প্রভু! তুমি আমাকে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের জন্য ক্ষমা করো। কিন্তু প্রভু, আমি তোমাকে ভুলেও কোন দিন এক ভিন্ন দুই বলি নি। মানুষকে সৃষ্টি করার রহস্য কিন্তু বুঝে নিয়েছি—

'দানী চেহ্ বুদ্ আদমখাকী খইয়্যাম্?
ফানুশ খিয়ালী বো চিরাগ দরওয়ে॥'

মাটির গড়া মানুষটিকে চিনতে পার খৈয়াম কবি?
ফানুশ তাহা খেলার লাগি চিরাগ তাতে উজল ছবি।

আত্মার অবিনশ্বর শক্তি প্রবাহের চেতনা মনে হয় তিনি কোনদিনই বিসর্জন দিতে পারেন নি।

'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥'

নিত্য শাশ্বত এই আত্মা। দেহের বিনাশে এর বিনাশ নেই। এ ভাবনা তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তেও দৃঢ় হ'য়ে বর্তমান ছিল। 'তামাম্ শুদ্'—সব শেষ হয়ে গেল—এমন স্পর্ধিত কথা কোন্ মূর্খ উচ্চারণ করবে?

এখন খাঁটি সূফী কবিদের কথায় আসি। হামাদনী তাহির বাবার ডাক নাম ছিল 'উরিয়ান্' বা 'নাঙ্গাবাবা'। তিনি ছিলেন বিরল বেশ এক সরল মানুষ; মন তাঁর একেবারে খোলা; রেখে ঢেকে কথা কইতেন না —তাই তিনি উরিয়ান (exposed)। এই উরিয়ান বাবাকেই আদি যুগের সূফী কবি বলা হ'য়ে থাকে। ওমর খইয়্যামের রুবাইগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝা যাবে, উরিয়ান বাবার রুবাইগুলি কত সরল অথচ ভাব-গম্ভীর। সেখানে খুব রঙের বাহার, সেখানকার রংগুলিও অকৃত্রিমভাবে দেশী ভেষজ রং, কদাচ আমদানী করা বিদেশী রং নয়। তাঁর রচনায় খইয়্যাম কবির গূঢ়-গভীর তত্ত্ব-রসের রহস্য বা উচ্চ কোটির জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় না পেলেও, এই সূফী সাধকের সরল কথা আনন্দের সঙ্গে পরমার্থের সন্ধান দেয়। বেদান্ত ভাষ্যের সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামৃত তুলনা করলে যেমন মনে হয়, এও তেমনি।

শোনা যায়, স্বয়ং তুঘ্রিল বেগ সেলজুক তাঁর এক বিজয় অভিযানে হামাদনের কাছে 'খিদ্র্' নামক ক্ষুদ্র এক পাহাড়ের নীচে এই সূফী সাধক উরিয়ান বাবার সাক্ষাৎ পান। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে এসে ভক্তি ভরে এই সূফী সাধকের হস্ত চুম্বন করেন। তাহির বাবা বলেন, 'তুর্কী সন্তান তুঘ্রিল বেগ! তুমি ঈশ্বরের সন্তানদের নিয়ে কি খেলা খেলতে চললে?' সুলতান বললেন, 'আপনি বলুন। আমি আপনারই হুকুম তামিল করব।' বাবা কুরান শরীফ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এক সুরা আবৃত্তি করলেন। নিশ্চিতই আল্লাহ্ মানুষের কাছে ন্যায় এবং শুভ প্রত্যাশা করেন।

ইন্নাল্লাহ্ ইয়ামোরো বিল আ'দলে ওয়াল এহ্সানে
ওয়াইতাএজিল। কোর্বা ওয়াইয়ান্হা আ'নিল
ফাহ্শা-এ ওয়াল মুন্কারে ওয়াল বাগইয়ে।
ইয়াএ জোকুম লা'ল্লাকুম্ তাজাক্কারুন্॥" (সুরা ১৬-৯১)

Verily Allah enjoins justice and the doing of good to

others; and giving like Kindred and forbids indecency and manifest evil and wrongful transgression. He admonishes you that you may take heed. (Sura 16-91)

সুলতান শুনে তাঁর পূর্ববর্তী অভিযানগুলির ধ্বংস যজ্ঞের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। বললেন—'বাবা, তোমার জয় হোক। আমি আজ থেকে খোদার আদেশই পালন করব।' উরিয়ান বাবা তাঁর হাতের আংটি সুলতানকে পরিয়ে দিয়ে বললেন—'এই তোমার মহা সাম্রাজ্য। মানুষকে ভালবেসো। ন্যায়-নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ো না।'—এই ঘটনা একাদশ শতকের মধ্যভাগে ঘটেছিল।

তাহির বাবা আবু' অলী বিন্‌সীনা—যাকে সংক্ষিপ্তভাবে 'অবিচেন্না' বলা হয়, তাঁর সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করতেন। কাজেই অবিচেন্নার সমসাময়িক হলেন উরিয়ান তাহির বাবা। সত্যই এই উরিয়ান সূফী ছিলেন মজ্জুব বা অর্ধোন্মত্ত। স্বর্গীয় প্রেমের দিব্যবিভার ছটা তাঁর মুখকে যেন সর্বদা উজ্জ্বল করে রাখতো। Moses এর মুখমণ্ডলে দিব্য আলোক দেখে যেমন লোকে বলতো—'He has seen God'—উরিয়ান বাবার মুখে চোখেও তেমনি এক স্বর্গীয় জ্যোতি দেখা যেতো। বাবা তাহির আরবী ও পারসী উভয় ভাষাতেই তাঁর গাথা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। ঈশ্বর ও মানুষের সাযুজ্য সাধনা তাঁর রুবাইগুলির মর্মকথা। খোদা মানুষেরই হৃদয়ে আছেন। তাঁকে বাইরে খোঁজা নিষ্ফল। আমাদের দুঃখ কষ্টের মূল সেই খোদা থেকে জুদাই বা বিরহ। 'ফানা' বা আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই আসে 'ইকদলী' বা সাযুজ্য—সাধকের আনন্দোৎসব। সে আনন্দের সীমা নেই।

সীর আমদম্ আয় খোদায়ে অজ্ হস্‌তী খ্বীশ্
অজ্ তঙ্গ্ দিলী ও অজ্ তহয়ী দস্‌তী খ্বীশ্।
অজ্ নীস্ত্ চু হস্ত মীকুনী বীরুন্‌আর
জীন নীস্তীম্ বহর মত্ হস্‌তী খ্বীশ্॥

—খোদা! বুঝি না আমাকে অজ্ঞেয় রাজ্যের শূন্যতা থেকে এই সৃষ্টির বৈচিত্র্যে টেনে এনে তোমার কি লাভ হয়েছে। আমি যে আমার অস্তিত্বের মধ্যে সর্বদাই বিরক্ত হ'য়ে চলেছি। আমি যে আমার হৃদয়ের

সঙ্কীর্ণতায় নিজেই লজ্জিত হ'য়ে চলেছি। আয় খোদা! আমি যে আমার দৈন্যে সর্বদা পীড়িত হচ্ছি। শুনি, এ আমার অস্তিত্বের পবিত্রতা। বুঝি না, প্রভু—এ কেমন পবিত্রতা—

'আন্ রোজ্ কেহ্ তুসন্ ফলক জীন করদন্দ্,
ও আরাইশ্ মশতরী ও পরওয়ীন্ করদন্দ্।
ইন্ বর দনসীর মা জদীবান্ কজা
মা-রা চেহ্ গোনাহ্, কি কিসমত্ মা ইন্ করদন্দ্॥

—যেদিন থেকে মহাপ্রকৃতি আসমানের এই জিন কশেছে আর দৌস্‌পিতর্ গ্রহপতি বৃহস্পতি ও কৃত্তিকাকে সেই জিনে সাজিয়ে দিয়েছে, সেইদিন থেকেই কি আমিও আমার অদৃস্টচক্রে ঘুরছি? সে কি আমার পাপ? না না,—সে আমার কিসমত।

'দিলী দীরম্ খরীদার-ই-মহব্বত্—
কজ উ গরমস্ত্ বাজার-ই-মহব্বত্।
লিবাসী বাফতম্ বর কামত্-ই-দিল্
জ পূদ্-ই-মিহনত্ রো তার-ই-মহব্বত্॥'

—আমি এমন একটি হৃদয়ের অধিকারী যে সর্বদা ভালোবাসার খরিদ্‌দার। এবং এইজন্যই আমি দেখি আমার প্রেমের বাজার বড় তেজী। ভালোবাসা দিয়ে আর নিয়ে আমার আর ফুরসত্ থাকে না। দুঃখ-শ্রমের পড়েন সূতো আর প্রেমের টানা সূতো দিয়ে আমি ঠিক হৃদয়ের মাপ নিয়ে নিয়ে ঝলমলে বসন তৈরী করে চলেছি।

সৈয়দ আবিল খয়ের

এরপর উল্লেখযোগ্য সূফী কবি সৈয়দ আবিল খয়ের। ইনিও সেই একাদশ শতকের সাধক সূফী কবি। ইনিই সর্বপ্রথম ধর্মের প্রেরণায় ভাগবতী ভাবধারাকে রুবাই ছন্দরূপে হৃদয়গ্রাহী ক'রে প্রকাশ করেন এবং সর্বসাধারণের ভালবাসার বস্তু ক'রে তোলেন। বড় কথা এবং

সুফীমতবাদ এত মনোহারী হ'তে পারে, লোকে আগে তা জানতে পারে নি। সুফী নামক প্রেমধর্মে উন্মাদনার সঙ্গে যে অনিবার্য এক আকর্ষণ আছে, তা সে যুগের মানুষ আবিল খয়েরের রুবাই প'ড়ে জানতে পারল। সেইজন্য আবিল খয়ের রুবাই রাজ্যের সর্বপ্রথম প্রিয় কবি।

বাবা তাহিরের মত ইনিও ইবন্-ই-সীনার সান্নিধ্যে এসেছিলেন। অবিচেন্না ও আবিল খয়েরের পরস্পর শুভ সম্মেলন এবং হৃদ্য সংলাপ সম্বন্ধে এক গল্প প্রচলিত আছে। কৌতূহলী জনতা জানতে চাইলো বাবা খয়ের অবিচেন্নাকে কেমন দেখলেন। বাবা বললেন, 'আমি যা নিত্য দেখতে পাই এই পণ্ডিত তা জানেন দেখলাম।' সেই কৌতূহলীরা আবার অবিচেন্নাকেও একান্তে প্রশ্ন করলেন—'এশিয়ার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত! বলুন—বাবা খয়েরকে কেমন দেখলেন?' অবিচেন্না সহজ সরলভাবে উত্তর দিলেন, 'আমি যা জানতে পেরেছি, দেখলাম এই সাধক তা নিত্য প্রত্যক্ষ করেন।' দুটি প্রশ্নোত্তরের অপূর্ব সঙ্গতি দেখে সেদিনের কৌতূহলী জনগণ যুগপৎ স্তম্ভিত ও আনন্দিত হয়েছিল।

এই দরবেশের জীবন ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ নয়। নীরব সাধকের সমগ্র জীবন শান্ত ও সমাহিত ছিল। পার্সী প্রবচনে আছে—এমন জীবন আছে যা কর্মের নয় ধ্যানের, এমন মানুষ আছে যারা জঙ্গম জগতে বাঁচে না—আত্মার জগতে বাঁচে; তারা দেহময় নয়, মনোময় বা চিন্ময় (All Soul)। আবিল খয়েরের জীবন ছিল এমনি ধরনের। তাঁর ছোট ছোট কথাগুলো রত্নের মত উজ্জ্বল—রত্নেরই মত মহামূল্য। এই মিতবাক্ ধ্যান-সমাহিত দরবেশকে দেখলে আদর্শ গুরুর কথা স্মরণ হয়। আমাদের শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ গুরুর লক্ষণ--তিনি কথা বলেন কম,—একটু যা বলেন তাতেই শিষ্যের সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়। 'গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানম্, শিষ্যাস্তু ছিন্ন-সংশয়াঃ।' তাঁর কাছে প্রশ্ন হলো সূফী ধর্ম কি? তিনি উত্তর দিলেন, 'বাবা! মাথায় যা কিছু আছে তার সবটাই ঝেড়ে ফেলে দাও। হাতের সবটা বিলিয়ে দিয়ে শূন্য হ'য়ে যাও। দুঃখ আসবে, বিচলিত হ'য়ো না।' এসব শুনে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞান-যোগের স্মরণ হয়!

'কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥'

যেটা সকলের কর্ম, সেটাকে বুঝবে অকর্ম। আর যাকে দুনিয়া অকর্ম বলে, সেটাই মনে করবে আসল কর্ম। এ কর্ম যে করে সেই মনুষ্য সমাজে বুদ্ধিমান্। সে সর্ব কর্ম সমাধা করে নিষ্কাম হয়ে আপ্তকাম হয়েছে। সাধকদের জীবনকে আমাদের মানদণ্ডে মাপা চলে না। সকলের জাগরণে মুখর দিবাভাগকে সাধকরা গভীর রাত্রি মনে করেন। জেগে থাকলেও তখন তাঁরা নিদ্রিত। আর নীরব নিশীথে চলে তাঁদের জাগরণের পালা।

'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতঃ মুনেঃ।'

হাতের জিনিস বিলিয়ে দাও। আমাদের শাস্ত্রে আছে, দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়। পার্থিব দৌলত এবং তাই দিয়ে আহৃত বস্তু দিয়ে কামযজ্ঞ হয়, জ্ঞানযজ্ঞ হয় না। সূফী সাধক জ্ঞানযজ্ঞের উপদেশ দিতে মস্তিস্ক ধোলাই করার ব্যবস্থা আগে করলেন। দানযজ্ঞে পবিত্র হয়ে ধ্যান সমাধির মধ্য দিয়ে দিব্যদর্শন ঘটবে। বাবা আবিল খয়ের আর একটি মূল্যবান্ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান স্বর্গ আর মর্তের নয়। ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে আছে স্বার্থসাধনের কালো পর্দা। সেই পর্দাই খোদাকে দেখতে দেয় না। পর্দা ছিঁড়ে ফেলে দাও, তাঁর দিব্য বিভা নয়ন-গোচর হবে। তখন বুঝবে তুমি তাঁরই অস্তিত্বের এক টুকরো। এই দিব্যদর্শনে ঘটে 'খোদায়ি'—এটাকেই বলা চলে 'বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধি'।

আবিল খয়ের বলেন, জীবনের কণ্টক পথের কোন বাধা নয়; জ্ঞান দিয়ে দিয়ে, সহিষ্ণুতা দিয়ে দিয়ে তোমার চলার পথকে সার্থক করে তোল। হে আমার প্রাণ! আমি তো আমার এই খোরাসানের খাওরানের প্রান্তরে এমন কোন কাঁটা দেখলাম না যে, আমার জীবনায়নের সহায়ক না হয়েছে।

'জানা ব জমীন্-ই-খাররান্ খারী নীস্ত্
কস্ বা মন্ রো রুজগারী মন্ কারী নীস্ত্।'

ব. বি./পারস্য সাহিত্য/৭৬-৭

বয়স্ক বলি,—'বা লুৎফ্, বো নবাজিশ্, জমাল-ই-তু মরা।
দর দাদন্-ই-সদ হজার জান—আরী নীস্ত্॥'

—হে আমার দুঃখ বেদনা! তোমার কমনীয় আদরে, তোমার সৌন্দর্যে, তোমার শত হাজার প্রাণের দাদনে ধন্য হয়ে উঠেছি। এই সাধকই তাঁর অনুগত শিষ্যদের শেষ প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন তিরস্কারের ভাষায়। শিষ্যরা জানতে চেয়েছিল মৃত্যুর পর তাঁর কফিন ধরাতলে রক্ষা করার সময় কোরান শরীফ থেকে কি মন্ত্র পড়া হবে। তিনি বলেছিলেন, পবিত্র কোরান এইসব তুচ্ছ ব্যাপারের অনেক উর্ধ্বে। আমার মৃতদেহের সঙ্গে ওসব সংশ্লিষ্ট করতে যেও না। তোমরা একবার ভাবতে শেখ, মৃত্যু কি মহান্! এই মৃত্যুর দ্বার দিয়েই বন্ধু তাঁর প্রাণের আসল বন্ধু ফিরে পায়। এই শেষ প্রয়াণকে মহান্ বন্ধুর সঙ্গে মহামিলনের এক সেতুরূপে জেনো। এ জীবনটা ছিল দুঃখপূর্ণ; দেখ মৃত্যুর পর আনন্দময় অস্তিত্বের শুরু হ'লো। এ জীবনটা ছিল শুধু কথার লহরী মাত্র। মৃত্যুর পর হ'লো আসল কাজের সূচনা।

'বেহতর অজ ঈন্ দর জহান্ হম চে বুবদকার
দোস্ত্ বর দোস্ত্ রফ্ত্, ইয়ার বর ইয়ার।
আন্ হম অন্দুহ্ বুদ্ বো ঈন্ হম শাদী
আন্ হম গুফতার বুদ্ বো ঈন্ হম করদার॥'

সমপ্রসঙ্গ মনে এলো। Hemlock বিষপাত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে। সোক্রাতীসের অঙ্গ অসার হ'য়ে আসছে। চক্ষুর দৃষ্টি ঝাপসা। রোরুদ্যমান প্রিয়তম শিষ্য প্লাতোকে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ধমকে দিলেন। মূর্খ! কাঁদ কেন? আমার আনন্দ হচ্ছে। নতুন জ্ঞানের আলোক পেতে পারি। মৃত্যুর রহস্য যদি কিছু থাকে তা এইবার আমার কাছে আবিষ্কৃত-হবে।

মৃত্যুর সময় আবিল খয়ের বলেছিলেন, 'শিষ্যগণ! যদি পার আমার সমাধিস্তম্ভে আমার শেষ কথাগুলো উৎকীর্ণ করে দিও—"আল্লাহ্! তুমি একবার ডাক দিলেই শুনবে আমি তৈয়ার। যদিও জানি, আমার মরদেহের ওপর আছে— মাটির ভারী চাপ। জেনো আমি তোমার হয়েই ছিলাম, তোমার হয়েই আছি। আমার চূর্ণ অস্থি মাটি হয়ে গেলেও আমি তোমারই।" কথাগুলি বাবা খয়েরের সমাধিস্তম্ভে আজও উৎকীর্ণ রয়েছে।

সুফী মতবাদ্ ইসলাম ধর্মের রহস্যকথা। অনেক মুসলিম পণ্ডিত এই মতবাদের সূচনা কোরাণ শরীফের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন। এমনও কথা আছে, হজরত মহম্মদ আপন জামাতা হজরত আলীকে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকেই এই রহস্যবাদের আলোকে কোরান ব্যাখ্যা শুনিয়ে চলেছিলেন। এই মতবাদ যে অনৈস্লামিক নয়, বরঞ্চ কোরান-অনুমোদিত সে কথা সুফীর শিরোমণি জলালউদ্দীন রুমীর কথাতেই আমরা বুঝতে পারি। তিনি বলেছেন—আমি যা বলে চলেছি তা কোরানের মগ.জ.। আমি তাই গ্রহণ করেছি, আর হাড়গোড় সব ছড়িয়ে ফেলেছি। কুকুরেরা তাই নিয়ে মারামারি করছে।

মন্ জ় কোরান মগজ় রা বরদাশতম্।
উস্তখোয়ান্ পেশ-এ সগান্ আনদাখতম্॥

—সূফী ধর্ম কোরানেরই সারাৎসার বা 'মগজ়'।

অনেক পণ্ডিত এই সূফী মতবাদে ভারতীয় ঔপনিষদিক প্রেমধর্মের সন্ধান পেয়েছেন। কেউ বা দক্ষিণ ভারতের আড়বার সম্প্রদায়ের প্রেমসাধনার দূরান্বয় সাধন করতেও সাহসী হয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অভিনব প্লাতোনিক মতবাদে উজ্জীবিত এই রহস্যবাদ—একথা প্রচার করেছেন। কেউ কেউ সেমীয় ধর্মশাস্ত্রের প্রেমোপাসনার ইঙ্গিত দিয়েছেন, বাইবেলের সলোমন সঙ্গীতের প্রমাণ উদ্ধৃত করে। কেউ বলেছেন 'ইরানীদের রক্তধারায় ছিল এই প্রেমোপাসনা—অবেস্তা তার প্রমাণ। প্রেমময় উপাসনার এই পদ্ধতি কত প্রাচীন এবং কোন জাতির মধ্যে এই সাধনার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হ'য়েছিল—তার বিশ্লেষণ 'জিজ্ঞাসা' থেকে প্রকাশিত মৎপ্রণীত 'সূফীমতের উৎস সন্ধানে' নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হ'য়েছে। ইস্লামিক রহস্যবাদ নামক সূফীতত্ত্বে ঈশ্বর কখনো প্রেমিক, কখনো প্রেমিকা হয়ে আবির্ভূত হন। সর্বদাই তাঁর আবির্ভাব রহস্য-ঘেরা হ'য়ে থাকে।

সৈয়দ আবুল খয়েরের কয়েকটি রুবাই এখানে অনুবাদ করে দিয়ে তাঁর রহস্য সাধনার ভক্তিরস তুলে ধরতে চাই।

(১)

ক্ষমা ক'রো মোরে, যদি খাই সুরা, যদি বা ঢালিয়া চলি
সুধা আর প্রেম মিলিয়ে মিশিয়ে,—খুলিয়া সকলি বলি।
ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলি যবে, বন্ধুকে পর ভাবি।
সুরার সোহাগে বেসামাল যবে, থাকে না হৃদয়ে চাবি।

(২)

পুছিলাম তাঁরে—কেবা সুন্দর ? কোথায় তাহারে পাই ?
উত্তর হ'লো, মূর্খ ! বোঝ না—আমি আছি, আর নাই।
প্রেম ও প্রেমিক, প্রণয়াস্পদ—তিনের মিলনে নামি
শোভা ও মুকুর, চোখের আলোক—সব মিলে মিশে আমি।

(৩)

'জোঁক চাই আমি, মাথা ছিঁড়ে যায়—করো মোর উদ্ধার'
তাঁর কথা ছাড়া কহিও না কথা, নহিলে শক্তি কার ?
এ ব্যাধিতে নাই অন্য ওষুধ। বাহিরে লাগাও খিল
হৃদয়-কাবাব, শোণিত-শরাব—দুয়ে কর মহফিল।

(৪)

জ্ঞান-যোগী যারা রহস্য বোঝে, নিঃশেষ করি 'আমি'
একে মিশে যায়, থাকে নাকো কিছু আমি হ'য়ে যায় 'তুমি'।
দ্বৈতজ্ঞানের সীমা পার হ'লে 'তুমি' 'আমি' একাকার ;
দু'য়ে মিশে এক, সংবিৎ শুধু. লায়লাহী মানে যার।

এই সব তর্জমার মধ্য দিয়ে আমরা যে মূলের রসোপাসনা আস্বাদন করলাম, তাতে বুঝি তিনি সূফীতত্ত্বের কত বড় মার্মিক ছিলেন। দেখা যায়, তাঁর নিবিড় অনুভূতি রহস্যের রূপ ধরেই আমাদের কাছে এসেছে। সে ইঙ্গিত দেয়—স্পষ্ট করে কিছু বলে না। অথচ তার প্রকাশের রূপ ও রঙ্গে এক প্রকার মানস-সম্ভোগ সম্ভব হয়। সূফী ও বৈষ্ণবের প্রেম-সঙ্গীতে এই কলাকৌশল কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। ঈশ্বরের মৌলিক পরিভাবনায় তাঁর সর্বকর্তৃত্ব, সর্বমঙ্গলমঙ্গল্য রূপ কোন স্থানেই বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় না। তিনি রুদ্র-ভয়ঙ্কর নন, তাঁর ঐশ্বর্যই বড় কথা নয়—এটাতেই সূফী-বৈষ্ণবের মিতালি। তিনি সুন্দর—অনন্ত সৌন্দর্যের শেখর,

পার্থিব সকল সৌন্দর্যের উৎস। সূফীর রুবাই ও গজল, এবং বৈষ্ণবের পদাবলী একাধারে উপাসনা এবং অপার্থিব সৌন্দর্য-সম্ভোগ। মানুষের চিত্ত এতে পবিত্র হয়, উন্নমিত হয়। বৈষ্ণবের সঙ্গীত পার্থিব মোড়কে আঁটা একখানি স্বর্গের চিঠি। সূফীর সঙ্গীত মাটিতে মূল রেখে অনন্ত শূন্যে তার শাখা পল্লব বিস্তৃত করে চলে। রহস্যের এক প্রকার ইঙ্গিতময় ভাষা আছে। রহস্যবাদী কবিরা সেই পরিভাষা বা সন্ধাভাষা ব্যবহার করে চলেন। সূফীদের কলেজার কাবাব আর দিলের রক্ত, তাদের শরাব আর সাকী তাদের মহফিল আর হমদমী, নিবিষ্ট হয়ে ধ্যানের মধ্য দিয়ে বুঝতে হয়। এখানকার ইয়ার আর দোস্ত, আশিক আর মা'শূক কখনোই দুনিয়াদারীতে নেমে আসে না। মধু মদিরায় রক্ত নয়ন, মুক্ত বেণীতে শর্বরী-র অন্ধকার, চন্দ্রাননে পূর্ণিমার মহোৎসব কখনই পৃথিবীর কামোৎসবে পরিণত হ'তে চায় না। মনে হয় যেন সে সৌন্দর্য—

'অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলেস্থলে
সব ঠাঁই হ'তে সর্বময়ী আপনাকে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিয়াছে একখানি মধুর মূরতি।'

এই উৎসবে ঠাঁই না পেলে সূফীরা কাঁদেন—

ম্যায়নে ক্যা খতা কী হ্যায়
ক্যোঁ জাম নহী মিলতা—
—সাকী! তোমার সুরার সভায়
পান করে সব দিল্ যে হারায়—?
কোন দোষে হায়! আমার বরাত
বঞ্চিত সে পাত্র হ'তে?

অনন্ত তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে আছি। তোমার দিব্যবিভা আমাকে পাগল করেছে। আমার খোঁজার শেষ নেই। আমি থামতে জানিনে, থামব সেদিন যেদিন পাব নির্বাণ—'Extinguished in thine Essence or extinct'।

এই ভাবসাধনার ইঙ্গিতময় ভাষা দিয়েছেন আবিদ খয়ের তাঁর মাজারের ঊর্ধ্ব পীঠে। ওগো সাধক! ওগো মুসাফির! আমার নাম ধরে ডেকো,

আমি সাড়া দেব। তোমার কদমের পবিত্র স্পর্শে আমার অস্থিচূর্ণ রঙীন হ'য়ে উঠবে। তারা নীরব ক্রন্দনে জানাবে—আছি, ওগো আছি, এখনও প্রাণময় হ'য়ে আছি।

কতদিন পর ইংলণ্ডের কবি Tennyson তাঁর কল্পনায় পার্থিব প্রণয়িনী Maud-এর জন্য ধরার তলে থেকে প্রণয়ীর ক্রন্দন শুনিয়েছিলেন—

"She is coming my own, my sweet ;
Were it ever so airy a tread,
My heart would hear her and beat,
Were it earth in an earthy bed.
My dust would hear her and beat,
Had I lain for a century dead ;
Would start and tremble under her feet,
And blossom in purple and red."

অশরীরী তোমার হাওয়াই পায়ের হাল্কা ছোঁয়া পেয়ে আমি কবরের নীচ থেকে নীল-লোহিত রঙে পুষ্পিত হ'য়ে উঠব। আমি কি মরি ?

অল গজালী

সেলজুক্ সাহিত্য-পরিক্রমায় একবা'র আমরা অল গজালীর উল্লেখ করে এসেছি। অল গজালী ছিলেন সম্রাট্ আর্সলানের পুত্র মালেকশার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। সেলজুক্ সাম্রাজ্য আরব থেকে মাবরান্নহর বা বক্ষুনদের উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একদা সেই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন অল্প্ আর্সলানের মন্ত্রী, পরে তাঁর পুত্র মালেকশার প্রধান মন্ত্রী নিজাম-উল-মুল্ক। তিনি ছিলেন সর্বগুণের আধার। এই গুণাকর রাজনীতি-ধুরন্ধর মহামাত্য ছিলেন স্বয়ং পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যের উৎসাহ-দাতা। মালেকশার রাজসভা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মত বহুরত্নে বিভূষিত ছিল। অল গজালী, ওমর খইয়্যাম এঁরাই সেই সব রত্ন।

প্রকৃতপক্ষে মহামন্ত্রী নিজাম-উল-মুল্কের প্রচেষ্টায় সর্বদিকে সাম্রাজ্যের মান উন্নীত হ'য়েছিল। তিনি নীশাপুরে ও এসফাহানে দুটি উচ্চমানের মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। বাগ্দাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁকে বিশ্ববন্দিত ক'রেছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এনেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত অল গজ়ালীকে ; ভুলভাবে উচ্চারিত হয়, তশদীদ দিয়ে "অল-গজ্জ়ালী"। তাঁর সম্পূর্ণ নাম—ইমাম আবু হামিদ মোহম্মদ অল গজ়ালী।

একাদশ শতকের মধ্যভাগের কিছু পরে (১০৬০ খ্রীঃ) অল গজ়ালী খোরাসান রাজ্যের তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন অল্প্ অর্সলান দিগ্বিজয়ী সেলজুক সম্রাট। প্রথম জীবনে পিতৃদেবের এক সূফী বন্ধুর কাছে গজ়ালীর বিদ্যাভ্যাস শুরু হয়। তিনি কিছুদিন শিক্ষাগ্রহণ ক'রেছিলেন গুরগানে। সেখানে শিক্ষাগুরু ছিলেন ইমাম অবু নসর অল ইসমাইলী। এই গুরগান থেকে শিক্ষার সমগ্র বিষয়গুলি টীকাটিপ্পনীতে লিপিবদ্ধ করে তিনি দেশে ফিরে আসছিলেন। এমন সময় একদল দস্যু তাঁর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়। গজ়ালী দস্যুসর্দারের কাছে কাতর মিনতি জানান—'ফিরিয়ে দাও। ওসব কাগজে আছে আমার জ্ঞানের বিষয়।' দস্যুসর্দার হেসে বলে, 'আমি নিয়েছি এক গোছা কাগজ। তোমার জ্ঞান তো নিই-নি। এমন অসহায়ের মত কাঁদছ কেন ? বুঝেছি—এসব বিষয়ে জ্ঞান তোমার নিষ্ফল হ'য়েছে। জ্ঞান থাকে ভেতরে, বাইরে নয়।' অবশ্য দস্যুসর্দার সব ফিরিয়ে দিয়েছিল। গজ়ালী পরবর্তী-জীবনে নিজেকে শুধরে নিলেন। সব বিদ্যাকে তিনি মগজে পুরেই রাখতে পারতেন ; বই দেখার প্রয়োজন হ'তো না। মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় অভ্রান্ত বিদ্যার অধিকার পেয়েই তিনি পরবর্তী জীবনে বলতেন—'এইবার হাজার দস্যু একসঙ্গে এলেও আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার লুট করতে পারবে না।'

এর পরবর্তী অধ্যায়ে গজ়ালীর নীশাপুরে আগমন। এখানে আসার পর তিনি এমন নৈষ্ঠিক পাঠক এবং শাস্ত্রার্থের অভ্রান্ত মার্মিক হ'য়ে উঠলেন যে, তাঁর যশের সৌরভ চারদিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়লো। ঠিক এই সময় নিজ়াম-উল-মুল্ক একাদশ শতকের শেষের দিকে (১০৯২ খ্রীঃ) তাঁকে বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে নির্বাচন করে নিলেন। গজ়ালীর মধ্যে ছিল অনন্ত জ্ঞান-পিপাসা। পরিক্রমা ছাড়া জ্ঞানের পূর্ণতা

ঘটে না। তিনি আপন ভ্রাতাকে অধ্যাপনার ভার দিয়ে প্রব্রজ্যায় বার হ'লেন। প্রথমে এলেন মক্কানগরীতে। কিছুকাল পরে আরামাইক রাজ্য সীরিয়ায় উপনীত হ'য়ে তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, গ্রন্থখানার নাম 'ইয়াহিয়া-অল্-উলুম-উদ্দীন' যার অর্থ—ধর্মতত্ত্বের পুনরুজ্জীবন। আরবীতে লিখিত এই মহাগ্রন্থের পার্সী অনুবাদ তিনি নিজেই সমাধা করেন। অনুবাদিত গ্রন্থের নাম 'কীমিয়া-ই-স'আদত্', অর্থ হ'লো—আনন্দের রসায়ন। সত্যই এই গ্রন্থ মানুষের জীবন-রসায়ন। সুস্থ জীবনের প্রশান্তি আনার ক্ষমতা এই গ্রন্থের মধ্যে আছে। বাগদাদে ফিরে এসে গজালী এই গ্রন্থ থেকেই উপদেশ প্রদান করতেন। বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তিনি পুনরায় ফিরে আসেন নীশাপুর মহাবিদ্যালয়ে। কেন যেন মাতৃভূমি তুসনগরী আবার তাঁকে টেনে নিয়ে গেল। এখানে এসেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন (১১১১ খ্রীঃ)—তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫২ বছর পূর্ণ হ'য়েছে।

অল্ গজালীর জ্ঞানের সীমা ছিল না। নানা-দেশের শাস্ত্র পুরাণ, নানা জাতির ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য সব যেন করামলকবৎ তাঁর হাতের খেলায় পরিণত হ'য়ে যেতো। সব বিষয়ের তোলন পন্থায় বিচার ছিল তাঁর অভ্যস্ত কৌশল। তাঁর বিচারমল্লতায় বড় বড় পণ্ডিত পরাজিত হয়েও বিমুগ্ধ হ'য়ে যেতেন। তাঁরা বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে ভাবতেন পয়গম্বরের মুখে 'লা নবীয়া বা'দী' কথাটাই বাদী হ'য়ে বাধা দেয়, নৈলে অল্ গজালীকে আমরা দ্বিতীয় পয়গম্বর রূপে বরণ করতে পারতাম।' পণ্ডিত সুয়ূতী একথা বলেছিলেন বলে শোনা যায়।

অল্ গজালী তাঁর আত্মকথায় বলে গিয়েছেন—'আমার তারুণ্যে অনতিক্রান্ত বিংশতি বর্ষে, আমার মনে পড়ে, আমি সর্বদাই আমার বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করে সব বিষয় বুঝে নিতে চেষ্টা করতাম। ক্রমোদ্ভিদ্যমান জ্ঞান-গৌরবে কিছুটা আত্মগরিমাও অনুভব করতাম। পঞ্চাশ বছর যখন পূর্ণ হ'লো তখন দেখি আমার সম্মুখে এখনও অনধিগত গভীর জ্ঞান-সমুদ্র বিস্তৃত হয়ে প'ড়ে রয়েছে। আমি শুধু তার তরঙ্গ উৎক্ষেপগুলি দেখেছি। তার সীমাহীন বিস্তার, গহন-গূঢ়

ভলদেশ এবং দুরুত্তীর্য ভ্রমিগুলি এখনও আমার আয়ত্তের বাইরে। আমার অভিজ্ঞতা অবশ্য যথেষ্ট হয়েছে। আমার জানা বিশ্বের সর্ব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রগুলি বিচার করে দেখেছি। দেখেছি অবিশ্বাসীর ঔদ্ধত্য, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসীর মূঢ় আস্ফালন। কোন গুপ্ত রহস্যবাদীর গোপন সাধন পদ্ধতিও আমি অ-দৃষ্ট, অ-স্পৃষ্ট করে রাখতে চাইতাম না। রুমী দুনিয়ার দেব-চত্বরে ভ্রমণ করে এবং প্রাচীন ইরানীর অগ্নি উপাসনার বেদি প্রদক্ষিণ করে, সব শেষে মানিকীয় সমন্বয়বাদের বিশ্রাম-শিলায় উপবেশন করেও দেখেছি।' এত সত্ত্বেও অল্ গজ্জালী তাঁর তারুণ্যে অভিনন্দিত সূফীর প্রেমধর্মে তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ় করে রেখেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মূল ইস্লাম থেকে বিন্দুমাত্র কেন্দ্রচ্যুত হননি। এইজন্য এই দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে সকলে হুজ্জতুল-এ-ইস্লাম বা ইসলামের প্রমাণ পুরুষ বলে সম্মানিত করে গিয়েছে।

আত্মচরিতে তিনি আরও বলে গিয়েছেন—'জ্ঞানের পিপাসা আমাকে অন্তরে বাহিরে কখনও স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয়নি। আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি নানা মতের সার উপলব্ধি করতে। আমি বুঝেছি সত্যই ঈশ্বর এবং একমাত্র ঈশ্বরেই সনাতন সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। আমার ক্রমোদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্বের মধ্যেও আমি তাঁরই শক্তি অনুভব করে এসেছি। তিনিই আমাকে জানা থেকে অজানা রাজ্যে পরিচালিত করে আনছেন। তিনিই আবার অজানার অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে আমার জানাকে সার্থক করে তুলছেন। এই ভাবে আমি পুরাতনের পাতা ঝরিয়ে ঝরিয়ে নতুন রাজ্যে অভিযান করে চলেছি। আমি বুঝতে পেরেছি পুথি-পত্রের জ্ঞানকে আত্মস্থ করে না নিলে প্রকৃত জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। অন্তরের জারক রসে জীর্ণ হলে তা জীবনের অনুকূল হয়ে ওঠার অবকাশ পায়।' প্রথম জীবনে দস্যুহস্তে লাঞ্ছিত হয়ে বোধ হয় তাঁর এই প্রকার বোধোদয় হয়েছিল।

সূফীমতের বিস্তৃতি—আবুল হসন্

সূফী সাহিত্যের বিহঙ্গাবলোকন প্রসঙ্গে যে সব তাত্ত্বিক এই তত্ত্ব-রসের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন, এইবার তাঁদের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করার সময় হয়েছে। নানা কারণে আবুল হসনের নাম তুলে ধরার ইচ্ছে হচ্ছে; কারণ সূফী তত্ত্বকে এই মনীষী বিশদ করে ব্যাখ্যা করেছেন। ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখনকার ইরানেরই অন্তর্গত গজনাতে। বাস করেছিলেন পর পর গজনারই নিকটবর্তী দুটি গ্রামে —একটি 'জুল্লাব', অপরটি 'হুজবীর'। তাঁর শেষ জীবন কেটেছিল ভারতবর্ষের লাহোরে। এইজন্য আবুল হসনের পরিপূর্ণ পরিচায়ক নামটি হ'লো—'আবুল হসন্ অল জুল্লাবী, অল হুজবীরী, অল লাহোরী। তিনি ছিলেন 'গঞ্জ্‌বখ্‌শ্' নামে পরিচিত এক সূফী গুরুর প্রিয় শিষ্য।

হুজবীরী বহু গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু অধিকাংশই কালের কবলে বিনষ্ট। তাঁর নষ্টাবশিষ্ট একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম—'কশ্‌ফ্‌-উল-মহজুব'। যার অর্থ রহস্যের উন্মোচন—Opening of the Secret। গূঢ়তম বস্তুর আবরণ ভেদ না করলে, সত্য দেখা দেয় না। ঈশোপনিষদে আছে জ্যোতির্ময় পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ আবৃত করা আছে। ওগো পূষণ্‌—সূর্যদেব! তুমি পরম জ্যোতির আবরণ খুলে দাও—

'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥'

হুজবীরী 'কশ্‌ফ্‌-উল-মহজুবে' তত্ত্বের আবরণ ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। এই মূল্যবান্ গ্রন্থখানা বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সূফীতত্ত্বের গবেষক নিকলসনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। সূফীতত্ত্বের এমন কোন দিক নেই যা' হুজবীরী স্পর্শ করেন নি। 'কশ্‌ফ্‌-উল-মহজুবে'র বিশদ আলোচনার পূর্বে আমরা হুজবীরীর নামের সঙ্গে জড়িত গ্রন্থ-সমূহের নাম উল্লেখ করি।

সেকালের সাহিত্যিকরা স্বার্থ ও পরমার্থ উভয় বিষয় নিয়েই অজস্র কবিতা রচনা করতেন। এই পরমার্থ-সাধক কবিও তা করেছিলেন। কবিতা সংগ্রহকে পার্সীতে 'দীবান্' বলা হয়। হুজ্বীরীর অবশ্যই কবিতা সংগ্রহ বা দীবান্ ছিল। এটা মনে রেখে আমরা আসল জায়গায় আসি। আবুল-হসান-অল-জুল্লাবীর সূফীধর্ম বিশ্লেষণ সাতটি গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছিল। সূফী তত্ত্বের মহা সরোবরে অবতরণের এই সাতটি যেন সাতটি বাঁধান ঘাট। (১) প্রথম গ্রন্থ, 'মিনহাজ-উদ্দীন'—নামটির অর্থ তত্ত্বসাধনার বাঁধান রাজপথ। (২) দ্বিতীয় গ্রন্থ, 'কিতাব-উলফনা বো বকা'। ফনা এবং বকার অর্থ আল্লায় লয়মুক্তি এবং জীবন্মুক্ত অবস্থা।

জীবন্মুক্তাবস্থা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। একটা যৌগিক কৌশলে (গীতার 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' স্মরণ করুন) মানুষ সর্বস্ব হারিয়েও সর্বস্ব পেতে পারে। ভগবানে আত্মসমর্পণই সেই কৌশল। এই অবস্থায় অস্মিতার (ego) লয়প্রাপ্তি ঘটে। তখন কর্ম থাকলেও সে কর্মে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। থাকে না বলেই তামস এবং রাজস বৃত্তিগুলি স্তিমিত হয়ে যায়। ঈর্ষা নেই, দ্বেষ নেই, নীচতা নেই, ক্ষুদ্রতা নেই। মনের উৎক্ষেপ নেই, বিক্ষেপ নেই; আছে স্থৈর্য এবং শান্তি। আচার্য গৌড়পাদ এই অবস্থাকেই জীবন্মুক্তাবস্থা বলেছেন। (প্রমাণ গৌড়পাদকারিকা ৩।৪২)

'যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে মনঃ।
অনঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা॥'

এই নিষ্পন্দ চিত্ত নিয়েই জীব ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হয়। বিদেহ না হয়েও এই দেহ নিয়েও এই যে নিত্য প্রাপ্তি, তারই নাম জীবন্মুক্তাবস্থা। সূফী মতে এই অবস্থার নাম 'বকা'। এই পরম রহস্য কথা ভারতের যোগীরা বুঝেছিলেন। এই রহস্য অনুভূতি সূফীরা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন।

রহস্য-উপাসনা বা Mysticism সহজ কথায় ধ্যান এবং সমাধি। এখানে খ্রীস্টধর্ম, ইস্‌লাম এবং ভারতীয় দর্শন অপূর্ব সঙ্গতি রক্ষা করে চলে। দ্বাদশ শতক থেকে ইসলামে এই রহস্যবাদ জোরদার হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায় এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের পথ সুগম করে দেয়। এর সার কথা বোধিচিত্তে (intuition) পরমানন্দ স্বরূপের উপলব্ধি।

উপনিষদের আনন্দরূপমমৃতম্ এবং কোরান শরীফের ঈশ্বরের শতনাম মালার মধ্যে অল্ হক এবং অল কাফী বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে নিউ টেষ্টামেণ্টের 'I am the Way the Truth and Life.'—এ কথার তাৎপর্যও অনুধাবনীয়।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনের রহস্যবাদও সমসূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। ধ্যানের মধ্য দিয়েই পুমোস বা আত্মাকে পরমেশ্বরে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করা যায়। এই একাত্মতার উপলব্ধি আসে সমাধির মধ্য দিয়ে। Plato বলেছেন—আত্মাই জীব, দেহটা নয়। দেহের পরিণাম এবং তুচ্ছতা হিন্দু দর্শনেও স্বীকৃত। এইপ্রকার রহস্যানুভূতি মহাযানী বৌদ্ধরাও স্বীকার করে গিয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁরা নশ্বর সকল কিছুর মধ্যে অবিনশ্বর বুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করতেন। এ সব ক্ষেত্রে অপরিহার্য হ'লো যোগের কর্মকৌশল, ধ্যান এবং সমাধি।

(৩) এরপর তৃতীয় গ্রন্থ—'অস্‌রার-উল্-খিরক বো মিন্নত্', পোশাক রহস্য ও দৈন্য বোধের তাৎপর্য। রহস্য সাধনার অনুকূল পোশাক পরিচ্ছেদের কথা এই সূফী সাধক উপেক্ষা করেন নি। বেশভূষা আন্তরভাবের উদ্দীপনা বিধান করে। আঁট সাঁট পোশাকে কোমরবন্ধ্ লাগিয়ে তলোয়ারে হাত দিলেই জিগীষা এবং জিঘাংসা জাগে। বিলাসীর মনোভাবই নির্বাচন ক'রে নেয় বিলাসের অঙ্গসজ্জা এবং প্রসাধন। প্রব্রজিত বৈরাগী যখন ভৈক্ষামাত্রে পরিতুষ্ট, তখন তাঁর যে পোশাক তার নাম হ'য়েছে ভেক—ভৈক্ষা>ভেক্খ>ভেক। এই ভেকবস্ত্র গিরি-মাটিতে রঞ্জিত ব'লে গৈরিক বসন। তান্ত্রিকদের সাধনার লক্ষ্য এবং উপায় আনন্দ। তাঁদের নামেও 'আনন্দ' অনুসর্গ (Suffix) রূপে গৃহীত হয়। তাঁদের বসন রক্তবর্ণ—আনন্দের প্রতীক। বৌদ্ধদের কাষায়বস্ত্র বিষয়ে অনাসক্তির দ্যোতক। শ্বেতাম্বর জৈনদের শুভ্রবসনে পবিত্রতার ভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। আমাদের শাস্ত্রও অশন-বসনের বিচার ক'রে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক কক্ষত্রয় নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে। সূফীরা সর্বপ্রথমে ছিলেন সূফ বা পশমি বস্ত্রপরিহিত—অত্যন্ত কর্কশ পশমি বস্ত্র। অতি সাধারণ সে সজ্জা বিলাস বসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে গৃহীত হ'য়েছিল। অনেক পরবর্তীকালে কোন কোন

সূফী সম্প্রদায় অতি দৈন্যের প্রেরণায় 'খিরকহ্' বা জোড়াতালি দেওয়া বহির্বাস ধারণ করতেন। আরবী শব্দ খিরকা মানে পাটি জাতীয় চটের বসন বা তালির বসন। এদিকে দেখা যায়—ইসলামী রহস্যবাদী সূফী এবং খ্রীষ্টান রহস্যবাদী ধর্মযাজকরা একই রং নির্বাচন ক'রে ফেলেছিলেন; সে রং কালো। সাধারণভাবে দেখতে গেলে এর তাৎপর্য অনাড়ম্বর। কিন্তু এতেই কি শেষ? রহস্যবাদীর পোশাকেও কোন রহস্যের দ্যোতনা থাকতে পারে।

খ্রীস্টান এবং মুসলিমে অনৈক্যের মধ্যেও যে যে ক্ষেত্রে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, আমরা নানাস্থানে তা' বলে এসেছি। আরব ও ইহুদী পুরাণের সমক্ষেত্রে পদসঞ্চার যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ঈশা-মূসা ঈশ্বরের বার্তাবহ পয়গম্বর বলে ইসলামে স্বীকৃত। ইসলামের সূফী মতবাদ এবং খ্রীস্টধর্মে রহস্যবাদ যথাক্রমে খলিফাদের ও খ্রীষ্টধর্ম যাজকদের অবাঞ্ছিত অশাস্ত্রীয়-ঐহিকতার প্রতিবাদেই জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়েই কৃষ্ণবর্ণের প্রতি প্রবণতার কারণ কি? আমাদের একটি নিগূঢ় কারণের কথা মনে জাগে। এক একটি রং এক একটি ভাবের দ্যোতনা করে, একথা পূর্বে বলে এসেছি। রহস্যবাদীরা রহস্যসাধনার অনুকূল রং নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। কালো একপ্রকার যবনিকা (Screen)। এই যবনিকার অন্তরালে থাকে আলো। আল্লাহ্ অল্ নূর বা পরম জ্যোতি। আবরণ উন্মোচনের জন্য এ দের গুরুরও প্রয়োজন হয়। উপনিষদে আদিত্যবর্ণকে তমস্ বা অন্ধকারের অন্তরালে ভাবা হয়েছে। সেই জ্যোতি কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়। তখনকার কথা হয়—'জানামি দেবং পুরুষং পুরাণম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'। খ্রীষ্টধর্মে এই আলোর উপলব্ধি তিনটি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে আসতো। St Paul—সে আলো সহজে দেখতেন। 'Trinity' বা ত্রয়ীর উপলব্ধিতে ত্রিমূর্তির তত্ত্ব আছে—The Father, The Son, The Holy Ghost,—পিতৃত্ব, পুত্রত্ব এবং দিব্যশক্তি—যাকে বলা চলে কারণ, কার্য ও সংযোজনশক্তি। এই তিন ভিন্ন হয়েও এক। এই প্রসঙ্গে অনুভববেদ্য করতে হবে The Original Sin। তারপর, ধ্যানগম্য করতে হবে—

আবির্ভাবতত্ত্ব বা Incarnation। এসব রহস্য কালো যবনিকায় আবৃত থেকে শুধু ভাগ্যবানের কাছে ধরা দেয়।

একমূর্তিস্ত্রয়োভাগা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ—এই হচ্ছে ভারতীয় পুরাণের রহস্যবাদ যা' ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বররূপ ত্রিশক্তির ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে নিহিত আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরের অনন্তলীলার মধ্যে মানবলীলাকেই সর্বোত্তম বলে গ্রহণ করেছেন। এই মানবলীলা অদ্বৈতের দ্বৈতাদ্বৈত পথে এসে শেষ হয়েছে। এই উপলব্ধিটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রহস্যকথা। মহাপ্রভু স্বয়ং এর প্রমূর্ত প্রমাণ। কৃষ্ণরাধা শক্তিমান ও শক্তির অভিন্ন বিগ্রহ—কিন্তু একদা পূর্ণেরই এক অপূর্ণ কামনায় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। আবার এক অতৃপ্তবাসনায় সেই দুয়ের এক হয়ে যাওয়াই গৌড়ীয় সম্প্রদায়-স্বীকৃত চৈতন্যতত্ত্ব। এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ না করে দুটি শ্লোকের উদ্ধৃতিমাত্র দেবো।

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাব দ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্॥"

এবং "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

কৃষ্ণ কালো, তার মধ্যে মাধুর্যের আলো। শ্রীমতী রাধার অঙ্গবাস কালো অন্তরে মহাভাবের আলো। এই কালো-আলোর ধূপছায়ায় বিশ্বের রহস্য সাধনা আত্মগোপন করে আছে।

এই কালোর আলো পার্থিব ঐশ্বর্যে প্রমত্তগণ বুঝতে পারতো না। এটাকে একটা ভেকমাত্র মনে করে তারা উপহাস করেছে। একান্ত বৈধীভক্তির উপাসক উলেমারা সূফীদের কালো পোশাক বরদাস্ত করতে পারতো না। অনেকে আবার এই জাতীয় বিধর্মী খ্রীষ্টানী পোশাক দেখে ঘৃণায় এবং ক্রোধে ফেটে পড়তো। একটি ছোট্ট কাহিনী বলি। যখন মহম্মদ বিন সলম্ (৭৮৪ খ্রীঃ) বসরায় এলেন, তখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন

সূফী ফকরদ্ অল্ সন্জী। তাঁর পরিধানে ছিল কালো বসন। সলম্ হুকুম করলেন—'জীয়া অল্ রুহবাঁ', ছেড়ে ফেলো এই খ্রীষ্টানী বেশ, এই কালো আবরণ।

আবুল হসন্ লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন (১০৭০ খ্রীঃ)। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভালো একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী মধ্যেই এই সূফী ধর্ম তার সমগ্র রহস্য কথা নিয়ে মধ্য এসিয়া থেকে যাত্রা করে উত্তর আফ্রিকায় বলাহিত হ'য়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। মধ্যযুগ থেকে হিন্দু সাধু-সন্তদের মতে এবং সূফীদের মতে ক্রমশ মিতালি বেঁধে উঠেছিল। পোশাকেও ভারতের গৈরিকবসন সূফী ফকিরের বহির্বাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছিল। কালো ও গৈরিকের এই অগোচরে মিলন শুধু কৌতূহল ও কৌতুকাবহ নয়—অনুসন্ধিৎসুর অনুসন্ধানের বিষয়। হসন্ জুল্লাবীর চতুর্থ গ্রন্থ 'কিতাব-অল-বয়ান লহ্লিল অয়ান্', সৎসঙ্গ এবং সদালাপ বিষয়ক। 'ত্যজ দুর্জন সংসর্গং ভজ সাধু সমাগমম্' চির প্রচলিত কথা। পঞ্চম গ্রন্থ 'বহর-উল-কল্‌ব্' হৃদয় রূপ মহা সমুদ্রের কথা। অনন্ত সমুদ্রে লহরী লীলার বিরাম নেই, মানুষের হৃদয় তরঙ্গেরও শেষ নেই। এখানে ডুব দেওয়াই আসল কথা। কিন্তু মানুষ কি অত সহজে তা পারে? বাউলের গানে আছে—'ডুবতে কিরে সবাই পারে? রূপসাগরের তরঙ্গেতে যায় রে ভেসে।' তাঁর ষষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে—'অল রীয়াত্ লহক-উল-এ-আল্লাহ্'—অর্থ শ্বাসযন্ত্রটিকে আল্লায় বেঁধে দেওয়া। পরবর্তী যুগে বাউল গেয়েছেন—'দমে দমে লইও নাম'। তাঁরই জন্য তো সকল সাধ্য সাধন তত্ত্ব। তিনি অলসলাম্—সকল মঙ্গলমঙ্গল্য, অল্ আজিজ, সর্বশক্তিমান্ এবং অল আলিম্, সর্বজ্ঞানের বিধান। তিনিই আবার সর্বপ্রেমের অনন্ত সমুদ্র, অল রাদুদ্। তাঁর সপ্তম গ্রন্থের নাম 'কাশ্‌ফ্-উল-মহজুব'। এই রহস্য উন্মোচন নামক গ্রন্থখানার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। তত্ত্ব সমুদ্রের এই সপ্ততীর্থ সাধক সূফী হুজ্‌বীরী, জুল্লাবী, লাহোরী আবুলহসন্ মজবুত ক'রে বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন।

শেষ গ্রন্থখানা পঁচিশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হ'য়েছে। অধ্যায়গুলির পরিচয় দিলেই গ্রন্থপরিচয় সম্পূর্ণ হবে। (১) প্রথম অধ্যায়—"ইল্‌ম্" বা তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানের পথে পা দিয়েই সাধক বুঝবে, পার্থিব ঐশ্বর্য

থেকে মুক্ত হতে হবে, এই সত্য। (২) দ্বিতীয় অধ্যায় 'ফক্‌র্‌' বা দারিদ্র্য। (৩) তৃতীয় অধ্যায়ে সূফীতত্ত্বের স্বরূপ ব'লেই তিনি (৪) চতুর্থ অধ্যায় 'খিরক্‌' বা বসনতত্ত্বে এলেন। (৫) পঞ্চমে এসে বললেন —বহির্বাসের প্রয়োজন থাকলেও অন্তঃশুদ্ধির প্রয়োজন তার চাইতে বেশি। এই অংশের নাম স্বফৎ বা পবিত্রতা। তারপর (৬-১৪) ষষ্ঠ থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ের মধ্যে আবুল হসন্ সুদীর্ঘ অবকাশে 'ইমাম' বা ধর্মগুরুদের কাহিনী বলে নিয়েছেন। (১৫) পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন 'মরীফৎ' বা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। (১৬) ষোড়শ অধ্যায়ে আত্মোৎসর্গ বা ফনার কথা আছে। (১৭) সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা, যার নাম 'ইমান্'। (১৮) অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে অবশ্যপালনীয় কতকগুলি শৌচাচারের কথা আছে। (১৯) ঊনবিংশ অধ্যায়ে প্রার্থনার আশ্চর্যশক্তির কথায় পরিপূর্ণ। এর নাম 'স্বল্‌বাত্'। (২০) বিংশ অধ্যায়ে 'জাকাত্' বা দান-মাহাত্ম্য। (২১) একবিংশ অধ্যায়ে সর্ববিষয়ে সংযমের কথা। এই অংশের নাম স্বৌম—আহার বিহার, বাক্, সর্ববিষয়ে স্বৌম। খামোশী বা বাক্‌সংযমও এই পরিচ্ছেদের বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়। (২২) দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আছে তীর্থপরিক্রমার কথা—বিশেষ করে 'হজ'। (২৩) ত্রয়োবিংশ খণ্ডে আছে 'স্বহবৎ' বা অনুশীলন তত্ত্ব। (২৪) চতুর্বিংশখণ্ডে তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। (ক) মকাম বা বাস্তু, (খ) হাল বা অবস্থা এবং (গ) তম্‌কিন্ বা যোগতত্ত্ব। (২৫) পঞ্চবিংশতিতম বা শেষ পরিচ্ছেদে আছে—সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ভাবাবেশে নৃত্যের কথা। এর নাম সূফীরা দিয়েছেন—'সমা'।

এইসব আলোচনার মধ্য দিয়েই বুঝে নিতে পারি কেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় এবং সূফী সাধনায় বিজাতীয় বৈরভাবের অভাব ঘটেছিল। 'খিরকধারী একনিষ্ঠ সাধক হরিদাস বাইশ বাজারে বেত্রাহত হয়েও ইমান পরিত্যাগ করলেন না। কেন এই যবন হরিদাস মহাপ্রভুর এত প্রিয় ছিলেন, পুরীর সমুদ্রতীরে তাঁর সমাধিতে কেন তিনি নিজহাতে মাটি তুলে দিয়েছিলেন। সূফীর প্রেম সাধনা সর্বধর্মের মিলন সেতু গড়ে দিতে পারে। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, অদ্বৈতাচার্য বরেণ্য ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তাঁর পিতৃদেবের শ্রাদ্ধাগ্রভাগ এই যবন হরিদাসের

হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শ্রাদ্ধাগ্রভাগ প্রিয়তম এবং পূজনীয়ের হাতে তুলে দিতে হয়। মন্ত্রটি হচ্ছে "ইদমন্নং ক দেয়ম্?" উত্তর হবে "ইষ্টায় দীয়তাম্"। যবন হরিদাস ছিলেন গোস্বামী প্রভুর এমনই প্রিয়পাত্র।

নাসির খুসরো

নাসির খুসরো প্রথম জীবনে সুলতান মহমুদের রাজসভার ঐশ্বর্য দেখেছিলেন। তৎপুত্র মস্'উদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছিল <<সফরনাম>>। মস্'উদ্ ১০৪৪ সালে তুগরীল বেগের হাতে পরাজিত হন। সুতরাং নাসির একাদশের মধ্যভাগে কবিপ্রসিদ্ধি অর্জন ক'রেছেন, এ কথা বলা যেতে পারে। এই কবির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় ছিল—হকীম নাসির খুসরো বিন্ হারিস কবাদিয়ানী। কবাদিয়ন ছিল বল্খের নিকটবর্তী। এরই কাছে সেলজুক রাজধানী খোরাসান। কেউ কেউ কবিকে খোরাসানীও বলতো। নাসির ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক এবং পরিব্রাজক। সেকালে প্রব্রজ্যা ছিল জ্ঞান আহরণের অপরিহার্য অঙ্গ। জ্ঞানী ব'লে পরিচিত হ'তে হ'লে এই সোপান উত্তীর্ণ হ'তেই হবে। কবির দীর্ঘ সাত বছরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে তাঁর 'সফর-নামা' নামক গ্রন্থে। সহজ সরল গদ্যে লিখিত এই গ্রন্থখানা বড় সুখপাঠ্য। তাঁর এই ভ্রমণ-বৃত্তকে এই কয়টি দেশে সীমাবদ্ধ করা চলে—পূবের দিকে তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, হিন্দোস্তান; পশ্চিমে এসিয়া মাইনর নামক রূমী দুনিয়া, পবিত্রভূমি মক্কার সঙ্গে সমগ্র আরব; তারপর বাঁয়ে হেলে মিসর দেশ।

পূর্বের ধর্মবিশ্বাসে সুন্নী মুসলিম নাসির খুসরোর মিসর ভ্রমণই কাল হ'লো। জাতিতে পার্সী কবিকে মিসর যেন কোন জাদুমন্ত্রে আকর্ষণ ক'রে নিলো। তিনি ইসমা'ইলী খলিফা* অল মুস্তনসির বি'ল্লাহ্'র

* ইসমা'ইলী খিলাফত সপ্তম ইমাম ইসমা'ঈলের নামাঙ্কিত। এই সম্প্রদায় তা'লিমী বা ফাতিমী নামেও পরিচিত। এঁরা শিয়া।

যশোগানে মেতে ওঠেন। তাঁর রাজসভার বর্ণনা, সেনাবাহিনীর বর্ণনা, কুশাসনের যশোগাথা শিয়াদের খুশী করলেও সুন্নী সেলজুক সম্রাটের রোষবহ্নি প্রজ্বলিত ক'রে দেয়। দেশে কবি ফিরলেন বটে, কিন্তু জীবন বিপন্ন বুঝে ছদ্মবেশে তিনি দ্বিতীয়বার ভ্রমণে বহির্গত হন। এবার তাঁর অজ্ঞাতবাস। সেমিনগানের মালভূমিতেই তিনি বিশ বছর কাটিয়ে দেন। অনেকদিন পরে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন।

এই অজ্ঞাতবাস থেকে কবি নাসির খুসরো মৃদুমন্দ প্রবাহিত পশ্চিমী হাওয়াকে (Zephyr) তাঁর খোরাসানী বন্ধু ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের উদ্দেশে দূত ক'রে পাঠিয়েছেন। মনে হয় যেন, রামগিরি-নির্বাসিত যক্ষ মেঘকে দূত ক'রে পাঠা'চ্ছে অলকায়, তার প্রিয়ার রাজ্যে। 'বাতাস! তুমি যাও, সোজা পূবদিকে যাও; আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন ক'রো খোরাসানী পণ্ডিতদের; তাঁরা আমার প্রাণের বন্ধু—'দিলী ইয়ারান্'। কায়দাগুলিও যেন ঠিক মেঘদূতের কবি কালিদাসের অভ্যস্তকৌশল 'হে আমার অপ্রতিহত সখা, পূর্বমুখী বাতাস! তুমি আমার কুশলবার্তা এবং অভিনন্দনের বাণী জানিয়েই কিন্তু আবার দ্রুত পশ্চিমে চলে এসো। খবর ঠিকভাবে পৌঁছলো কিনা, তাতো আমার জানতে ইচ্ছা হয়,—তাই বলছি দ্রুত চলে এসো। চিত্তটা তো আমার স্থির করতে হবে।'

মেঘদূতে বিরহী যক্ষ উত্তরমুখী মেঘকে খবর পৌঁছে দিয়েই দ্রুত দক্ষিণদিকে চ'লে আসতে বলেছিল—

'সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্ বচোভির্মমাপি।
প্রাতঃ কুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ॥'

ওগো দূত মেঘ! আমার এই প্রাণ প্রভাতে ফুটে ওঠা কুন্দফুলের মত শিথিল। এই বুঝি বৃন্তচ্যুত হ'য়ে যায়। তুমি এই কথাটি মনে রেখে অলকা থেকে দ্রুত ফিরে এসে, আমার প্রিয়ার কুশলবার্তা জানিয়ে, আমাকে জীবনের এই শিথিল বৃন্তে ধরে রেখে যেও। তবে তো বাকী চারটি মাস কোন গতিকে বেঁচে থাকতে পারবো!

নিজবাসচ্যুত প্রবাসী কবি বলছেন, 'তুমি খোরাসানী বন্ধুদের কানে কানে ব'লো—তুর্কী শাসনের উদ্ধত অহঙ্কার আর কয়দিন? বিশ্বত্রাস কাবুলী সুলতান মহমু'দই তো চলে গেলেন, আর এই সেলজুক তুর্কী!

সব যায়, সবই যাবে। এটাই তো এই নশ্বর দুনিয়ার অবিনশ্বর সত্য। আমার কোন দুঃখই নেই; কারণ আমি আত্মাকে আবিষ্কার করে ফেলেছি। আমার ভাগ্যের চেয়ে, আমার আত্মা বড়। ভাগ্য পরিবর্তিত হয়, অনন্তের অংশ এই আত্মা অপরিবর্তনীয় এবং অবিধ্বংসী।

কবির শেষ জীবন কাটে বদখ্‌শানের নিকটবর্তী য়ম্‌গানে। এই পণ্ডিত, কবি ও দার্শনিক জ্ঞানের নিকষ পাষাণ খোরাসানী ব'লে আজিও পরিচিত। পার্সী ভাষায় বলা হয় হুজ্জতুল্‌-ই-খোরাসান। ১০০৩-১০৮৮ এই ছিয়াশী বছর তিনি জীবিত ছিলেন। সে যুগের লোক ঠিক বুঝতে পেরেছিল ইসলাম-শাস্ত্রে জাহিরী বা সনাতনী পণ্ডিত বাত্বিনী বা মরমী হ'তে গিয়েই তাঁর জীবনে দুর্বিপাক টেনে এনেছিলেন। —কিন্তু কবির বিশ্বাসের রাজ্যে কোন সুবিধাবাদের গোঁজামিল ছিল না। কবি সর্বদা নির্ভীক, স্পষ্টবাদী এবং যুক্তিনির্ভর। ব্যক্তপরিচয় এবং ছদ্মপরিচয়—এই দ্বিবিধ ভ্রমণের বৃত্তান্তে ভরা নাসির খুসরোর দুটি গ্রন্থের এইবার একটু পরিচয় দেই। (১) 'সফর নামা' যার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। (২) দ্বিতীয় গ্রন্থ কিতাব-ই-জাদুল্‌-মুসাফিরীন্‌ (ভ্রাম্যমানের সঞ্চয়ন)। দুটি গ্রন্থেই সেকালের বিশ্বপরিচয় এবং বুদ্ধি ও জ্ঞানের সঞ্চয়ন লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে।—নাসির দেখেছিলেন বাগদাদ, গজনা, হিন্দোস্তান, খোরাসান, মাজন্‌-দরান্‌, আমুদরিয়া, রায়, সিন্ধুদেশ, সীস্তান্‌, এস্‌ফাহান্‌ এবং কাবুলিস্তান্‌। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের কথা তাঁর জানার রাজ্যে ছিল—আদম, ঈভ, নোয়া, শেম, হাম, আব্রাহাম, সারাহ্‌, মোসেস্‌, জোশুআ, দানিয়েল এবং স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট। বাইবেল যে তিনি কি নিবিষ্টভাবে পড়েছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ ধর্মগ্রন্থের রচনারীতি ও বচনভঙ্গিমার অনুসরণে। পার্সী মুত্‌নেরার মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত প্রবাদ ও প্রবচনগুলি ধরা পড়ে। 'Casting pearls before swine, answer a fool according to his folly, thou hast no oil in thy lamp, naked shalt thou depart as thou didst come.'

তিনি জানতেন গ্রীক দার্শনিক সোক্রাতীস, প্লাতো, আরিস্তোত্‌ল ও ইউক্লিদকে। তিনি জানতেন রোম সম্রাট্‌ কনস্তানতাইনকে ইরানী

দিব্যদর্শী জমশীদকে। ফেরেদূন এবং আর্দশীর পুত্র শাপূর সম্বন্ধে তাঁর পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় এবং তাদের মতবাদ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। য়িহুদী ধর্মশাস্ত্র, খ্রীষ্টধর্ম, সমন্বয়বাদী মানিকীয় মতবাদ তিনি ভাল করে জানতেন। তাঁর জ্ঞানের রাজ্যে এসেছিল দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদী হিন্দু দর্শন ও জ্যোতিষ্ক পূজারী-সেবীয় সম্প্রদায়। তারপর তিনি বিচার ক'রে দেখলেন—বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মত, সর্বোপরি তিনি ছিলেন একাধারে জাহিরী বা সনাতন-শাস্ত্রী, অন্যদিকে আবার বাতিনী বা মরমিয়া। এই মরমিয়ার মর্ম বা রহস্যকথাকেই তিনি বাহিরের চাইতে বেশী মূল্যবান্ মনে করতেন। অনুষ্ঠান গৌণ, অন্তরের অনুভবই মুখ্য।

এই বাতিনী নাসিরের সঙ্গে তাঁর জনৈক পর্যটক বন্ধুর তীর্থ পরিক্রমা বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বন্ধু মক্কাশরীফ পরিক্রমা করে এসেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন—বল, সেই পবিত্র মন্দিরকে তুমি কিভাবে সম্মানিত করেছিলে? তুমি কেমন করে অনুষ্ঠানের পোশাক 'ইহ্‌রাম' ধারণ করেছিলে? তুমি কি সেই পোশাকে আল্লার কাছে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলে 'আমি হাজির, আমাকে আদেশ কর'—এই তহ্‌রিম অনুষ্ঠান কিভাবে সেরেছিলে? তুমি কি হৃদয় দিয়ে বলতে পেরেছিলে—'আমার জীবনে, হে প্রভু! তোমাকে ভুলে যাওয়ার অনেক 'হারাম' পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে। আল্লাহ্ তুমি আমায় সব হালাল করে দাও। বন্ধু শুষ্ক মুখে বলেছিলেন 'অত তো কিছু বুঝিনি। নাসির বললেন—বল! কবুল কর—তুমি কি বলতে পেরেছিলে—আল্লাহ্—এই আমি প্রস্তুত আছি, তুমি আদেশ কর। 'লব্বিক্।' তুমি কি আরাফত্ পর্বতে উঠে আ'রিফ হ'য়ে ম'রিফৎ' কিছু পেয়েছিলে? উত্তর হ'লো অত কিছু বুঝিনি। নাসির বললেন তীর্থযাত্রা তোমার নিষ্ফল হ'য়েছে বন্ধু! তুমি নিজেকে শুদ্ধ ক'রে নিয়ে আত্মোৎসর্গ করতে পারনি, তুমি শুধু রুপো খরচ ক'রে বালুর উপর হেঁটে এসেছো। এতেই বোঝা যায় নাসির খুসরো জাহিরী নন বাতিনী—মার্মিক। চণ্ডীদাসের এক রাগাত্মিক পদ মনে পড়ে গেল।

'মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সই তাদের কথায় বাহিরে রহুন তারা।'

ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাড়া এই কবির অন্য তিনখানা গ্রন্থও স্মরণযোগ্য : (১) রৌশন-ই-নাম বা আলোর কেতাব এবং (২) স'আদত্ নামা— আনন্দ মহোৎসব (৩) তাঁর দীবান বা কাব্যসঙ্কলন। এইবার দীবান থেকে কবির সূক্তিরত্নগুলি তুলে ধরব।

জগতের অনন্ত পরিবর্তনশীল বস্তুপরম্পরা আল্লার ছায়া কিন্তু তাঁর স্বরূপ নয়, মায়ার খেলা। ওরই মধ্য দিয়ে তাঁর স্বরূপ আবিষ্কার করবে তত্ত্বজ্ঞান বা ম'রিফতের সাহায্যে। মানুষের জীবন দেখ। 'তন্ বজান্ জিন্দ্ অস্ত্ রো জান্ ব-ইল্ম্। দেহটা প্রাণের দিকে গিয়ে জীবন পায়। আর জীবন বাঁচে জ্ঞান নিয়ে।

দানিশ্ অন্দর্ কান্-ই-জানত্ গরহর অস্ত্।
ইলম্ জান্-ই-জান ই-তূস্ত্ অয় হোশিয়ার্।
গর্ বীজয়ী জান্-ই-জান্ রা দর্-খূরস্ত্।

জ্ঞান হ'লো ভেতরের প্রাণ-খনির মূল্যবান্ রত্ন। সেই প্রাণের প্রাণ-জ্ঞান সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকবে। যদি সেই প্রাণের প্রাণকে অনুসন্ধান কর, তবে সেটাই দর খূর্ বা উপযুক্ত কাজ হবে।

তা ইল্ম্ নয়ামূজী, ন তবান্ করদ্।
বে সীম্ নয়ায়িদ্ দিরম্ রো বেজর্ দীনার্॥

সেই জ্ঞান যদি আয়ত্ত না কর (না শিখ) তবে কিছু করতে পারবে না। মনে রেখো রূপো ছাড়া দিহ্রাম গড়া যায় না, এবং সোনা ছাড়া দীনার হয় না। জ্ঞানই সকল কিছুর উপাদান। নাসির খুসরো এমনই ছিলেন জ্ঞান-তাপস। চঞ্চলের মধ্যে অচঞ্চলের ছায়া দেখবে জ্ঞান দিয়ে। তখন বুঝবে সবকিছুই অণু এবং অণু বিভুরই অংশ। কাল ও মহাকাশ অনাদি ও অনন্ত। মহাকাল অবিধ্বংসী, কালও তাই। তথাপি এই জগৎ কিন্তু চিরন্তন নয়। ইচ্ছাশক্তিই সৃষ্টি করে এবং ধ্বংস করে। সৃষ্টি-সংহার একটা কিছু ফল প্রসব করে। ঈশ্বর জননী সৃষ্টি ক'রে বুকে তার স্তন্য দিয়েছেন। দেহযন্ত্র তাঁরই ইচ্ছায় ক্রিয়াশীল; কিন্তু শিশুর ইচ্ছাশক্তিই ক্ষীরধারা আকর্ষণ ক'রে নেয়। দিল তোমার কেতাব,

তোমার ক্রিয়াকলাপ তার লিপি। তুমি হৃদয় গ্রন্থকে অশুচি লিপিতে পূর্ণ ক'রো না। সদাচারের পবিত্র লিপিতে পূর্ণ কর সেই মহাগ্রন্থকে। তোমার হাতসহ কর্মেন্দ্রিয়সমূহ তোমার কেউ নয়।

ডুবুরি তুমি আপন অন্তরে ডুব দাও। সেই তো রত্নাকর। রত্ন জলে ভাসে না, জলের তলে থাকে। তীরের মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে থেকো না। একেবারে ডুবে যাও। রত্নকে নাও, তীরকে উপেক্ষা কর।

বাহিরের খেলা ফুরিয়ে যায়। দারিয়ুস, সিকন্দর—তাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য কোথায় গেল? এমন যে দুর্ধর্ষ সুলতান মহমুদ্ তিনি তো কিছু রেখে যেতে পারলেন না? সবই কালের বক্ষে ক্ষণস্থায়ী বুদ্-বুদ্। সবই যায়, সবই যাবে; সত্য চিরন্তন—সেই সত্য খোঁজ। জ্ঞানই তোমার চক্ষু।

অনসারী

পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে সেলজুক যুগের প্রথম ভাগের সূফী সাধক আবিল খয়েরের জীবনী এবং দিব্যদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই সূফী সাধকের সমকালীন ছিলেন শেখ আবূ ইসমাইল আবদুল্লাহ্ অনসারী। ইনি জন্মগ্রহণ করেন আফগানীস্তানের হেরাতে। তাঁর জীবনকাল—১০০৬ থেকে ১০৮৮। আরবী ভাষায় 'নিসবত্' মানে কুলজী। এই কুলজী বা বংশতালিকা অনুসারে অনসারী—স্বয়ং পয়গম্বরের সহচর আবু আয়ুবের রক্তধারার সন্তান। অল্প বয়সেই সূফী ধর্মে দীক্ষিত হ'য়ে তিনি সূফী তত্ত্বসম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা করেন। পার্সী এবং আরবী—উভয় ভাষাই তাঁর আলোচনার বাহন হয়েছিল। তিনি উভয় ভাষাতেই ছিলেন সমান দক্ষ। আরবী এবং পার্সী ভাষা শুধু নয়, তাঁর নৈপুণ্য ছিল আর এক দিকে। এই হেরাতী কবি তাঁর মাতৃভাষা হেরাতী উপ-ভাষাকেও সমাদৃত করেছেন। সে যুগে এটা খুব স্বাভাবিক ছিল না। 'আরবী' ধর্মের ভাষা, পার্সী 'রাজভাষা'। এই দুটিকে প্রদক্ষিণ করে কোন উপভাষার অবতরণ সাহিত্য সমাজে যুগপদ্ ভীতি ও সমস্যার

বিষয় ছিল। অনসারী সেই অসাধ্য সাধন করতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি গণ্য আরবী এবং পণ্য পার্সীর বাজার উত্তীর্ণ হ'য়ে একেবারে গ্রামে পথে নেমে এসেছিলেন। হেরাতী কবির এই আঞ্চলিক ভাষার সেবা পার্সী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। অবশ্য স্মরণযোগ্য বাবা তাহির হামাদনী ইতিপূর্বে এই দেশজ ভাষায় সাহিত্য সেবার পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন।

এই হেরাতী কবি অনসারী বহু গ্রন্থ রচনা ক'রে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে বিষয়বাহুল্য নেই। ধর্ম, ধার্মিকের জীবনী, প্রকৃত জ্ঞান, সূফীতত্ত্ব এবং সর্বশেষ তাঁর অমূল্য উপদেশ—এই নিয়ে তাঁর গ্রন্থাবলী।

একএকটি করে এই গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেই—

(ক) মনাজ়িলুস্ সা'ইরীন্—তীর্থযাত্রীর ক্রমোন্নতি-সোপান।

(খ) অন্‌ৱারুত্ তহ্‌কিক—প্রত্যভিজ্ঞার আলোক।

(গ) ইলাহীনামা ও মহব্বত্‌নামা—ভাগবত ও প্রেমগ্রন্থ।

(ঘ) জ়াদুল অরিফীন্—জ্ঞানমার্গের উপাদান।

(ঙ) কিতাব-ই-অসরার—রহস্যগ্রন্থ।

এছাড়া অনসারীর 'নসীহত্' বা উপদেশ (নিজ়াম-উল্-মুলককে উপহার) এবং মোনাজাত্ বা প্রার্থনাগুলি সর্বসাধারণে প্রসিদ্ধি অর্জন ক'রেছিল। এই কবি সুল্লামীর তরকাত্-ই-সূফীয়া বা সূফীদের জীবনী সংগ্রহকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবর্ধিত ক'রে দিয়েছিলেন।

কোরান শরীফের অন্তর্গত যুসুফ ও জুলেখার কাহিনী নিয়ে তিনি রচনা ক'রেছিলেন—"অনীসু'ল মুরীঅঈ'ন্ বো-শমসু'ল মজালিস্"—শিষ্য-সঙ্গ এবং সূর্য-সভা।

এই পীর-ই-অনসারের সাহিত্যসাধনায় আর একটি বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হ'য়ে আছে তাঁর পদ্য-গদ্য মিশ্রিত রীতি এবং ছন্দিত গদ্য রচনার মধ্যে। এই সব রচনা প্রায়শই নীতিগর্ভ হ'য়েও মধ্যে মধ্যে রহস্যগূঢ় হ'য়ে উঠেছে। তাললয় সমন্বিত তাঁর সুষম গদ্য রচনা বাইবেলের ছন্দিত গদ্যের মত উপাদেয় মনে হয়। এই ছন্দ-সুষম গদ্যগাথার নিদর্শন তাঁর মোনাজাত্। শুধু এই বিশিষ্ট রীতি নয়, সরস গদ্যকথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ পদ্যে পদক্ষেপ করেন। এই বিশিষ্ট রীতি পরবর্তী যুগে

শেখ স'দী তাঁর গুলিস্তানে অবলম্বন করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই রীতি আছে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ তার নমুনা। এই জাতীয় রচনাকে 'চম্পূ' বলা হয়।

"গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে"। খানিকটা তত্ত্বরস খানিকটা নীতিগর্ভ উপদেশ দিতে দিতে পীর-ই-অনসার মিত্রাক্ষর পয়ার অথবা রুবাই অথবা গজল গীতিতে নেমে আসেন।

অনসারীর নসীহত্ বা উপদেশাত্মক গ্রন্থের নাম 'রিসালহ্-ই-মকূলাত্'। এই পুস্তকখানা যেন উপদেশের রত্ন ভাণ্ডার। মনোরাজ্যের সমগ্র অলি-গলির সন্ধান না পেলে কেউ এমন পথের নির্দেশ দিতে পারে না। অনসারীর কথাগুলি পরীক্ষিত সত্য ব'লে সর্বদা গৃহীত হ'তে পারে। তাঁর উপদেশ সর্ব যুগের সকল মানুষের জীবনবেদ।

"মানুষের উপযুক্ততা আসে অভ্যাস থেকে। অনুশীলন সর্ববিদ্যার সহজ পথ। সদ্বস্তুর অনুশীলন সমুন্নতির পথ উন্মুক্ত ক'রে দেয়। খা মোশী বা বাক্—সংযম কর্মের সফলতা সাধন করে। মন্ত্রগুপ্তি শুধু রাজনীতি নয়, সকল নীতিতে উপাস্য হওয়া উচিত। ঈশ্বর সর্বদ্রষ্টা—সব দেখছেন, কিন্তু কিছু বলছেন না। বাগাড়ম্বর এবং অসময়ে রহস্যভেদ সর্ব কর্ম পণ্ড করে দেয়। ভালোবাসার পাত্র পাত্রীকে গৃহ থেকে বিতাড়িত করা সহজ কিন্তু মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। শূন্যগৃহ তখন শূন্যতর মনে হয়। তোমার জীবনটা এমনভাবে যাপন কর যেন সকলের প্রশংসা অর্জন করতে পার। প্রশংসা-ধন্য জীবনই জীবন। এরই মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে। এতে তিন তরফা লাভ। প্রথম প্রশংসা অর্জন, দ্বিতীয় শ্লাঘ্য জীবন যাপনের আনন্দলাভ, তৃতীয় খোদার প্রীতি অর্জন। মাছিদের স্বভাব দেখ, ওরা বায়ুর উল্টো দিকে কানা হ'য়ে ছুটে চলেছে, সহজাত প্রবৃত্তি বশে; তাদের টানছে হয় খুশবু না হয় বদবু। বিচার নেই কামনার পেছনে ছোটাই তাদের স্বভাব, আত্মকর্তৃত্ব নেই। জঞ্জাল-গুলি স্রোতের অনুকূলে ছুটছে, জলপ্রবাহ যে দিকে ঠেলে নেয় সেই দিকে যায়—ওদেরও আত্মকর্তৃত্ব নেই, কিন্তু তুমি মানুষ—তোমার চরিত্রে দৃঢ়তা থাকা উচিত। তুমি বিচার ক'রে চলবে। অন্ধ কামনা এবং জবর-দস্তির কাছে বৈতসী বৃত্তি উভয়ই পরিত্যাগ করবে। তোমার চরিত্রের

পরিচয় দাও। তুমি একটা কিছু হ'য়ে ওঠ।" অনসারীর কথা বড় সুন্দর। মানুষের জীবনে একটা কিছু হয়ে ওঠায় (becoming) নামই চরিত্র (character)। অনসারীর ভাষায় বলি—

'অগর বর হওয়া পরী মগ্‌সী বাশী, অগর বর,
রু-এ-আব বরী খসী বাশী, দিল বদস্ত্ আর কসী বাশী।

<<মগ্‌সী স° মক্ষিকা>মক্ষী ; খস্=তুচ্ছবস্তু, কস্—মানুষ কসী-মানুষের মত মানুষ> ..আর=আন>>। অনসারীর একটি রুবাই বলছে—

"Great shame it is to deem of high degree
Thyself, or over others reckon thee:
Strive to be like the pupil of thine eye—
To see all else, but not thyself to see."

—Browne

শুধু আত্মগরিমা ক'রো না, তোমার চোখের তারার মত হ'য়ো, পরকে দেখ, নিজেকে নয়।

অনসারী সূফী ছিলেন ; চিরাচরিত সংস্কারকে উর্ধে স্থান দিতেন না। তিনি শাস্ত্রের মর্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করতেন এবং খোলসটা তুচ্ছ করতেন। 'তুহারত্' বা বাহ্য বিশুদ্ধতার উপরে তিনি দেখতেন স্বফরৎ বা আভ্যন্তর শুচিতা। হজ ক'রে হাজার বার কাবা প্রদক্ষিণ ক'রেও কোন ফল হয় না, যদি তুমি অন্তরে পবিত্র হ'য়ে আল্লার অনুভূতিতে ডুবে না যেতে পার। হৃদয়েই সবকিছু পাবে। বাইরে খুঁজতে হবে না। বাইরেরটা অর্থহীন নয়, কিন্তু ভাবতে শেখ অন্তরের বস্তুটাই আসল—বাইরে তার প্রতিরূপ মাত্র। অনসারীর নিজের কথায় শুনুন—

দর রাহ্-ই-খোদা দূ ক'বহ্ আমদ্ হাস্‌িল্।
য়েক্ ক'বহ্-ই-সূরত্ অস্ত্ য়েক্ ক'বহ্-ই-দিল্॥
তা বে তবানী জিয়ারত্-ই-দিলহা কুন্।
কাফ্‌জুন জ হজাব কবহ্ আমদ্ য়েক্ দিল্॥

বাহিরটা অন্তরের প্রতিচ্ছবি বা সূরত্। তবানী বা আলস্য ছেড়ে হৃদয়-কাবার প্রদক্ষিণ কর। হৃদয়-কাবার কাছে বাইরের হাজার কাবা' যথেষ্ট খাটো হ'য়ে যাবে।

একটি প্রার্থনার পরিচয় দেই। অনসারীর মোনাজাতে দেখি, দেখি তার নেই, আত্মশোধন এবং আত্মশক্তি লাভের জন্য তাঁর নিরন্ত প্রার্থনা। আল্লাহ্ 'জ়্'ল জলাল বা'ল ইকরাম্'—তিনি বিশ্বপতি এবং তাঁর বদান্যতার সীমা নেই। আল্লার কাছে তাঁর প্রার্থনা—হে ঈশ্বর! তুমি তোমার আবদুল্লাহ্‌কে তিনটি সঙ্কট থেকে সর্বদা রক্ষা ক'রো। মানুষের মধ্যে শয়তান বাস করে—আমি যেন সেই শয়তানী প্রলোভন থেকে মুক্ত হই। মানুষের মধ্যে যে চঞ্চল মনোভাবগুলি আছে—যা দেহকে কেন্দ্র ক'রে সর্বদা ঘোরে—তার থেকে সেই দেহঘাত থেকে আমাকে রক্ষা ক'রো। আর রক্ষা করবে আমাকে মূঢ় অহঙ্কার থেকে। অনসারীর ভাষায়— "আবদুল্লাহ্ রা অজ় সেহ্ আফত্ নিগাহ্ দার, অজ় রন্ রস্-ই-শয়তানী, অজ় হবা হিস্-ই-জিস্মানী ·বো অজ় গুরুর-ই-নাদানী"। এর সারমর্ম আত্মশক্তির প্রার্থনা। "বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে যেন করিতে পারি জয়।"

সুফীদের মত তিনি পরমাত্মার অংশরূপে নিজেকে দেখেছেন Browne-এর অনুবাদের ভাষায় বলি—

'I need no wine, nor cup : I am drunk with thee ;
Thy Quarry I, from other snares set free :
In Ka'ba and Pagoda Thee I seek :
Kaba, Pagoda, what are these to me ?'

তিনিই মূল। আবদুল্লা সেই খনি থেকে তোলা এক মণি। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত। মসজিদ্ মন্দির খুঁজতে হয় না তাঁর। উপলব্ধিতে তিনি আর সেই 'আল হক্' এক হ'য়ে যান।

হে ঈশ্বর! ক্ষণে ক্ষণে তোমার প্রেমে আমি এক হ'য়ে যাই, আবার আমার ব্যক্তি চেতনা ফিরে আসে। তোমার ইয়াদ্ আবার ফিরে আসে, আমি আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আবারও যেন আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ফিরে আসে। এই অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের টানা প'ড়েনে হে আমার হৃদয় বল্লভ, তুমি আমার হাত ধর।

'দর ইশক্-ই-তু গহ্ পস্ত্ বো গহী মস্ত্ শবম্।
বো জ় ইয়াদ্-ই-তু গহ্ নীস্ত্, বো গহী হস্ত্ শবম্।

দর পস্তী ও মস্তী অর ন গীরী দস্তম্।
য়েক্ বারগী অয় নিগার অজ দস্ত্ শবম্॥"

পাতঞ্জল যোগদর্শনে এটা বিক্ষিপ্ত চিত্তের অবস্থা। চিত্ত স্থৈর্য ও চাঞ্চল্যে ক্রমাগত ঘুরে মরে। একাগ্রতা আসে না, বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধি সর্বকালীন হয় না। অনসারী এই বিক্ষিপ্ত চিত্তে ভুগে ভুগে—আল্লার হস্তধারণ করতে চাইছেন। তুমি না ধরলে আমি যে এক বারগী—একেবারেই হস্তচ্যুত হ'য়ে যাব!

অনৱারী

সেলজুক সম্রাট্ মালেকশাহের পুত্র সনজরের সভাকবি ছিলেন অনৱারী। ইনি খোরাসানের অন্তর্গত খাবরানে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন বলে তাঁর পরিচয় ছিল 'খাবরানী'। দৌলতশাহের বিবরণ অনুসারে বাল্যকালের দুরবস্থায় তিনি অতি কষ্টে তূসের মনসূরীয় কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করতে থাকেন। একদিন জাঁকজমকের বেশভূষায় সজ্জিত-বহুপরিচারক-পরিচারিত কোন অশ্বারোহী কবিকে দেখে তাঁর কবি হওয়ার বাসনা জাগে। শ্রমসাধ্য বিদ্যার্জনে ইস্তফা দিয়ে অর্থার্জনের সুগম পথে পদার্পণ করেন। রাজপ্রশস্তি গাইতে পারলেই কবি বলে সম্মানিত হওয়া যায়। ঐশ্বর্যের দুয়ারও সহজে মুক্ত হয়ে যায়। দুদিকের এই লাভের রাস্তা হাসিল করতে হবে. যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তিনি সনজরের স্তুতিগানে আত্মনিয়োগ করলেন। বস্তুত অনৱারী প্রশস্তি গাথা বা 'কসীদ' (উচ্চারণ কসীদা short আ) রচনায় ছিলেন অদ্বিতীয়। সেকালের মানুষ এই জাতীয় প্রশস্তিকে সুনজরে দেখতো বলেই আন্‌ৱারীকে যে স্থানে তুলে ধরা হ'য়েছিল তা আজকের বিচারে নিতান্তই হাস্যকর। এই কবি সম্বন্ধে সে যুগের বিচার হয়েছিল—

'দর শা'য়ের সেতন্ পয়াগম্বরানন্দ্
করলিস্ত কে জুমলগী বরানন্দ্।
ফেরদৌসী উ অন্‌ৱারী উ সা'দী
হর চন্দ্ কে 'লা নীবয়া বা'দী॥

কবিতার সাম্রাজ্যে তিনটি পয়গম্বর আছেন—যদিও বচন আছে 'লাপয়ং পয়গম্বরো নাস্তি'। মহাকাব্যে আছেন ফেরদৌসী। সা'দী আছেন সম্বোধনাত্মক প্রেম গাথায় (Ode) এবং প্রশস্তি গাথায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অনবারী'। অনবারীর বৃহস্পতি তখন তুঙ্গী ছিল। কবিতার থালায় প্রশস্তি নিয়ে অগ্রসর হ'তেই সনজর তাঁকে বরণ ক'রে নিলেন অনবারীর ভাষায় বলি—

'অনবারী রা খুদায়গান-ই-জহান্
পেশ-ই-খোদ্ খ্বান্দ্ রো দস্ত্দাদ্ রো নিশান্দ্।
বা'দ ফরমুদ্ রৌশে'র খ্বাস্ত অজ উ

জগতের অধিপতি অনবারীকে সম্মুখে চাইলেন, হাত ধারণ করলেন এবং বসালেন, পরে তাঁর কাছ থেকে কবিতা চাইলেন। আমরা বলি অনবারীর এ প্রশস্তি গাথা তাঁর স্তবের পাত্রকেই আনন্দ দিয়েছে। বোধহয় চিরকালের সমঝদার পাঠক ওগুলিকে চাটুকারের চাটুবচন রূপেই গ্রহণ করবে। জীবনীকার 'অরফী' এই কবির কাব্যগাথায় গুণগান না করে বহুমুখী বিদ্যার কথা বলে গিয়েছেন—যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি।

অনবারীর পৃষ্ঠপোষক সম্রাটের প্রতি তাঁর স্তবগান শুনুন—

গর দিল উ দস্ত্ বহর্ রো কান্ বাশদ্।
দিল রো দস্ত্-ই-খুদায়গান্ বাশদ্॥
শাহ্ সনজর কি কমতরীন্ খাদেমশ্।
দর জহান্ পাত্শাহ্ নিশান বাশদ্।
মন্ নগুয়ম্ কে জুজ খুদায় কসী।
হাল গরদান্ রো। গয়রদান্ বাশদ্॥

এর অর্থটা বিশেষ নিবিষ্ট হ'য়ে বুঝে নিতে হবে। 'যদি কোন হৃদয়কে ও হাতকে দরিয়া এবং (সোনার) খনি বলতে চাও তবে জেনে রাখো সে হৃদয় এবং হাতের মালিক খোদাবন্দ্ আমার রাজাধিরাজ। সাধারণ মানুষ কিন্তু নয়। তারা কতটুকু দিতে পারে? শুনে রাখো বন্ধুরা, আমার রাজাধিরাজ সনজরের একজন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভৃত্যও রাজাধিরাজের অনুগ্রহে বাদশাহের মুদ্রাচিহ্ন পেতে পারে। আমি কিন্তু এমন কথা

বলব না যে খোদা ছাড়া আর কেউ মানুষের অবস্থা ফেরাতে পারে না, কল্যাণকৃৎ বা গয়েরদান হ'তে পারে না। পারেন খোদাবন্দ পারেন।' এর চাইতে অষ্টাদশ শতকের দেহলবী উর্দু কবি জবান্-ই-উর্দুতে অনেক বেশি মূল্যবান কথা বলতে পেরেছিলেন। "গয়র অজ খুদাকে কিসমে হ্যায় কুদরত্ জো হাত উঠায়ে। মকদুর কিয়া কিসীকা ওহী দে ওহী দিলায়ে" সকল যুগেই রাজানুগ্রহে পরিপুষ্টদের এমন মূঢ় রাজপ্রশস্তি শোনা গিয়েছে। সাজাহানের অনুগৃহীত পণ্ডিত রাজ জগন্নাথ সপ্তদশ শতাব্দীতে বলেছিলেন—

'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবা মনোরথান্ পূরয়িতুং সমর্থঃ।

অন্যৈ নৃপালৈঃ পরিদীয়মানং শাকায় বা স্যাল্লবণায় বা স্যাৎ।'

তাঁর কথায় এতটা অহঙ্কার ছিল না। তিনি বলেছেন মানুষের মনোরথ পূর্ণ করতে পারেন হয় দিল্লীশ্বর অথবা জগদীশ্বর। আর সব রাজারা কতটুকু দিতে পারেন? তাঁরা যা দেন, তা দিয়ে শাক কেনা যায় বা বড় জোর নুন কেনা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব'লে পরিচিত এবং সে যুগে একজন নামজাদা গণকরূপে পরিচিত অনবারীর অভ্রান্ত গণনাবিদ্যার একটু পরিচয় রাখাও ভাল। সনজরের রাজত্বেই একসঙ্গে সাত সাতটি গ্রহের অবস্থিতি এমন হ'লো যে তারা যুগপদ্ পৃথিবীকে টেনে মহাপ্রলয়ের ধ্বংস সাধন করবে বলে মনে হ'লো। দিনটিও অনবারী ঘোষিত করে দিলেন।

অয়্ মুসলমানান ফগান্ অজ জুর-ই-চরখ্-ই চম্বরী।

রজ নিফার-ই-তীর রো কসন্দ্-ই-মাহ্ রো কয়দ-ই-মুশ্তরী।

কি আর বলব মুসলমান ভাইগণ! আমাদের এই চরম দুর্বিপাক ঘনিয়ে আসছে—দিক্‌চক্রবালে আবদ্ধ—আকাশের নির্দয়তা থেকে, বুধ দুশমনি করছে, চাঁদের অভিপ্রায় বড় খারাপ. এমন যে জ্যোতিষগুরু বৃহস্পতি সেও প্রবঞ্চনা করছে। হায় হতভাগ্যরা! শোন,—এমন ঝড় বইবে যে বাড়ীঘর তো দূরের কথা, পাহাড়গুলোও টিকবে না।—কিন্তু ঝড় এলো না। মহাপ্লাবনও গর্জে উঠলো না। এটা ছিল ১১৮৫ সালের কথা। তবে ভবিষ্যদ্ বক্তার মৃত্যুর এক বৎসর পর মহাপ্রলয় ইরানের বুকে সত্যই এসেছিল মোঙ্গোল আক্রমণ-রূপে।

চাটু বচনে পারদর্শী, সাধারণ শিক্ষিত রাজপ্রসাদপুষ্ট এই কবির আত্মশ্লাঘাও কম ছিল না। সে অবশ্য অনেক কবিরই থাকে। ভবভূতির ছিল, লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব গোস্বামীর ছিল, কৃত্তিবাস ওঝার ছিল, মঙ্গল কাব্যের কবিদেরও যথেষ্ট ছিল। কেউ আত্মসচেতন, কেউ আত্মগরিমায় স্ফীতবক্ষ, কেউ কাচ ব্যবসায়ী হ'য়েও কাঞ্চন ব্যবসায় কপটকৌশলী। আমাদের অনবারী সনজরের মৃত্যুর পর বোধহয় অনাদৃত হ'য়েই বলে গিয়েছেন—

I have a soul ardent as fire and a
tongue fluent as water,
A mind sharpened by intelligence,
and verse devoid of flaw,
Alas! There is no patron worthy of my eulogies!
Alas! There is no sweet heart worthy of my odes!

সনা'য়ী

পীর-ই-অনসার, ইসমাইলী আবদুল্লার মত সূফী কবি সনা'য়ীও ছিলেন রহস্য পথের পথিক এবং লোক-সমাজের উপদেষ্টা। ইনি শুধু ভাবের সাধক ছিলেন না, ইনি ছিলেন বহুদর্শী এবং জ্ঞানী। সনা'য়ী একস্থানে ব'লেছেন—হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে এমন জ্ঞানের জ্যোতি দাও—যে-জ্যোতি দেখে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ইব্‌ন্‌-ই-সীনাও ঈর্ষ্যান্বিত হয়। বস্তুত, আবুল্‌-মজ্‌দ্‌-মজদুদ্‌-বিন আদম্‌ সনা'য়ী ছিলেন জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির উপাসক। তাঁর জ্ঞানও অসীম—ভক্তির উন্মাদনাও অসমোর্ধ্ব। সর্বোত্তম সূফী, সূফী কবির মধ্যমণি মাওলানা জলাল-উদ্দীন-রুমী তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব সংমিশ্রণ সম্বন্ধে বলে গিয়েছেন—

'তরক্‌-জ্‌শী করদম্‌ নীম্‌ খাম্‌।
অজ হকীম্‌-ই-গজনবী বশনুতমাম্‌॥

পরিপূর্ণ প্রেমোচ্ছ্বাস মহাপণ্ডিত গজনবী সনা'য়ী থেকে পাওয়া যায়। E. G. Browne এই মন্তব্যকে মহাজ্ঞানী জলালের গুণগ্রাহিতার ভাবাতিশয্য বলে মনে করেন। তথাপি বলা চলে, সনা'য়ী একাধারে দিব্যপ্রেমে ভাবোন্মত্ত জ্ঞানী এবং উপদেষ্টা।

এই কবি সুদীর্ঘজীবী ছিলেন (মৃত্যু ১১৫০ সাল)। সনা'য়ী শুধু তাঁর কালে নয়, পরবর্তী কালেও প্রশংসার আসন অধিকার করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সূফী জলাল-উদ্দীন রূমীর আর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—অত্তার হলেন সূফী তত্ত্বের আত্মা; সনা'য়ী এই তত্ত্বের দুটি চক্ষু। সনায়ী না হ'লে দিব্যদর্শন সম্ভব হয় না। আমরা তাঁর দুটি চোখ দিয়েই দেখে চলেছি—

'অত্তার রূহ্ বুদ্ সনা'য়ী দূ চশ্‌ম্-ই-উ।
মা অজ পয় সনা'য়ী বো অত্তার আমদীম্॥'

দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিবৃত্তকথা একটুখানি তুলে ধরা যাক। আ-রব থেকে আরম্ভ ক'রে বলখ্ পর্যন্ত বিস্তৃত সেলজুক সাম্রাজ্য—কালক্রমে বিধাতার বিধানে ধ্বংসের সম্মুখে উপনীত হ'লো। নতুন নতুন জিগীষু জাতিরা মাথা তুলতে আরম্ভ করলো। এরমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বল্‌খের এক পার্বত্য রাজশক্তি নাম তার 'ঘুর'। রাজ্য সামান্য হ'লেও শক্তি হ'য়ে উঠলো অসামান্য। এই শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে সুলতান মাহ্‌মুদের ইস্পাত দৃঢ় গজনী ভেঙ্গে গেল। গজনীর রাজদরবারের রাজকবি সনা'য়ী বহরম শাহের আশ্রয়-চ্যুত হ'য়ে পরিব্রাজকরূপে মক্কায় এলেন এবং শেষে খোরাসান পর্যন্ত সকল রাজ্য ঘুরে বেড়ালেন। এই অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে পরিভ্রমণ তাঁর জীবনে অভাবিত কল্যাণের কারণ হয়েছিল। তিনি বহু ভ্রাম্যমান সূফী দরবেশের সঙ্গলাভ করেন এবং তাঁর দিব্য-দর্শনের পথ উন্মুক্ত হ'য়ে যায়। সূফী ভাবোন্মত্ততায় তিনি তাঁর পূর্ববর্তী দুজন কবিকে ভালভাবে স্মরণ ক'রেছেন। একজন 'ফার্ রূখী', অন্যজন 'বুল্ ফতূহ্'—সনা'য়ী বলেছেন, আমার এই মোহন ভাব আমি ফার্ রূখীর কবিতা থেকে আনি এবং মাঝে মাঝে বুল্ ফতূহ্‌র গীতের রসে আবেশে নৃত্য করি—

"হাল বা শ'অর-ই-কমরুবী আরীম্।
বকশ্, বর শ'অর-ই-বুল্ ফতুহ, কুনীম্॥"

সনা'য়ীর মসনবী কাব্যগুলির নাম—

(ক) হাদীকত্-উল্-হকীকত্ বা সত্যের উদ্যান। এই গ্রন্থই সর্বোত্তম ব'লে স্বীকৃত।

(খ) তরীকুত্-তহকিক—নিরীক্ষা ও পরীক্ষার পথ।

(গ) গরীব নামা—অজ্ঞাত-পথিক-বৃন্দ।

(ঘ) সযরু'ল-ই'বাদ ইলা'ল ম'দ্দ—বান্দাদের পরলোক তীর্থ...... পরিক্রমা।

(ঙ) কার-নামা—কর্মগ্রন্থ।

(চ) ইশ্‌ক নামা—প্রেমগ্রন্থ।

(ছ) আকল-নামা—বিচার-গ্রন্থ।

সনা'য়ীর হদীকত্-উল-হকীকত্ একখানা উৎকৃষ্ট মসনবী। এই বৃহৎ কাব্যের দশটি বিভাগে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সূফীদেরই অবলম্বিত পন্থায় নানা গল্প, উপাখ্যান, উপদেশের মধ্য দিয়ে বিবৃত হ'য়েছে। এই গ্রন্থে কিছু কিছু ঐতিহাসিক অবদানও দৃষ্টিগোচর হয়। সে সব স্থলে বহ্‌রাম শাহের সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই উপাদেয় 'মসনবী'খানা গজনীর রাজা এবং কবিরই পৃষ্ঠপোষক বহ্‌রাম শাহের নামে উৎসর্গিত হয়েছে। একটি নীতিগর্ভ উপদেশে বলা হ'য়েছে—রাত দিন কেবল কথা ব'লে যেও না। মনে রেখো, তোমার জ্ঞান কর্ম সম্পাদনের জন্য, বাগাড়ম্বরের জন্য নয়—তোমার জ্ঞান হচ্ছে অস্ত্র, যা' দিয়ে তোমার চরিত্রের ভাঙ্গ্‌চুরগুলি কেটে ফেলে দিয়ে সুস্থ সবল হ'য়ে উঠতে পার—

'দানিশত্ হস্ত কার বস্তন্-ই-তু।
খন্ জরত্ হস্ত্ স্বফ্ শিকস্তন্-ই-তু॥'

কর্মাশ্রিত জ্ঞানই সফল জ্ঞান, কর্মহীন জ্ঞান শুধু বন্ধন মাত্র।

ইল্‌ম্ বা কার সূদ্-মন্দ্ বুবদ্।
ইল্‌ম্ বে কার পায়বন্দ্ বুবদ্॥

সনা'য়ী বলছেন—বাইরের রূপ কিছু নয়, ভেতরের গুণই আসল কথা।

এক মূর্খ উটকে বলেছিল—'তুই এমন কুঁজো কেন?' উট বলেছিল, 'সাবধান আমার সৃষ্টিকর্তার দোষ খুঁজতে যেও না'—

অ'ঈব-ই-নক.াশ্ মী কুনী হুশ্দার।

বলছি শোন—বাইরের এই কুঁজো রূপের বিচার না ক'রে আমার কাছে (মরুভূমিতে) চলার সোজা পথটি জানতে চেয়ো—তোমার লাভ হবে।

'দর কজ-ই-মন্ মা কুন ব অ'য়ব নিগাহ্।
তূ জ. মন ব.াহ্-ই-রাস্ত্ ব.ফতন্ খ্বাহ্॥'

এমন জ্ঞানগর্ভ উপদেশের উস্তাদ্ এই সূফী কবি সনায়ী। হিন্দুশাস্ত্রে আছে—অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না। যদি দেখাতে যায়—দুটোরই ঘটে অপঘাতে মৃত্যু। "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" সনায়ী দিয়েছেন অন্ধ মূর্খদের হস্তীদর্শনের কাহিনী। হাতীর জ্ঞান লাভ করতে চাইলো অন্ধরা। কেউ পেটে হাত বুলিয়ে বললে—হাতী ময়দানের মত। কেউ শুঁড়ে হাত দিয়ে বললে—হাতী দেখতে ঠিক যেন জলের নল। কেউ পায়ে হাত চালিয়ে বললে—দূর বোকা! হাতী ঠিক যেন রাজবাড়ীর স্তম্ভ। খোদাতালার স্বরূপ নিয়ে দেশে দেশে যুগে যুগে এই হস্তীদর্শন চলেছে।

আমিও জানিনে তাঁর স্বরূপ। কিন্তু তাতে আত্মসমর্পণ ক'রে আমি আনন্দে আছি।

'ব হর্ হ.াল রো হর কার্ আয়দ্ ব পেশম্।
খুদাবন্দ্ বাশদ্ দর আন্ হ.াল ইয়াদম্॥
জ. কস্ খয়র্ রো খুশী ন বাশদ্ ন খ্বাহম্।
বদান্ চম্ বুবদ্ হম খলক্. রাদম্॥

আমার সম্মুখে যে অবস্থা বা যে কর্মই উপস্থিত হোক্—আমি স্মরণ করি তার মধ্যে খোদা বর্তমান, খোদার ইচ্ছা বর্তমান। আমি কারো কাছে আমার মঙ্গল বা সুখ কামনা করি না। সেইজন্য আমি চিন্তামুক্ত, আমি এই সৃষ্টির মাঝে (রাদম্) ঠিক আছি। আসল পাওয়া যে আমি মাঝে মাঝে পেয়ে ধন্য হয়ে যাই। শুনবে আমার মা'শূক, আমার প্রণয়িনীর কথা? তবে শোন, তাতে আমাতে কি কথা হয়। আমি বলছিলাম, আর সে উত্তর দিচ্ছিল—

হৃদয়ে আমার যতটুকু ছিল, আমি তো দিয়েছি সব।
বিদায় বন্ধু! বিদায়।
সে কি! আর কোন দিন পাবো না তোমাকে?
বুঝিবা এবার ঠিক কথা শোনা যায়।
তবে, বিদায়ের ক্ষণ হৃদয়ে চাপিয়া রাখি?
বেলা বয়ে যায়, বিদায়, বিদায়!
তবু, শুনে যাও কথা—
তব, কালো কেশপাশ আঁধারে ঢাকিয়া দিবসের আলো
পেতেছে ইন্দ্রজাল।
মোহ ও লোভের মাঝখানে ফেলে যাবে? সে কি ভালো?
মোহের ঊর্ধ্বে ওঠো। দেখ, সব চলে যায়।
বিদায়, বিদায়।
দেখ, আগুন জলের মাঝখানে আমি।
রসনা শুকায়, চোখে বহে জল;
শুনিবে না কোন কথা?
অধরা আমি যে,—একথা বোঝ না কেন?
বিদায়, বিদায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রশ্ন উঠেছিল—সেই পরমপুরুষ কি জ্যোতি-স্বরূপ? উত্তর হয়েছিল, হাঁ নিরীক্ষণ কর। আত্মাই সেই জ্যোতি। 'আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি।'

যিনি জ্যোতিষাং জ্যোতি—পরম জ্যোতি, তাঁকে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত কদাচিৎ দেখা যায়; ধরে রাখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'পথেরে শিহরি দিয়া সুরে,
চলে যায় চকিত নূপুরে।'

তাই, স্বীকার করা ভালো প্রাপ্তি ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ক্রন্দন চিরকালের।

এই মরমিয়া ভালোবাসা সম্বন্ধে বাবা তাহির উরিয়ান্ বলেছেন—

My heart is restless in love for Thee
And my eyes are shedding tears of blood.
The heart of lover is a wet piece of wood,
Burning at one end while dripling from other.

হৃদয়ে আমার জ্বলে হুতাশন তোমার প্রেমের লাগি,
রক্ত নয়নে অশ্রু ঝরিছে, দিবস রজনী জাগি।
আমি যেন ভিজে কাঠের টুকরো একদিকে জ্বলে সারা;
বিপরীত দিকে বয়ে যায় শুধু তপ্ত জলের ধারা।

আমীর মুঅজ্জী

মহ.ম্মদ বিন্ আব্দুল মালিক বুরহানী নীশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মালেকশা'র প্রিয়পাত্র, শেষে তৎপুত্র সনজরের রাজকবি। তিনি উপাধি পেয়েছিলেন—মু'ইজ্জু.'দ্দীন, যার অর্থ 'ধর্ম-যশোবর্ধন'। চহার মকালায় বলা হয়েছে—তাঁর কবিতা মধুর মধু, ছোট ছোট বাক্য কৌশলে তিনি অদ্বিতীয় এবং এর কবিতা পারস্য সাহিত্যে উচ্চগ্রামের সঙ্গীতে বাঁধা সর্বশেষ কথা—তাজা প্রাণ নিয়ে এই কবির কবিতা সর্বদা আত্মপ্রকাশ করে থাকে। কবি বলতে তিনজনের নাম মনে হয়—সামানী শাসনে কবি রূদগী, গজনবী যুগে উনসারী এবং সেলজুক শাসনে এই কবি মু'ইজ্জু.দ্দীন।

প্রবাদ প্রচলিত আছে সুলতান সনজরের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে অতর্কিতে মু'ইজ্জু.দ্দীনের বুকে বিদ্ধ হ'য়েছিল। সুলতান্ বেদনাহত হলেন, তাই দেখে কবি বললেন, দুঃখ কি সুলতান! ঈশ্বরের কৃপায় আপনার বান্দাহ্ তো নিহত হয়নি। আমার কোন গুণই নেই কিন্তু খোদা আমাকে রক্ষা ক'রেছেন। সুলতান্ তো ধনুক থেকে তীর আমার উদ্দেশ্যে ছোঁড়েন নি।

মিন্নত্ খুদায়-রা-কে ব-তীর-ই-খুদায় গান্।
মন্ বন্দাহ্-ই-বীগুণ ন শুদম্ কুশ্.ত রায় গান্॥
মিন্নত্ খোদায় রা কি বজান ন করদ্ কস.দ্।
তীরী কি শাহ্ বকস.দ্ নীন্দাখ্.ত্ অজ. কামান॥

মু'ইজ্জু.দ্দীনের বাক্যসজ্জায় অলঙ্কারের ঘনঘটার পরিচয়টা দেওয়া যেতে পারে।

(১)

তাঁর মুখখানা ছিল যেন আকাশের চাঁদ: অবশ্য যদি সে চাঁদের উপর দিয়ে কালো কস্তুরীর প্রলেপ গড়িয়ে গড়িয়ে, আবার তাকে মুক্ত ক'রে দেয়।

(২)

দেহখানি তার সরল উন্নত, যেন ঋজু সাইপ্রিস্, যদি সে বৃক্ষ পুষ্প-স্তবকে থ'লো থ'লো হ'য়ে ভ'রে ওঠে। তার সুডৌল চিবুক, আর কালো কুঞ্চিত কেশপাশ কত না প্রণয়ীকে সেলামে আনত ক'রে রেখেছে। তাদের বুগ্ন আনত দেহগুলি যেন সুন্দরীর পোলো খেলার বাঁকাদণ্ড। আর তাদের দিলগুলি এক একটা সেই খেলার কন্দুক।

এমনি ক'রে অলঙ্কারিত উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মালা রচনা করাই এই কবির বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী যুগের স'দী ও হাফিজে.র ভাবগম্ভীরতার কাছ দিয়েও এগুলি যায় না। যু'ইজ্জ্‌.দ্দীনের মধ্যে আছে সেই যুগের কাব্যকলার রঙীন ফানুশ, একটু বালসুলভ আনন্দ দিয়েই তা শূন্যে মিলিয়ে যায়, হৃদয়ে কোন দাগ কাটতে পারে না। এ কবির কাব্যরূপসী এত বেশি অলঙ্কার প'রেছে যে বলতে ইচ্ছে হয়—

অলঙ্কার যে মাঝে প'ড়ে
মিলনেতে ব্যাঘাত করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার মুখর ঝঙ্কার।

খাক.নী শীরবানী

সংক্ষিপ্ত নাম 'খাক.নী' দ্বারা পরিচিত, কবিটির পূর্ণ নাম—আফজ.ল-উদ্দীন ইব্রাহীম্ বিন্ অলী শীরবানী। সলজুকীয় যুগে দ্বাদশ শতাব্দীর কবিরূপে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হ'য়ে আছেন; জন্ম ১১৬৭ সাল। তাঁর রচনা মূলত ক.সী.দা। তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু তাঁর পিতৃব্য। তিনি ছিলেন চিকিৎসক। এই পিতৃব্যগুরুর কাছে খাক.নী নানা শাস্ত্রে পারঙ্গম হ'য়ে ওঠেন। পারসী ও আরবী উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হ'য়ে তিনি সর্বপ্রথম আয়ত্ত করেন চিকিৎসা শাস্ত্র। তারপর জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তাঁর কালে প্রচলিত দর্শন শাস্ত্রসমূহে আত্মনিয়োগ করেন। কাব্য-কলার শাস্ত্রসমূহেও তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁর ছন্দ ও অলঙ্কারে জ্ঞান ছিল অপরিসীম। এই জ্ঞান আহরণের কেন্দ্র থেকেই খাক.নীর প্রকৃত জীবনের আরম্ভ।

মনুচিহর্ শীরবান শাহের রাজকবি আবুল অলাগঞ্জবী খাক.নীর কাব্য-কলা-গুরু। তিনি তাঁকে ছন্দ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের পাঠ দিতে থাকেন। এই গুরু তাঁর জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে জামাতারূপে বরণ করেন। বোধহয় এই সম্বন্ধ যোজনার আনন্দদিনেই বিধাতাপুরুষ বাঁকা হাসি হেসেছিলেন। কথা আছে, Even gods have humour'। বিবাহোত্তর জীবন থেকেই গুরুশিষ্য বা শ্বশুর-জামাতার বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ হয়। খাক.নীর মধ্যে শুধু দুরধিগম্য উচ্চাশা ছিল না; ছিল দুরন্ত অর্থলিপ্সা। অপূর্ণ আশা ক্রমশ তাঁকে শ্বশুরের প্রতি বিরক্ত ক'রে তোলে। এদিকে খাক.নী ছিলেন অত্যন্ত উদ্ধত। এই উদ্ধত অহংকারে তিনি পূজনীয়কেও তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। শ্বশুর হয়তো মেয়েটিকে কাছে রাখতে চান। কাজেই শীরবান শাহের রাজদরবারে জামাতাকে বেঁধে রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য হবে। যখনকার কথা বলছি তখন শাহ্ সঞ্জর সেলজূক সম্রাট্। ওই রাজসভার জন্য তখন জামাতা

উদ্‌গ্রীব। তাঁর অভিমান তিনি বুলবুল, বুলবুল চায় গুল-এ-স্তান্—সে কি এই শীরবানশাহী মজলিস্। বুলবুল চায় খোরাসানী চমন—যেখানে গুলবাহার। এইজন্য আহত অভিমানে তিনি বলেন—আমাকে কেন এখানে বেঁধে রেখে দেওয়া হ'য়েছে? কেন আমাকে খোরাসানে যেতে দেওয়া হয় না?

চি শবব্ সূয় খুরাসান্ শুদনম্ ন গুজ়ারন্দ্।
অ'ন্দলীবম্ বিহ্ গুলিস্তান শুদনম্ ন গুজ়ারন্দ্॥

আমি খুরাসন পর্যন্ত গিয়ে আমার পথের শেষ দেখতে চাই। আমি তৃষ্ণার্ত, খুরাসান আমার পিপাসা জুড়াবে—

রাহ্ রবম্ মক.স.দ-ই-ইমকান বিখুরাসান্ যাবম্।
তিশ.ন অম্ মশরব-ই-ইহ.সান্ বিখুরাসান্ যাবম্॥

আবার ওদিকে খ্বারেজ.মশাহের জাঁকজমকপূর্ণ রাজদরবার তাঁকে হাতছানি দেয়। সেখানকার রাজকবির মধ্যবর্তিতা কাজের আনুকূল্য বিধান করবে ব'লে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে মস.নবী পাঠিয়ে দেন। শ্বশুর অবশ্যই দেখে চলেছিলেন এই খোরাসন আর খ্বীবা পাগল জামাতাটিকে। মনে হয় রাজকবির নির্দেশেই শীরবানশাহ তাঁকে নজরবন্দী করে রেখে দেন। এই বন্দী অবস্থায় খাক.ানী জেহাদ ঘোষণা করতে থাকেন।

খাক.ানীর সুদীর্ঘ মস.নবী কবিতার নাম—'তুহ.ফতু'ল 'ইরাক.যন্' যার অর্থ দুটি ইরাকের দান। এই গ্রন্থ যেমন একদিকে মক্কা শরীফের পরিচয় দেয়, তেমনি অপরদিকে পরিচয় দেয় তাঁর আত্মজীবনীর।

এইবার জামাতা-শ্বশুরের বাদ-বিসংবাদের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। একদা জামাতার তীব্র বিদ্রূপের আঘাত পেয়ে শ্বশুর জানালেন—

'প্রিয়, পুত্রোপম খাক.ানী! তোমার ক্ষমতা অস্বীকার না ক'রেও বলছি—ইয়াদ রেখো, তোমার চেয়েও জ্ঞানীগুণীরা এই দুনিয়ায় বর্তমান আছেন।'

এতে জামাতাজীবন একেবারে অগ্নিশর্মা। তিনি কৈফিয়ৎ তলব করলেন শ্বশুরের। শ্বশুর স্পষ্ট কথা সহজভাবে বললেন—'তুমি ছুতোরের পুত্র। [খাক.ানীর পিতা বৃত্তিতে ছিলেন সূত্রধর, মাতা ছিলেন খ্রীষ্টান, পরে ইসলামে ধর্মান্তরিতা] রাজসভায় ঠাঁই পেয়েছ আমার জন্য। উচ্চাসন,

বিত্তবৈভব প্রতিষ্ঠা সবকিছু আমার জন্য। ভুলে যাচ্ছ—তুমি আমার জামাতা ব'লেই এইসব। তার উপর তুমি আমার ছাত্র। এই কি তোমার বিনয়, এই কি তোমার সাধু এবং ভদ্র চরিত্রের লক্ষণ?'

এইসব বাদ-বিসংবাদ অনেকেরই দুঃখের কারণ হ'য়েছিল। খাক.নী তখন জীবন জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যেন মরে যাচ্ছে।

রাশাকী দিহ্‌ কি দর্ বরম্ গীরদ্।
যা রিশাকী, কি দর বরশ্ গীরম্।

'আমি কোথায় পালিয়ে বাঁচি? শেয়ালের চামড়ার আচ্ছাদন নিয়ে সাঝ সকালে ডাকব? না চাকর নোকরের কাজ নেবো? এ জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরলুম।'

খাক.নীর জীবনের অতি ভয়ানক কথা হচ্ছে, তিনি ক্রোধের জ্বালায় ইসলাম বিসর্জন দিয়ে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং বাইজানতিয়াম্ সম্রাটের চাকরি নিয়ে সম্রাটকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি ইরানের প্রাচীন জরথুস্ত্রীয় ধর্মটি ফিরিয়ে আনেন। অবশ্য পরে তিনি এর জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে বলেছিলেন—'খোদা! তুমি আমার এই পাপচিন্তা, পাপকর্ম ক্ষমা ক'রো।' মোটামুটি এই হ'লো ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত, হিতাহিতে অন্ধ, শ্রদ্ধাভাজনে অশ্রদ্ধাশীল, উচ্চাশায় আকাশচারী, পরিণামে অনুশোচনায় ভেঙেপড়া কবির জীবনকথা। ইংরেজীতে যাকে বলে Frustrated; কবি ছিলেন তাই—পরাভবে ব্যর্থমন্য।

আমাদের উদ্ধৃতিগুলি দেখলেই বোঝা যাবে কবি আত্মম্ভরিতায় আচ্ছন্ন। তাঁর প্রকাশ সরস নয়, অত্যন্ত কৃত্রিম। অলঙ্কার—তাও শব্দালঙ্কার তাঁর কবিতার ভূষণ নয়—দূষণ, অত্যন্ত ভারের বোঝা। যাকে বলে শব্দের জাদু তার প্রতিই কবির আকর্ষণ সর্বাধিক।

নিজ.ামী গঞ্জবী

সেলজু.ক যুগের আর একজন জ্ঞান-গরিষ্ঠ ভাবুক কবির পরিচয় দেই। ইনি নিজ.ামী গঞ্জবী বলে প্রসিদ্ধ। তাঁর পরিপূর্ণ নাম—হ.কীম আবু মহ.ম্মদ ইলিয়াস ইউসুফ বিন জ.কী নিজ.ামী গঞ্জবী। এই কবি তাঁর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে এবং মৌলিক ভাবনায় একালের পাঠকদেরও মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন। তিনি ছিলেন মসনবী কবিতায় সিদ্ধ-হস্ত। এই বিশেষ জাতীয় কবিতা রচনায় তাঁর যশ একদা এসিয়া মাইনর এবং সমগ্র তুর্কীস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর সমগ্র জীবনের ইতিবৃত্ত সংরক্ষিত নেই। তাঁর জীবনী রচিত হ'তে পারে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি নিয়ে। কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'গঞ্জ' নামক একটি স্থানে। এই স্থান এখন আজ.ারবাইজানের অন্তর্গত। তাঁর জন্মকাল ১১৪০ এবং মৃত্যু সন ১২০৩। তিনি মাত্র চৌষট্টি বছর বেঁচে ছিলেন। এই পরিমিত পরমায়ুর সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন তাঁর অনলস সারস্বত সাধনায়। পাঁচখানা বৃহৎ কাব্য এবং সামান্য কিছু কসীদা ও গজ.ল নিয়ে বেশ কয়েক হাজার বয়ত্ সুপরীক্ষিতভাবে গঞ্জবী-রচিত বলে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর রচনা অজস্র হ'লেও মূল্যহীন নয়। সার্‌বান রচনার মূল্য নিরীক্ষায় তাঁকে সফল স্রষ্টার কবিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ কবির রচনায় সাহিত্য যেমন ফুটেছে, তেমনি ফুটেছে ইতিহাস। কখন কখন জ্যোতিষের দ্যুতিও রেখাপাত করেছে।

গঞ্জবী রচনা করেন পাঁচখানা মস্‌নবী কাব্যের একটি গুচ্ছ। এ কাব্য-পঞ্চককে পার্সী ভাষায় বলে 'খম্‌সা' ইংরেজী 'Quintet', লাতীন ভাষায় পাঁচটি যন্ত্রের সমবেত সঙ্গীতকে বলা হতো 'Quintus'। এই 'খম্‌সা' বা পঞ্চককে একটি মহাভাবের সমবায় বলা যেতে পারে। সে ভাবে আছে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ধূসর ছায়া। কাব্যগুলির মর্মার্থ বিশ্লেষণে সেই সত্য অবিসংবাদিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতবর্ষের রামায়ণে এবং

মহাভারতে নানা গল্প ও কাহিনীতে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। ভোগ-সম্ভোগ আশা-উদ্দীপনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিষণ্ণ-মাধুর্যে। মাধুর্যের আস্বাদ পাওয়ার মধ্যেও বিষাদ যেন অঙ্গুলি সংকেতে জগতের অন্য আর একটি দিক দেখিয়ে দেয়। খম্‌সাতেও অনুরূপ সংকেতকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমে, কবির পঞ্চক বা খম্‌সার গুচ্ছ খুলে একটি একটি করে পরিচয় দিই।

(১) মখজ়ন-উল-অসরার' যার অর্থ রহস্যের রত্নভাণ্ডার (১১৬৫-৬৬)। এখানে সূফীতত্ত্বের উন্মোচন হয়েছে নানা গল্প ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে। এই রীতি অবলম্বন করেছিলেন সনা'য়ী তাঁর 'হদীক' নামক গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালে জলাল তাঁর মস.নবী কাব্যে।

(২) খসরু বো শীরীন্—প্রেমের কাব্য। নায়ক সাসান সম্রাট্ খুসরো পরবীজ়., নায়িকা—শীরীন. প্রতি নায়ক সামান্য এক মজুর ফরহাদ (১১৭৫-৭৬)।

(৩) লায়লা বো মজনূন্—আরব দেশের লোকগাথায় প্রসিদ্ধ নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনী (১১৮৮-৮৯)।

(৪) ইস্‌কন্দর-নামা—বিশ্ববিজয়ী সম্রাট্ আলেকসন্দারের ভুবন-বিজয় গাথা (১১৯১)।

(৫) পঞ্চক কাব্যের শেষ কাব্য—হফ্‌ত্ পয়কর বা সপ্ত প্রতিকৃতি। সাসানরাজ বহ্‌রাম গূরের লোক-প্রসিদ্ধ অলৌকিক প্রেম-গাথা। সাত মহলে সংরক্ষিত সাতটি তসবীরের প্রতি রাজার প্রেম (১১৯৮-১১৯৯)। কবির জীবনদীপ—নির্বাণ এর ঠিক চার বছর পর ১২০৩ সালে।

গ্রন্থগুলিকে এক একজন সমসাময়িক শাহ্‌কে গঞ্জবী উপহার দিয়েছেন সেকালের চিরাচরিত নিয়মের অনুবর্তনে। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, কবি কোনদিনও রাজস্তুতি করে তাঁর ঈপ্সিত আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হন নি। সে যুগে এমন নিরাকাঙ্ক্ষ সারস্বত সাধনা সত্যই বিরল ছিল। সত্যকার সারস্বত সাধকের আদর্শ জীবনের একটি ছবি আমরা গঞ্জবী কবির 'খসরু বো শীরীন' থেকে পাই। সেখানে কবি বলছেন—

'আমি আমার পার্থিব জীবন কাটাই পৃথিবীর এক নির্জন কোণে। আমি নীচমনা (পস্ত্) থেকে একটি ক্ষুদ্র শস্যকণাও গ্রহণ করি না। যখন আমার কাব্য চর্চার মধ্যেই জীবনের সব কাজ খুঁজে পেয়েছি—এই জায়গাতেই যখন সব মিলছে, তখন আর অন্য স্থানের সম্ভাবনায়—আত্মবিক্ষেপ অনুচিত মনে করি। নিজ়ামী গঞ্জবীর ভাষায়—

মনম্ অজ় জহান্ দর গৃশহ্ করদহ্।
কমী অজ় পস্ত্ জওরা তুশহ্ করদহ্॥
অগর চি দর সখুন কার-ই-হয়াত্ অস্ত্।
বুরদ জায়জ় তর আন, চি অজ় মুমকিনাত্ অস্ত্॥

উদ্ধৃত রাজপ্রাসাদের প্রসাদলুব্ধ নিজ়ামী যে ছিলেন না—এই কবিতা-চূর্ণক তার পরিচয় বহন করে। সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলালের কথা মনে পড়ে—

'এস আদরিণী বাণী সম্মুখে আমার।
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর।'

সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা ব'লে গিয়েছেন নিজ়াম-ই-গঞ্জবী তাঁর পঞ্চক-কাব্যের আখ্যানভাগের জন্য ফেরদৌসীর কাছে ঋণী। ফেরদৌসীর শাহ্‌নামা এক বিপুল-কলেবর জাতীয় মহাকাব্য। ইরানী জাতি ঐ কাব্য থেকে রক্তের কৌলীন্য ও হৃদয়ের বল আহরণ করেছিল। আদিতম যুগ থেকে ইরানের ইতিহাস, লৌকিক গাথা এবং কিংবদন্তী এই মহাকাব্যকে পরিপুষ্ট করেছে। পরবর্তী কালের কবিরা অনেকে শাহনামার উৎস থেকে তাঁদের কাহিনী-কাব্য গড়েছেন। নিজ়াম-ই-গঞ্জবী তেমনই একজন কবি। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কাহিনীগুলিকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন রূপে সাজিয়ে দিয়েছেন। ফলে কাহিনী অংশ শেষ হলেও ভাবনা অংশ শেষ হয় না। ধূপের ধোঁয়া শেষ হ'লেও যেমন তার সুগন্ধ চারদিক আমোদিত করে রাখে এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কাব্য-পঞ্চকের মর্মার্থ প্রসঙ্গে সে কথা স্পষ্ট করার চেষ্টা করব। মহাভারত-রামায়ণ-ইলিয়াদ এবং ওদেসী

যেমন প্রাচীন যুগে রচিত হয়ে পরবর্তী যুগে কবিদের বিভিন্ন কাব্যের উপাদান সরবরাহ করেছে শাহ্‌নামাও তাই। এইজন্য বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমার কবির কবি; ফেরদৌসীও ইরানী সাহিত্যের ইতিহাসে কবির কবি।

(১) কাব্য পঞ্চকের প্রথম কাব্য 'মখজ়ন্‌-উল-অসরার' সর্বপ্রথম রত্নভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করে দিল। এখানে যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথার সূত্রপাত হলো সেই গৈরিক সূত্রে বাকী চারখানা কাব্য গ্রথিত হয়েছে। বিষাদ এবং বৈরাগ্য সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তার মধ্য থেকে জীবনসত্যকে কুড়িয়ে পাওয়াই পরমা প্রাপ্তি। বলা বাহুল্য, মখজ়ন্‌-উল-আস্‌রার এর মূল শাহ্‌নামাতে নাই। থাকতেও পারে না। এই রহস্যের রত্নভাণ্ডার 'পঞ্চক' বা কুইনটেটের প্রস্তাবনা মাত্র।

(২) 'খসরু বো শীরীন' কাব্যে সাসানরাজ পারবীজ় ও শীরীনের প্রেম প্রমাণ করে—The course of true love never ran smooth. প্রেমের বন্ধুর ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা। এই কাব্যের প্রতিনায়ক ফরহাদ সামান্য একজন পাথর-কাটা মজুর। এই সামান্য প্রতিনায়ককে অসামান্য চাতুর্যে ও কৌশলে (শীরীনের মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদে) নিহত করা হ'লো। কাব্যখানা শেষ করে কি দারিদ্র্যের ব্যর্থ প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবনের পাওয়া না পাওয়ার চরম কথাটা মনে আসে না? তাজমহল দেখে এক আধুনিক কবি বলেছেন—

'যহাঁ ইক শাহানশাহ্‌ দৌলতকা সহরা লেকর,
হম গরীবোঁ কী মুহব্বতপর
উড়ায়া হ্যায় মজ়াক।'

এই কবিতার কবি হ'লেন আধুনিক যুগের কবি—সাহর লধীয়ানবী। বাংলা অনুবাদ করা চলে—হেথা, কোন এক মহারাজ দৌলতের অহংকারে, ব্যঙ্গ করে গরীবের প্রেম।'

'When Far-had heard his message, with a groan
From the rock-gully fell he, like a stone.'

কবি এই পাথুরে কারিগর ফরহাদের উপর এক দুনিয়াদারীর নির্মম পাথর ছুঁড়ে মেরেছেন। জগৎ-যন্ত্রের নির্মম পেষণে কত বুকের তাজা

রক্ত এমনি ধারা প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে! তাতে পৃথিবীর রথচক্র থেমে থাকে না। এমন উদাসীন দৃষ্টি ফেরদৌসীরও ছিল,—আমরা সেকথা সোহ্‌রাব-রুস্তম প্রসঙ্গে বলে এসেছি। তথাপি মনে রাখতে হবে, বীর ও রৌদ্র রসের উত্তেজনা এ কাব্যের মর্মকথা নয়। করুণ রসের অশ্রুতে সকল উৎসাহ ও উন্মাদনা ধুয়ে মুছে শেষ হ'য়ে গিয়েছে। জীবন রহস্যময়। আশার পেছনে নৈরাশ্য, সুখের পাশেই দুঃখ—কে অস্বীকার করতে পারে? অদৃষ্টের অদৃশ্য লোক কি চোখে দেখা যায়? ওটা স্বীকার ক'রে নেওয়া ভাল। অবশ্য অদৃষ্টও কার্যকারণসম্ভূত এবং সর্বময় কর্তৃত্ব ঈশ্বরের, একথা মরমীরা জানেন। তাঁর অস্তিত্বেই সবকিছু অস্তিত্ববান, তিনি সুখ দেন, দুঃখও দেন। আশার আলোক দিয়ে নৈরাশ্যের অন্ধকার টেনে আনেন। এই দিন, ওই রাত্রি—আমাদের চন্দ্র-সূর্য সবকিছু তার থেকেই—

গম্ বো শাদী নিগার ও বীম বো উম্মীদ্।
শব বো রুজ আফরীন, বো মাহ্ বো খুরশীদ্
হজু দশ বর্ হম্ মৌজুদহ্ কাহির।
নিশানশ্ বরহম্ বিনস্মহ্ জ.াহির।

গঞ্জবী দার্শনিক চিন্তামুক্ত করে কিছুই যেন দেখতে রাজী নন। এই মনোময়তাই তাঁর রচনাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। বিষয়বস্তুর তথ্য অতিক্রম করে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা আত্মপ্রকাশ করে। ফেরদৌসীর মহাকাব্যের খণ্ড বিষয়গুলি নিয়ে পরবর্তী কবি জামী এবং আমীর খুসরোও একই প্রকার পন্থা অনুসরণ করেছেন। যথাসময় আমরা সেটা দেখব।

(৩) লায়লা বো মজনুনের বিষয়বস্তু কবি গ্রহণ করেছেন আরবের মরুপ্রান্তরে প্রচলিত কোন লোকগাথা থেকে। শাহ্‌নামা এ কাব্যের উৎস নয়। গঞ্জবী এই আরব্য কাহিনী সুন্দরভাবে ইরানী পরিবেশে স্থাপিত করেছেন। এখানেও দেখি এই পৃথিবীর প্রেমে বাধা আসে অদৃষ্ট জগৎ থেকে। সে বাধা অনতিক্রম্য। প্রেমিককে সে পাগল করে দেয়। কিন্তু দেখা যায় এমন ক্ষেত্রেও মানুষ সান্ত্বনা লাভ করতে পারে ধ্যানে। মজনুন্ লায়লাকে ধ্যানের মধ্যে পেয়ে শান্ত হয়েছিল। তখন তার লায়লা

এক ভাবময় বিগ্রহ হয়ে মজনূনকে কৃতার্থ করল। তার ঐ মহাভাবময়ীর ধ্যানের মধ্যে মজনূনের আত্মসমর্পণ সার্থক হ'লো। তাই তারা অপার্থিব লোকে আলোর সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে প্রেমকে জয়ী করেছিল—

"From head-to foot adorned with robes of light,
Like hours fair in heaven's mansions bright."

(৪) শাহ্‌নামা ভিত্তিক ইস্কন্দর নামা কাব্যে আলেকসন্দারের বিজয় অভিযানে সহসা আত্ম-বিস্মৃত কবি যেন শাহ্‌নামা মহাকাব্যের উন্মাদনায় ছুটে এসেছিলেন। এ কথা বলি এইজন্য যে, কবি যেন হঠাৎ ভুলে গেলেন তার হজ.াজ ছন্দের সপ্ততাল। যুদ্ধের ঘনঘটায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'লো শাহ্‌নামার বহর-ই-তকা.রিব—যে ছন্দ শাহ্‌নামায় পঞ্চমাত্রার সাটোপ পদক্ষেপে সমগ্র কাব্য প্রদক্ষিণ করেছে (⏑ — —)। হ্রস্ব দীর্ঘ দীর্ঘ মাত্রার নিয়ম সূত্রে এই ছন্দের জোর কদম আসাই স্বাভাবিক ছিল, নইলে ভুবনবিজয়ীর বিজয়োল্লাস ঠিকভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠতো না। নিজ.ামী তাঁর পূর্বসূরিকে এক্ষেত্রে স্মরণ করেছেন সুন্দর স্পন্দিত তালে—

সখুনগূয় পীশীন্ দা না-ই-তূস্।
কি আরাস্ত রূয্ সখুন্ চূন্ আ'রূস্॥

আমি তূসের মহাপ্রাজ্ঞের সম্মুখে আমার কাব্যগাথা গাইছি, যিনি কাব্য-বধূর (সুন্দর) মুখখানা আমাদের সামনে এনে (উঁচু করে) ধরেছিলেন। "নমো নমঃ সেই মহাগুরু"।

এ যেন কবি মধুসূদন বাল্মীকিকে নমস্কার জানালেন—

'নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি!'

কিন্তু ইস্কন্দরের বিজয় উল্লাসের শেষ পরিণতি ঘটেছিল বিষাদের রাজ্যে। হিংসা ও জিঘাংসায় মানুষের হৃদয় পাওয়া যায় না, হৃদয় অর্জিত হয় ভালোবাসায়। শাহ্ ইস্কন্দরও তা বুঝেছিলেন। এইজন্য তাঁর ইরানপ্রীতি, এইজন্যই ইরানময় বিবাহ মঙ্গল। তিনি চেয়েছিলেন ভারত-বহ্‌লীক সমেত ইরান এবং দোয়াব সহ সমগ্র এসিয়া মাইনরকে প্রীতির সূত্রে বেঁধে দিতে। ব্যাবিলনে সেই ভাবালু স্বপ্নময় জীবনের অবসান ঘটে গেল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অর্জিত মহাসাম্রাজ্য তাঁরই

ত মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অনন্ত কালের বক্ষে সব হয়ে চলেছে। বিজয় ও বিপ্লব, সংগ্রাম ও শান্তি অনন্ত কালের ভেসে-ওঠা স্বপ্নময় ছবি ছাড়া কিছু নয়। ওরা সেই অনন্তকালের অবভাস মাত্র। ইস্কন্দর নামায় এই দার্শনিক চিন্তাধারাই দর্শনীয়, অপর কিছু কাহিনী মাত্র।

(৫) শেষ কাব্যখানা হফ্‌ত্‌ পয়কর বা সপ্তপ্রতিকৃতি। এর অন্য নাম 'বহ্‌রামনামা'। বহ্‌রামগুর—য়জদ্‌গীরের সন্তান; সাসানকুলের তিনি রাজা। শাহ্‌নামায় এই রাজকীয় প্রেমকাহিনী থাকলেও গঞ্জবী তাকে মনের মত করে সাজিয়ে দিয়েছেন। দুর্গের একটি রহস্যময় অংশে রাজা আবিষ্কার করেন সাতমহলে সাতটি রাজকন্যার তসবীর। তাঁরা সাতটি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে ছিলেন। সকলেই অনিন্দ্যসুন্দরী। কক্ষ সাতটি সাত রঙের —কালো, পীত, জরদ, লাল, গোলাবী, সাদা ইত্যাদি। শনিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ভারতের রাজকন্যার কালো কক্ষ থেকে আরম্ভ ক'রে তিনি ক্রমশ ফেরেঙ্গী রাজকন্যার সাদা কক্ষে চলে আসেন। সুন্দরীরা (১) ভারত রাজ-দুহিতা (২) চীনের খান কন্যা (৩) খীবার শাহ্‌জাদী (৪) স্লাভ বা রুশীয় রাজকুমারী (৫) পারস্যের শাহ্‌জাদী (৬) বাইজানতি-য়ামের রোম-সম্রাট-কন্যা (৭) পশ্চিম দুনিয়ার, মগরব দিশার রাজার ঝিয়ারী। এই রাজ্যগুলি আবহাওয়ার বিভাগে সেকালের পৃথিবীর সপ্ত বিভাগ। রাজকন্যাদের আবাস কক্ষগুলিও নানা রঙে তাঁদের সৌন্দর্যের প্রতীক।

তিনি সকলকেই বিবাহ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ওই অদৃষ্টই বাদী হ'লো। রাজমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে স্বয়ং বিবাহার্থী রাজারই মৃত্যু ঘটলো। মানুষ অসমাপ্ত কার্য রেখেই চলে যায়। যত সাধ থাকে তার কতটুকু সাধ্যের সীমায় আসে? কিছু না। সব শূন্য রাজ্যের মন-গড়া বুদ্‌বুদ্‌—ফুটে আর টুটে। এদের বাস্তব কোন সত্তা নেই।

গঞ্জবী পরিমাণের দিকে প্রভূত রচনা করলেও কোন কালে কোন অলস কল্পনা তাঁকে অধিকার করেনি। তিনি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল এবং সর্বদাই অসাধারণ। অনেক সময় তাঁকে তাঁর প্রতিভার উন্নত শিখরে স্পর্শ করাই দুরূহ হয়। এ বিষয়ে অনবরী ক.জ.রীনী, দৌলতশাহ্‌ এবং লুফ্‌ত

আলী বেগ প্রভৃতি জীবনীকারগণ একমত। এমনকি স'দী. হাফিজ, জামী ও ইস.মত্ প্রভৃতি কবিবৃন্দও সমস্বরে একই রায় দিয়েছেন। আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। চরিত্রে এ কবির কোন জুড়ী ছিল না। সূফীরা বাইরের শরাব দিয়ে অন্তরের অনুপ্রেরণা আনতেন। হাফিজ প্রসঙ্গে সে কথা বিশেষ করে বলব। কিন্তু গঞ্জবী জীবনে সুরা স্পর্শ না করেও সূফী কবি। গঞ্জবী মনুষ্য-জীবনের আনন্দ সন্ধান করতে গিয়েও স্বভাব-ধর্মেই শুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থিত। গ.জ.ল গীতিতে তিনি জীবন-রসিক কবি। গঞ্জবী গ.জ.ল বেশি রচনা করেন নি। তাঁর একখানা গজল গীতির পরিচয় দিয়ে এই কবির প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব,—

জোয়ানী বরসব্-ই-কূচ অস্ত্ দরইয়াব ইন জোয়ানীরা।
কে শহরী বাজ.কয় বাশদ্ গরীব কাররানীরা?
খমীদহ্ পুশ্ত্ অজ.আন্ গশ্তন্দ্ পীরান্-ই-জহান্ দীদ্।
কি অন্দর খাক্ মী জুয়ন্দ্ অয়াম্ই—জোয়ানীরা॥

যৌবন এই জীবনযাত্রার সারতম অংশ, জীবনের শিরোমণি। শৈশবও নয়, বার্ধক্যও নয়। যৌবনকে তেমন করেই জেনো (দরইয়াব) আমরা এই বিনাশী জগতের অচেনা মানুষ (গরীব) আমরা যেন চলন্ত-যাত্রায় অংশগ্রহণ ক'রেছি, যাযাবর আমরা স্থায়ী নাগরিক জীবন কেমন ক'রে পাব? আমার যে হুকুম নেই। এই যাত্রা-পথেই জীবনের আনন্দ অনুভব কর—কিন্তু সে যৌবনে। দেখনা, এই পৃথিবীর ক্রান্তযৌবন বৃদ্ধরা বাঁকা পিঠে ঝুঁকে পড়ে তাদের যৌবনের দিনগুলি (আয়াম্) অনুসন্ধান করে চলে—যে দিনগুলি এখন অন্দর খাক্, মাটির নীচে।

সুতরাং—

ব-হরজ.হ্ মী দিহী বরবাদ 'উমর-ই-নাজ.নীন কজ.রয়্।
ব-হ.াসি.ল মীতরান্ করদন্ হ.য়াত্ জাবদানী রা॥

সুতরাং এই লাজুক জীবনটা বৃথা বরবাদের ঘরে ঠেলে দিও না। বরঞ্চ তোমার ক্ষণিক জীবনকে আনন্দ রসে অফুরন্ত করে তোল।

কারণ, আগর তূ শাদমান্ বাশী ম' অজ.লী রসদ্ গ.মরা
যো গর খোদ্রা কশী অজ. গ.ম, চি নুকসান্ শাদমানীরা?

কারণ, তুমি যদি আনন্দে থাক তা হ'লে সংসারে অবধারিত দুঃখের

তো অবসান হবে না! দুঃখ যখন আসার তখন আসবে। আগে থেকে গুমরো মুখে থাক কেন? আর যদি তুমি স্বেচ্ছায় নিজেকে দুঃখের মধ্যে ডুবিয়ে আত্মঘাতী হও তবে আনন্দের কি ক্ষতি হবে—ক্ষতি তোমারই।

বাবরের স্মৃতিকথায় আছে—১৫০৪ সালে কাবুল অধিকার ক'রে তিনি সেখানে খুব আনন্দে ছিলেন। তিনি বলেছেন, সেখানে যখন হলুদ আর লাল ফুলের সমারোহ ফুটে উঠতো তখন তিনি যেন কোন স্বর্গ রাজ্যে চলে যেতেন। তিনি বলেছেন, 'আমার জানা পৃথিবীর কোন স্থানকে তুলনায় এর কাছে আনতে পারি না।' সেখানে পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে কেটে এক ক্ষুদ্র জলাধার তৈরী করিয়ে তিনি তাকে স্ফটিকে মুড়ে দিয়েছিলেন। সেই জলাধারকে লাল শরাবে (আব-ই-আঙ্গুর) পূর্ণ করে রাখতেন। তার গায়ে তিনি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন তাঁর নিজেরই একটি কবিতা—যাকে বলা চলে যৌবনের গান।

নৌ রোজ. রো নৌ বহার রোময়্ রো দিলবু.বা খুশস্ত্।
বাবুর ব 'অয়িশ্ কুশ্ কি 'আলম্ দূবারহ্ নীস্ত্॥—'বাবুর'

এ কবিতার ইংরেজী অনুবাদ আছে—

'Give me but wine and lovely girls,
All other joys I freely spurn;
Enjoy them, Babur, while you may,
For youth once past, will ne'er return.'

—H. G. Rawlinson

মহাভয়ংকর দিগ্‌বিজয়ীর তক্ষণ শিল্পে উৎকীর্ণ এই যৌবন প্রশস্তি আর বিচক্ষণ দার্শনিক মহাতপস্বী গম্ভীর যৌবন প্রশস্তিতে পার্থক্য কত! তাই বলছিলাম—জীবন রসের রসিক কবির গ.জ.ল গানেও তিনি তাঁর শুদ্ধ-স্বরূপে অবস্থিত।

শেখ অত্তার

'অত্তার' বলে পরিচিত শেখ ফরীদ্-উদ্দীন মোহম্মদ অত্তার একজন স্বনামধন্য সূফী কবি। তিনি পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। এইজন্যই কিন্তু লোকে তাঁকে 'হ.কীম' বলতো না, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্যই লোকে তাঁকে বলতো 'হ.কীম', যেমন আধুনিক যুগে ডক্টরেট-উত্তীর্ণকে লোকে বলে ডক্টর সেইরকম। তার উপর পেশায় তিনি চিকিৎসক বা হ.কীম; কাজেই তিনি দুদিকেই হ.কীম। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল, পার্সীভাষায় হ.কীম—ডাক্তার এবং পণ্ডিত, কিন্তু হা.কিম হা. এবং 'ক' এ হ্রস্বই দিয়ে যে শব্দ তার মানে হ'লো—শাসক বা বিচারক। প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ এ দুটি। শেখ অত্তার তাঁর ঔষধালয়ে প্রত্যহ কম করেও পাঁচশ রোগীকে পরীক্ষা ক'রে ব্যবস্থা-পত্র দিতেন। পার্সীতে ভৈষজ্যশালাকে বলা হ'তো 'দারুখানা'। আজকাল 'দারু' কথাটার বিস্তর অর্থাবনতি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার অর্থপরিবর্তন লক্ষ্য করি। 'আ'তর' আরবী কথাটার অর্থ ছিল, রাসায়নিক-দ্রবপদার্থ। পরে অর্থ দাঁড়ায় গুলনির্যাস বা গোলাব (rosewater); তারপর অর্থ হয় যে কোন ফুলের সুগন্ধি দ্রব্য। আমাদের অত্তার ছিলেন রসায়ন-পারদর্শী সুচিকিৎসক, সূফী দার্শনিক, তত্ত্বরসের মহাকবি এবং বিদ্যাবিভূষণ মহাপণ্ডিত বা হ.কীম। তাঁর জন্ম হয় নীশাপূরে, এবং এই নীশাপূরের অদূরে শাদ্য়াখ নামক স্থানে তাঁর সমাধিস্তম্ভ বিরাজমান। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর জন্ম এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে তাঁর মৃত্যু। সেলজু.ক সম্রাট মালেকশার পুত্র সন্‌জরের রাজত্বকাল তিনি পেয়েছিলেন অথবা তাঁর যশোগাথা তাঁর শ্রুতিগোচর হ'য়েছিল। তাঁর গ্রন্থে সন্‌জরের প্রশংসা আছে।

আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার ব'লে এসেছি, সে যুগে পুঁথিগত

ব. বি./পারস্য সাহিত্য/৪৬-১০

বিদ্যাকে নিরীক্ষামূলক পরিভ্রমণ দ্বারা বলাহিত করার প্রথা ছিল। পুস্তকের বিদ্যা এইভাবে জোরদার হ'তো এবং জীবনের অনুকূল হ'য়ে গড়ে উঠত। শেখ অত্তারও তাঁর যুগের ভুবন ভ্রমণ আরম্ভ করেছিলেন। এই ভ্রমণ তাঁর অধি-আত্মিক বিদ্যার সহায়ক হ'য়েছিল। তাঁর সুদীর্ঘ প্রব্রজ্যায় তিনি বহু সূফী-সাধকের সঙ্গলাভ করেছিলেন। এইভাবে তাঁর বাল্যের ও তারুণ্যের জ্ঞানপিপাসা জ্ঞানীদের সংস্পর্শে এসে চরিতার্থ হ'য়েছিল। এই পরিভ্রমণের দেশ ও কাল ছিল সুদীর্ঘ। সে বিবরণ—ইরান থেকে মিশর, প্রত্যাবর্তনের পথে সীরিয়া এবং রাজধানী দামাস্কাস, বিশ্ববিদ্যার কেন্দ্র বাগদাদ এবং অবশ্যই ইসলাম ধর্মের পবিত্র পীঠস্থান মক্কাশরীফ, সমগ্র এসিয়া মাইনর বা রূমী তুর্কিয়া, পরিশেষে ভারতবর্ষ। এই বিশ্বভ্রমণ তাঁর বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের সহায়ক হ'য়েছিল। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ-বৃত্তের পরিচয় অত্তারের গ্রন্থাবলী থেকেই জানা যায়। তিনি ব'লেছেন দু'খানা গ্রন্থ তিনি তাঁর দারুখানায় বসে বসে লিখেছিলেন—(১) মুসীবত্-নামা বা জীবন-যন্ত্রণা এবং (২) ইলাহীনামা বা ভাগবতী-কথা, ওই জীবন যন্ত্রণারই অচূক চিকিৎসা। সকল পাঠকই স্বীকার করবেন তাঁর ইলাহীনামা—চিত্তের আরাম, জীবনের শান্তি ও পরিণামের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

সূফীতত্ত্বে যিনি ছিলেন হুজ্জতুল বা প্রমাণ-প্রস্তর সেই জলাল-উদ্দীন রূমী ব'লে গিয়েছেন—শেখ অত্তার সূফীতত্ত্বের সপ্ত ভুবন প্রদক্ষিণ করে গিয়েছেন। জলাল বলেছেন—আমরা রহস্য সাধনার অতি সঙ্কীর্ণ অলিগলিতে ঘুরে মরেছি। অত্তার এই তত্ত্বের সপ্ত নগর অধিগত করে ফেলেছেন—

'হফ্ত্ শহর-ই-ইশ্ক্ রা অত্তার গশ্ত্।
মা হনূজ্ অন্দর্ খম্-ই-য়ক্ কূচয়ম্॥'

তিনি আরও বলেছেন—সনায়ী সূফীদের সাধ্যসাধনতত্ত্বের দু'টি চক্ষু, আমরা সেই চোখ দুটি দিয়েই দেখি। আর অত্তার হ'লেন স্বয়ং আত্মা, যিনি সেই পরমানন্দের সাক্ষাৎ প্রমাণ—

'অত্তার রূহ্ বূদ্ ও সনায়ী দূ চশ্ম্-ই-উ।
মা অজ্ পয় সনায়ী-ও অত্তার আমদীম্॥'

আমরা যারা সূফীজ্ঞানের মুসাফীর, তাঁরা এই দুজনকেই অনুসরণ করে চলেছি।

আমরা চতুর্দশ শতকের আর একজন সূফী কবির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। তাঁর নাম 'অলা-উদ্দৌল সাম্নানী'। ইনিও ছিলেন রহস্যতাত্ত্বিক। তিনি স্বীকার করে গিয়েছেন—

'সির্‌রী-দরূন্-ই-দিল-ই মরা পয়দা শূদ্।
অজ. গুফ্ ত্-ই-অত্তার রো জ. মৌলানা শূদ্।'

আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে সুগুপ্ত রহস্য (সির্‌রী) জন্ম নিয়েছিল সে দুজনের বচন থেকে—একজন শেখ অত্তার অপরজন মৌলানা জলাল-উদ্দীন রূমী। সূফী সাধক অত্তার পার্থিব ভোগসম্পদের জন্য কোনদিন কারোও স্তব-স্তুতি করেন নি। তিনি বলেছেন—

ব' উমর-ই-খ্বীশ্ মদহ.-ই-কস্ ন গুফতম্।
দুর্‌রী অজ. বহর্-ই-দুনিয়া* মন্ ন সুফ্ তম্॥'

আমার জীবনের অস্তিত্ব ভ'রে কোনদিন (ধন দৌলতের আশায়) কাকেও চাটুকথা শোনাইনি এবং কোনদিকেই* আমি স্তবের জন্য মুক্তার মালা গাঁথিনি।

এইবার আমরা শেখ অত্তারের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেবো। এমন কথা প্রচলিত আছে কোরানশরীফের সূরার সংখ্যায় অত্তারের গ্রন্থ-সংখ্যা মিলিয়ে নেওয়া যায়—অর্থাৎ তাঁর পুস্তক ছিল একশো চৌদ্দখানা। Browne একে অতিশয়োক্তি মনে করেন। যতদূর লোকপ্রসিদ্ধ ও প্রমাণসহ আমরা তাই অনুসরণ করব। সে হচ্ছে সংখ্যায় ত্রিশখানা—তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ—

(১) পন্দ্ নামা—উপদেশমালা।

(২) মন্তি. কু'ত. ত.য়র—যাকে বলা চলে বিহঙ্গ সংবাদ বা বিহঙ্গ সংলাপ। এটি সূফী তত্ত্বের প্রমাণ গ্রন্থের অন্যতম এবং অত্তারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

(৩) তথ্ কিরত্ উ'ল অবলিয়া'—সূফী সাধুদের জীবন কাহিনী।

(৪) মুসী.বত্. নামা—দুঃখের কেতাব।

(৫) ইলাহী নামা—ভগবৎ-কথা।

(৬) লিসান্ 'উল গয়ব্—অদৃশ্যের বাণী।

(৭) উশ্‌তুর নামা—উষ্ট্রের জীবন।

এই সপ্তম গ্রন্থে সাধক কবি ব'লেছেন—তিনি স্বপ্নে পয়গম্বরকে দেখতে পেয়েছেন এবং সেই স্বপ্নেই তিনি তাঁর আশীর্বাদ কবিকে জানিয়েছেন। শেখ অত্তারের সর্বশেষ গ্রন্থ বোধ হয়—

(৮) মধ্‌হ্‌র্'ল অজা'ইব—যাকে বলা চলে বিস্ময়ের আবির্ভাব। এই গ্রন্থে শীয়া ভাবের প্রকাশটা খুব বেশি হ'য়েছিল ব'লে কবি অত্তারকে সমাজে ধিক্কৃত এবং নির্বাতিত হ'তে হ'য়েছিল। সে উপদ্রবে তাঁর গৃহ ভস্মীভূত হয় এবং সর্বস্ব লুণ্ঠিত হ'য়ে যায়। এই সময় তিনি মনোবেদনায় মক্কাতীর্থে পরিক্রমা করেন। এরই সাক্ষাৎ ফল তাঁর অদৃশ্যের বাণী—'লিসান্ 'উল গয়ব'।

অনেকে বলেন, তিনি আপন গৃহ নীশাপুরে ফিরে এসে তখনকার দেশজোড়া মোঙ্গল আক্রমণে তাঁর প্রাণ হারান। সে কালটা বোধ হয়, ১২৩০ খ্রীস্টাব্দ।

উল্লিখিত গ্রন্থরাজি ছাড়াও শেখ অত্তারের দীবান বা সঙ্কলন গ্রন্থ ছিল যাতে ছিল তাঁর ক্‌সীদা ও গ্‌জ্‌ল গীতি। আর ছিল 'খুসরোনামা' 'অসরারনামা' 'জ্‌বাহিরনামা' এবং 'মুখতারনামা'। বিরুদ্ধ সমালোচকরা শেখ অত্তারের উপর অজস্র রচনার বাহুল্য দোষ অর্পণ করেন। তাঁর রচনায় বাহুল্য থাকলেও ফলপ্রসূতার অভাব ঘটেনি—একথা সাহস করে বলা যায়। এইবার আমরা তাঁর মস্‌নবী কাব্যখানার আলোচনা করব। কাব্যের নাম বিহঙ্গসংবাদ বা "মুন্‌তি‌ক্‌তু‌ত্‌-ত্‌য়র্"।

এই বিহঙ্গ-সংবাদ একখানা রূপক কাব্য। এতে আছে চার হাজার ছ'শো বয়েত্। বিষয়বস্তু হ'লো বিহঙ্গদের বিহঙ্গরাজ সীমুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা। রূপকের আবরণ উন্মোচন করলেই বোঝা যায় এ যাত্রা সূফী সাধকদের অল্‌হক্‌ বা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। গ্রন্থের আরম্ভ হ'য়েছে খোদাতালার বন্দনা, পয়গম্বরের বন্দনা এবং পয়গম্বর প্রতিনিধি আসল চারজন খলিফার স্তুতিগানে। এঁরা হ্‌জ্‌রত আবুবকর সিদ্দীক্‌, হ্‌জ্‌রত উ'মর ফারুক্‌, হ্‌জ্‌রত ওসমান্ গ্‌নী এবং হ্‌জ্‌রত আ'লী। এই চারজনই খোলফায়ে রাশেদীন্ বা প্রকৃত প্রতিনিধি।

নিশ্চয়ই এই যুগ পর্যন্ত অত্তার সুফী মতাবলম্বী। প্রায় ছশো বয়েতের ভূমিকা অন্তে ৪৫টি মকাল বা আসল আলোচনা। সর্বশেষে আছে এই সুদীর্ঘ তত্ত্বালোচনার খাতিম বা পরিসমাপ্তি।

বহু পাখী সমবেত হ'লো এবং সর্ববাদীসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হ'লো পাখীরা হুদহুদ বিহঙ্গের পথ নির্দেশে সীমুর্গের উদ্দেশে যাত্রা করবে। এই বিহঙ্গ দূতের অতীত সাফল্যের ইতিহাস আছে। এই পাখীকেই য়িহুদীরাজ সলোমন দূত করে পাঠিয়েছিলেন শেবার রাণী—বিলকী.সের কাছে। সুতরাং এই পুরাণ-প্রসিদ্ধ বিহঙ্গদূতই হলেন পথপ্রদর্শক। ঝুঁটিদার এই হুদহুদ পাখী আনন্দের প্রতীকরূপে মিসরে, রাজমুকুটে স্থান লাভ করেছিল। লাতীন ভাষায় উপুপ (hoopoe) রোমানদের কাছে বাৎসল্য ও আনন্দের চিহ্ন। হূদ্ য়িহুদীদের পয়গম্বর বাইবেলের হেবের (Heber)। কোরানের কৌ.মিহূদ সূরা স্মরণ করুন। 'হূদ' পয়গম্বর হ'য়ে এসেছিলেন। হূদা মানে জ্ঞান। সুতরাং এই হুদ পথ-প্রদর্শক প্রতিগমভর পয়গম্বর। সীমুর্গ যে সে পাখী নয়। ইসলাম পুরাণ প্রসিদ্ধ আনকা.। সে জ্ঞানের জ্ঞানী এবং কা.ফ্ (Qaf) পর্বত-বাসী। তার বৃহৎ কলেবর। আবার এই সীমুর্গ গুণে অসমোর্ধ্ব। তার একখানা পালক যেখানে খসে পড়বে সে দেশ আনন্দে পাগল হবে। অতীতে ঘটেছিল তাই। চীনদেশে পড়ে চীনকে সত্যের আনন্দে বিভোর করেছিল। এইজন্য পয়গম্বর বলে গিয়েছেন—'এমন কি চীনেও সত্য অনুসন্ধান করবে।' বৈষ্ণবরা বলেন ভক্তি যেখানে, সেখানেই ছুটে যাও।

কিন্তু হ'লে কি হবে। Tall talks end in smoke। বলার সঙ্গে করার সামঞ্জস্য থাকে না; বুলবুল কলকলিয়ে বললে—'আমি গোলাপ ছেড়ে কোথায় যাব?' কাকাতুয়া ঝুঁটি নেড়ে বললে—'কি করব? আমার সৌন্দর্যই কাল হ'য়েছে। দেখ না সৌখীন মানুষেরা আমাকে খাঁচায় পুরে রেখেছে।' ময়ূর বললে—'যেতাম, কিন্তু জান তো আদমের সঙ্গে নির্বুদ্ধিতার জন্যই আমি স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলাম।' হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে বলে উঠলো, 'আমার জল চাই—বুঝলেন! সাঁতার কাটার জল।' তিতির বলে বসল—'যেথায় যাবে সে কি পাহাড়ে রাজ্য? আমার

বাপু পাহাড় ছাড়া স্বাস্থ্য টেকে না।' বক 'আমার হ্রদ চাই' বলে বসল। আর পেঁচা মুখ ঘুরিয়ে বললে—'মশাই! আমাকে ভাঙা বাড়ী দিতে হবে।' সাধারণ মানুষের সত্যসন্ধানের পরাঙ্‌মুখতা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। মানুষ চায় আরাম, আধ্যাত্মিক পথযাত্রার শ্রম এবং ক্লেশ তারা স্বীকার করবে কেন?

যাক্, অনেক ওজর আপত্তি শেষে যাত্রা শুরু হ'লো। ত্রিশটি পাখী মহত্তম সীমুর্গের উদ্দেশে সুদীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হ'লো। সাত সাতটি দুর্লঙ্ঘ্য উপত্যকা সে দুস্তর পথের মাঝে পড়ে। প্রথমটি 'ত.লব' বা অনুসন্ধান। জানার তাগিদ্ না এলে জানা যায় না; একে বলে অনুসন্ধিৎসা। তারপর আসবে ভক্তির মধ্য দিয়ে প্রেমের টান। রবীন্দ্ ইয়ারকন্দ্ শরদ্ সংখ্যের দুর্বার আকর্ষণ দ্বিতীয় উপত্যকা উত্তীর্ণ করাবে। এ উপত্যকার নাম প্রেম বা ইশ্ক.। কিন্তু আমার ভালবাসা কাকে অর্পণ করছি, এ বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে সে মূঢ় ভালবাসার মূল্য নেই। ভক্তিকে বলা হ'য়েছে 'সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা' কিন্তু সেই প্রীতি হবে জ্ঞান-মিশ্রা। সেইজন্য ইশ্কে. মেশান চাই ম'রিফত্। এই রহস্যতত্ত্ব-দর্শনের মোকা.ম হ'লো তৃতীয় উপত্যকা। এইবার হৃদয় দৃঢ় হ'য়ে প্রণয়াস্পদের জন্য ছুটছে। কোন ভয় নেই এর নাম 'ইস্তিঘ্.না'। চতুর্থ মোকা.মে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় দৈবী অবস্থার প্রথম কথা—ভয় থেকে নিষ্কৃতি। সূফীদের এই মোক.ামে ঘটে নির্ভীকতা। এই শক্তিই সত্যের জন্য জিহাদের প্রেরণা যোগায়। এইবার সত্যস্বরূপের মুখোমুখী হ'য়ে সাধক তাঁর সঙ্গে সারূপ্য উপলব্ধি করেন। এটি পঞ্চম উপত্যকা। এই ঐক্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই আসে মহাবিস্ময় বা হ.য়রত্। এটা ষষ্ঠ মোকাম। তখন অস্মিতার বিলোপ ঘটে। অহংবোধ তিরোহিত হয়ে যায়—আত্মবিলুপ্তি ঘটে। ছোট আমি বড় আমিতে মিশে একাকার হয়। এতদিন নিজেকে তোমার বান্দা ভেবেছিলাম—মনে ক'রেছি—তবৈবাহম্—আমি তোমার দাস, আমি তোমারই। আজ দেখছি ত্বমেবাহম্ 'আমি' 'তুমি' হ'য়ে গেছি—অনা অল্ হক.। এর নাম ফনা বা আত্মোৎসর্গ। এখানে

চুন্ য়.কী বাশদ্ কমী ন বাশদ্ দূয়ী
হম মন্-ই-বর্ খীজ.দ্ ইন্জা হম তূয়ী।

এর পরের অবস্থাই শাশ্বত নিত্যাবস্থা—এ জীবন থাকলেও সে জীবন্মুক্তাবস্থা বা বকা.। এই অবস্থায় এসে আসলে সীমুর্গ ওই ত্রিশটি পাখী সেই সীমুর্গ। আরবী ভাষায় সীর্‌ মুর্গ বা সমরূপ পাখী বা বিহঙ্গরাজরূপেই নিজেদের দেখতে পেল। সে এক আশ্চর্য দর্শন। কোরানশরীফের মধ্যে ঈশ্বরের সর্বময়তার কথা উল্লিখিত আছে। ২৮।৮৮ সূরায় আছে আল্লার অস্তিত্ব ছাড়া সবকিছুই হালিক (নশ্বর), দুনিয়ার সবকিছুই চ'লে যায় (ফানী) কিন্তু মহিমময় আল্লার গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্ব (মুখ) চিরকালই থাকে। তুমি যেদিকেই তাকাও সেইদিকেই আল্লার মুখ দেখতে পাবে। সীমুর্গরা আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্বে সেই পরম সীমুর্গ বা সত্যস্বরূপকে দর্শন করে বিস্মিত হ'লো। আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং। আশ্চর্যবদ্‌ বদতি তথৈব চান্যঃ।

এই অংশের কুড়িটি বয়তের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। সবটুকু নয়—নির্বাচিত অংশটুকু মাত্র তুলে ধরব।

'Once again they became servants with souls renewed ;
Once again in another way were they overwhelmed with astonishment.'

... .

When they looked, that was the Simurgh.

... ...

All of them were plunged in amazement, and continued thinking without thought.

... ...

They besought the disclosure of the deep mystery, and demanded the solution of 'weness' and 'thouness'. Without speech came the answer from that Presence, saying : 'This Sunlike Presence is a Mirror'.

মহাজ্ঞানের মহাদর্পণে শুভক্ষণে শুভবুদ্ধিসম্পান্নদের আত্মদর্শন ঘটে। তখন নিজেকেই দেখা যায়—সে জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তখন স্বর্ণকণা সোনার খনিতে পৌঁছে যায়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিশিখায় আত্মনিমজ্জন করে —"গ.র্‌ক্‌.-ই-আতশ্‌ শুদ কসী কান্‌জা রসীদ্‌"।

Who soever enters It sees himself in It : in It he sees body and soul, soul and body.........

Ye yourselves see, and it is yourself you have looked on. (E. G. Browne)

'চুন্ নিগাহ্ করদনদ্ ইন সী-মুরগ. জুদ্।
বেশক্ ইন্ সীমুরগ্. আন সীমুরগ্ বুদ্॥

এই রহস্যের জ্যোতি সকলে দেখতে পায় না, ভাগ্যবান্ দেখে। সহস্র সহস্রের মধ্যে সে ভাগ্যবান্ এক-আধজন হয়—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

(৭—৩ জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ)

সূফী সাধক অত্তার এই অবস্থায় বললেন—কেউ মনে করে মিহ্রাব বা খোদার ঘরই খোদা; কেউ বা খোদার মূর্তি গড়ে মনে করে 'এই খোদা'—

ইন্ য়কী মহ্.রাব রো আন্ বুত্ ইয়াফ্তহ্।

কিন্তু হায়! দিব্যদর্শনে পরমজ্যোতির সাক্ষাৎ পায় ক'জন?

স.দ্ হজা.রান্ মরদ্ গুম্ গরদদ্ মদাম্।
তা য়কী অস্‌রা.র্ বীন্, গরদদ্ তমাম্।

শত শত, হাজার হাজার সাধারণ মানুষের নিশ্চিহ্ন পতন ঘটে যায়; কোন এক ভাগ্যবান সেই রহস্য দেখে; কিন্তু পড়ে যায় প্রায় সকলে। একটি গ.জ.লে সূফী অত্তার বললেন,—একটা ব'য়ে যাওয়ার পথ আছে সেটা শরাবখানার পথ। এ পথে নিজেকে হারিয়ে ফেলা খুব সোজা 'গুম্ গুদন্ রো বেখ্.দীস্ত্ রাহ্-ই-খরাবাত্।' ওটাই আত্মোৎসর্গ বা ফনা। সেটা 'লা' বা অনস্তিত্বের অবস্থা। অন্তরের চিৎশক্তি জাগিয়ে তুললেই দেখবে—ভেতরে তুমি একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। যদি স্ফুলিঙ্গই হও তবে সূক্ষ্মদর্শী বাতি.ন্ ভেতরটা দেখ—বাইরের ধোঁয়া দেখে কোন লাভ নেই—অত্তারের ভাষায়—

নুক্.ত.হ্-ই-আতশ্-অস্ত্ দর বাতি.ন্।
দুদ্ দীদন অজ.-উ চেহ্ সূদ্ বুবদ্?

শরাবখানার সোজা পথে যাও, বেখুদী নিশাত্ হবে।
আলোর কণিকা নিজেরে হারাও বহ্নির উৎসবে॥

জালাল-উদ্দীন

জালাল-উদ্দীন এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পুত্র। তাঁর পিতার নাম বাহা-উদ্দীন মহ.ম্মদ, যাঁর উপাধি ছিল 'সুলতান-অল্-উলেমা'। আ'লিম মানে পণ্ডিত তার বহুবচনে উলেমা। যিনি পণ্ডিতকুলের প্রদীপ্ত সূর্য (প্রধান) তিনিই সুলতান-অল্-উলেমা। এই পণ্ডিতের পুত্রই জালাল-উদ্দীন। সেকালের বিদ্যানুশীলনের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র 'বলখ' নগর ছিল তাঁর জন্মভূমি। যিনি জন্মসূত্রে 'বলখী' এই উপনামে পরিচিত হ'তে পারতেন, তিনি অদৃষ্টসূত্রে প্রসিদ্ধ হলেন 'রূমী' এই উপনাম নিয়ে। এখনকার এসিয়া মাইনর ছিল সে যুগের 'রূম'। মধ্য এসিয়ার পূর্ব থেকে স'রে গিয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্র হ'লো এসিয়ার পশ্চিম প্রান্ত। এতেই বোঝা যায় জালাল-উদ্দীনের সাতষট্টি বছরের পরিমিত আয়ুষ্কাল (১২০৭-১২৭৩) ঘটনার ঘনঘটায় পরিপূর্ণ ছিল। সংক্ষেপে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই।

যখনকার কথা বলছি তখন খ্বারজ.ম বা খ্বীবার অধিপতি শুধু ঐশ্বর্যে এবং সম্পদে নয়, পাণ্ডিত্যের কদরদান হিসাবেও সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এই রাজ্য তখনও মোঙ্গল অভিযানের ঝটিকা-ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেনি। খ্বারজ.ম সম্রাটের আত্মীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন জালাল-উদ্দীনের পিতৃদেব বাহা-উদ্দীন, যিনি ছিলেন জ্ঞান-তাপস ও সূফী-সাধক। কিন্তু,—

'বড়ার পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।'

এ কথার তাৎপর্য হ'লো—বড়লোকের মর্জির কোন স্থিরতা নেই - কখন যে খুশী, কখন বেজার—কে তা বলবে? সম্রাটের অনভিপ্রেত আত্মীয় বাহাউদ্দীন সপরিবারে বলখ্ ছেড়ে অনির্দিষ্ট পথের যাত্রী হলেন। এসব মানসিক বিপর্যয়ে তীর্থযাত্রায় খানিকটা অবসাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। বাহাউদ্দীন সপুত্রক মক্কার পথে অগ্রসর হ'লেন।

পথে বাগদাদ। এইস্থানে তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'লো দুজন মনীষীর: (১) মহান্ সূফী সাধক শিহাবুদ্দীন উমর সোহ্রাবর্দী; (২) কবি ও তত্ত্ব-রসিক ফরীদুদ্দীন অত্তার। জালাল তখন বালক মাত্র। বালকটির প্রতিভাদীপ্ত মুখখানা দেখে সাধক কবি অত্তার তাকে কোলে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং ভাবী গৌরবের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করলেন। সেই সঙ্গে তিনি স্বহস্তে উপহার দিলেন তাঁর তত্ত্বরসের মহাগ্রন্থখানা—'অসরারনামা'।

বাগদাদ থেকে মক্কা গিয়ে সেখানে 'হজ' সম্পূর্ণ ক'রে পিতাপুত্র এলেন 'লারিন্দ্' নামক স্থানে, এর বর্তমান নাম করমান্ (Qaraman)। এই রাজ্য তখন সেলজ্.ক সুলতানের অধীন। সাত বছর এখানে বাসের পর ১৮ বছর বয়সে জালালের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় গৌহর খাতুনের সঙ্গে। সেলজ্.ক সুলতান আলাউদ্দীন কয়ক.বাদের বিশেষ অনুরোধে নবদম্পতী রাজধানী কে.ানীয়তে বসতি স্থাপন করেন। এই ইতিহাসেই বোঝা যায় কেমন করে বলখী জালাল শেষে রূমী বলে পরিচিত হয়ে রইলেন। জন্মসূত্রে পূর্ব এসিয়ার 'বলখ' নীরবে নিমজ্জিত হয়ে গেল পশ্চিম এসিয়ার রূম পরিচয়ের মধ্যে। কবি আর পূর্ব এসিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন নি।

মৌলানা জালাল-উদ্দীন রূমী সূফী সাধক এবং সূফী কবিকুলের শিরোমণি। জালাল এবং গৌহরের দুটি মাত্র পুত্র (১) আলাউদ্দীন্ (২) পরবর্তী জীবনে সুলতান বলদ নামে প্রসিদ্ধ বাহাউদ্দীন। কে.ানীয়ায় সংঘটিত এক সংঘর্ষে জ্যেষ্ঠপুত্র আলাউদ্দীন পিতৃদেব জালাল-উদ্দীনের গুরুদেব শামসুদ্দীন তব্রীজ.ী সহ নিহত হন।[১] জালাল শৈশবে পিতৃসকাশে সূফীতত্ত্বে দীক্ষিত হ'লেও—এই গুরুর কাছে অনেক রহস্যের আলো দেখেছিলেন। সুতরাং তিনি দ্বিতীয়বার পিতৃকল্প গুরু-বিচ্ছেদে অভিভূত হন। সূফীগুরু শামসুদ্দীন সম্বন্ধে নিকোলসান বলেছেন—তিনি ছিলেন যেন অপার্থিব, অলৌকিক এবং অবিশ্বসনীয় এক পুরুষ। কালো পশ্‌মিন পুশে আগাগোড়া আবৃত হ'য়ে চকিতে দর্শন দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে যেতেন। এইজন্য তাঁর একটি নাম ছিল 'পরিন্দহ্' বা বিহঙ্গম। খ্‌ানদানী বা

---

১ কেউ কেউ বলেন শামসুদ্দীন অন্তর্হিত হ'য়ে যান। কেউ আর তাঁর খোঁজ পেলেন না।

দরবেশতানী শিক্ষার কাছ দিয়ে না গেলেও চরম ও পরমতত্ত্বের দিব্যদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন তিনি। কে.ানীয়-বাসের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হ'য়েছিল জালালের জীবনে এই মহাপুরুষের সঙ্গলাভ। আকস্মিক দুর্ঘটনায় অনিশ্চয়ের রহস্যে ঘেরা এই মহাপুরুষের তিরোভাবের পর থেকেই ঢিলেঢালা গৈরিকবাসে সজ্জিত মৌলবী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'লো। এই মহাপুরুষ আধ্যাত্মিক অনুভূতির তীব্র প্রেরণায় ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতেন। জালাল-উদ্দীন প্রবর্তিত সম্প্রদায় সেই প্রথা বজায় রেখে চলছেন। য়ুরোপে এই সম্প্রদায় 'Dancing Darvesh' রূপে পরিচিত।

খয়ামীর একটি রুবাই আছে তাতে দেখা যায় মহাশূন্যে গ্রহমণ্ডলের পাক খাওয়াকে তিনি দরবেশ নৃত্য বলছেন; সুতরাং নৃত্যপরায়ণ দরবেশরা জালাল-উদ্দীনের বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিলেন। এই সম্প্রদায় সুদীর্ঘদিন চলেছে। এই সম্প্রদায়ের মূল কর্মসচিব 'চেলিবি' বলে প্রসিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত বিখ্যাত কবি মীরজা ঘ.ালিব ছিলেন 'চেলিবি' বা ভারতের কর্মসচিব। কে.ানীয়তে প্রতিষ্ঠিত মৌলানা রুমীর সমাধি স্থান 'কুব্বাহ্-ই-খজ্রা' আজও দর্শনীয় পবিত্র স্থান।

এইবার সাধক কবি মৌলানা রুমীর রচিত গ্রন্থগুলির পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

(১) আধ্যাত্মিক ভাব-সমৃদ্ধ, নানা উপাখ্যান-জড়িত নানা মনীষার সূক্তি বিভূষিত ২৬,৬৬০ বয়তে রচিত, ছ'টি খণ্ডে সমাপ্ত বিখ্যাত কাব্য 'মস.নবী-এ মন'বী' কাব্য। মৌলানার প্রিয় শিষ্য এবং কর্মসচিব (চেলিবি) হু.সাম 'এর নামে এই কাব্যের আর এক নাম 'হু.সামনামা'। কাব্যখানা আগাগোড়া রমলছন্দে রচিত। এই ছন্দে ৬টি করে পর্ব থাকে (Hexa-metre)—এর মধ্যে পাঁচটি পূর্ণ পর্ব এবং শেষ পর্বটি খণ্ডপর্ব। এই মস.নবী কাব্যখানাকে অনেক সময় ফার্সী ভাষায় নিবদ্ধ কু.রান্ বলা হয়ে থাকে—"হস্ত্ কু.রান্ দর জ.বান এ ফারসী"। এ সম্বন্ধে স্বয়ং গ্রন্থকার জালাল-উদ্দীনও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ব'লে মনে হয়। সূফীদের মধ্যে দুটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তর্কাতীত হ'য়ে ফুটে ওঠে। (১) নিখিল বিশ্বের সমস্ত ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। (২) এইজন্যই এঁরা সাম্প্রদায়িক ভাবমুক্ত এবং পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বিবর্জিত। আবার সেই জন্যই বাহ্য

আচার অনুষ্ঠানের প্রতি এদের ঔদাসীন্য। একথা ঠিক, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সুফী ধর্ম তার জোয়ার হারিয়ে বসেছে। ধর্মবিমুখ, আধুনিক জগতের বিজ্ঞান-সেবাই তার কারণ। তথাপি যদি কোন ধর্ম নির্দ্বিধায় বিশ্বতোমুখ হ'তে চায়—সে এই মৌলানা প্রবর্তিত বাহাই—অন্য কিছু নয়। জালাল-উদ্দীন কু.রানের মহাবাণীতে শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু অনুষ্ঠান সর্বস্বতায় এই ধর্মকে বিশ্বধর্মের পরিপন্থী ক'রে তুলতে চান না। এইজন্যই তিনি বলেছেন, 'মন জ. কুরান্ মগ্.জ. রা বরদাশতম্। উস্তুখোয়ান্ পেশ-এ-সগান্ আন দাখত্.ম্॥'--এ তাঁর স্পর্ধিত উক্তি নয়, সত্যলিপ্সু.র অনুষ্ঠান বৈমুখ্যের স্পষ্ট ভাষণ। জালালের কথাগুলিকে বাংলায় অনুবাদ ক'রে দিই—

আমি কোরানের মগজ তুলিয়া জ্বালাই মোমের বাতি।
ছুঁড়ে ফেলা হাড়ে কুকুরের দল কলহে উঠেছে মাতি॥

মৌলানার মস.নবী তথ্যের সাহায্যে গভীর তত্ত্বের সম্পন্ন ভাণ্ডার। তথ্যগুলি ছোট ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্ত ও উপমা'র সাহায্যে মূলতত্ত্বে পৌঁছে দেয়। অতঃপর উল্লেখযোগ্য জালালের গদ্যগ্রন্থ 'ফীহ মা ফীহ'। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গ্রন্থকে বলা চলে 'সুহ.বত্-এ-রুমী'—রুমীর আলাপ আলোচনার সংগ্রহ সঙ্কলন, এর সংগ্রহকর্তা জালাল্-উদ্দীনের এক শিষ্য নাম ময়ন্-উদ্দীন পরয়ানা।

রুমীর তৃতীয় গ্রন্থের নাম করি—'দীয়ান্'। সুফী তত্ত্বরসের অসমোর্ধ্ব বিশ্লেষণ ঘটেছে এই দীয়ানে। সেই তত্ত্বরস পরিমার্জিত বুদ্ধি এবং অনুশীলিত হৃদয়ের কাছেই তার সবটুকু মহাভাব উদ্ঘাটিত করে দেয়। ভাব-সিদ্ধ অথবা সাধনায় অভিনিবিষ্ট মানুষ ভিন্ন দীয়ান্ কখনো তার অর্গল মুক্ত করে দেয় না। অতঃপর আমরা 'দীয়ান্' গ্রন্থের অর্গল অবারিত করার চেষ্টা করি।

তত্ত্বদর্শী জালাল বলেন ঈশ্বরের স্বরূপ বিশ্লেষণ মানুষের সাধ্য নয়; তবে উপলব্ধিতে ধ্যানযোগে তিনি মাঝে মাঝে ধরা দেন। আমরা তাঁর অনেক নাম দেই, অনেক গুণের বর্ণনা করি কিন্তু তিনি নাম ও গুণাতীত। অথচ আমাদের চিন্তাধারা সেই নামগুণকেই প্রদক্ষিণ করে চলে।

গর্ তরহ্ হম্ মী কুনদ্ উ 'ইশক-ই-থাত্।
থাত্ ন বুরদ্ বো হম্-ই-এস্মা বো স্বফাত্॥
বো হম্ জ.ায়দহ্ জ. অউ স্বাফ্ বো হদ্ অস্ত্।
হ.ক্ ন জ.ায়দহ্ অস্ত্ উ লম্ ইউলদ্ অস্ত।

সুতরাং বলা চলে ভগবদ্‌চিন্তা গুণ নাম ও প্রশস্তির মধ্যেই সঞ্জাত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর—সেই সত্য স্বরূপের কোন জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তিনি জনক নন, জনিত হন না। তিনি লম্ ইউলদ্। আর যদি বলতে ইচ্ছে হয় তাঁকে বলো লম্ ইয়জ.লী—সেই সত্য স্বরূপ সনাতন। সর্ব কারণকারণম্।—"স কারণং কারণাধিপাধিপো, ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।"

কিন্তু সহজে সে উপলব্ধি আসে না। মানুষ আত্ম কামনায় ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। এটা মহাপ্রকৃতির রঙ্গশালায় এক লীলা। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ল। সৃষ্টিরহস্য সন্ধানে ঋগ্‌বেদে দেখতে পাই—

'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীত্॥'

মহাসৃষ্টির উষালগ্নে সর্বাগ্রে জন্ম নিয়েছিল কামনা। এই কামনাই মনের বীজ। জালালের চিন্তাধারা অনুরূপ প্রবাহে বয়ে চলেছে। মানুষ আত্মকামনায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। জ্ঞানযোগীরা 'আত্মকাম' পরিহার করে 'আত্মারাম' হয়ে থাকেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে—ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি বুদ্ধি, স্বভাব এই সপ্তব্যূহ যখন প্রথমটিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়—তখনকার আনন্দের সীমা নেই। জালালের কথা—মানুষ এই আত্ম-কামনার প্রমত্ত খেলায় প্রতিনিয়ত কেন্দ্রচ্যুত হয়ে চলেছে। তার মধ্যে খোদায়ী শক্তি তখন অনুভবের মধ্যে আসে না। অথচ সে অল্ নূরেরই এক প্রকাশ, বিরাট্ আতশের এক স্ফুলিঙ্গ। জালাল বলেন এটাই মনুষ্য সমাজের বড় দুঃখ। তিনি আমাদের স্বয়ং যে ধরে আছেন, আমরা যে কত মোচড়ে তাঁর সঙ্গে জড়ানো সূতো তা আমরা বুঝি না। তার আরম্ভ শক্তিতেই আমাদের অস্তিত্ব, নৈলে আমাদের কি মূল্য আছে? তিনি আরম্ভের আলিফ—আমাদের সবকিছু তাঁকে আশ্রয় করে।

মা কিষ্মিম্ অন্দর্ জহান্-ই-পীচ্-পীচ্।
চু আলিফ্ উ খুদ চিদারদ্? হীচ্, হীচ।

আমরা বুঝেও বুঝি না, এই তত্ত্ব প্রাণেরই প্রেমিক, তাকেই ঘিরে থাকতে চায়। আমাদের ম'অশূক-ই সত্য এবং সনাতন, আমাদের ম'অশূক-ই চিরজীবন্ত—দেহাভিমানী আমরা মরণশীল, আত্মা আর দেহের মধ্যে মিথ্যা অস্মিতার পর্দা ঝুলছে।

জুমলহ্ ম'অশূক. অস্ত্ বো আশিক. পরদয়ি।
জি.ন্দহ্ ম'অশূক. অস্ত্ বো আশিক. মুরদয়ি।
প্রিয়তমা মোর চির সনাতন যবনিকা ঢাকে মোরে।
প্রিয়তমা মোর আছে জীবন্ত আমি তন্দ্রার ঘোরে॥

মহাসাধক হ.ল্লাজ 'অনা অল্ হক.' উদ্ঘোষণা করে চরম বিপদ টেনে এনেছিলেন। জালাল তাঁর গন্থরচিত কথামৃতে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। অল্হক. বা সত্য স্বরূপে 'ইস্তিঘ.রাক.' বা তাদাত্ম্য নিদিধ্যান দ্বারা সম্পূর্ণ সমর্পিতের কোন কাজেই আর অস্মিতা থাকে না। 'তখন মক্ষিকাও গলে নাকো পড়িলে অমৃত হ্রদে।' সে থাকে, কিন্তু তার সর্বইন্দ্রিয়, সর্বশক্তি স্তব্ধ। আল্লাও তাই চান। একবার আমাতে সমর্পিত হও, দেখ, আমিই তোমার ভার গ্রহণ করে বসে আছি। গীতার সেই 'যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণয়ম্' সেই অবস্থায় শ্রীভগবান্ বলেন—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' তুমি যদি আমাতে সর্বস্ব সমর্পণ কর, তবে তোমার সব প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত সংরক্ষণ আমিই করব। সর্বস্ব সমর্পিতের দশা বা অবস্থার নাম 'বক.া'—জীবন্মুক্তাবস্থা। এই সমর্পণের মধ্য দিয়েই মুসলিমের ইসলাম ধর্মের তাৎপর্য সত্য হয়ে ওঠে। অস্মিতার চেতনা যতক্ষণ ততক্ষণ ভক্ত বলে 'আমি তোমার দাস'—'অনা অল্ 'অব্দ' আমার আমিটুকু তাঁতে নিমজ্জিত হ'লেই অনা অল্ হক্.। 'তুমি আজ আমা মাঝে আমি হয়ে আছ।' এখানেই সূফীদের চরম উপলব্ধি—এটাই ঐ ধর্মের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

জালাল বলেন আত্মকামনা বিসর্জন দাও—কামনার রাজ্যে এক কদম অগ্রসর হওয়াও সর্বনাশের কারণ—Paradise Lost বা জন্নত্ জুদায়ী তার পরিণাম।

'খুব্ কদম্ জ.দ্ আদম্ অন্দর্ খৌফ্-ঈশ্।
শুদ্ ফিরাক.-ই-স্বদর্-ই জন্নৎ স্তৌক.-ই-নক.স্॥

মনুষ্য জন্মের তাৎপর্য এক তপস্যা। তাপ ও তপস্যার মধ্য দিয়ে মানুষ স্বর্গ-ভ্রংশকে ব্যর্থ করে দেয়। আবার খোদার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যায়। যতক্ষণ সে শুভমিলন সংঘটিত না হয়, ততক্ষণ বিরহের ক্রন্দন চলে। জালাল বলেন বাঁশী করুণ সুরে কাঁদে কেন—জান? ওই বাঁশের টুকরো রেণুকুঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে—তাই সে কাঁদে, কেবলই কাঁদে। মানুষও কাঁদে—কবেকার তিমিরাচ্ছন্ন যুগে সে আনন্দের মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে; তাই তাঁর ক্রন্দন। বাঁশী বলে আমার সুরে পুরুষও কাঁদে, নারীও কাঁদে—

'বশনূ অজ. নয় চু হি.কায়ত্ মী কুনদ্?
অজ. জুদায়িহা শিকায়ত্ মী কুনদ্।
কজ. নয়স্তান্ তা মরা ব বুরীদহ্ অন্দ্।
অজ. নফীরম্ মরদ্ রো জ.ন্ নালীদহ্ অন্দ্॥

(মস.নবী)

সেই পরম জ্যোতিকে খুঁজে বের করতে হবে—এরই নাম তপস্যা। তিনি তাঁর প্রকাশের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছেন। প্রেম তাঁর প্রকাশ কিন্তু সে প্রেমের সনমকে আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাই না, তিনি প্রচ্ছন্ন। আবার তিনি নতুন খেলা খেলেন—লীলার জগতে আমাদের মাতোয়ারা ক'রে সেখান থেকে বাইরে চলে যান। কখন ভেতরে লুকোচুরি, কখনো বাইরে তিরোধান। ধরতে পারিনে, তাই কাঁদি—

'ইশক.-এ-উ পয়দা রো ম'শূক্শ্ নিহান্।
ইয়ারবীরূন্ ফিত্ন্ ই-উ দর্ জহান্॥'

ভালবাসা তাঁর জাগে থেকে থেকে, সে আছে সদাই গুপ্ত;
জগৎ জুড়িয়া তাঁর অনুভব সে নহে কখনো লুপ্ত।

সূফীর ধর্ম প্রেমের ধর্ম; এর ধরণধারণ, আচার-আচরণ অনুষ্ঠান-সর্বস্ব অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সগোত্রতা রক্ষা করে চলতে পারে না; অথচ এ ধর্ম কদাচ নাস্তিক মতবাদ নয়। এ ধর্ম ধারণ করে থাকে খোদাকে—তিনি প্রেমিক, আমরাও প্রেমে সমর্পিত আমাদের মিল্লত্ (ধর্ম)

আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং, যিনি আমাদের ধারণ ক'রে আছেন তিনি আলিফ আমরা ধৃত-আশ্রিত।

মিল্লত্-ই-ইশ্ক. অজ. হম দীনহা জুদাস্ত্।
আশিক.াঁরা মিল্লত্ বো মজ.হব্ খুদাস্ত্॥

দেখ, তিনি অরূপ হলেও যদি কারও মনের মুকুরে তাঁর কোন রূপের ছায়া আসে, আর সে যদি তাঁর উপাসনা ঐ রূপের মধ্যেই করতে থাকে, তবে সে কি পাপ? তোমরা এ অবস্থায় মুসা (Moses) ও মেষপালকের গল্প স্মরণ করো। খোদার রূপ কল্পনা করে এক মেষপালক তাঁর এবাদৎ করছিল। খোদার বার্তাবহ ব'লে স্বীকৃত মুসা রূপের উপাসনার জন্য তাকে তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু, তখনই তিনি এই আকাশবাণী শুনলেন—

'মা জ.বান্ রা-নিগরীম্ বো কাল্‌রা
মা দরূন্ রা নিগরীম্ বো হ.াল্‌রা।
তু বরায্ বস্‌ল্‌করদন্ আমদী
নই্ খুদ্-অজ. বহর্-ই-বরীদন্ আমদী।

আমরা ভাষাও দেখি না, শব্দও দেখি না; আমরা দেখি মানুষের অন্তরের অন্তস্তল, মানুষের অবস্থা। তুমি আমার পয়গাম নিয়ে গিয়েছ মানুষকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য। আমার থেকে ঠেলে বাইরে নেবার জন্য তুমি যাও নি।

ঈশ্বরের যে বিশেষ কোন ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই, তা কি সুন্দর ক'রে বোঝান হ'লো। যিহুদীরা যাকে জানতেন এবং বুঝতেন এবং ভালবাসতেন হিব্রু—একথা যিহুদীর পুরাণ বলে। হিন্দুরা জানে দেবতারা সংস্কৃতই বোঝেন তাই ও ভাষা দেবভাষা। শাস্ত্রার্থের মর্মবেত্তারা কিন্তু বলেন—যে ভাষাই বলো, ঐকান্তিকতা থাকলে ঈশ্বর তা' শোনেন; জানবে—ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ। ভগবান্ অন্তরের ভাবটুকু গ্রহণ করেন, প্রকাশের ভাষাটা নয়।

রুমী তাঁর দীবানে একটি গ.জলের মধ্য দিয়ে এক বিশ্বধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন। সে ধর্মের বিশেষ সম্প্রদায় নেই, বিশেষ জাতি

নেই। সে ধর্ম বিশেষ কোন দেশের মাটিতে সীমাবদ্ধ থাকে না ; সে প্রেমের ধর্ম বিশ্ব-বিসারী, সে ধর্মে নিখিল বিশ্ব মিলে যেতে পারে।

মকানম্ লা মকান্ বাশদ্ নিশানম্ বে নিশান্ বাশদ্।
নহ্ তন্ বাশদ্ নহ জান্ বাশদ্ কে মন্ অজ. জান-ই-জানানম্॥
নহ্ অজ. চীনী নহ্ অজ. উক.বা নহ্ অজ. জন্নত্ নহ্ অজ. দোজ.খ্।
নহ্ অজ. আদম্ নহ্ অজ. হ ব্বা নহ্ অজ. ফেরদৌস্ রো য্দানম্॥

আমার গৃহ নেই, ঠিকানা নেই, আমি এই দেহে নেই, এই ছোট্ট প্রাণে নেই, আমি মহাপ্রাণের উৎস থেকে এসেছি। আমার কোন ধর্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, পুনর্জন্ম নেই, আমার স্বর্গ নেই, নরক নেই, আমি আদম থেকে বা হাওয়া থেকে আসি নি, স্বর্গোদ্যানও আমার উদ্ভব স্থান নয়, জঞ্জালও নয়।

যদি আমরা জালালকে কানে কানে বলতাম—'তা হ'লে রুমী বলো। আমি হিন্দু, আমি শুনতে চাই তুমি কে ? তা হ'লে জালাল কানে কানে বলতেন—ব'লো হিন্দু ! ব'লো, তোমার শাস্ত্রের ভাষায় ব'লো,—

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবশ্চ। রাজতেঽবধূতো দ্বিতীয়োমহেশঃ॥

বল হিন্দু তান্ত্রিক। তোমার তন্ত্রের ভাষায় ব'লো—

মাতা মে পার্বতী দেবী, পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

উপলব্ধি করার চেষ্টা করো তোমার ব্রহ্ম 'বহিরন্তশ্চভূতানাম্'। তিনি জ্যোতির জ্যোতি—এমন জ্যোতি যে তাঁকে তুলনা দিয়ে বোঝান যায় না। সূর্য নয়, চন্দ্র-তারকা নয়, বিদ্যুৎ নয়—পার্থিব অগ্নির কথা তোলাও বৃথা। তিনিই আলোর আলো।

'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'

তাঁরই আলো পেয়ে সব আলোময়। তাঁকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর আলোতেই চোখ সব দেখে। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি। তুমি বলতে পারো—এই চোখ আর ওই আলো

ব./বি.পারস্য সাহিত্য/৫৬-১১

তখন মিলে মিশে একই হয়ে যায়। মহা সাধক জালালুদ্দীন বুঝে বললেন—

ঈন্ চশ্‌ম্ বো আন্ চিরায়, দু নূর অন্দর্‌হর য়কী।
চু ঈন্ বহম্ রসীদ্ কসী শান্ জুদান করদ্॥

এই চোখ আর ওই আলো শিখা এক ক'রে দেয় যেবা।
এই চোখে এসে সব ধরা দেয়, সেকথা বুঝিবে কেবা?

জালাল অনুভব করেছেন তিনি ক্ষণে ক্ষণে শরাবী শরাব ও সাকীর সঙ্গে এক হয়ে যান। তাঁর ভেঙেচুরে নতুন গড়া এক জাদুখেলা—

খুদ হম উ আব অস্ত্ বো সাকী বো মস্ত্।
হর সে ইয়েক্ শবদ্ চুঁ তিলসমে-তু শিকস্তহ্॥

শরাব শরাবী এক ক'রে তুমি সাকীরে মিশিয়ে ঢালো।
ভাঙা গড়া নিয়ে এই জাদুখেলা জালাল বুঝেছে ভালো॥

আমীর খুসরো

সূফী ধর্মের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, আরব বা মধ্য এসিয়ায় এই প্রবাহ সীমাবদ্ধ না থেকে দূর দূরান্তে বিস্তৃত হ'য়ে পড়ছিল। বৌদ্ধ বা খ্রীস্টধর্মের মত রাজানুগ্রহে পরিপুষ্টির অপেক্ষা না ক'রেই ঘটেছিল তার দূরবিস্তার। সূফীধর্মের মধ্যে যে সমন্বয়ের ঐকান্তিকতা আছে, তারই সাহায্যে সে মানুষের হৃদয় অধিকার ক'রে চলেছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে বলা চলে, মধ্য এসিয়ার এই ধর্ম-স্রোত মিসরে বলাহিত হ'য়ে শেষে ভারতে প্রবেশ করেছিল। প্রথম পর্যায়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দুয়ার এই মতবাদের সংস্পর্শে এসেছে। পাঞ্জাবের মুলতান ছিল এই ধর্মের একটি কেন্দ্র। ইরাকী. প্রসঙ্গে এবং তাঁর গুরু জ.কারিয়া সম্বন্ধে তার চিত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমই এই ধর্মের একমাত্র কেন্দ্র ছিল না। ভারতের আর এক দিগন্ত মনে হয়, সর্বপ্রথম এই প্রেমধর্মের আলোকে সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক দিক থেকে সে কথাটা আমাদের আলোচনার মধ্যে আনা প্রয়োজন।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিন্ধুরাজ ব্রাহ্মণ দাহির আরবের সেনাপতি মোহম্মদ বিন কাসেমের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। দাহিরের এই পরাজয়ের মূলে ছিল বৌদ্ধগণের অসন্তোষজনিত বিশ্বাস-ঘাতকতা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর জাতিভেদ এবং বৌদ্ধ-নির্যাতন বৌদ্ধদের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষের হেতু হ'য়েছিল। তারই প্রকাশ হ'য়েছিল প্রতিহিংসায় এবং বিশ্বাসঘাতকতায়। আশ্চর্যের বিষয় এই অংশে মুসলিম বিজয়োত্তর কালে কোন অশান্তি ছিল না। উৎপীড়ন, নির্যাতন বা বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণের কোন ইতিহাস আরব-বিজিত এই সিন্ধুদেশে ছিল না। আমার মনে হয়, আরব ও হিন্দুর মত বিনিময়ের প্রথম উদার ক্ষেত্ররূপে সিন্ধুদেশ পরিগণিত হ'তে পারে। সুলতান মামুদের

লুণ্ঠন ও নির্যাতনের পালার অব্যবহিত পরেই বিদেশী ভারত-প্রেমিক, ভারতাত্মার তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহান্ পণ্ডিত আল্ বেরুনীকে স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে। সুলতান মাহ্মুদের বার্ষিক অভিযানগুলি উত্তপ্ত ছায়া-ছবির মত এল আর গেল। দানে প্রতিদানে কোন স্থায়িত্বের ইতিহাস রচিত হ'লো না। ভারতে কার্যকরী মুসলিম বিজয় মুহম্মদ ঘোরী থেকে এবং পারস্পরিক নৈকট্যে দান প্রতিদানের পালার সূচনা দাসবংশ থেকে।

এই বংশের পরাক্রান্ত সুলতান তুর্কী ইলতুতমিস পশ্চিম ভারতে সুশাসনের জন্য যেমন অভিনন্দিত হ'য়েছিলেন, তেমনি সুদূর বাগদাদের খলিফার প্রতিনিধি-দ্বারা ভারতেরই বুকে দিল্লীতে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হ'য়েছিলেন। ঠিক এই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চিঙ্গীজ্ খানের রুদ্ররোষ সামান্য একটু ঝলক দিয়েই ধূমকেতুর মত সরে গেল। বুদ্ধিমান ইলতুতমিস চিঙ্গীজে্র বিরাগ-ভাজন খারেজ্মের অধিপতিকে আশ্রয় দিলেন না। কিন্তু আমরা জানি, তখনকার যুগে মোঙ্গল অভিযান মধ্য এসিয়াকে ছারখার ক'রে চলছিল। এই রুদ্র রোষের একটু স্পর্শ পেয়েই আমীর খুসরোর পিতৃদেব আমীর সয়ফ্উদ্দীন তাঁর পৈতৃক নিবাস বল্খ্ থেকে পালিয়ে এসে আগ্রার কাছে পাতিয়ালী গ্রামে নিশ্চিন্ত জীবন পেলেন এবং দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিসের সৈনিক বিভাগের বৃত্তি গ্রহণ করলেন। এখানেই তাঁর পুত্র ভাবীকালের সুবিখ্যাত আমীর খুসরো জন্মগ্রহণ করেন (১২৫৩ সালে)। কবি একাত্তর বছরের পরমায়ু নিয়ে ক্রমাগত পাঁচ-পাঁচজন সুলতানের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। কম কথা নয়, সুলতানগণ পরিবর্তিত হ'য়ে চলেছেন। এমনকি, এক একটি সুলতান বংশের পতন ঘটছে; নতুন বংশের অভ্যুদয় ঘটছে, কিন্তু আমীর খুসরো অপরিবর্তিত রাজানুগ্রহে সম্বর্ধিত হ'য়ে চলেছেন। দাস বংশের গিয়াস্-উদ্দীন বলবন থেকে খালজী বংশের আলা-উদ্দীনের মধ্য দিয়ে তুঘলুক বংশের গিয়াস্-উদ্দীন পর্যন্ত প্রশংসা-ধন্য এই আমীর খুসরো। মানুষটির গুণ ছিল, ক্ষমতা ছিল স্বীকার করতেই হবে। তদুপরি ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাবান্ কবির সুযোগ বুঝে অবস্থা মানিয়ে নেওয়ার অসামান্য কৌশল। এই

প্রসঙ্গে আমরা তিনটি সুলতানী বংশের অন্তত পাঁচজন সুলতানের নাম করব। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে কবির সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার ছিল এবং এরা প্রত্যেকেই গর্বিত ছিলেন আমীর খুসরো তাঁদের রাজসভা অলঙ্কৃত করে আছেন বলে।

দাসবংশের (১) গিয়াস্-উদ্দীন বলবন (২) কায়কোবাদ। খিলজী বংশের (৩) জালাল-উদ্দীন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (৪) আলাউদ্দীন। তুঘলুক বংশের (৫) গিয়াস্-উদ্দীন তুঘলুক। গিয়াস্-উদ্দীন থেকে গিয়াস্-উদ্দীন কবি জীবনের বৃত্তরেখা একই নামে শেষ হয়েছে। অথচ নামে এবং কামে কতনা প্রভেদ! প্রথম গিয়াস্-উদ্দীন অপত্য স্নেহে কবিকে লালন করেছেন। আর শেষ গিয়াস্-উদ্দীন কবির হাত থেকে অজস্র প্রশংসা-মুখর কাব্যকৃতি পেয়েও মনে মনে কবিকে ভালবাসতে পারেন নি ; কারণ আমীর খুসরোর দীক্ষা-গুরু নিজামউদ্দীন আউলিয়া তুঘলুক গিয়াস্-উদ্দীনের চক্ষুশূল ছিলেন। এই প্রবন্ধেই সে সব কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম জীবনে ইলতুতমিসের আশ্রিত ও অনুগ্রহধন্য, শেষে ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরউদ্দীনের শ্বশুর হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন দাসবংশের গিয়াস্-উদ্দীন বলবন। এই বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র মোহম্মদ ছিলেন নিজেও কবি এবং বিশেষ এই কারণেই কবি খুসরোর অত্যাগসহন বন্ধু। এই বলবন পুত্র মোহম্মদ শীরাজের মহাকবি শেখ স'দীকে ভারত দর্শনের আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন। মহাকবি বার্ধক্যের জন্য সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন নি। ঘটনাচক্রে মোহম্মদ মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। পুত্রশোকে বলবন প্রায় উন্মত্ত হয়ে যান। আমীর খুসরোকে পুত্রস্নেহ দিয়ে তিনি অনেকটা মানসিক শান্তি লাভ করেন। মুলতানে দীর্ঘদিন মোহম্মদ ও খুসরো—দুই কবি বন্ধু একসঙ্গে ছিলেন। বন্ধু বিয়োগে আমীর খুসরো মোঙ্গল জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণায় এবং ধিক্কারে ফেটে পড়েন। 'কুৎসিত এই মোঙ্গল জাতির মানুষগুলি। কুৎসিত অন্তরে ও বাইরে। ওদের মুখ থালার মতো। চ্যাপ্টা নাক ও ক্ষুদ্র চক্ষুর মানুষগুলো চোখের কোণ বুজিয়ে রাখে এবং মনে মনে নিষ্ঠুরতার পাপ-চক্র ঘুরিয়ে চলে। ওদের চাক্ষুষ দর্শনই এক মহাপাপ।'

বলবনের দরবার শুধু আমীর খুসরো দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল না। মোঙ্গল

আক্রমণে নির্যাতিত বাস্তুভ্রষ্ট সেদিনের বহু গুণী ও সাহিত্যিক এই রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেছিলেন। এই সব জ্ঞানী গুণীর জন্য সেকালের দিল্লী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য বলবনের রত্নসভার শ্রেষ্ঠমণি ছিলেন হজরত আমীর খুসরো দেহলবী। তিনি সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরে পরিচিত ছিলেন 'তূতী য়ে হিন্দ্' বা ভারত-শুক নামে। বলবনের রাজসভায় আমীর খুসরোর পরিপূর্ণ যৌবন। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী এবং রচনা আকারে ও প্রকারে অজস্র। দৌলতশাহ্ বলেন তাঁর রচনার সমষ্টি অন্তত পঞ্চাশ হাজার বয়ত। কেউ কেউ বলেন তিনি শতাবধি গ্রন্থের রচয়িতা। নিঃসন্দেহে আমীর খুসরোর ২২ খানা গ্রন্থ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর লেখনী চলেছিল সকল স্রুততায়। কসীদা, গ.জ.ল, মসনবী, মরসীয়া নানা রূপে, নানা ভঙ্গিমায়, নানা ভাষায় তাঁর রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তুর্কী, আরবী, পার্সী, সে যুগের প্রত্ন উর্দ্, প্রত্ন হিন্দী বা হিন্দ্ বী, আঞ্চলিক বৃজ ভাষা—নানা ভাষা যেন তাঁর রসনাগ্রনর্তকী। পদ্যে ও গদ্যে সমান দক্ষতায় লেখনী পরিচালনাও এক অসামান্য কৃতিত্ব। কাব্য, কবিতা, লোকগীতি, ইতিহাস, ধর্ম সকল বিষয়ে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর র'য়েছে। সর্বোপরি কথা, সমরবিদ্যা ও কলাবিদ্যাকে সমান দক্ষতায় গ্রহণ করেও তিনি পরম ধার্মিক এবং মার্মিক সূফী সাধক। সেকালের শ্রেষ্ঠ সাধক নিজ.াম-উদ্দীন আউলিয়া তাঁর দীক্ষা গুরু। গুরুর দেহরক্ষার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এ জীবনের মায়া কাটান। গুরুর মাজারের পাশেই তিনি শায়িত মহানগরী দিল্লীতে।

সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা আমীর খুসরোর দীবান বা কাব্য সমষ্টিকে তাঁর জীবনের পঞ্চ পর্যায়ে বিভক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন।

(১) তুহ. ফতুস-স্বগীর—বাল্যকালের রচনা। কসীদা, গ.জ.ল ও তরজী.বন্দ্।

(২) বসাত্ত্.ল হ.য়াত্—যৌবনের রচনা। গুরু নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার এবং পৃষ্ঠপোষক সুলতানগণের প্রশস্তি।

(৩) ঘু. র্ রাতুল-কমাল—মধ্য জীবনের রচনা। এতে আছে সনায়ী, খাকানী, নিজামী ও স'দীর প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি এবং প্রণতি। এতে

আরও আছে নসরত্ উদ্দীন, সুলতান মোহ.ম্মদ, সুলতান্ মু'অজ উদ্দীন, এবং সুলতান কায়কোবাদের প্রশস্তি।

(৪) বকি.য়া-ই-নকি.য়া—বা প্রৌঢ়সীমায় রচনা। এতে আছে মুহ.ম্মদ শাহের প্রশস্তি। ইনি সেই মোঙ্গল যুদ্ধে নিহত কবিবন্ধু গিয়াস্-উদ্দীন বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বন্ধুবিচ্ছেদের কাতর বিলাপে এই গ্রন্থ অত্যন্ত করুণ হ'লেও প্রৌঢ় রচনার সংযমে সুন্দর।

(৫) নিহায়.ত্-উল কমাল হচ্ছে তাঁর শেষ জীবনের কবিতাবলী। এতে আছে গিয়াস্-উদ্দীন তুঘলুকের প্রশংসা এবং সুলতান আলাউদ্দীনের দ্বিতীয় পুত্র কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহের মৃত্যুর জন্য শোক-গাথা বা মরসীয়া।

এই প্রসঙ্গে আমীর খুসরোর মরসীয়া নামক শোকগাথার একটুখানি নমুনা দিতে চাই। এই শোকগাথা তাঁর পরিণত বয়সের রচনা। মাকে তিনি হারিয়েছেন। মরসীয়ার রচনা কাল ১২৯৮ সাল। শৈশবে পিতৃহারা কবির সম্মুখে মায়ের একখানা ছবি রয়েছে। পিতৃহারা পুত্রের হৃদয় জননী এতদিন স্নেহ দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিলেন। শৈশবে পিতৃহারা কবি মাতামহের তত্ত্বাবধানে মানুষ হ'য়েছিলেন। আজ তাঁর স্নেহের জননী নেই।

"রূজী কেহ্ লব্-এ-তূ দর সখুন বূদ্।
পন্দ্-এ-তূ স্বলাহ্ কার-এ-মন্ বূদ্॥
ইমরূজ. মনম্ বমোহর পয়বন্দ্।
খামোশী য়ে তূ হমী দহদ্ পন্দ্॥"

যখনই তোমার ওই ওষ্ঠে ভাষা ফুটেছে, আমি জানি তখন তোমার উপদেশ আমার মঙ্গলের জন্য, সৎ কাজের জন্য বর্ষিত হয়েছে। আজ নীরবতা তোমার ওষ্ঠ মুদ্রিত করে রেখেছে। কিন্তু তোমার নীরবতাই আমাকে উপদেশ দিয়ে চলেছে।

এই চিত্র সাহিত্যরসিকদের কাছে আনবে মাতৃহারা ইংরেজ কবি কুপারের মায়ের ছবিখানি। কুপার তাঁর মায়ের ছবি পেয়ে লিখেছিলেন—'On the Receipt of My Mother's Picture'. সেখানে এই প্রকার বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস:

'Oh that those lips had language! Life has pass'd
With me but roughly since I heard the last.
Those lips are thine—they own sweet smiles, I see,
The same that oft in childhood solaced me;
Voice only fails, else, how distinct they say
'Grieve not, my child, chase all thy fears away.'

—William Cowper

এ নিস্তব্ধতা বেদনার হ'লেও আমাকে প্রেরণা দিচ্ছে। Wordsworth পরবর্তী যুগে নক্ষত্রের আলো-ঝলমলে নিস্তব্ধ আকাশের সৌন্দর্য ছবিতে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'The silence that is in the starry sky.' শুধু তাই নয়—'The silent heavens have goings on.' নিস্তব্ধতা নীরবতা নয় যেমন—'খামোশী য়ে তু দহদ্ পন্দ্'—তোমার নীরবতা আমাকে আজও উপদেশ দিয়ে চলেছে।

এইবার আমীর খুসরোর রচনাবলী থেকে কৌতুকাবহ পাঁচখানা গ্রন্থের নাম করব। ইতিপূর্বে নিজ়ামী গঞ্জবী প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থ-পঞ্চকের উল্লেখ করেছি। পার্সীতে পঞ্চসমন্বয়কে বলা হয় 'খাম্সাহ্' (Quintet)। দেখা যাচ্ছে খুসরো যেন গঞ্জবীর সরণি অনুসরণ করে চলেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা ভাল প্রতিভাবান্ কবি চর্বিতচর্বণ করেন না। একই বিষয়ে নতুন আলোকের সন্ধান দেবার তাগিদ তাদের প্রবর্তিত করে অপরের পদাঙ্কিত পথযাত্রায়। খুসরোর ক্ষেত্রে অবশ্যই তা ঘটেছিল। এইবার 'খাম্সাহ্'এর পরিচয় দিই। বলতে পারি, এ হচ্ছে 'আমীরী খাম্সাহ্'।

(ক) মত্.লা অল্ অনরার (আদর্শ মখজ়.ন্-উল-অসরার) কাব্যের অর্থ আলোর আবির্ভাব।

(খ) শীরীন্ বো খসরু (আদর্শ খসরু বো শীরীন্)

(গ) মজ়.নূন্ বো লায়লা (আদর্শ লায়লা বো মজনূন্)

(ঘ) অয়নয়ী সিকন্দরী (আদর্শ ইসকন্দর্‌নামা) কাব্যের অর্থ সিকন্দর দর্পণ।

(ঙ) হশ্ত্ বিহিশ্ত বা স্বর্গাষ্টক (আদর্শ হফ্ত্ পয়্কর)।

আমীর খুসরোর রচনায় দেবগিরি থেকে মুলতান, মুলতান থেকে

অযোধ্যার মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশ,—ভারতবর্ষের এই ত্রিভুজ যেন বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। ডকটর আবদুস সোভান আমীর খুসরোকে ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় কবি ব'লে অভিহিত করেছেন। ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, জাতীয় জীবন, এমনকি, রণকৌশল—ভারতের কোন দিক যেন এই কবির নাগালের বাইরে নেই। প্রকৃতপ্রস্তাবে, এই কবির রচনা পরিক্রমা ভারত প্রদক্ষিণ। অবশ্য তা শ্রমসাপেক্ষ; তবু আনন্দদায়ক। ইতিহাসের দাস বংশ থেকে খিলজী বংশের মধ্য দিয়ে, তুঘলুক বংশের প্রারম্ভ পর্যন্ত আমরা যেন আমাদেরই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আলোকিত পথে সানন্দে পরিক্রমা ক'রে চলি। পথের আনন্দে পথশ্রম ভুলে যাই। আমীর খুসরোর গ'ড়ে দেবার কৌশল ছিল অসামান্য। তা না হ'লে বুদ্ধিমান, নিরক্ষর সুচতুর নির্দয় আলা-উদ্দীন পর্যন্তও মুগ্ধ হ'লেন কোন গুণে? তিনি সাগ্রহে পিতৃব্য জালাল-উদ্দীনের রত্নটিকে আপন সভায় সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই আলা উদ্দীনের অনুপ্রেরণায় খুসরোর গ্রন্থগুলি সহজে প্রকাশিত হ'য়েছিল। কবির একমাত্র গদ্যগ্রন্থ 'খাজা ইনু-ফুতুহ্' এই সুলতান আলা-উদ্দীনের স্নেহচ্ছায়ায় ব'সে তিনি রচনা ক'রেছেন। এটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ হ'লেও অলঙ্কার ও উচ্ছ্বাসে প্রায় সরস কাব্য হ'য়ে উঠেছে। আশ্চর্যের বিষয়, স্নেহময় পিতৃব্য জালা-লউদ্দীনের হত্যার মধ্য দিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ্দীনের সিংহাসন লাভের দূরতম উল্লেখ পর্যন্ত এই গ্রন্থে নেই। আলা-উদ্দীন সিংহাসনে বসলেন ঈশ্বরের ইচ্ছায়। আল্লাহ্ তা 'আলার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাতেই দুনিয়াতে সবকিছু ঘটে। শুধু সুলতান নয়, রসুল বা পয়গম্বর, এমন কি কোরান শরীফ পর্যন্ত সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর-নির্দিষ্ট রচনা। এই যেখানে ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠা সেখানে তাঁর সর্বশেষ ঐতিহাসিক গ্রন্থ তুঘলুকনামাতেও খাঁটি ইতিহাস অনুসন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য। গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের পিতৃদেব গিয়াসউদ্দীন বলবনের ক্রীতদাস ছিলেন। মাতা ছিলেন জাঠ হিন্দু রমণী। আলা-উদ্দীনের সময় মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্তা হ'ন। দুর্ধর্ষ আলা-উদ্দীনের মৃত্যুর পর শেষ খিলজী সুলতান নাসিরউদ্দীনকে হত্যা ক'রে দিল্লীর মসনদে বসলেন গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক। আমীর খুসরোর দৃষ্টিভঙ্গী অনৈতিহাসিক রঙ্গে রঙ্গীন হ'য়ে উঠলো।

তিনি তাঁর অতুলনীয় ভঙ্গিমায় বললেন—নাস্তিক কাফের নাসিরউদ্দীনকে কোতল ক'রে তিনি কাতিল ব'লে আখ্যাত হ'তে পারেন না। এ ঘটনা ধর্মযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল। বিজয়ী বীর গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক কাফেরকে উপযুক্ত স্থানে পাঠিয়ে হয়েছেন গাজী।

জানি, আধুনিক ঐতিহাসিক মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। আধুনিক ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে মানবিক। মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি, মানুষের হিংসা, বিদ্বেষ, জিগীষা, জিঘাংসা দিয়ে এবং মানুষেরই শক্তি-সাহস রণ-কৌশল দিয়ে ইতিহাস তৈরী হয়। মানুষ অবস্থার অনুরোধে কাজ ক'রে চলে। কিন্তু কালচক্র তো একভাবে থাকে না। যুগে যুগে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আরবের ইতিহাস আল্লাহ্ তা 'আলার কুদরতের ইতিহাস। হিন্দু ভারতের মহাভারত যতো ধর্মস্ততো জয়ের ইতিহাস। গীতায় ভগবান্ বাসুদেবের বাণী—'আমি যা' করার আগেই ক'রে রেখেছি ;—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্'। ঘাবড়াও মত, কাজ ক'রে চলো, শত্রু সংহার কর, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রক্ষা করে চলো। যুদ্ধে তুমি নিহত হ'লে স্বর্গ পাবে, আর বিজয়ী হ'লে পাবে এই পৃথিবী।

পাঠক আমাকে স্বর্গত আমীর খুসরোর অন্ধ স্তাবক মনে করবেন না। আমি বলছি, বিশ্বাস করুন, খুসরো মিথ্যাবাদী নন। তিনি তাঁর 'মিফ্তাহ্-ল্ ফুতুহ্' গ্রন্থে সত্য কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বলেছেন—আমি যা লিখছি তা সুলতান ও সুলতান-তনয়দের অনুরোধে লিখে চলেছি। আর একটা মানবিক দিকও তো আছে ; সেটা কৃতজ্ঞতার প্রেরণা, পুরস্কারের প্রত্যাশা এবং সাহিত্যকীর্তি প্রতিষ্ঠার সহজ উপায়। এমন সহজ সরল সত্য ভাষণের জন্য আমীর খুসরো ধন্যবাদের পাত্র, ধিক্কারের নয়। একাদশ শতকের কাশ্মীরী আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট 'কাব্য দিয়ে কি হয় ?' এই প্রশ্ন তুলে বলে গিয়েছেন—কাব্য যশ আনে, অর্থ আনে, অনেক দেশের অনেক কথা জানা যায়, ওতে ঈশ্বরের এবং ধর্মের কথা থাকলে নিজের অমঙ্গল কেটে যায় ; আবার কাব্য লিখে এবং শুনিয়ে লেখকের এবং শ্রোতার বড় আনন্দ হয়। এতে ভাল ভাল উপদেশ বড় মধুর করে দেওয়া থাকে, যেন প্রিয়তমা বধূর মুখের মধুর উপদেশ। প্রভুদের নির্দেশাত্মক উপদেশ

তো নয়ই, বন্ধুর ভালবাসায় উপদেশের চাইতেও তা প্রিয়তর এবং মহত্তর।—'কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে, ব্যবহারবিদে, শিবেতরক্ষতয়ে। সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশ যুজে।' আমীর খুসরো বললেন, আমার ঐতিহাসিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ ঐহিকলাভ এবং মানসিক বিশ্রামের জন্য। এ আমার অবসর বিনোদনের সহজ ও সরল পন্থা। এই কি শেষ কথা? আমাদের বিশ্বাস হয় খুসরো ইতিহাসের পট পরিবর্তন দেখে দেখে ভাবতেন সাধারণ জীবনই তো দুঃখ দিয়ে ভরা। ঐতিহাসিক জীবনগুলো সর্বদা অনিশ্চয়তার কুয়াসায় আচ্ছন্ন এবং তাদের শেষ পরিণাম সুনিশ্চিত দুঃখ। আমীর খুসরোর কথায় বলি—'ওগো ভোরের বাতাস! নিখিল বিশ্ব সঞ্চারী! তুমিই বলো, এমন কি একটি স্থানও আছে, যেখানে দুঃখ নেই?—গৃয়ী নিশান্ ব্রহ্ জায়ী কেহ্ গ.ম্ নহ্ বাশদ্।

এ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা কবি আমীর খুসরোতে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এটাই তাঁর জীবনের সীমান্ত নয়। আমীর খুসরোর আর এক মহৎ ও বৃহৎ পরিচয় রয়েছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। এইবার তাঁর জীবনের সেই অধ্যায়ের পরিচয় দিতে চাই। এই ক্ষেত্রে সে যুগে তাঁর সংশয়াতীত সফল ভূমিকা।

আলাউদ্দীন আলেকসান্দারের মত বিশ্ববিজয়ের বাসনা পোষণ করতেন। পিতৃব্যের অনুমতি না নিয়েই তিনি দেবগিরির যাদব রাজ্য আক্রমণ করে বিজয়ী হয়ে ফিরেছিলেন এবং পিতৃব্যকে হত্যা করে স্বয়ং সুলতান্ হয়ে অখণ্ড ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ভারত সঙ্গীতে শার্ঙ্গদেব ও তাঁর রচিত মহাগ্রন্থ 'সঙ্গীতরত্নাকর' বহু প্রয়োজনীয় ইতিহাস এবং সঙ্গীতকলার ঐতিহ্য রক্ষা করেছে। অবশ্য কিংবদন্তীও তার সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে আছে। এতে এবং পরবর্তী কাশ্মীরী ফকির উল্লার কথায় বোঝা যায় বংশে কাশ্মীরী এবং উপনিবেশে দক্ষিণী সঙ্গীতাচার্য গোপাল নায়ক এবং আ'মীর খুসরো সমসাময়িক। শোনা যায়, আলা-উদ্দীন খিলজী তাঁর দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত অভিযানে যে সব ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করেছিলেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন এই গোপাল নায়ক। আলা-উদ্দিনের আ'ম মজলিসে খুসরো ও গোপালের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হ'য়েছিল। এসব গালগল্পে মুসলিম ও হিন্দুর পরস্পর স্বপক্ষ সমর্থনের

সুমীমাংসা কখনো সম্ভবপর হয় নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিংবদন্তী সত্য হলেও আমরা বিশ্বাস করি আ'মীর খুসরো ও গোপাল নায়ক কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের দ্বন্দ্বাবসানে পরস্পর 'জিগরী দোস্ত' ব'লে করমর্দন করেছিলেন। আমীর খুসরোর জীবনটাই গুণিজনসুলভ সমন্বয় সাধনের জীবন। এর বহু পূর্ব থেকেই গ্রীক, পারসীক এবং আরবী সঙ্গীতকলার কিছু কিছু উপাদান ভারত সঙ্গীতে প্রবিষ্ট হয়েছিল। য়েমেনী মুসলিমদের সিন্ধু এবং মুলতানে উপনিবেশ স্থায়ী হ'য়ে চলেছিল। আরবের এবং ইরানের সঙ্গীতকলা এই সব উপনিবেশে সগৌরবে অনুশীলিত হতো। আমীর খুসরোর মধ্যে গ্রহণ করে স্বায়ত্তীকরণের শক্তি ছিল অসামান্য। ভারতের কল্যাণ রাগের সঙ্গে য়েমেনী রাগিনী মিশিয়ে তিনি গড়লেন ইমনকল্যাণ। তিনি তাঁর যুগে ব্যবহৃত ভারতী, আরবী এবং ইরানী বাদ্যযন্ত্রগুলির তালিকা দিয়ে গিয়েছেন। পূর্ব ভারতে একতারা, খানসাম্রাজ্যে দোতারা এবং ইরানে সেতারা প্রসিদ্ধ ছিল। আমীর খুসরো তিনতারের সেতারাকে সপ্ততার বিশিষ্ট সেতার ক'রে দিলেন। আদিতে হজরত মোহম্মদের গুণকীর্তন ছিল কবালী। কবাল মানে গায়ক। তিনি এই কবালীকে পার্থিব বিষয়ে টেনে এনে বিশেষ একটা পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ করলেন। খুসরোর শিষ্য প্রশিষ্যরা তাকে আবার খেয়ালে রূপান্তরিত ক'রে দিলেন। ধ্রুব সঙ্গীতের অপরিহার্য যন্ত্র মৃদঙ্গ আরবী তবলার পথ উন্মুক্ত করে দিল। আমীর খুসরো সর্বদাই নিজেকে ভারতী বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব অনুভব করতেন। খুসরোর প্রসিদ্ধ মসনবী কাব্য নুহ্ সিপিহরে তৃতীয় কাণ্ডে তিনি স্পষ্ট ভাষায় সংস্কৃতি বিষয়ে সমগ্র জগতে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের গুণগান করেছেন। তাঁর পারসী রচনাতেও যথেষ্ট ভারতীয় শব্দের গাঁথুনি রয়েছে। বংশ-রক্তধারায় প্রিয় তুর্কী আরবী পারসীতে প্রগাঢ় পণ্ডিত হয়েও ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে তিনি হামেশা রচনা করতেন। তাঁর ব্রজভাষায় রচনার একটি উদ্ধৃতি—

'মোরা জোবনা নবে্লরা ভৈয়া হ্যায় গুলাল।
কৈসে গর দীনী বকস্ মোরী মাল।'

হিন্দীতে রচনা করলেন—

গোরী সোয়ে সেজপর মুখপর ডারে কেস।
চল খুসরী ঘর আপনে রৈন ভঙ্গ সব দেস।

সুন্দরী শয্যায় শুয়ে। তার আলু থালু কেশ মুখে ছড়িয়ে আছে। সারা দেশে রাত্রি ঘনিয়ে এল। এইবার খুসরো ঘরে চলো।

অপর আর একটি হিন্দী রচনা—

সগরী রঙ্গৈন মোহে সঙ্গ জাগা।
ভোর ভঙ্গ তব বিছুড়ন লাগা॥
ইসকী বিছুড়ী ফাটত হিয়া।
আয়ে সখী সাজন? না সখী দিয়া।

সারারাত আমার সঙ্গে সে জেগে রইলো। ভোর হ'লে বিচ্ছেদ ঘটল। তার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় ফেটে গেল; সখী বললে, ওগো সখী! তুমি কি প্রিয়তমের কথা বলছ? সে বললে—না সখী! আমি প্রদীপের কথা বলছি। ভোর হ'তে হ'তেই দীপটি নিবে গেল কিনা? কথায় চাতুর্য আছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের অপহ্নুতি অলঙ্কার। মনের আসল কথাকে অপর কথা দিয়ে চাপা দেওয়া। বহু ভাষায় দক্ষতায়, বহু শাস্ত্রের জ্ঞান-গরিমায়, বৈদগ্ধ্যের নৈপুণ্যে, অনুভবের গভীরতায়, সর্বোপরি মাধুর্য-সাধনার ধ্যানে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের এই কবি আমীর খুসরো সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ এবং সর্বযুগের এক স্মরণীয় নাম।

এইবার সূফী আমীর খুসরোর উপলব্ধির একটুখানি দিক দেখান প্রয়োজন। তার আগে তাঁর গুরু নিজামউদ্দীন আউলিয়ার একটু পরিচয় প্রয়োজন। এই নিজামউদ্দীন ফরীদউদ্দীন নামক ফকিরের শিষ্য। এঁর সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল—এই ফকীর যা কিছু গিলতেন তাই শক্কর বা চিনি হ'য়ে ফিরে আসত। এর তাৎপর্য হচ্ছে—তিনি কটুতম কথারও মিষ্টতম জবাব দিতেন। শিষ্য নিজামউদ্দীনের আকর্ষণে হিন্দু-মুসলমান শুধু নয়, সর্বধর্মের ধর্মপ্রাণরা অত্যন্ত সহজে আকৃষ্ট হ'তো। আজও দিল্লীতে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে নানা জাতির পবিত্র সঙ্গমে উদাত্তস্বরে কাব্বালী গানের লহর চলতে থাকে—

"জলতা হ্যায় যুঁ ফকীরকী সমাধপর দিয়া।
লগতা হ্যায় জী রহে হ্যাঁয় নিজামুদ্দীন আউলিয়া॥
যে মরে নহী হ্যাঁয় ছিপে যহীঁ।
হর ইনসানমেঁ, হিন্দু মুসলমানমেঁ॥

আজ ফকীরের সমাধিক্ষেত্রে এমন করেই প্রদীপ জ্বলছে যে, মনে হচ্ছে নিজামউদ্দীন আজও জীবিত আছেন। বস্তুত উনি মরেন নি, এখানেই লুকিয়ে আছেন; প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমানভাবে আছেন। এই সঙ্গীতের তাৎপর্য নিজামুদ্দীনের জীবনবেদের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদরেখা ছিল না। সত্যদ্রষ্টা প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটুকু দেখেছিলেন। তাঁর প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন আমীর খুসরো। গুরু সগর্বে বলেছিলেন, খোদার দরবারে গিয়ে যদি শুনি, 'আউলিয়া, পৃথিবী থেকে আমার জন্য কি উপহার তুমি এনেছো?' তবে আমি বলব, 'এই নিন আমার শিষ্য আমীর খুসরোকে নিন।' তখনকার দিনে এই হেঁয়ালির রহস্যটুকু অনেকে ধরতে পারেন নি। আউলিয়া ছিলেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি বুঝেছিলেন আমীর খুসরোর শেষদিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আসবে। তাই ঘটেছিল। এইপ্রকার দিব্যদর্শনের পরিচয় গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক প্রসঙ্গেও ঘটেছিল। বঙ্গদেশ থেকে বিদ্রোহ দমন করে প্রত্যাবর্তনকালে সুলতান অসহিষ্ণুভাবে হুকুম জারী করলেন—আমার দিল্লী প্রবেশের পূর্বেই যেন আউলিয়া দিল্লী ছেড়ে চলে যায়। আদেশ শুনে ফকীর বলেছিলেন —'হনূজ দহলী দূর অস্ত্'।—এখনও দিল্লী অনেক দূর। ইতিহাস পাঠক জানেন পুত্র জুনা খাঁর ষড়যন্ত্রে দিল্লী প্রবেশ মুখেই কাষ্ঠতোরণে চাপা প'ড়ে কনিষ্ঠ পুত্রসহ গিয়াসউদ্দীন নিহত হন। জুনা খাঁ ইতিহাস প্রসিদ্ধ মোহম্মদ তুঘলক, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল মাহ্‌মুদ।

এই প্রসিদ্ধ আউলিয়া নিজামুদ্দীন যাঁর গুরু তাঁর ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ নিরীক্ষা—এমনকি সঙ্গীতের কলাকৌশল বহিরঙ্গ বিভূষণ মাত্র। অন্তরের অন্তস্তলে তাঁর ভিন্ন এক অগ্নির উত্তাপ ছিল। সূফী খুসরো দিব্যদর্শনে ভিন্ন এক মানুষ। ভারতগুরু খুসরো নিজেও কবিরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠার কথা জানেন। কিন্তু এ কি হ'লো যাঁকে তিনি একান্তভাবে

কামনা করেন, তিনি তো ধরা দেন না। এইজন্য সাশ্রুনয়নে তিনি বলেন,—

'দানী কেহ্ হস্তম্ দর জহাঁ মন্ খুসরো-এ-শীরীন্ বয়ান্।
গর নাঈ অজ বহর-এ-দিলম্ বহর-এ-জ.বান্-এ-মন্ বীয়া।

তুমি তো বন্ধু জানো মোরে ভাল, বিশ্রুত যশ কবি।
মিঠে বুলি তার জগৎ জুড়িয়া ছড়ায়েছে এই ছবি॥
আমার হৃদয় অক্ষম যদি, তোমাকে আনিতে হেথা।
আমার জ.বান পারে যেন বঁধু তোমাকে তুষিতে সেথা।

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়। তিনি বুঝেছিলেন—তিনি তাঁকে না পেলেও তাঁর গান ক্ষণে ক্ষণে তাঁর চরণ ছুঁয়ে যায়। সূফী খুসরো এই পৃথিবীর ভালবাসার সীমাবদ্ধতা দেখেছিলেন। দিব্যদর্শীর এজন্য কোন দুঃখ ছিল না। তিনি গুরুবিরহের পরে তৈরী হ'য়েই ছিলেন—

তোমার বিরহে সব তেজ গেছে বৃদ্ধের প্রায় আমি;
এতদিনে বুঝি আপন জনেরা মুখ ফিরায়েছে স্বামী।
আমার কি দোষ? হাজার দুঃখে কোমর গিয়াছে টুটে,
সবাই চোখের কাঁটা বলি গণে, কথা নাহি মোর ফুটে।
লুণ্ঠনে শেষ শূন্য গৃহেতে বন্ধু না দেয় দৃষ্টি।
দোষী নই আমি, বিরাগ ভাজন আজব আমার সৃষ্টি।
প্রেমিক তোমার মুখছবি যেন সূর্য কিরণে ঢালা।
তোমার সমুখে নীচু মনে হয় সাইপ্রিস তরুমালা॥
ব'লো না প্রেমিক খুসরো তোমার দেরী হবে আরো কিছু।
সেই শঙ্কায়, ব'সে আছি আমি মাথাটি করিয়া নীচু॥

খুসরো-সাধনার জীবনের উষালগ্নেই বুঝেছিলেন, ভালবাসা দেওয়া এবং নেওয়ার উপর নির্ভর করে। এই মানস ব্যাপার অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী হ'য়ে আমাদের পীড়িত করে। এই পার্থিব ভালবাসা কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না। প্রত্যেক সূফী জানেন এই পার্থিব প্রেম বাড়ে কমে, আবার ভেঙ্গেও যায়। সুতরাং এই কালপরিণামী, ক্ষণস্থায়ী প্রেমে সর্বস্ব উজাড় করে ঢেলে ফেলা মূর্খের বাণিজ্য। শেষে সব হারিয়ে 'হায় হায়' ক'রে কাঁদতে হয়। এই প্রেমটাকে সূফীরা বলেন ইশ.ক-

এ-মজাজী.। এই ক্ষণভঙ্গুর প্রেমে মশগুল হ'য়ো না ভাই। উপলব্ধি করতে চেষ্টা ক'রো আর একটা প্রেম আছে ই'শ্ক-এ-হকীকী। যা সত্য, অবিনশ্বর তাকে আশ্রয় কর। দেখবে সব পাওয়া হ'য়ে গিয়েছে। এটার নামই সর্বার্থসিদ্ধি। আমীর খুসরো তাঁর কাব্যের কলাকৌশলে এই সত্য প্রেমের ছবিটা দেখিয়েছেন। এ প্রেমের কাছে পার্থিব প্রেম কত লঘু. তা তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় ব'লেছেন—

অগর দানীস্তম্ অজ.রোজ-এ-আজল দাগ-এ-জুদায়ীরা।
নমী করদম্ বেদল রোশন্ চিরাগ-এ-আশনায়ী রা॥
মরণের দিনে বিয়োগের তাপ শুরু হয় শুরু হয়।
ধরণীর প্রেমে সব ঢেলে দিলে পরিণামে আছে ভয়।

মহাজ্ঞানী শেখ সা'দী এমন ক্ষেত্রে বলেছেন—হোশিয়ার বন্ধু! এই জগৎটা দেখে ভুলে যেয়ো না। মনে রেখো প্রিয় থেকে প্রিয়তর আছে। তাঁর জন্য হৃদয়ের সামগ্রীগুলো সঞ্চয় ক'রে যাও। সর্বশেষে তাকে কিছু দিতে হবে তো!

শেখ সা'দী ও খুসরো উভয় মরমিয়া সূফী সাধকের কাছে হয়তো এই দার্শনিক তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশ হ'য়েছিল যে, কালের মধ্যে পূর্ণ সৌন্দর্যের নিঃশেষ বিকাশ সম্ভবপর নয়। কালের বুকে যে বিকাশ তা বড়জোর ক্রমবিকাশ। এই ক্রমের শেষ নেই। ক্রম মানেই ক্রমশ উদ্ভিদ্যমান। তা পরিপূর্ণ হ'য়ে নিঃশেষ নিশ্রেয়স বা নিঃসীম সৌন্দর্যে স্থির হ'য়ে যায় না। এই আমার আমি যখন সেই নিঃসীমকে অনুভব করেছিল তখন কাল ছিল না, দেশ ছিল না। সেটা ছিল আমার যোগের অবস্থা। আমি আজ যোগভ্রষ্ট হ'য়েছি। এই যোগভ্রংশই বিরহ বা জুদায়ী। আবার সেই যোগের জন্য উতলা হ'য়েছি। যদি তাই হয়, তবে পথের আনন্দে সবটুকু পাথেয় শেষ ক'রে দেওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না। খুসরো বললেন, তত্ত্বটি বুঝেছি ব'লেই বলছি—'নমী করদম্ বেদল্ রোশন্ চিরাগ-এ-আশ্নায়ীরা'—মজুদ কর, সেইখানে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রো। সেইজন্যই তো আমার ধ্যানের প্রেমাস্পদের জন্য আমার প্রতিদিনের সঞ্চয় রক্ষা করি। এটা সকলে বোঝে না, আমাকে

এইজন্য কাফের ব'লে তিরস্কার করে। তাতে আমার ক্ষতি কি? আমার এজন্য কোন অনুতাপ নেই—

'যহ্‌ জরম্‌ ইশ্‌ক্‌. অগর কাফের কুনন্দম্‌ খাক. গুমী কুন্‌।'

এ বিষয়ে আমার শিক্ষাগুরু আউলিয়া আমার পথ প্রদর্শক। শোন আমার কথা। প্রত্যেক ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন পথ—কেউ পূর্বমুখী, কেউ পশ্চিমমুখী। আমার মুখ আমার নিজের ক.বলার দিকে—দেখনি সে ক.বলার টুপী একদিকে একটু হেলে থাকে। উনি অমনি ক'রেই টুপী পরেন—

'হর ক.দম্‌ রাস্ত্‌ রাহী দীনী বো ক.বলাহ্‌ গাহী।

মা ক.বলাহ্‌ রাস্ত্‌ করদেম্‌ বরস্তরফ্‌ কজকোলাহী॥'

ওইতো দেখ, সবাই বলে খুসরো তোমার জপের মালা কোথায়? মূর্খরা জানে না আমার দেহের শিরায় শিরায় জপের মালা।

"আমার শিরার জপের মালায় মুহব্বতের নামের কলি।

ইসলাম ভুলি ওই নাম জপি ঘৃণা ক'রো মোরে কাফের বলি॥"

"কাফির ইশক.ম মুসলমানী মরা দরকার নীস্ত্‌।

হর রগ মন তার গুশ্‌তাহ্‌ হা.জতে জন্নার নীস্ত্‌॥"

গাল দাও ক্ষতি নেই; কারণ জানি, তুমি অহঙ্কারের মত্ততায় সমাচ্ছন্ন। তোমার হৃদয় মুকুরে তাঁকে দেখতেই পাও না। আত্মসমর্পণ করবে কার কাছে? আসল কথা, তুমি দেখে চলেছ শুধু নিজেকেই। নিজেকেই সিজ.দা (প্রণাম) ক'রে চলেছ। তুমি দীনদার মুসলমানও নও, মূর্তি-পূজারী হিন্দুও নও; তুমি আত্মপূজারী—খোদপরস্ত্‌. বুৎপরস্ত্‌ নও, খোদ-পরস্ত্‌।

"কে ক'রেছে ওই মনের মুকুর অহঙ্কারের ছায়ায় ভরা?

আপন ছবির উদ্ধতরূপে তুচ্ছ করিছ নিখিল ধরা!"

আমার প্রেমের রক্তরাগে রঙীন হৃদয় আমি দিয়ে ফেলেছি যাঁকে, সে তো নিজেকে তাঁর রহস্য ছায়া-থেকে মুক্ত ক'রে, সর্বদা ধরা দিতে চায় না। তাই প্রশ্ন করি—

'লালা রূখা, সমান্‌ বরা, আফত্‌-এ-জান কীসী?

গুল রূখা, শকর লবা সরর রবান্‌ কীসী?'

তুমি চম্পকাবনে, নবমল্লিকা পয়োধরে, তুমি আমার হৃদয়টা উত্তাল ক'রে চ'লেছ,—'নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত-দ্রাক্ষাসম।'—তুমি কে? ওগো নবপাটল-কপোলা, মধুক্ষরোষ্ঠা, তুমি পর্বাগুল্মবকাঙ্ক্ষিতভ্রা সাইপ্রিসের মত আমার সম্মুখে সঞ্চারিণী। তুমি কে?

রবীন্দ্রনাথ যাত্রা শেষে এমনি এক ঘাটে তরণী বাঁধতে চেয়েছিলেন—

'যেখানে পথের বাঁকে, গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট ল'য়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী॥'

এমন রহস্যময়ীকে কবি দার্শনিক গোয়েথে বলেছিলেন—

Ver weile! du bist doch so Schon

—ফ্যার বাইলে! ডু বিস্ত্‌ দখ্‌ জো. শোয়েন্‌—একটু থামো! তুমি সত্যাই সুন্দর।

সূফী ইরাকী

ইতিপূর্বে মোঙ্গল যুগের সূত্রপাত করতে গিয়ে বলে এসেছি, মধ্য এসিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণ শুভাশুভের মিশ্রিত ফলপ্রসূ্‌ হ'য়েছিল। অনিশ্চয়তার সংশয় এবং ধন-প্রাণ-মান রক্ষায় অকর্মণ্য রাজশক্তির প্রতি অবিশ্বাস শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রাণ মানুষদের ক্রমশ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল। পীর ও দরবেশরাই সেদিন অশান্ত মানুষদের শান্তির আলোক দেখিয়েছিলেন। এই যুগ সূফীধর্মের পুনর্জাগরণের যুগ। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর সূফী কবিকুলের মধ্যে যাঁরা তাঁদের কৌলধর্মের বার্তা কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে পরিবেশন ক'রে অমর হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সূফী 'ইরাকী' এক অবিস্মরণীয় নাম। কবিদের এক একটি ছদ্মনাম থাকে। সে নাম হয় খুব সংক্ষিপ্ত; কারণ তাঁদের কবিতায় ও গানে সেই নামেরই ভণিতা চলে। তথাপি এ নামগুলো সর্বদাই অর্থবহ। 'ইরাক.' মানে লেখনীর মধ্যভাগ। কবিসত্তা সর্বদাই লেখনীর গুহাগৃহে অবস্থান করে। কলম চলে, কবিরও ক্রমশ আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই

হয়তো ব্যঞ্জনা। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, 'ইরাকী' মানে সার-গ্রাহী। যা' সারসমূহ, তার গ্রহণকর্তাই ইরাকী 'সারং ততো গ্রাহ্যমপাস্ত ফল্গু'—সূফীধর্মই গ্রহণ করে সারাৎসার।

এই কবির পরিপূর্ণ নাম—ফখরউদ্দীন ইব্রাহিম হমাদানী। (হমাদান—সর্বজ্ঞানের কেন্দ্র।) এঁর সংক্ষিপ্ত তখল্লুস্ ইরাকী' কথাটায় ইরাকের সঙ্গে সম্বন্ধ খোঁজা নিরর্থক। কারণ শুধু ইরাক নয় এই কবি তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনে বহু দেশের সম্বন্ধে এসেছিলেন। এঁর জীবন-কথার ইতিবৃত্ত ভালো করে দেওয়া আছে জামী রচিত নফহ.াতু'ল্-উন্‌স্ গ্রন্থে। জামী বলেছেন শৈশবকালেই ইরাকী কো়রানশরীফ আবৃত্তিতে সকলকে মুগ্ধ করতেন। তাঁর উচ্চারণে অপ্রমত্ত আরবীসুর এবং ভাষার বিশুদ্ধি পণ্ডিতদেরকেও মুগ্ধ করত। ভাবী কবিটি যে সুন্দরের উপাসনা করবেন তা' তাঁর অনতিভিন্ন যৌবনেই বোঝা গিয়েছিল। পার্সী ভাষায় 'ক.লন্দর' মানে ভ্রাম্যমান। এই ভ্রাম্যমান সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা পোশাকে পরিচ্ছদে ছিমছাম এবং মুণ্ডিতশির, মুণ্ডিতশ্মশ্রু হ'য়ে থাকেন। এমন এক কলন্দর গোষ্ঠীর মধ্যে এক সুন্দর তরুণ সন্ন্যাসীর ভক্ত হ'য়ে গেলেন এই তরুণ ইরাকী। Browne-এর ভাষায় এই নবীন সন্ন্যাসী ছিলেন—'......the typical Qalandar, heedless of his reputation, and seeing in every beautiful face or object reflection, as in a mirror, of Eternal Beauty.' বিশ্বের সকল বিকীর্ণ সৌন্দর্যে নিখিল সৌন্দর্যের শিখরকে আবিষ্কার করার চোখ সকলের থাকে না। এই তরুণ সন্ন্যাসীর ছিল। তাঁর চেলা হ'য়ে ইরাকীও বুঝতে শিখেছিলেন—জগতের যাবতীয় রূপই এক একটি প্রকাশ-মহাপ্রকাশের বিশিষ্ট বিলাস। এই প্রবুদ্ধ চেতনা থেকেই ইরাকীর কণ্ঠে গজ.লগুলি এসেছিল। ইরাকী যেন চতুরক্ষরী মহামন্ত্র পেরেছিলেন—সৌন্দর্য, প্রেম, উল্লাস ও আত্মসমর্পণের অর্থভরা সে চতুরক্ষর।

এই কলন্দরের কারবানের সঙ্গে 'ইরাকী এলেন ক্রমশ ভারতের মাটিতে—মুলতান নগরে। এইখানে তিনি শিষ্যত্বে দীক্ষিত হলেন শেখ বহাউদ্দীন জ.করিয়ার কাছে। গুরু সম্বন্ধে শিষ্য 'ইরাকী' ঘোষণা দিলেন—

'পুরসী অগর অজ. জহান কীস্ত্‌, ইমামুল-অনাম্‌।
ন শনবী অজ. আসমান্‌ জুজ., জ.করিয়া জবাব॥'

যদি জানতে চাও কে এই পৃথিবীতে মানব-গুরু, তবে আসমান থেকে 'জ.করিয়া' এই নাম ভিন্ন অন্য কিছু শুনবে না।

শিষ্যদের ৪০ দিন চিল্লাখানায় থাকতে হয়। এটা নির্জন প্রকোষ্ঠে সাধনার প্রস্তুতিপর্ব। দশদিন পর 'ইরাকী'র নামে নালিশ এল—চিল্লাখানায় জপতপ না ক'রে 'ইরাকী' সুর করে গ.জ.ল গাইছে। সে এমনই গ.জ.ল যে সারা মুলতান নগর তাই শুনে মুগ্ধকণ্ঠে ওটাই গেয়ে চ'লেছে। জ.ক.রিয়ার শিষ্যদের মধ্যে নিন্দা ও ধিক্কারের তুমুল ধ্বনি উঠল। এই গ.জ.লের ভাবানুবাদ দিয়ে ইরাকীকে বিচারসভায় আনা প্রয়োজন—

সা.কীর আধখোলা অলস নয়ন থেকে সুধা নিয়ে
ওরা প্রথম পিয়ালা পূর্ণ ক'রেছিল;
কিন্তু তাদের অসহ্য তৃষ্ণা মুহূর্তে সে পাত্রগুলি শূন্য ক'রে দিল।
বেখুদী নিশাত্‌ তখন জমে উঠেছে।
তারপর পিয়ালার পর পিয়ালা পূর্ণ হয়, আর শূন্য হয়।
শেষে কিছুই আর রইল না—আত্মহারা ভিখারীর দল!
চেতনা, বিচার, বিতর্কের কি কোন প্রশ্ন ওঠে?
শূন্য পিয়ালা গড়িয়ে গড়িয়ে সবার হাতে হাতে ঘোরে।
তবু ওরা সেই শূন্য পেয়ালায় চুমুক দেয়।
বড় করুণ সে দৃশ্য! এইবার আসে নতুন চমক।
মা'শূকের চারু বিম্বাধর থেকে ঝ'রে পড়ে শরাব-এ-সুরখ্‌—
মুহূর্তে পাত্রগুলি পূর্ণ হয়ে ওঠে।
এ সুধার নাম দেয় ওরা 'শরাব-এ-'আশিক.'—
যা অবিশ্রান্ত ক'রে পড়ে দিলরুবার রঙীন ওষ্ঠ থেকে।
আর ওই সনম্‌! তাঁর কোন বিশ্রাম নেই।
কতগুলো জান নিয়ে তাঁর খেলা চলেছে!
এতগুলো দিল থেকে 'সব' কেড়ে নিয়ে,
তাদের অশান্ত কামনায় শান্তিবারি ছড়িয়ে দিতে হবে তো।
তাই সুন্দরী চঞ্চলা।

সর্বনাশার খেলা শুরু হয়, দিল নিয়ে কারবার ;
কথা নাই মুখে, বিশ্বাস শুধু, চিত্ত চমৎকার।
যেখানে দৈন্ত, দুঃখ যেথায় ওঠে রব হায় হায় ;
এই দয়া শুধু, মিশানো ওষুধ অবসাদ দূরে যায়।

'চু খুদ করদন্দ্ রিজ. খবীশ্‌তন্, কাশ্
'ইরাকীরা চেরা বদনাম করদন্দ্।'

তুমি স্বয়ং যদি এমনধারা চেলে চলো, তা হলে আমায় এই আব-এ আঙ্গুরে ঢলে পড়ায় দোষ দেখছো কেন?—তোমরা অযথা ইরাকীর বদনাম করে চলেছ!

সাক্ষীরা হাজির। আদালত থমথমে। বিচারক হেঁসে রায় দিলেন বেটা! তোমার চিল্‌হা থেকে বেরিয়ে এসো। তুমি নিত্যসিদ্ধ। আর সাধনার প্রয়োজন নেই। তোমার হাতে আমার এই সুলক্ষণা কন্যা, আমার স্নেহের দুলালীকে সমর্পণ করলাম। কিন্তু অতো সহজে কি সব মিটে? গুরুর গদিতে উত্তরাধিকারীরূপে ইরাকীর মনোনয়ন প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হলো। ইরাকী আবার কিছুদিনের জন্য মুসাফিরের জীবন যাপন করলেন। মক্কা, মদীনা এবং এসিয়া মাইনর। এখানে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—"লম'আত্" নামক সূফী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জলাল-উদ্দীন-শিষ্য মঈনুদ্দিন পরবন সূফী 'ইরাকীর জন্য একটি খানক্‌াহ্ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করে দেন। ইরাকী মিসর পর্যন্ত যান এবং ফিরে এসে সিরীয়ায় বাস করেন। এইস্থানে রাজধানী দামাস্কাসে তিনি দেহত্যাগ করেন (১২৮৯)।

যেখানেই ইরাকী লেখনী ধারণ করেছেন সেখানেই প্রেম ও সৌন্দর্যের পথ বেয়ে সূফীর রহস্যসাধনা আত্মপ্রকাশ করেছে। 'ইরাকীর দীবান তত্ত্বরসের আনন্দধারা। এমন মন কেড়ে-নেওয়া কথার বাঁধুনি অল্প কবির মধ্যেই দেখা যায়। এই কবি গ়জ়ল ছাড়া মস়নবী কাব্যও রচনা করেছেন। একাধারে কবি এবং তত্ত্বব্যাখ্যাতা প্রায়শ দেখা যায় না। 'ইরাকী এই বিরল দৃষ্টান্ত। 'লম' আত্ গদ্যে পদ্যে মিশ্রিত তত্ত্ব বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ—ঠিক যেন স'অদীর গুলিস্তান্। 'লম'আত্' কথার অর্থ আলোর ঝলক। জামীর মত তাত্ত্বিক কবি এই গ্রন্থের মর্ম বিশ্লেষণ

করে গিয়েছেন। আটাশটি আলোকস্ফুরণ বিদ্যুতের মত চমক দিয়ে যায় এই গ্রন্থে। জ্ঞানের সঙ্গে উন্মাদনা, বিচার বিতর্কের সঙ্গে রসাস্বাদন— এই গ্রন্থে হাত ধরাধরি করে চলেছে—

'য়ক্ 'অঈন্-ই-মুতকি.কক.কি জ.উ জ.রা নবুদ্।
চুন্ গশ্.ত্ জ.াহির্ ঈন্ হমা অগি.য়ার আমদহ্॥
অয় জ.াহির-ই-ত্ 'আশিক.রো ম'অশূক. বাতি.নত্
মত্লুব্ রা কি দীদ্ তলবগার আমদহ্॥

সেই সর্বোত্তম, অদ্বিতীয় সত্তা ছাড়া এক কণাও কোথাও নেই। তিনি প্রকাশিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আর সব তাতে মিলে যায়। প্রেমিক প্রকাশিত আর প্রেমিকা অন্তর্লীন। অভীষ্টাকে কে ভাল করে দেখেছে? (কেউ না)। শুধু একবার অনুভব কর অনুসন্ধিৎসু হাজির। যদি তা হয়, তবে নিশ্চয় সেই উদ্দিষ্টাকে পাবে।

'ইরাকীর তরজীবন্দ্ কবিতাগুলিও সুন্দর। তাতেও প্রশ্নোত্তরে রহস্যের বার্তা আমাদের কাছে আপনি চলে আসে। একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব।

ওকি, পিয়ালার মাঝে শরাব উজল?
নাকি, মেঘের আড়ালে রবিকর?
হেথা, পিয়ালার শীশা, শরাবের রং
এক হ'য়ে গেছে ভাই!
কাঁচের পিয়ালা স্বচ্ছ শরাব
ভেদ হেথা কিছু নাই॥
পাত্র ছাড়াই সুরা থাকে হেথা
মিটায় সকল তৃষা।
সুরা নাই হেথা, শূন্যপাত্রে,
চুমুকের চলে দিশা॥
যদি, জটিল বাঁধন খুলে নিতে চাও,
খুলিয়া বলিব সব।
'প্রাণের উৎস মহাপ্রাণ বোঝ'
মিটে যাবে কলরব॥

'কেহ্ হমা উস্ত্ হমচেহ্ হস্ত্ ইয়েকীন্
জান য়ো জানান য়ো দিলরুবা য়ো দিল য়ো দীন্।

সব এখানে ভেঙে চুরে একাকার—একমেবাদ্বিতীয়ম্। সব প্রাণ প্রাণ-সাগরে মিশে যায়। দিলরুবার দিল এক হ'য়ে যায়—এটাই তো আমাদের দীন—আমাদের সাধ্য সাধনতত্ত্ব।

খ্বাজূয় কিরমানী

হফ্ত্ ইক্‌লীম্, আতশ্‌কদ, মজমা' উল ফুসাহ্ প্রভৃতি অধিকাংশ কবি জীবনীগ্রন্থে খ্বাজূয় কিরমানীর উল্লেখ থাকলেও কমাল-উদ্দীন্ আবুল অতা. মহ.মুদ্ বিন্ আলী কিরমানীর জন্ম ও জীবন-বৃত্তের ঐতিহাসিকতা সন্দেহাতীত নয়। পার্সী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত এইজন্য সর্বদা সন তারিখের অপ্রমত্ত স্পষ্টতায় সমুজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে না। রিদ.াকুলী খান্ তাঁর মজমা' উল ফুসা.হা গ্রন্থে এবং দৌলতশাহ্ তাঁর বিশ্রুত জীবনী গ্রন্থে বিভ্রান্তিকর এবং এলোমেলো সন তারিখে পাঠককে সর্বদা দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছেন। মোটামুটি সর্বদিকের সুবিবেচিত সিদ্ধান্তে যা দাঁড়ায় তাতে বলা চলে, কবি ১২৮০ সালে কিরমান শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

হফ্ত ইকলীমের প্রমাণ অনুসারে খ্বাজূয় কিরমানী প্রসিদ্ধ সাধু শেখ রুক্‌নুদ্দীন আ'লাউদ্দৌলার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সূফী-মতে অনুরক্ত হ'য়ে সূফী তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। শুধু তত্ত্ববিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ নয় স্বয়ং তিনি সাধক ছিলেন। এ কথাও অনেকে বলেন তাঁর প্রতিভা খাঁটি কবির প্রতিভা এবং তাঁর কবিতা কাব্য-বিচারের মানদণ্ডে কখনই লঘু নয়। এই নৈসর্গিক কবিপ্রতিভার জন্যই তিনি হ.াফিজের বন্ধু এবং উৎসাহদাতা, শীরাজের শাসনকর্তা আবূ ইশাক ইনজূর স্নেহধন্য হ'তে পেরেছিলেন। আবার এ কথাও শোনা যায়, জনৈক শীরাজী কবি হা.য়দর শীরাজী খ্বাজূয় কিরমানীকে বলেছেন একজন কাবুলী চোর, যে সর্বদা তস্করবৃত্তিতে ওস্তাদ্ এবং শেখ সা.দীর ভাবের ঘরে

মরমী কবি মরমিয়া সাধনার কথাগুলি বেশ বিরোধাভাসের মধ্যে জমিয়ে তুলেছেন। তাঁর কমাল্‌-নামায় আছে—শোন মরমী! "পা চলবে না, কিন্তু তুমি পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে চলেছ। বুঝে নিয়ো এই মানস-ভ্রমণের তত্ত্ব। আবার তুমি পা চালালেও ভিতরে কিন্তু একটুও নড়ছো না। তুমি তখন বকায় আছ। তখন তোমার জীবন্মুক্তাবস্থা। বাইরের ইন্দ্রিয় সচল—তুমি অন্তঃকরণে অচল। বুঝে নিয়ো তত্ত্বকথা। নিজেকে ছাড়, খোদায় তখনি তোমার সঙ্গম।" মূল উদ্ধৃত করি—

'পায় ন নহাদহ্‌ দর জহান গুশতন্‌।
আমদহ্‌ জ.াহির্‌ বো নিহান্‌ গুশতন্‌॥
তুরক্‌-ই-খুদ্‌ করদন্‌ বো খুদা জুসতন্‌।
মিত্বর্‌ পরহরদন্‌ বো রফা জুসতন্‌॥

মোঙ্গল যুগ ও পার্সী সাহিত্য

এই পৃথিবীতে অবিমিশ্র শুভাশুভ প্রায়শই দৃষ্টিগোচর হয় না। মোঙ্গলদের অত্যাচারে একদা মধ্য এসিয়া পশ্চিম ভারত সহ বিধ্বস্ত হ'য়ে গিয়েছিল। আবার এই ধ্বংসের মধ্য দিয়েই বিশ্ববিধাতা নতুন ক'রে পুনর্জাগরণের তর্জনী সঙ্কেত করলেন। মহাচীন যখন 'সুং' বংশের গৌরবে সমুজ্জ্বল, তখন সেই সাম্রাজ্যের সীমান্তে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতি অত্যাচারে এবং লুণ্ঠনে পূর্বরুশিয়া এবং মধ্য এসিয়া, এমন কি চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছিল। মানুষ যুগে যুগে আপন প্রয়োজনে সর্বনাশা দানব-শক্তির সাহায্য নিতে গিয়ে বিপদ টেনে আনে। একদা সুলতান মহ্‌মুদ সেলজুক তুর্কীদের সাহায্য নিতে গিয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের সমাধি রচনা ক'রেছিলেন। এবার সুং সম্রাট মোঙ্গলদের সাহায্য নিতে গিয়ে সেই একই ভুল করে বসলেন। ইতিহাস যেন যুগে যুগে বলে আসছে—'আমি এক সুরে একই কথা বলি, আমি বার বার ঘুরে ফিরে আসি।' সুং সম্রাট সেই ঐতিহাসিক ভুলটি ক'রে বসলেন। তিনি 'কিন্‌' নামে একটি সীমান্ত দস্যু উপজাতিকে সাহায্যার্থ আমন্ত্রণ করে

অন্ত উপজাতি দমনে নিযুক্ত করলেন। কিন্‌রা সুং সাম্রাজ্যের অনেক খানি গ্রাস ক'রে ফেলল এবং পরিশেষে নিজেরাই এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল—রাজধানী হলো 'পিকিং'। এই কিন্‌রা শেষে সুসভ্য হ'য়ে উঠেছিল।

কিছুদিন পরেই শুরু হ'লো নতুন আক্রমণ। এবার আক্রমণকারী স্বয়ং চেঙ্গীজ. খান্। ইনি বিশ্বের অন্যতম দুর্ধর্ষ বীর এবং হুন এটিলার পর বোধ হয় নৃসংসতম জিগীষু। বৈকাল হ্রদের পার্শ্ববর্তী একটি অঞ্চলের নাম মোঙ্গলিয়া, ইনি সেই অঞ্চলের মোঙ্গল নায়ক। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম 'তেমুজিন্'—চেঙ্গীজ. বা জেঙ্গীজ. তাঁর উপাধি। 'খান্' তুরানী শব্দ 'খাকান্' থেকে অপভ্রষ্ট। আর ওই চেঙ্গীজের অর্থ সার্বভৌম অধিপতি বা সম্রাট্। ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতেই পিকিং থেকে শুরু করে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। সাইবেরিয়া থেকে সিন্ধু, পারস্য থেকে পিকিং—সমগ্র সাম্রাজ্যটা তাঁর অস্ত্রের বল পরীক্ষা করে মাথা নোয়াল। তিনি গর্ব করে বলতেন তাঁর সাম্রাজ্যের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু সোজা হেঁটে গেলে কমসে কম ছ'মাস সময় লাগত। মহানায়কের মৃত্যুর পর পুত্র 'ওগদই' দিয়ে কিছুই হ'লো না। পুত্র ছিলেন অত্যন্ত পানাসক্ত এবং অকর্মণ্যতায় পিতৃদক্ষতার সম্পূর্ণ অযোগ্য উত্তরাধিকারী। ইউরো-এসিয়ার এই বিরাট্ ভূখণ্ডের খবরদারী করা ছিল তার পক্ষে সাধ্যাতীত। সেটা সম্ভবপর হয়েছিল পৌত্র খুবিলাই খাঁ দ্বারা। তিনি ইতিহাসবিশ্রুত সুশাসক হয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ বিশ্ব-পরিব্রাজক মার্কো পোলো, ধরনধারণে চৈনিক মোঙ্গল খুবিলাই খাঁকে পিকিংএ এসে নতজানু হ'য়ে সম্মান দেখিয়েছিলেন।

এই বংশেই এলেন তইমুরলাঙ্, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৩৬৯)। তুর্কিস্তানের সাম্রাজ্য গড়ে' সমরকন্দকে রাজধানী ক'রে তিনি এই বংশেরই রক্তধারার তাগিদে অভিযানে আত্মনিয়োগ করেন। ক্ষিপ্রতম অশ্ববাহিনী পরিচালনা, গ্রহণ-বর্জনে ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রয়োগ এবং বিজয়োত্তর শৃঙ্খলা আনয়নে তিনি সে যুগের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এই শক্তির কাছে রুশিয়া, সীরিয়া এবং অতোমান তুর্কীস্তান পদানত হ'লো। শেষে পূর্বাভিযানে তিনি দিল্লী পর্যন্ত করায়ত্ত ক'রে ফেললেন। নিজে

তিনি ধর্মাধর্মের কোন ধারই ধারতেন না, অথচ ইসলামের জয়ডঙ্কা বাজিয়েও ইরানে তিনি মুসলিম রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন। এক ইস্‌ফাহানেই তিনি সত্তর হাজার নরমুণ্ডের মিনার গড়িয়ে বিজয়োল্লাস করেছিলেন। আরও প্রায় দুই শতাব্দী পরে ভারতের দ্বারপ্রান্তে দেখা দিয়েছিলেন বন্দুক ও কামানে সুসজ্জিত, যুদ্ধ চালনায় সে যুগে অদ্বিতীয় বাবর—মাতৃরক্তধারায় চেঙ্গিজ. আর পিতৃরক্তে তইমুরের বংশধর। ইনিই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মুঘলরা মোঙ্গল এবং তুর্কিজাতির সংমিশ্রণে অভিজাত, একথা ঐতিহাসিক মহলে সুবিদিত। তৈমুরের প্রপৌত্র আবু স'ইদের নয়টি ছেলের অন্যতম উমর শেখের পুত্র বাবর। চতুর্দশ শতকের মধ্যেই মোঙ্গল বা তুর্কি অভিযানে ইরানের উপর অভাবিত অত্যাচারের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। এর এক শতাব্দী পূর্বেই চেঙ্গিজে.র হাতে পুরাতন সেলজুক তুর্কিদের পতন ঘটেছিল। তখন খ্বারজমের শেষ সম্রাট্ নিহত হয়েছেন এবং ইরানে মোঙ্গল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মোঙ্গল ইলখানী-বংশের প্রথম সম্রাট হুলাগু খাঁ আব্বাসী সর্বশেষ খলিফা আলমুস্তা'সিম্ বিল্লাহ্‌কে সপরিবারে নিহত করে বাগদাদ লুণ্ঠন করেন। এই হত্যা-কাণ্ডের শোকগাথা পরবর্তী কালে শেখ স'দী বড় করুণ রসে গ'ড়ে তুলেছিলেন। তখন পর্যন্ত খানেরা কিন্তু ইসলাম অবলম্বন করেন নি। তাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল বংশানুক্রমে আদিম ধর্মবিশ্বাস—খ্রীষ্টজগতে নিন্দিত Paganism, আর মুসলিম দুনিয়ায় ধিক্কৃত কাফেরী বা বিধর্ম।

১২৯৫ সালে গাজান খাঁ সম্রাট হয়ে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন; কাজেই পূর্ববর্তী খানেরা এবং গাজানোত্তর খানেরা ধর্মবিশ্বাসে যে সম্পূর্ণ আলাদা একথা সর্বদাই স্মরণযোগ্য। নবধর্ম গ্রহণ করলেও এদের হৃদয়ের কোমল পরিমার্জনা সুদীর্ঘ দিনেও আসে নি। সে কথা আমরা একটু আগে তইমুর সম্বন্ধে বলে এসেছি। মোঙ্গল বংশের আবু স'য়িদের মৃত্যুর পর মোঙ্গল সাম্রাজ্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং মোঙ্গলরাও পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়। (১) জলায়রিয় (২) সরদারিয় (৩) অলকরত্ (৪) মুজফরিয় (৫) চোবনিয়। তইমুরের হাতে নিধন-যজ্ঞের পালা শেষে বিশ্লিষ্ট সাম্রাজ্য আবার সংশ্লিষ্ট হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলা

আমার ক্ষমতা ছিল বিশ্বত্রাস তৈমুরের। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে তা ঘটেনি।

এই প্রসঙ্গে ইরানের উপর আরব অভিযানের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। ইরানে আরব এবং ইরানে মোঙ্গল দুই এর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। আরব এসেছিল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে, আর তুর্কো-মোঙ্গল এসেছিল উত্তর-পূর্ব থেকে। আরব এসেছিল 'দীন দীন' গর্জনে—নতুন ধর্মের উন্মাদনায় এবং তার প্রতিষ্ঠার বাসনা নিয়ে। তাতার এসেছিল শক্তি এবং জিগীষার উন্মত্ত হিংসায়। হত্যা ও লুণ্ঠন, বিনাশ ও সন্ত্রাসই ছিল তাদের অভীপ্সিত, নতুন সভ্যতার এবং নতুন কোন ধর্মের আলোক দেওয়া তাদের দূরতম চিন্তার রাজ্যেও ছিল না, থাকতেও পারে না। আরবের মধ্যে সেইটা ছিল মুখ্য। তাতার ভয়ঙ্কর, বীভৎস, ধূর্ত, নির্দয় ও ক্ষমাহীন; আরব ছিল বীরত্বের মধ্যেও শিষ্টাচার এবং মহত্ত্বদর্শনে সুমহান্, উদার এবং সর্বদাই পুরোদস্তুর আদব-দোরস্ত্। বাগদাদ্ লুণ্ঠনের অর্ধশতাব্দীর পরে ১৩০০ সালে লেখা 'কিতাব-উল্-ফখরী' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে দুই জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের তৌলনপন্থায় আলোচনা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশের চেঙ্গিজ্‌ থেকে আরম্ভ করে চতুর্দশের মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্য এসিযায় অবস্থা ছিল নিত্য উদ্‌বেগে সম্পূর্ণ অব্যবস্থিত। এই অবস্থায় সাহিত্য সাধনার মূলোচ্ছেদ ঘটে; তাই ঘটেছিল। জীবনযাত্রার নিত্য উদ্‌বেগে সাধারণ মানুষের শান্তি তিরোহিত হয়ে যায়; তাই হয়েছিল। ধার্মিক যাঁরা, তাঁরা শান্ত জীবনের জন্য নগর, এমনকি গ্রাম পরিত্যাগ করে অরণ্যবাসী হন অথবা পাহাড় পর্বত বিহারী হন। তাঁরা সব ছাড়তে পারেন, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস বা ইমান্ পরিত্যাগ করতে পারেন না। তাঁদের চোখের উপর প্রমাণিত হল জীবন কত অর্থহীন, সমাজব্যবস্থা কত নশ্বর এবং রাজশক্তি কত দুর্বল। আত্মরক্ষায় যে অসমর্থ তার পররক্ষার প্রতিশ্রুতি নিতান্ত মূল্যহীন। সূফী-পীর ও ফকীরগণ আত্মদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অশান্তদের শান্ত করলেন। বিষয়ের বিষে আসক্ত, বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত খলিফাদের নির্লজ্জ জীবনযাত্রা দেখে আরবে একদা সূফী ধর্মের উন্মেষ ঘটেছিল। আজ ইরানের অসহায় রাজশক্তির

দুর্দশা মর্দনে, দুর্বল সমাজশক্তির অপদার্থতায় নতুন করে নতুন মন্ত্রে সুফী-সাধকেরা উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের চিন্তা, ভাবনা, তাঁদের জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অপার্থিব আনন্দ দিয়ে তাঁরা নতুন এক ভাব-সাম্রাজ্যের পত্তন করে চললেন। এইজন্যই বলছিলাম বিপদ নিরবচ্ছিন্ন অশুভ নিয়ে আসে না। অশুভ দুর্যোগের মধ্য থেকে মঙ্গলের অরুণরাগ আকস্মিকভাবেই দেখা দেয়; আমরা নৈরাশ্যের তন্দ্রাঘোর কাটিয়ে উঠি। সে মুহূর্তে সচেতন হয়ে আমরা ভাবতে শিখি, রুদ্রের বামমুখের পাশেই তো রয়েছে তাঁর প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ। প্রার্থনা করি 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'। হে রুদ্র! তোমার মঙ্গল মুখের প্রসন্নতায় আমাদের রক্ষা কর।

এই ধ্বংসযুগের পারিপার্শ্বিকতায় সূফী কবিরা বাইরের থেকে মন গুটিয়ে আপন মনের গহনে ডুব দেওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। বাইরে যেখানে বিতৃষ্ণা, মানুষ সেখানে অন্তরে সুধা খুঁজতে চায়। তাতার মোঙ্গলের ধ্বংস যজ্ঞের পর ভস্মতিলকে ললাট উজ্জ্বল করেই দেখা দিলেন ইরানের বিশ্ববিশ্রুত কবিরা। কয়েকজনের নাম কীর্তন করি—(১) জলাল্-উদ্দীন রূমী (২) নূরউদ্দীন আবদুর রহমান জামী (৩) সিরাজ-প্রসূন শেখ স'দী এবং (৪) সেই সিরাজেরই অবিস্মরণীয় কবি হ.াফিজ, যিনি চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছেন—লিসানুল ঘ.য়ব বা রহস্য দ্রষ্টারূপে।

সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় ইরানে আরব অধিকার অধ্যায়ে ইরানী ভাষার উপর আরবী ভাষার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে এসেছি। তুর্কো-মোঙ্গল শাসনে সেই আরবী মিশ্রিত পার্সী ভাষা আবার আর একদিকে পার্শ্বপরিবর্তন করে চললো। বিজেতার ভাষাসম্পদ, বিশেষ করে শব্দাবলী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিজিতেরা গ্রহণ করে থাকে, না হলে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। আরবী, পার্সী 'হজূম' দিয়ে আর আক্রমণের মর্যাদা রক্ষা করা চলছিল না, নতুন তুর্কি শব্দ আক্রমণের ইজ্জত রক্ষা করল—শব্দটি 'আয়িলগার'। ইরানীরা লুণ্ঠনকে বলতো 'ঘ.ারত্'। তুর্কীরা বলতো 'য়ঘ.ম' অথবা 'চপাবল'। ইরানীদের কাছে চিরপ্রসিদ্ধ ছিল—ক.ারগাহ যার অর্থ ছিল সেনানিবাস। তুর্কো-মোঙ্গলরা এই অর্থে চিনতো 'উর্দূ'। সেই 'উর্দূ' ভারতবর্ষেও মুঘ.ল

যুগে সেনানিবাস। ঢাকার একটি স্থানের নাম অদ্যাপি 'উর্দু'। সেই প্রকার সেনানিবাসে হিন্দবী ও ফার্সী মিশ্রিত হিন্দু মুসলমানের পরস্পর ভাব বিনিময়ের ভাষা হয়ে গেল উর্দু। কেহ কোথাও প্রেরিত হলে গ্রীকরা বলতো Apostolos যার থেকেই Apostle, ইরানীরা বলতে অভ্যস্ত ছিল ফিরিস্ত্‌দেহ্‌, তুর্কো-মোঙ্গলরা এসব ক্ষেত্রে বলতো 'অয়িল চি'। অজ্ঞাত-মূল sentinel অর্থ প্রহরী, সারা য়ুরোপে প্রচলিত কথা। তারই অপভ্রষ্টরূপ sentry হিন্দোস্তানে সান্ত্রী বলে আজও পরিচিত। ইরানীরা এ জাতীয় রক্ষীকে বলতো 'পাসবান্‌'; কিন্তু তুর্কী কথা সে যুগে জোরালো হয়ে দেখা দিলো 'করাবল', লোকে সহজে গ্রহণও করে ফেলল। পার্সী কথা এবং চিরপ্রসিদ্ধ কথা শাহ্‌জাদাকে কিন্তু 'নূয়ান' বেশি দূর নোয়াতে পারে নি। অপরদিকে পার্সী বচন ছিল 'রহলত' সৈন্যের গমনাগমন। পরে তুর্কী কূচ বা কোচ (যাতায়াত)+কারাজ, যার মানে যষ্টির আস্ফালন, মিলে গিয়ে কুচকারাজ হয়ে রহলতকে বাস্তুচ্যুত করে ছেড়ে দিল। আজও কুচকারাজ ভারতময় সদম্ভে বিচরণ করছে। ইরানীর গ্রীষ্মাবাস হলো তুর্কীর য়াইলাক। ইরানীর দস্তুর হয়ে গেল তুর্কী য়ুসুন। আরও কয়েকটি তুর্কী শব্দ বলি—ঈলখী 'stud', ঈলাক bravado। সুদূর পূরবিয়া অঞ্চলে বাংলা ভাষাতেও তুর্কিপ্রভাব সম্বন্ধে কিছু বলা চলে। এই প্রভাব ফার্সীর মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছে। ফার্সী পাঁচশো বছরের অধিককাল ভারতের রাজভাষার গৌরবে অধিষ্ঠিত ছিল। যদি বলি—'দেখ উজবুক কুলিটা আলখাল্লা পরে একহাতে কাঁচি, অন্য হাতে চাকু নিয়ে কি মতলবে যেন বেরিয়েছে। উর্দু ব'লে লোক ভুলিয়ে বোঁচকা মারার তালে আছে না কি? ধরে ফেললেই ওকে কাবু করা যায়। কিন্তু, ওর বিবির মুখে দানাপানি উঠবে না।'—এখানে মতলব, দানাপানি বাদ দিয়ে সব বিশেষ্য বিশেষণই তুর্কী শব্দ।

এছাড়াও বলতে পারি, 'রন্ধনশালায় বাবুর্চি কোর্মা তৈরী করে। খান এবং খাতুনরা পরমানন্দে ভোজন করেন। তাদের বৈঠকখানায় আর পার্সী ফরশ, বা কালীর আদর নেই; এখন বিলকুল গালিচাপাতা। যারা বাহাদুর, তাদের কথাই আলাদা। খুন করে লাস গুম করলেও সাওগাতের জোরে দারোগা বকশী সব বশ। তারপর বাহাদুরেরা বড়-

জোর একটা মুচলকা দিয়ে খান্না থেকে বেরিয়ে আসেন।'—এখানে কুরুন, কালী, গুন, খান্না বাদ দিলে সব কথাগুলি তুর্কী শব্দ।

একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা বিশ্বত্রাস তৈমুর এলেন, আর ইরানী ভাষায় দ্বিতীয়বার তুর্কী শব্দ-সম্পদের স্রোত এল। বিপর্যয়ের অব্যবস্থিত দশাটাও কেটে গেল। হ.াফি.জে র মত বিশ্ববিশ্রুত কবিও সেই বিশ্বত্রাসের হাতে আশীর্বাদের খিলাত পরিধান করলেন। ভাষা-স্রোত এবার নতুন আর একটি দিক ধরলো, সেটা সাহিত্য শিল্পের আঁকা বাঁকা বড় মধুর, বড় সুন্দর সরণি। পূর্বের কাব্যভাষার হৃদয় থেকে হৃদয়ে সংক্রমণ আর রইলো না। সেটা ছিল সোজা এবং অনাডম্বর হৃদয়সরণি। এখনকার সেই হৃদয়সরণি একটু উপরে উঠে বুদ্ধির রাজ্য ঘুরে আসে, পল্লবিত ভাষণের কিছু শ্রী ও লাবণ্য তাতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সংযত, অনাড়ম্বর পদক্ষেপ পরিত্যাগ করে কাব্যবধূ নানা অলঙ্কারে এবং প্রসাধনে প্রসাধিত হয়ে উঠলো। তার চরণের নূপুর-নিক্কন আমাদের নতুন আর এক প্রকার আনন্দ দিল। অবশ্যই তাদের কৃত্রিমতার আবরণ কিছুটা ছিলই। জড়ির ওড়নার মধ্য দিয়ে কাব্যবধূর মুখখানা দেখে কিন্তু মুগ্ধ হতেই হবে। হয়তো বা দূরে দাঁড়িয়ে পূর্ব যুগের এক কবি বলতেন—এত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা কেন? এত কথারই বা কি প্রয়োজন? হয়তো বা চোখের জল ফেলে বলে বসতেন—

'জান্-ই-মন্ আন্ রূ.জ.রফ্.ত্, কি রুখ.ত্ আমদ্
ব পেশ্-ই-মন্।'

ওগো! তুমি আমার সামনে যেদিন থেকে তোমার মুখ আবৃত করেছ, সেদিন থেকেই আমার জান্ আমার দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছে। তোমার অলঙ্কারের আবরণ আমার ভাল লাগে না।

আমাদের প্রস্তাবিত তৈমুরীয় যুগের ইরানী সাহিত্যে সমৃদ্ধিযোগ দেখাবার পূর্বে একথা স্বীকার করে নিতে হবে হুলাগূ খানের মৃত্যুর পর থেকে (১২৬৫) ঈলখানের মৃত্যু পর্যন্ত (১৩৩৭) ইরানী সাহিত্য কদাচ অবক্ষয়ের অভিশাপে ভোগে নি। এইসব খানেরা কাফের হলেও পার্সী সাহিত্য অনুশীলনে বাধা দেননি। কারণও ছিল। খানেরা তাঁদের অভিযানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করাতে চাইতেন, তাঁরা ধর্মগ্রন্থ এবং দর্শন

সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন এবং সেইসব অমূল্য গ্রন্থরাজি ভস্মীভূত হতে দেখেও বিদ্বেষের হস্ত তোলেন নি। কিন্তু ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, জ্যোতিষ, এক কথায় বিজ্ঞান গ্রন্থগুলি তাঁরা সযত্নে রক্ষা করে গিয়েছেন। কবিদের তাঁরা শুধু বাঁচিয়ে রাখেন নি, পারিতোষিকে পরিতুষ্ট করে বৃত্তিদানে রীতিমত লালিত করে রেখেছেন; কারণ তাঁরা চাইতেন তাঁদের বিজয়গাথা কবিকণ্ঠে সালঙ্কারে ঘোষিত হোক। ঈলখানের পরবর্তী শাসক গাজ.ান খাঁ স্বয়ং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিবর্তন ঘটে গেল। চেঙ্গীজ. খাঁর এবং সেই বংশের নৃশংস বর্বরতা স্মৃতির রাজ্য থেকে মুছে না গেলেও তার রক্তরাগ অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছিল।

মোঙ্গলদের বিধ্বংসী অভিযান থেকে শীরাজ. অন্তত চরম ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তখন শীরাজে.র শাসনকর্তা বহু স্বর্ণমুদ্রার উপহার ঢেলে দিয়ে সেদিন শীরাজ.কে রক্ষা করেছিলেন। স'দী সুকৌশলে বূস্তান গ্রন্থে ঐ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর অনবদ্য ব্যঞ্জনাময় ভাষায় বলেছেন সেকেন্দরের অভিযানে পাথর ও পিতল ঢেলে দিয়ে গগ ও মাগগের বাইরে আসার পথটাকে সরু করে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এই বিধর্মী খানেদের সময় সেই পথ বন্ধ করে দেওয়া হ'লো সোনা ঢেলে দিয়ে।* এতে কবি শীরাজ. রক্ষার উপায়ের ইঙ্গিত দিলেন এবং সুকৌশলে যবন ও মোঙ্গল অভিযানের পার্থক্যও বুঝিয়ে দিলেন। কবি স্পষ্ট করে তুললেন দুই যুগের উৎকোচের তারতম্য। স'দীর ভাষায় "তোরা সেদ্দ ইয়াজূজ কফর অজ.জ.রস্ত্"।

বলেছি মোঙ্গল নায়করা ইতিহাস চেয়েছিলেন। এই যুগে নামকরা ইতিহাস—জহান্‌গুশা—ঐতিহাসিক জুবায়নী। আর একটি ইতিহাস—জামি' উত্‌তবারীখ—ঐতিহাসিক রশীদুদ্দীন ফদ্‌ল্লাহ্। এই প্রসঙ্গে

* গগ ও মাগগ—রোজ. কেয়ামতের পূর্বে গগ মাগগ শয়তানেরা শূন্য থেকে ছুটে আসবে সব ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। ওরা উঁচু দেওয়ালে আবদ্ধ হয়ে আছে, তাই সৃষ্টির নিয়ম চলছে। কোরাণশরীফ—২১: ৯৬-৯৭ সুরা।

সিকন্দর ব দীরার iw' রো সঙ্গ বকরদ্ অজ.জহান্ রাহ্‌ য়াজূজ তর্শ.তোরা সদ্দ্ যাজূজ কাফের অজ. জরস্ত্ ন চূ দীরার-এ-সিকন্দরস্ত্।

এই যুগের প্রখ্যাত মনীষীর নাম করতেই হবে। তিনি নাসীরুদ্দীন তূসী। বহুদিন পরে আবার একজন সার্বভৌম পণ্ডিতকে দেখা গেল। চিকিৎসা, ভৈষজ্যবিদ্যা, অস্ত্রোপচার—সর্ববিষয়ে তিনি সুদক্ষ। তদুপরি তিনি সূক্ষ্ম চিন্তায় অদ্বিতীয় দার্শনিক। তিনি প্রাক্ খ্রীষ্টীয় যুগের Plato এবং Aristotle—এই দুটি গ্রীক দার্শনিকের ন্যায়দর্শনের (Logic) সমীক্ষা করেছিলেন।

শেখ স'দী

কবি শব্দের একটি নির্বচন সম্প্রদায়গত বেদব্যাখ্যায় স্বীকৃত হ'য়ে আছে। সেখানে দেখি ঋষিরাই কবি। ঋষি মানে দ্রষ্টা, কবিরাও দ্রষ্টা। কবিরা মেধাবী, কবিরা ক্রান্তদর্শী—যার অর্থ তথ্যের কারবারী ও সত্যদর্শী। নৈয়ায়িক বুদ্ধি বিচারের ঊর্ধ্বে যে দূরদর্শন বা প্রজ্ঞা থাকে, সেই প্রজ্ঞাবলেই কবিরা হ'ন 'কবি'। এই প্রজ্ঞাশক্তি আনে তাঁদের দূরদর্শিতা। এই প্রজ্ঞাচক্ষুই তাঁদের দিব্যচক্ষু—সেই চক্ষু, যে চক্ষুকে Carlyle বলেছেন—'The seeing eye, It is this that discloses the inner harmony of things.' বস্তুজগতের প্রাণ-রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে নিয়মের ঐক্য দর্শন করার যে চক্ষু, এ সেই চক্ষু। বুদ্ধির উপরে আছে যে বোধি, সেই অলৌকিক শক্তিতেই তাঁদের হয় অপরোক্ষানুভূতি। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইরানের শীরাজ. নগরে এমনই এক ক্রান্তদর্শী প্রজ্ঞাচক্ষু কবির জন্ম হ'য়েছিল—১১৮৪ সালে। তিনি জীবিত ছিলেন একশ' আট বছর। তাঁর ছোট্ট নামটি ছিল আবদুল্লাহ্। ধর্ম নামের সমুন্নয়নে নামটিকে পরিমার্জিত করা হ'য়েছিল মুশার্‌রফ্ উদ্দীন দিয়ে এবং পিতৃপরিচয়ে বলাহিত করা হ'য়েছিল বিন্ মুস্‌লিহ্ উদ্দীন দিয়ে। আশ্রয়দাতা প্রভু স'দজঙ্গীর নামও তার সঙ্গে যুক্ত হ'তো ছোট ক'রে স'দী। শীরাজে. জন্ম ব'লে শীরাজী। প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ব'লে তিনি 'শেখ'। এইসব দিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ নামটি দাঁড়িয়েছিল—

"শেখ মুশারিফ-উদ্দীন বিন মুসলিহ্-উদ্দীন আবদুল্লাহ স'দী শীরাজী।" অতি সংক্ষিপ্ত নাম স'দী। স'দীর অর্থ সৌভাগ্যবান্। এটাকেই তিনি সংক্ষিপ্ত কবিনামরূপে ব্যবহার করতেন—পার্সী ভাষায় যাকে বলে 'তখল্লুস'। ইংরেজীতে এমন ছদ্মনাম False name বা Pseudonym। ফরাসী ভাষায় এসব নামকে বলে 'নঁ ছ গ্যার' nom de guerre বা মসীযুদ্ধের নাম। যুদ্ধ না থাকলে সোজা ফরাসী ভাষায় 'nom de plume' যার অর্থ (পালক) লেখনী-নাম।

স'দী-দরিদ্রের ছেলে। তার উপর আর এক অদৃষ্টের অভিসম্পাত এল। তিনি শৈশবেই পিতৃহীন হলেন, কিন্তু তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না। মানুষটি শৈশব থেকেই অন্তরে বাইরে শক্ত। চললেন তিনি বাগদাদের নিজামিয়া মহাবিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য। তিনি তাঁর আশ্রয়দাতা ইরান-রাজ অতাবেক স'দজঙ্গীর সাহায্যেই বাগদাদে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। হাঁ, এইবার সেই শক্ত মানুষটির একটু কথা বাকী রইলো। সত্যই কি তিনি অন্তরে বাইরে শক্ত ছিলেন? মনে হয়, মাঝে মাঝে তাঁর ভাবপ্রবণতা তাঁকে দুর্বল করে ফেলতো। তাঁর প্রথম গ্রন্থ বুস্তানের বিবরণে বোঝা যায়, পিতৃহীন অনাথ বালকের ভেতরটা কত দুর্বল ছিল! অনাথ শিশুর ভাবোচ্ছ্বাস দিয়েই বুস্তানের সে অংশ রচিত। সে অংশ যে কোন হৃদয়বান্ পাঠকের মর্ম স্পর্শ করবে। তিনি তাঁর কবিতায় তাঁরই শৈশব-জীবনের ছবি দিয়েছেন।

'সহায়হীন, অবজ্ঞাত অনাথশিশুর চোখের সামনে তোমার নিজের সন্তানকে কখনো আদর করো না, কোনদিন স্নেহচুম্বন দিও না। পিতার স্নেহালিঙ্গন কণ্ঠে জড়িয়ে শিশু ভাবে সে সোনার মুকুট মাথায় পরেছে। জাননা তোমরা, অনাথের আর্তনাদে খোদার দীপ্ত আসন টলে ওঠে। তাই বলি, তোমরা—অনাথের সম্মুখে আপন শিশুকে আদর করো না।' তিনি পরে বলেছেন—'অনাথের মর্মবেদনা যে আমি জানি। অনাথের শূন্য হৃদয় কেমন করে জ্বলে তার ছবি যে আমারই রক্ত রেখায় আঁকা।'—কিন্তু এ ক্ষণিক উচ্ছ্বাস। ভাবাতিরেকে ক্ষণে ক্ষণে দুর্বল হলেও স'দী ছিলেন আত্মিক শক্তিতে একজন সুদৃঢ় মানুষ। অনন্যমনা হ'য়ে অবিচলিত নিষ্ঠায় তিনি বাগদাদে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করলেন। নানা

শাস্ত্রে হ'লেন তিনি ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত এবং প্রাবীণ্য অর্জন করলেন হাদীস সহ কুরানশরীফে। আরবে তাঁর নাম শেখ বা পণ্ডিত বলে প্রচারিত হ'লো। বাগদাদ ছিল সে যুগের ইসলাম দুনিয়ার প্রাণ-কেন্দ্র, জ্ঞান বিজ্ঞান অনুশীলনের শ্রেষ্ঠস্থান। খলিফা হারুন-অল্-রশীদ্ বাগদাদকে বিশ্ব-বিশ্রুত ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাগদাদ আর একদিকেও প্রসিদ্ধ ছিল। কেউ কেউ বলেন, এখানেই সূফী ধর্ম বা মরমী সাধনার উন্মেষ এবং বিকাশ ঘটেছিল। ইরানীদের রক্তের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাতে তারা এই প্রেমধর্মে সবচেয়ে বেশি সাড়া দিয়েছে। তখন বাগদাদে রাজত্ব করছেন আব্বাসীয়া বংশের শেষ খলিফা 'অল্ মুস্তা সিম বিল্লাহ্'। এই সময়কার একটা ঘটনা—মোঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদ লুণ্ঠন এবং শেষ খলিফার সপরিবারে হত্যা—স'দী-তাঁর একটি মরসীয়াতে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অন্তরের গভীর শোকোচ্ছ্বাসে আজিও এটি সত্যকার গীতিকবিতা বলে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। বাগদাদে সেই সময় একজন প্রসিদ্ধ সূফী ছিলেন। তাঁর নাম শেখ শিহাবুদ্দীন সুহ্রাবর্দী। স'দীর মন তখন বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ। তিনি এই সূফী গুরুর কাছে দীক্ষিত হলেন। তাঁর সংস্পর্শে, তাঁর কৃপা-ধন্য হ'য়ে তিনি আনন্দ পেয়েছিলেন তার পরিচয় আছে স'দীর বুস্তান গ্রন্থে। সেই মহা-সাধকের অহেতুক কৃপা এবং অকৃপণ প্রেমের বর্ণনায় তিনি পঞ্চমুখ। তিনি বলেছেন—তিনি শুধু আধ্যাত্মিক সম্পদ্ এই গুরুর নিকট পান নি, তাঁরই কৃপায় তার নাম দেশ বিদেশে প্রচারিত হয়েছে। স'দীর গুলিস্তাঁ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়, তিনি শামসুদ্দীন আবুল ফর্‌রাজ ইবন্-উল-জাওজীর কাছেও দীর্ঘকাল সূফীদর্শনের জ্ঞান অর্জন করেন। আমাদের এই জীবনী-আলোচনার শেষভাগে মরমী সাধক স'দীর যে পরিচয় দেবার চেষ্টা করব তারই পূর্ব-পীঠিকারূপে এই সূফী সাধক দুটির নাম উল্লেখ ক'রে রাখলাম।

স'দীর শিক্ষাগ্রহণকাল ঠিক কতদিন জানি নে। তবে বাগদাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল ১২২৬ সালে। জন্ম ১১৮৪ ধরলে, বয়স তখন ৪২ বছর। প্রৌঢ় ব'লে স'দীকে এখনই বাতিল করা কিন্তু চলবে না। এতো মাত্র শুরু—আসল জীবনের শুভারম্ভ। জীবনের এই চল্লিশী পর্যায়

ইংরেজী প্রবাদবচন 'The old age of youth and the youth of old age'. বিয়াল্লিশ বছরের এক তরুণ প্রৌঢ় সবেমাত্র পুঁথির জ্ঞান শেষ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ-বিজ্ঞানের জন্য অঞ্জলি পেতেছেন। জ্ঞানের পিপাসা এবং অবিচল অধ্যবসায়ের মিলিত রসায়ন স'দীকে গ্রন্থে নিবিষ্ট করে রেখেছে; আবার আর একটা প্রেরণা তাঁকে বার বার বহির্মুখীন করে দিয়েছে। খাঁচার পাখীটা বার বার বনের পাখীর ডাকে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। তাঁর কৌতূহলী মন তাঁকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয় নি। বাগদাদে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সুদীর্ঘ দেশভ্রমণে বের হয়ে পড়তেন। তাঁর গুলিস্তাঁ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে এইরকম ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং কাশগড়ে অবস্থিতির বৃত্তান্ত আছে। যদিও এটা ছিল তাঁর শিক্ষাকাল, তথাপি এমন সময়েই তাঁর যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শেখ স'দী তাঁর জ্ঞানে এবং অভিজ্ঞতায় বহুদর্শী পণ্ডিতরূপে ইসলাম দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন।

বহুদিন পর শেখ স'দী স্বদেশ শীরাজে. ফিরে এলেন। মনে পড়লো একদিন শৈশবে বাগদাদ যাত্রার প্রাক্কালে এই শীরাজে.র জন্য প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু অভিভূত হলেও সেদিন তিনি কোন ভাবোচ্ছ্বাসকে আমল দেন নি। সেদিন জন্মভূমি শীরাজ. ত্যাগ করে কোনো অন্যায় তিনি করেন নি। পরবর্তীকালে শেখ আত্মানুসন্ধান করে তার ঠিক উত্তর যেমন পেয়েছেন, অকপটভাবে তিনি তাই হুলাগূ খানের প্রধানমন্ত্রী সাহ.ব দীবানের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি গজ.লে প্রকাশ করেছেন। তমাম কোরানশরীফ ও হাদীসে মহাপণ্ডিত স'দী জানতেন হাদীসে আছে—'দেশপ্রীতির নামই ঈমান্'। তিনি ব'লেছেন হাদীসের সেই 'হুব্বুল-এ-বতন মিনাল ঈমান্' কথাটি প্রায় মসল বা প্রবাদবচন হ'য়ে গিয়েছে; তথাপি তিনি বলেছেন—হে স'দী! তুমি এই শীরাজে. জন্ম নিয়েছিলে বলেই অনাহারে তিলে তিলে শক্তিহীন হয়ে সেখানে মরে যাবে, এমন কথা হতে পারে না। স'দী বলেছেন—

"স'দীয়া হুব্বুল-এ-বতন্ গর চে হদীসীস্ত্ সহীহ্।
ন তুবান্ মুরদ্ বে সখতী কে মন্ ইন্‌জা জাদম্॥"

তিনি আরও বলেছেন—আজ আমি চললুম। আজ বাগ.দাদ আমার

হৃদয় ধ'রে টান দিয়ে শীরাজে.র সম্বন্ধ থেকে কেড়ে নিতে চলেছে। তাই হোক, আজ থেকে সেই দিনটার শুরু হোক, যে দিনগুলিতে আমার খবর দেবে বাগ.দাদ, শীরাজ. নয়—

"দিলম্ অজ. সুহ.বত্-এ-শীরাজ. বে কুল্লী বে গ্রেক্ত।
রকৃত্-এ-আনাস্ত্ কে পুর্‌সী খবর অজ. বাগ.দাদম্॥"

কবির কোমল প্রাণের মধ্যে কতবড় একটা শক্ত বাস্তব অংশ সহাবস্থান করছিল তার প্রমাণ এই ঘটনা। গ্রহণ-বর্জনের এই বস্তুগ্রাহী অংশ দিয়েই স'দীর চরিত্র গঠিত ছিল। এই অংশে তিনি লৌহ-দৃঢ় মানুষ। এইসব জন্যই সূফী-প্রেমে বিগলিতহৃদয়ে কবিটিকে তার হিকমত্ অংশে ঠিকভাবে মেলানো যায় না। তাঁর মধ্যে দুটি সত্তা dual personality নির্বিরোধে চিরকাল বাস করে এসেছে।

স্বদেশপ্রীতির জন্য শীরাজে.র কবিরা প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আর একজন সূফী শীরাজ.ী কবির উল্লেখ করছি। তিনি শীরাজ. ছেড়ে বেহেশ্তেও যাবেন না। তাঁর এক প্রসিদ্ধ গজ.লে তিনি বলেছেন—'সাক.ী! আমার জন্য যতটুকু সুরা আছে, সবটুকু এখানেই ঢালো। বেহেশ্তে তো তুমি এই শীরাজে.র উপনগর মুসল্লার উপবন আর উপনগর রুকনাবাদের নদীর তীর পাবে না; সুতরাং ঢালো সাক.ী এখানেই ঢালো।' হাফিজ. ছিলেন এই বসুন্ধরার ভক্ত, স্বদেশ-বৎসল মানব প্রেমিক কবি। তিনি বলতে পেরেছেন—'বরতর্ অজ. গরদূঁ মোকাম্-এ-আদমস্ত্'। মানুষের বাসস্থান—এই মাটীর পৃথিবী স্বর্গ থেকে বড়। তিনি বলতে পেরেছিলেন—মানুষের প্রতি প্রেমই সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ। 'আমল্-এ-তহজীব এহ্তরাম্-এ-আদমস্ত্'। শেখ স'দী বুদ্ধিজীবী স্থিরচিত্ত অস্তিত্ববাদী। স'দী দেশ ভালবাসেন; কিন্তু ভাবের ঘরে যার চুরি নেই, সে কবি মনে করেছেন দেশের চাইতেও বড় হচ্ছে মানুষের প্রাণ। স'দী একজন বড় existentialist—এমন অস্তিত্ববাদী সে যুগে দুর্লভ। তিনি abstract থেকে সর্বদাই concreteকে বেশি মূল্য দিয়ে এসেছেন। এইজন্যই হাদীস্-এ-সহীহ্ এর পাশে আত্মরক্ষার জৈব ধর্ম। দুর্ভিক্ষে, বৃত্তিহীনতায়, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং জীবনসংশয়ে প্রয়োজন

হলে দেশত্যাগ চলে। আসল কথা মানসিক স্থৈর্য। সেটি বিঘ্নিত হলে সবই স্থান-চ্যুত হয়ে যায়। এই বস্তুনিষ্ঠতা স'দীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। স'দী বুঝলেন নিশ্চিত মরণ সম্মুখে রেখে যে বাঁচা, সে তো বাঁচা নয়। আমরা মরার জন্য বাঁচি না, বাঁচার জন্য অজানায় ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত হই। সমগ্র ফারসে আগুন জ্বলছে। শীরাজ.কে রক্ষা করা যাবে না। সুসজ্জিত রাজসভা, অভিরূপ সঙ্গম—সব স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। স'দী তাঁর গুলিস্তাঁ। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় নির্ভীকভাবে সত্য কথাটি বলছেন—

······তোমরা কি জানতে চাও কেন আমি স্বজন, স্বজাতি, স্বদেশ ছেড়ে নির্বাসিতের মত পথে পথে, দেশে বিদেশে ঘুরে মরেছি? তবে শোন—তুর্কীরা (মোঙ্গল) তখন দুনিয়াটাকে এলোমেলো করে দিয়েছিল, একেবারে নিগ্রোদের চুলের মত এলোমেলো। ওরা নরাকার নেকড়ে বাঘ। বৃকের মতই ওদের শাণিত নখর, ওদের রক্ত পিপাসাও তেমনি।'...

সুদীর্ঘ তিরিশ বছর পর আবার তিনি শীরাজে. ফিরেছিলেন। সে ঘটনা গুলিস্তা র উপক্রমণিকায় তিনি বলেছেন। 'হাঁ, ভুবন ভ্রমণ শেষে আমি আবার আমার শীরাজে. এসেছি। শীরাজ. এখন শান্ত। আমি সুদীর্ঘ প্রবাস শেষ করে এসে পেয়েছি—আতাবক আবূ বকরকে।' এই আবূ বকর ছিলেন তাঁর অশেষ প্রণয়ভাজন আশ্রয়দাতা আতাবক স'দ জ.ঙ্গীর পুত্র। কালটা তখন ১২৫৬ সাল। কবির বয়স বাহাত্তর। এই সময়—প্রথমে তাঁর বূস্তান এবং তারপর তাঁর গুলিস্তান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বূস্তান মসনবী নামক বর্ণনাত্মক কাব্য। বূস্তান সুগন্ধি স্থান বা ফলোদ্যান। আর গুলিস্তান ফুলের বাগান। দুই-ই মনোরম। গুলিস্তাঁ। গদ্য পদ্যময়ী রচনা। এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীর সঙ্গে উপদেশ বা হিকমত্ মিশ্রিত আছে। এই গ্রন্থের কথায় পরে আসছি। তার আগে সুদীর্ঘ তিরিশ বছরের পরিব্রাজকরূপের একটু পরিচয় দিই।

বুদ্ধিতে বিচক্ষণ. আচারে আচরণে সর্বদা সপ্রতিভ মানুষটি স্বদেশচ্যুত হ'য়ে পরিব্রাজকরূপে তখনকার আফ্রো এসীয় দুনিয়ার অনেকস্থানেই ভ্রমণ করেছিলেন। পূর্ব-এসিয়ার বলখ, গজনা, পাঞ্জাব, গুজরাট; ওদিকে পশ্চিম এসিয়ার ইয়েমন্, হে.জাজ. এবং আরবের তীর্থ দুটি। তারপর সীরিয়া এবং সমগ্র এসিয়া মাইনর। বাগদাদ তো তাঁর নখদর্পণে।

আবিসিনিয়া সহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকাতেও তিনি পর্যটন করেছিলেন। অধিকাংশ স্থানেই তিনি দরবেশ, কদাচিৎ অন্তবেশে। এইভাবে দেশে দেশে তিনি বন্দিত না হলেও স্বয়ং নন্দিত হয়ে ঘুরেছিলেন। বন্দিত হবেন কেমন করে? তাঁর ছদ্মবেশে তাঁকে চিনবে কে? মাদ্রাসার ছেলের দলে মিশে তিনি যখন ব্যাকরণের ফাঁকি নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন সেই ছেলের দল শেখ স'দীকে তাদের চেয়ে সামান্য একটু বেশি বিদ্বান মনে করতো। মরুভূমির উপর দিয়ে পথ চলতে চলতে তিনি তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে এমন হাসি মস্‌খরায় গল্প জুড়ে দিতেন, যে তাদের বোঝার উপায় থাকতো না মানুষটির সত্যস্বরূপ কি! অনন্ত কৌতূহলী তাঁর মনে কৌতুকও কম ছিল না। যেমন তিনি নৈয়ায়িকের তীক্ষ্ণ যুক্তি দিয়ে কার্যকারণপরম্পরা বিশ্লেষণ করতেন, তেমনি তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন দুর্জ্ঞেয় মানব চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করতে। মানুষের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে মনের নাগাল পাওয়া যায় না; তাই সা'দী নানা বেশে সর্বদা অজ্ঞাতপরিচয়। দীর্ঘদিন পরিব্রাজকরূপে শেখ স'দী বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করলেন লোকচরিত্র এবং নানা দেশের আচার-ব্যবহারে অপরোক্ষ জ্ঞান। গ্রন্থে অধীত জ্ঞানের বিষয় এইভাবে বাস্তবজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁর হিকমত্‌ বিস্তৃত জ্ঞানের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে।

গুলিস্তাঁ থেকে তাঁর কতগুলি উপদেশ তুলে ধরি। তিনি বলছেন—

"ইলম্‌ চন্দাঁ কে বেশতর খ্বানী।
চূঁ আ'মল দর তূ নীস্ত্‌, নাদানী॥"

জ্ঞান তোমার গভীর, জানি সে জ্ঞান বিস্তর অধ্যয়নে সুপ্রতিষ্ঠিত; কিন্তু যদি তোমার মধ্যে আ'মল বা বাস্তব কর্মের কিছু না থাকে, তবে তুমি একজন নীরেট মূর্খ॥

"না মহক্‌কীক্‌ বুদন্দ্‌ দানেশমন্দ্‌।
চাহর পা-এ বরউ কেতাব-এ-চন্দ্‌॥"

এমন বাস্তব জ্ঞানহীন কখনো পণ্ডিত বা জ্ঞানী বলে স্বীকৃতি পাবে না। সে যেন এক চতুষ্পদ জন্তু, যার উপর চাপানো আছে কতগুলো বইএর বোঝা।

"আন্ তহী মগ.জ্.রা চে ইলম্ রো খবর্।
কে বরউ হেজিমস্ত্রা দফতর্॥"

ওই শূন্য মস্তিষ্কের কি বা জ্ঞান, আর কি বা অভিজ্ঞতা? ওর উপর চাপানো আছে কতগুলো হেজিম্ বা কাষ্ঠখণ্ড অর্থাৎ কাঠে বাঁধান বইপত্র।

শেখ স'দী প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা কি বুঝেছেন, আশা করি তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গুলেস্তাঁ সকল বয়সের মানুষের চির আদরের সামগ্রী। বিশ্বের কত ভাষায় যে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গ্রন্থখানা পড়ে মনে হয় ইরানের এক সিদ্ধসারস্বত দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে পূর্ণ সিদ্ধির ফলটি নিয়ে অভাবিত দর্শন দিলেন। সেখানে যেমন আছে তাঁর বহুদর্শিতা এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তেমনি প্রকাশের মধ্যে ফুটে উঠেছে তাঁর নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করতে পারে, এমন পাঠক দুর্লভ। এই আত্মপ্রত্যয়ের উচ্চচূড়া থেকেই তিনি সর্বদা কথা বলেন এবং কর্তব্যবিমূঢ়দের পথের নির্দেশ দেন। তাঁর দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, অনুভূতি যেমন গভীর, জটিলতম সমস্যার সমাধানও তেমনি দ্রুত এবং অবিসংবাদিত। তাঁর কথার সঙ্গে অনেকের কথাই মিলতে চাইবে না; কিন্তু প্রকাশে তিনি সর্বদাই অকপট এবং নির্ভীক। য়ুরোপ এবং এসিয়ার Ethics বা নীতিশাস্ত্রের যে প্রচলিত মানদণ্ড আছে, তা দিয়ে শেখ স'দী-কে ওজন করা চলবে না। বুস্তান এবং গুলেস্তানে এমন চমক দেওয়া ঘটনাসমূহ আছে, যেগুলি আমাদের সংস্কার-লালিত চিত্তকে নাড়া দিয়ে জানিয়ে দেয়, চিরাভ্যস্ত অঙ্গুলি সঞ্চালনে ঘুম পাড়ায় না। শেখ স'দী সত্যকে কালত্রয়ে অবাধিত, সর্বাবস্থায় অপরিবর্তিত ধ্রুবরূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। ইষ্টের অনুকূলে মিথ্যা পরসন্তাপের কারণ না হ'লে সত্য থেকেও ভালো; পরসন্তাপের কারণ যে শয়তানি সত্য, সে মিথ্যার চাইতেও নিকৃষ্ট। গুলেস্তানে স'দী সত্য মিথ্যার এইরকম বিচার ক'রেছেন। ভারতের বহুদর্শী নীতিবিদ্ বলেন, "পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্ধনম্"—সাপকে দুধ খাওয়ালে তার বিষই বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ইরানের নীতিবিদ্ বহুদর্শী স'দী বলেন,—সর্বোত্তম শিক্ষাও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রক্তের শয়তানিকে দূর ক'রে দিতে পারে না।

আবার ভারতের নীতিশাস্ত্র বলে—'অগ্নেঃ শেষং ঋণাৎ শেষং শত্রোঃ শেষং ন শেষয়েৎ'—অগ্নির শেষ, ঋণের শেষ এবং শত্রুর শেষ রাখতে নেই। স'দী বলেন—এসব ক্ষেত্রে একেবারে শেষ করে দেওয়াই ভালো। দুর্বলের শয়তানিও সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মার্জারকে কোণঠাসা করলেও নিস্তার নেই, সুযোগ বুঝলেই সে নেকড়ে হ'য়ে চোখ ওপড়াতে চাইবে। নিকৃষ্টতম শত্রু হচ্ছে জ্ঞাতিশত্রু কারণ সম্পত্তির অংশ নিয়ে মনোমালিন্য হবেই। ভারতের নীতিশাস্ত্রকাররা সহজশত্রু এবং সহজ মিত্রের ব্যাখ্যায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। বাঙ্গালী কবির কথা—"বড়ার পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।" স'দী লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন—বাদশাহ্‌দের কোন মতিস্থির নেই। কখনো সহস্র সেলামেও মন পাওয়া যায় না, আবার কখনো গালি দিলেও ইনাম মেলে। কামন্দকের নীতিশাস্ত্রে আছে—শত্রুকে কাঁধে কাঁধে রাখো, আর সুযোগ পেলেই আছাড় মেরে মাটির ঘটের মত চূর্ণ করে ফেল—'ভিন্দ্যাদ্‌ ঘটমিবাশ্মনা'। মহাদুষ্ট দ্বারা নির্যাতিত হ'য়ে, তখন কিছু না ব'লে পরিশেষে রাজরোষে কারাবন্দী সেই দুষ্টকে পাথর ঠুকতে গিয়ে স'দীর গল্পের নায়কটি এইরকমের সুযোগের তত্ত্বই ব্যাখ্যা করেছে। এ বিষয়ে স'দীর উপদেশ হ'লো কিছুদিন সহ্য কর, তারপর—

বিধির বিধান ক্ষয় ক'রে দেবে শাণিত নখর সব।
সেইদিন তুমি মগজ. কাড়িবে—রহিবে না কলরব॥'

(গুলিস্তা ১ম পরিচ্ছেদ ২২ নং গল্প)

এইসব নীতি, পরিশীলিত-বুদ্ধি উদার হৃদয় মানুষের জন্য নয়। উচ্চতম জীবনের এ আদর্শ হ'তে পারে না। বিচক্ষণ সংসারী মানুষ গড়ারও প্রয়োজন থাকে, স'দীর হিকমত্‌ সেইজন্য। ব্যবহারিক জগতে এগুলোর মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতবর্ষে একদা একটি Practical ধর্ম প্রচারিত হ'য়েছিল। সে ধর্ম তন্ত্রধর্ম। তন্ত্রশাস্ত্র মানুষকে তিনটি ভাগে বিভক্ত ক'রে দিয়ে বলেছিল—আচার আছে তিনটি—পশ্বাচার, বীরাচার এবং দিব্যাচার। পশু থেকে দিব্যজীবনে পৌঁছবে বীরাচারের মধ্য দিয়ে। দিব্যভাবে উন্নীত হ'লে বাকী দুটোর কোনো মূল্যই থাকে না। তবে এ কথা স্বীকার করা ভাল,—মানুষ জন্ম থেকেই পশু;

বাকী ছুটো স্বর আসে অনুশীলনের ফলে। এতো কথা বলছি এইজন্য যে, শেখ স'দীকে যেন ভুল বোঝা না হয়। পারত্রিক চিন্তা-বিমুখ ঐহিকতা-সর্বস্ব স'দী শেখ স'দীর একাংশ মাত্র। পশু বীর এবং দিব্য —এই ত্রিভুবনেই তিনি ত্রিবিক্রম। সে যুগের ইরান এবং সে যুগের সাধারণ ইরানীদের জন্য একান্ত ব্যবহারিক নিম্নস্তরের কথারও প্রয়োজন ছিল; কারণ যুগটা অব্যবস্থিত—স'দীর কথায় 'তুর্কীরা যে সব নিগ্রোদের চুলের মতো এলোমেলো ক'রে দিয়ে গেল।' তখন বুদ্ধিবাদী এবং অস্তিত্ববাদী না হ'য়ে উপায় ছিল না। যে জীবনের জন্য এইসব উপদেশ সে জীবন চাতুর্যপূর্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত, ভোগময় এবং আত্মকেন্দ্রিক। এই আত্মকেন্দ্রিক জীবনটারও তো নানাদিকে প্রয়োজন আছে! মানুষ বাধা বিপত্তি এড়িয়ে বাঁচতে চায়, ভোগ করতে চাওয়া জীবনেরই একটা দিক।

শেখ স'দীর আর একটি দিক আছে; যেদিকে নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-কেন্দ্রিকতা এবং ভোগ সর্বস্বতা নিন্দিত হ'য়েছে। তিনি বলেন অর্থের প্রয়োজন আছে। জীবনের আরাম এবং সুখের জন্য অর্থ; কিন্তু তাই ব'লে অর্থকেই পরমার্থ করা উচিত হবে না। এমন হ'লে মানুষ সঞ্চয়ের অচল বিকারে পচে গলে মরবে। জীবনটা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমাজগত। এই সামাজিক তত্ত্বটি (Social reality) ইসলাম ধর্ম গোড়া থেকেই উপলব্ধি করেছে। শেখের দৃষ্টি এদিকে অত্যন্ত জাগ্রত মনে হয়। তিনি স্পষ্টকথায় বলছেন—

মাল অজ. বাহরে আসায়েশে উ'মরস্ত্।
না উ'মর অজ. বাহরে গিরদ্‌করদনে মাল॥

সম্পদ্ জীবনের সুখের জন্য; কিন্তু জীবনটা অর্থ সঞ্চয়ের জন্য নয়। শেখ স'দী আরও বলেন,—বুদ্ধিমান্ নিশ্চয়ই বলবে, ভাগ্যবান্ ভোগ করে এবং বিলিয়ে দেবার উদারতাও তার মধ্যে থাকে। হতভাগ্য সেই, যে নিজের বিষয়ের বিধিব্যবস্থা না করেই মৃত্যুর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়। সেই আত্মসর্বস্ব পরবিমুখের মৃতদেহের উপর কোন প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করো না।—'মা কুন নমাজ. বর আন্'। কাজেই আমরা দেখি ভোগ এবং ত্যাগের অপূর্ব মিশ্রণেই স'দীর জীবনদর্শন গ'ড়ে উঠেছিল। তিনি সংসার এবং স্বর্গ, ভোগ এবং মোক্ষের মধ্যে অপূর্ব সেতুবন্ধন করেছিলেন।

আবার এদিকে খাঁটি পণ্ডিত এবং সাধুরা যে কেমন ভোগবিমুখ হন, উচ্চ চিন্তায় সর্বদা আত্মনিয়োগ করেন, তাও তিনি গুলিস্তাঁ। গ্রন্থে দেখিয়েছেন। গুলিস্তাঁর একটি চূর্ণকে আছে—মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব থেকে বিচ্যুত হ'য়ে দরবেশ হ'লেন; তারপর অনুতপ্ত বাদ্‌শাহ আবার তাঁকে তাঁর পদাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন; কিন্তু দরবেশ আর মন্ত্রী হ'তে চাইলেন না। বাদশাহ্ বললেন—'তোমাকেই চাই; কারণ তুমি খাঁটি, আমি খাঁটি মানুষ চাই।' দরবেশ বললেন, 'আমি খাঁটি বলেই তো, ব্রত-ভঙ্গ করতে পারব না, আমি চিরকালের জন্য দরবেশ।' এই সময় দরবেশ বাদশাহ্‌কে উপদেশ দিলেন—

"অগর বশুনুয়ী আয়্ বাদশাহ্, দর হমা
দফতর বেহ্ অজ্.ইন্, পন্দ্‌নীস্ত্।
চূ জ. বে খিরদ্‌মন্দ্ মা ফরমা আ'মল,
গর চে আ'মল কার-এ-খিরদ্‌মন্দ্ নীস্ত্॥"

যদি তুমি শোন বাদশা! তবে বলি—আমার এই উপদেশের মত উপদেশ সমগ্র গ্রন্থশালাতেও মিলবে না। কথাটি হচ্ছে এই—বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ছাড়া আর কাউকেও কাজের ভার দিও না। জানি—বুদ্ধিমানেরা তোমার আমলা হতে আসবে না। এ কাজ তাদের নয়। তবু তাদেরকেই খোশামোদ ক'রে এনো।

এইবার শেখ স'দীর অন্য আর একটি দিকের আলোচনা করতে হবে। ভারতবর্ষের আলঙ্কারিক—ব্যক্তিবিবেককার মহিমভট্ট কবিদের অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। প্রজ্ঞাচক্ষুতে এই দিব্য-দর্শন ঘটে। একে বলা চলে Prophetic Vision। আর প্রবাদ-বচনে কবিতার সাম্রাজ্যে স'দীর পয়গম্বরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে। 'দর শে'র সে তান্ পয়গম্বরানন্দ্।······ফেরদৌসী, আনবারী বো স'দী।" মহিমভট্ট ব'লেছেন—এই প্রজ্ঞাচক্ষুই কবিদের তৃতীয় নয়ন।—'সা হি চক্ষুর্ভগবতস্তৃতীয়মিতি গীয়তে।' প্রতিভাই প্রজ্ঞা। প্রাতিভ দর্শনই প্রজ্ঞার দর্শন। রঞ্জনরশ্মির মত বহিরাবরণভেদী দৃষ্টি কবিদৃষ্টি। স'দী এই প্রাতিভ দর্শনে নিত্যসিদ্ধ।—তা না হ'লে তিনি গাছের পাতায় বিশ্বরহস্য দেখবেন কেমন ক'রে? স'দীর দর্শন সর্বদা অস্তিত্বময়। তিনি আছেন

এবং ধরণীর ধূলি থেকে মহামহীরুহ পর্যন্ত তাঁরই অস্তিত্বের অভ্রান্ত স্বাক্ষর। তুমি বলছো ওই সবুজ গাছের পাতাটি? দেখ, হুশদার বা সচেতন হ'য়ে দেখ, তোমার নজরে পড়বে ওই সামান্য সবুজ পাতা মহাগ্রন্থাগারের বিরাট গ্রন্থ। ওকে কি পড়ে শেষ করতে পারবে? কেমন ক'রে পারবে? ওই সৃষ্টিতে যে কিরদ্‌গার বা স্রষ্টারই সাক্ষাৎ ম'রিফত্‌ বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় বিদ্যমান।

"বর্গ-এ-দরখতান্‌ সব্‌জ্‌. দরনজ়রে হোশীয়ার্‌।
হর বর্গে দফ্‌তরীস্ত্‌ ম'রিফত্‌-এ-কিরদ্‌গার॥"

সমগ্র ইরানী সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাতে যুদ্ধবিগ্রহ আছে, প্রেমসৌন্দর্য আছে, মানব চরিত্রের সুনিপুণ বিশ্লেষণ এবং সত্য উদ্‌ঘাটন আছে, জীবনের সমুন্নত আদর্শের অনুধ্যানও আছে। কিন্তু, যাকে বলে খাঁটি প্রকৃতি কবিতা তা কিন্তু বেশি নেই। অথচ গুল আর বুলবুলের দেশ ইরান। এর জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। ওঁরা কেমন যেন অত্যন্ত সহজেই বুঝতে পেরেছেন এই বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনন্ত সৌন্দর্যের শেখর। ওঁরা যখন কথা বলেন তখন সেই কথার পেছনের সুরটা আমাদের চারপাশের দুনিয়ায় স্থির থাকতে দেয় না। ওঁদের কাব্যের ঐন্দ্রিয়িক সৌন্দর্য আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করি সত্য,—কিন্তু ইন্দ্রিয়াধীশ মনের আকুলি-বিকুলি থামতে চায় না। স'দীর কবিতা বহুক্ষেত্রেই এমন সীমার বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে অসীমের ইঙ্গিত দিয়েছে। কারণ স'দী সূফী। সূফী সংগীতের এই নিয়ম। আমরা ব'লে এসেছি মোঙ্গল কর্তৃক বাগদাদ লুণ্ঠন এবং শেষ খলিফা অল মুস্তা'সিম্‌ বিল্লা'র নিধন স'দীকে বৈরাগ্যে পূর্ণ করেছিল। তখন তাঁর গুরু হ'লেন পর পর দু'জন প্রসিদ্ধ সূফী—(১) শেখ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাবর্দী (২) শামসুদ্দীন আবুল ফর্‌রাজ ইবনুল্‌ জাবজ়ী। তিনি ব'লেছেন গুরুর উপদেশ আমার বুকে জলের রেখার মত র'য়েছে। নজরে পড়ে না, কিন্তু আছে। আমি যখন কথা বলি—তখন বুঝবে ভেতরে অন্যের সাড়া রয়েছে। তিনি ব'লেছেন—'দো আন্‌দর জ়. ফর্‌মুদ, বর রূ-এ-আব্‌'। আর শোন একটি উপদেশ—(১) একী আন্‌কে বর গাঁয়ের বদবীন্‌ মা-বাশ (২) দোম্‌ আন্‌কে বরখে্‌শ খোদবীন্‌ মা-বাশ্‌।

বৎস পরের খারাপ দেখো না, আর নিজের বড়াইটা দেখো না। পরঘৃণা এবং আত্মাদর সমান পাপ। স'দী সকলের উপর ঠাঁই দিয়েছেন তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞানটা যখন আসে তখন অত্যন্ত সহজে মানুষ অহং বা অস্মিতা বিসর্জন দিতে পারে। স'দী বলেন—

'হায় মানুষ! এই জগৎটা শুধু দৈহিক অহং'এর পুষ্টির জন্য নয়।
যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী মানুষের সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন।
ভোরের পাখীর সুরলহরী নিদ্রিত মানুষ জানে না—
মানুষের জগৎটা যে কী, তা পশু কেমন করে জানবে!'

('পারস্য যাত্রী' রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইরানের শ্রদ্ধাঞ্জলি)

আমি শেখ স'দীর কাব্যসাধনায় তথা জীবনসাধনায় একপ্রকার তান্ত্রিক পরিক্রমাই দেখতে পেয়েছি। তন্ত্রশাস্ত্রের গোড়ার কথা পশ্বাচার, দ্বিতীয় আচার বীরাচার, তৃতীয় স্তরে দিব্যাচার। তন্ত্রশাস্ত্র ক্রমশ ঊর্ধ্ব-গতির কথা বলে—কেবলি অভ্যুদয়, নীচে নামা নয়। জীবমাত্রই প্রথমে পশু—শিব সেখানে পশুপতি। নিম্নস্তরের উপাসনায় জীবধর্মগুলির অস্বীকার না ক'রে তর্পণ করতে হয়। তর্পণই তৃষ্ণাক্ষয়ের উপায়, বাসনার মূলোচ্ছেদ অবদমনের মধ্য দিয়ে হয় না। বাসনা মিটিয়ে সাধক বাসনার ঊর্ধ্বে ওঠে—তখন সে হয় বীর। সংসারের বিধিনিষেধগুলো, নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো তার কাছে তখন শিথিল হয়ে যায়। সে তখন উচ্চরাজ্যে উঠে শিব-সাজুয্যের সম্মুখীন হতে চলে। দিব্যাচারে বাইরের কোন কারবার নেই; যা চলবে সে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যের খেলা। এই অবস্থায় শক্তি মূলাধার থেকে ক্রমশ উত্তরোত্তর চক্রগুলি ছাড়িয়ে সহস্রারে শিব-সাযুজ্য লাভ করে—তখন যে সামরস্যের রস সেই রসই সুরা বা সুধা। সেই রস 'পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে, উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' এখানে সব জ্ঞান তিরোহিত হ'য়ে থাকে এক দিব্য চেতনায়। সে চেতনায় জাগে শিবোঽহম্। এই আনন্দের সীমা নেই। আবুলহ.সন্ এই মানস সম্ভোগের একটি ছবি দিয়েছেন—

তা বে তবানী জি.য়ারত্-ই-দিলহা কুন।
কাফ্জুন্ জ. হজার কবহ্ আমদ্ য়ক্ দিল॥

এই শিব-সাযুজ্যে ছোট আমি বড় আমির সঙ্গে মিলে যায়, Microcosm মিশে যায় Macrocosm নামক বিশাল সত্তায়।

স'দীর সাধনার আর একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করা প্রয়োজন। তিনি অনুভব করেন—তিনি জীবন্ত এবং তিনি জ়াহির কিন্তু যিনি প্রেমোদ্দিষ্টা সেই ম'শূক পরদয়ী। এইজন্য সেই অধরার জন্য প্রেম প্রায়শই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। নিরন্তর এই ব্যর্থতায় প্রেমিকের অভিমান জাগে। কু.বুল বা মুহব্বত্ প্রাপ্তিতে সার্থক হ'তে চায়। কিন্তু ছলনাময়ীকে স'দী তাঁর প্রতীক্ষিত শূন্য শয়নে পান না। আবার নিজেই ভাবেন, 'কেমন ক'রে পাব?—সে যে বিশ্বের, সে যে সকলের, আমার দাবী কতটুকু?' তিনি বলেন—

……সৌভাগ্যের দান
আমারে দিল না কোন মান।
তিমির রজনী শেষে, উষারূপে আসিবে সেজন—
বক্ষে ধরি নিষ্ঠুর পীড়নে, বিম্বাধরে সুধা পান করি'
ভুলিব প্রবাস—সে আমার নয়।
তাই মনে ভাবি—
মান ক'রে দূরে চ'লে গিয়ে—
তার ওই ছলনার মায়াপাশ ছিন্ন করে ফেলি—
বঞ্চনারে করিয়া বঞ্চনা।
জানি আমি আসিবে সে যবে,
আমার কোলের কাছে;
পারিব না, তার ওই কালো কেশপাশে
অলস অঙ্গুলি দিয়ে অনঙ্গ বিলাস।
আমি তুচ্ছ এক শুধু। সেখানে যে বন্দী হ'য়ে আছে
অযুত প্রেমিক প্রাণ; অযুত বৎসর ধরি
পিঞ্জরের রুদ্ধগৃহে পাখির মতন।

অপরাজিত প্রেমের দুর্জয় অভিমানটুকু স'দীর বিলক্ষণ আছে। আবার প্রতীক্ষা-কাতর স'দী বিরহের মধ্যেও মিলনের আশ্বাস পেয়েছেন। তখন তিনি বলেছেন—"এই যে বুকভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আমার কারবার, সেও

তো আমার এক কাজ। এই কাজের মধ্য দিয়ে আমার দিনগুলো চলে যায়। সারা রাত্রি আমি প্রতীক্ষায় থাকি। উষার মতো সুন্দর মুখখানি নিয়ে, প্রভাতকে মধুরতর ক'রে দিয়ে একজন আসবে। সেই বঁধুর মুখ দেখতে পেলেই আমার জীবন সফল হবে। আমি কি মানুষের নিন্দায় ভয় করি? বীরের বক্ষ বর্ম হ'য়ে ফিরিয়ে দেয় নিন্দার শেলাঘাত। বহু বহু বাধা এবং বিস্তর বিফলতার ভিত্তিতেই জয়ের স্তম্ভ প্রোথিত হয়। নবরোজ আসে শীতেরই শেষে—বসন্তে। অনেক লাভ-লোকসানের হিসাব করা প্রেমিক লায়লাকে চেয়েছিল: কিন্তু পাগল মজনু তার সবকিছু হারিয়ে তবে তাকে লাভ করেছিল। আমাকে তুমি বশেই রেখেছ। এখন নতুন খেলা খেল। পোষা পাখীর জন্য শেকলের প্রয়োজন কি? যে ইহকাল পরকাল সব খোয়াতে পারে, তারই তো হিম্মত। আমি তাই ক'রেছি। এ শক্তি সংসারের তপস্বীদের হবে না জানি। ভবিষ্যৎ, অনাগত, অতীত মৃত, স'দী আজ প্রাণ ভরে মজা লোট।"

সূফী সাধকদের প্রেমের গুরু সাকী পেয়ালা ভ'রে শরাব দেন—প্রেরণা দেন। বীর সাধকদের তখন পরোয়া থাকে না। সেই পাওয়ার মুহূর্তটাই চরম মুহূর্ত। তখন অতীতও অনাগত—দুইই তুচ্ছ হ'য়ে যায়। বর্তমানই জীবন ব'লে মনে হয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই সংসার ত্যাগ করবে। পরমক্ষণ বার বার আসে না। তীর্থ, তিথি, নক্ষত্র, বার, ক্ষণ —এসব স্মৃতির ধর্ম, বীরের ধর্ম নয়, দিব্য ধর্মও নয়।

অন্যত্র আ'শিক স'দী তাঁর প্রেমোদ্দিষ্টা মা'শূককে বলছেন—"শীরাজ় নগর আজ নবরোজে়র দিনে সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। আজ প্রবাসী এই শীরাজ়কে পেয়ে তার দেশ ভুলে যায়—তার গোলাম হ'য়ে যায়। এমন দিনে ফুল হাসে, আর ওদিকে মেঘের চোখ থেকে ঈর্ষ্যায় দু'এক ঝরা জল ঝরে। একদিকে ওই ভালোবাসা অন্যদিকে ওই ঈর্ষ্যা—সব তো তোমারই জন্য। যদি তুমি তোমার লঘু চরণ-ক্ষেপে এমন দিনে চলেই আস,—তবে? না তোমার ওই চরণের রক্তরাগ আর লঘু চরণ ভঙ্গিমা আমি কি দিয়ে বোঝাব? সঞ্জীবনী সুধার পরশ আছে তোমার রাঙ্গা চরণে। জানি সখি জানি। ওই চরণের কোমল পীড়নে

তড়িৎস্পর্শ আছে। তাতে আসবে মরণের নতুন জীবন। জানি সখি জানি! যারা আছে কবরের অন্ধকারে তাদেরও ক্রন্দন কাফনের মৌন আবরণ ভেদ ক'রে চলে আসবে।"

এ কথা ঠিক স'দী বিচ্ছেদে কাতর হ'য়েছেন, বিলাপ ক'রেছেন। সাধারণ প্রেমিক সূফীর মতই তিনি সাধারণ কথা বলেছেন—বুলবুল অমন ক'রে কেঁদো না! তুমি ফুলের প্রেমিক—তুমি যদি অমন কাঁদো তবে, আমার কান্নাও তার সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। আমিও যে বিরহী—আমি ভালবাসি যে কুসুম-কোমল দেহখানি গুল অন্দাম্। স'দীর ভাষায়—

অয় বুলবুল অগর নালী, মন বা তু, হম আবাজ.ম্।
তূ ইশক্-এ-গুল-এ-দারী, মন আশিক্-এ-গুল-আন্দাম্॥

কিন্তু, অসাধারণ স'দী একটি অসামান্য কথা বলেছেন; সেটা হচ্ছে এই—সম প্রেমিকের প্রেমের মধ্য দিয়েই বিসদৃশ আমরা মিলে যেতে পারি। স'দীর এই স্বপ্ন বিভেদের পৃথিবীতে কি কখনো সত্য হবে? একই প্রেমময়ের প্রেমিক উপাসকরা তো কোনদিনই পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখলো না! স'দী বলেন, 'ওরে স'দী! তুই এক কোণে পড়ে আছিস কেন? প্রত্যেকেই যে একটাই জাম বা পাত্রের মধ্যে র'য়েছে—"হর কস্ মিয়ান্-এ-জাম্ অয় বো স'দী বগুশায়।" তুমি কি জান না? বেগানহ্ (পরজন) অজ. আশনায়-এ-ইয়ার বন্ধুর প্রেমের মধ্য দিয়ে হমখল্ক্. সমদুনিয়ার হয়ে যায়। "বেগানহ্ বাশদ্ অজ. হমখলক্. আশনায়-এ-ইয়ার"—এই যে প্রেমের কথা, সে সব প্রেম-ডোবানো প্রেমের কথা। এর পর আর কিছু নেই, আর কিছু থাকতে পারে না। এই প্রেমে পৃথিবীর দেওয়াল ধ্বসে প'ড়ে একাকার হ'য়ে যায়। মানুষে মানুষে কোন ভেদ থাকে না।

পার্থিব প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়ে শা'এর পয়গম্বর শেখ স'দী পার্থিব ভালোবাসার রাজ্যটার ক্ষুদ্র সীমা উপলব্ধি করেছেন অত্যন্ত সহজে। আমাদের হৃদয়ের সবটুকু নিংড়ে নিয়ে, সবটুকু প্রেম পার্থিব আধারে ঢেলে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কাজটা নাদানী বা মূঢ়তা। মূর্খ! তুমি জান না—এই পৃথিবীতে নদী, সমুদ্র, পাহাড় পর্বতেরও যেমন শেষ নেই, প্রেমেরও তেমনি হদ্ বা সীমানা নেই। সুতরাং ওই

মহাবস্তু একেবারে শেষ ক'রে দিও না। বিচরণ করতে করতে দেখবে প্রিয়াৎ প্রিয়তরম্ মিলে যাচ্ছে। এগিয়ে যাও, তার চাইতেও প্রিয়তর পাবে। মূর্খ! তোমার ভুবন ভ্রমণ শেষ করেও প্রিয়তম ব'লে থামতে পারবে না। স'দী বলেন—

মাটির মায়ায় মানুষের প্রেমে শেষ হ'য়ো নাক ভাই।
দরিয়া জমীন অগণিত ভবে, প্রেমেরও সীমানা নাই॥

'মস্.নবী'।

এই কথা ইশ্.ক-এ-মজাজী সম্বন্ধে। সেটা ক্ষণভঙ্গুর। ইশ.ক-ই-হক.ীকীতে একবার বেদিল হ'য়ে চিরাগ জ্বালিয়ে দাও; দেখবে ভিতরেই তিনি আছেন। শেখ স'দী সে গুপ্ত বহ্নির তাপ হৃদয়ে অনুভব ক'রেছেন—তার ধোঁয়া মাথা পর্যন্ত উঠে সব এলোমেলো ক'রে দিয়েছে—'দূদম্ বেসর বরামদ্ জিন আতশ্-এ-নিহানী'। তখন তিনি কেঁদে কেঁদে ব'লেছেন—'জাবকী চুনান্ ন দারদ্ বেদূস্ত্ জিন্দগানী'—আমার বঁধুছাড়া জীবনের কোন আকর্ষণ নেই। প্রায় একই সুরে প্রেমের সাধক হাফীজ. বলেছেন—

'আয়্ বেতূ হারাম্ জিন্দগানী'।

—হায়! তোমাকে ছেড়ে আমার জীবনকে আজ হারাম বলে মনে হচ্ছে।

১৯৩২ সালে শীরাজে. রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনায় ইরানীরা বলেছিলেন—'শীরাজ শহর দুটি চিরজীবী মানুষের গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁদের চিত্তের পরিমণ্ডল তোমার চিত্তের কাছাকাছি।' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন——'আপনাদের পূর্বতন সূফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে।'

কমাল-উদ্দীন ইসম'াইল

ত্রয়োদশ শতাব্দীর অভিশপ্ত ইরানে জমাল-উদ্দীন মহ.ম্মদ আবদুর্ রজ্জাক. ইসফাহানীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন 'কমাল-উদ্দীন্ ইসমা'ইল্'। ইরানের অভিশাপ এসেছিল রাজ্যময় মোঙ্গল অভিযানের মধ্য দিয়ে।

সা'দীর সমসাময়িক ছিলেন এই কমাল-উদ্দীন। শেখ সা'দীর আশ্রয়দাতা অতাবেক স'দ জ.ঙ্গী ও তৎপুত্র অতাবেক আবুবকর্ স'দের উদ্দেশ্যে কমাল-উদ্দীনের প্রশংসাগীতি বা কস়ীদা আছে। কস়ীদা বা বীরুদ্ কবিতায় এই কবির যুগোচিত উৎসাহ বেশি পরিমাণে ছিল বলেই তমাম খারেজ.মশাহীর রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে তার কিছু না কিছু রচনা আছে।

জীবনীকার দৌলত শাহ্ বলে গিয়েছেন—কমাল-উদ্দীন ইসমা'ইল বিত্তবান্ এবং উদারচিত্ত ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে যা ঘটে, তাই ঘটেছিল। উদারচেতারা পরদুঃখে কাতর হ'য়ে পরের প্রয়োজনে অর্থ দিয়ে প্রবঞ্চনার জালে জড়িয়ে মানসিক ক্লেশ পান। কমাল-উদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দয়ায় তিনি যত সহজে ভেসে যান, তত সহজেই ক্রোধে অগ্নির মত জ্বলে ওঠেন। অকৃতজ্ঞ ইস্ফাহান্বাসীর জন্য তিনি খোদার অভিশাপ কামনা ক'রে বলেছিলেন—

হে সপ্তগ্রহের অধীশ্বর তুমি কোন দুর্ধর্ষ, দুর্জয়, নিষ্ঠুর কাফিরকে পাঠিয়ে দিয়ে এই দার-ই-দাস্ত্কে একদম শূন্য প্রান্তর (দশ্ত্) ক'রে ছাড়ো। এখানে রক্তের জোয়ার বইয়ে দাও। এখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা বাড়ুক তাদের খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গে।

খোদা তাঁর প্রার্থনা শুনেছিলেন। তিনি মোঙ্গলদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চিঙ্গিজ খাঁর পুত্র ওগদই খাঁ ১২৩৭ সালে ইস্ফাহানকে শ্মশান ক'রে ছেড়েছিলেন। এই নরহত্যায় স্বয়ং কবি কমাল-উদ্দীনও রক্ষা পেলেন না। জীবনে কোন আদর্শ খোঁজা নিষ্ফল সাধনা। তুর্কী প্রবচনে আছে—

'ইয়ার্ সিজ. ক.লির্ কিমসেনে আ'য়ব্-সিজ. ইয়ার ইস্তেয়ান্।'

যদি নিষ্পাপ নিষ্কলুষ বন্ধু চাও তবে নির্বান্ধব হ'য়ে থাকতে হবে। কমাল-উদ্দীন গৃহহীন, স্বজনহীন, নির্বান্ধব হ'য়েই মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হন।

ঘটনাটি বলি। মোঙ্গল রাষ্ট্রবিপ্লবে কমাল বৈরাগ্যে সূফী হ'য়ে নগরের উপকণ্ঠে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। তাঁর বন্ধু, পরিচিত, অর্ধপরিচিত, অপরিচিতের দল তাঁদের ধনদৌলত কমালের কাছে গচ্ছিত করলেন।

কমাল কূপের জলে ফেলে দিয়ে সেগুলোকে নিরাপদ করলেন। কোন তুর্কীর জি.হগির বা আঁটিবাঁধা বাণ এসে পড়লো সেই কূপের জলে। এই সাঙ্কেতিক বাণ গুপ্তধনের খবর বলে। কূপ খুঁজে পাওয়া গেল প্রভূত ধনদৌলত। ফল অনুমেয়। কমাল প্রাণ হারালেন। তাঁর শেষ ক্রন্দন খোদার বিরুদ্ধে তীব্র অভিমান। বাংলার কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, নিশ্চিত মৃত্যুসূচক অসাধ্য ব্যাধির কবলিত হয়ে বলেছিলেন'—

'আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ,
গর্ব করিতে চুর্।

সে আত্মসমর্পণের সুর। কমাল-উদ্দীন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আর্তকণ্ঠে বলেছিলেন—

দিল খুন শুদ শর্ত-ই-জান গুজ.াজ.ী ইন্ অস্ত্।
দর হজ.রত্-ই-তূ কমীন্ বাজ.ী ইন্ অস্ত্॥
বা ইন্ হম হীচ দম্ নমী বায়দ্ জ.দ্।
শায়দ্ কি তুরা বন্দ্নরাজী ইন্ অস্ত্॥

আমার রক্তমাখা হৃৎপিণ্ডটা বেরিয়ে আসছে, আসবেই—কারণ, আত্মোৎসর্গের যে এই নিয়ম প্রভু। আর এটাই তো তোমার কামীন বা অবোধ্য খেলা—এসব নিয়েও কোন অভিযোগ আমার দমে দমে আসে না—আসা উচিত নয়। সম্ভবত তুমি ভক্তদের এমনি করেই অভ্যর্থিত কর।

কমাল-উদ্দীন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটি 'হিজু' বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা উদ্ধৃত করি।—

জ. মর্দ্-ই-ফানী বাবর্ কুনম্ অগর গোয়িদ্।
কি মন্ বখ্ান্-ই-খুদ্ মীখোরম্ ত.রাম্ হ.লাল্।
কি আন্ কি মাল্-ই-হ.লাল্ অস্ত মর্দ-ই-ফানীরা ?
কুদাম মাল্ কি উ দারদ্ রো কুদাম্ হ.লাল্ ?
বলে, জ. মুমসিকী আন্গাহ্ মাল্-ই-খ্বীশ্ খোরদ্।
কজ্. ইজত.য়ার্ মরদ্ বা শবদ্ হরাম্ হ.লাল্।

কম্বক্ত, হাড়কঞ্জুস বলে কিনা বাড়ীতে আমি পবিত্র খাদ্য খাই। হাঁ বিশ্বাসযোগ্য কথা বটে! পরের রক্তশোষা অর্থে সে তো নিরন্তর হারাম ভোজী। দানা ও দৌলত্ দুই তো তার অর্থে হারাম্। নিপীড়িতের

রক্ত শুষে যা আসে তার সবটাই তো হারামী। ওর কাছে হারামই হালাল।

শুধু কসীদা ও হিজু নয়, কমাল-উদ্দীনের মধ্যে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীও আছে—এবং সে দৃষ্টিতে রসিকতাও আছে—

রূ-এ-ক. আন্ খুবতর্ তবান্ বুদ্?

ওর মুখ থেকে অন্য কোন মুখ সুন্দরতর হতে পারে কি?

হান্ বগোয়েদ্ অগর তবানদ্‌বুদ্।

হাঁ বল, যদি সুন্দর সম্ভব হয় বলতে পার।

আন্ চুনান্ নাজু.ক্ বো চুনান্ শীরীন্।

বলছি শোন! সে মুখখানা এমন কোমল-পেলব ও মিষ্টি যে—

লব ন বাশদ্ শকর্ তবানদ্ বুদ্॥

হাঁ, এমন মিষ্টি যে ওর ঠোঁট ঠোঁট নয়, একেবারে মিছরির টুকরো।

'হ.াফিজ. শীরাজ.ী'

হ.াফিজের নাম স্মরণে জাগলেই মনে হয় সুনিশ্চিত মৃত্যুঞ্জয়, অবিস্মরণীয়, অতুলনীয় হ.াফিজ.। তাঁর পূর্ণ নামটি শমসুদ্দীন মহ.স্মদ হ.াফিজ.। গুণমুগ্ধরা কবিকে বলতেন—'লিসানু'ল ঘ.য়ব', অদৃশ্য লোকের বার্তাবহ। কেউ কেউ বলে গিয়েছেন—'তরজু. মানু'ল অসরার' বা রহস্যের ভাষ্যকার। প্রসিদ্ধ জীবনীকার দৌলতশাহ. কবির তিরোধানের শতবর্ষ মধ্যে তাঁর জীবনেতিহাস দিয়ে গিয়েছেন। বহু জীবনীকারের মধ্যে আধুনিক কালের রিদাকু.লী খাঁর 'মজম' উল ফুসহ.া' এবং 'রিয়াজু.ল্ আরিফিন্' প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। তবু দুঃখে রয়ে যায়, সব হ.াফিজ.-জীবনীতেই খাঁটি তথ্যের চেয়ে যেন প্রচলিত কিংবদন্তী অধিকতর পরিমাণে মিশ্রিত হয়ে আছে। অনেক সময় মনে হয়, প্রবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতেই যেন জীবন-কথার ইমারত. সন্তর্পণে গাঁথা হয়ে চলেছে। জীবনকথাগুলির মধ্যে অবশ্যই বিশেষ মূল্য দিতে হবে মুহ.স্মদ গুলন্দামের রচনাকে; কারণ তিনি ছিলেন কবির সমসাময়িক এবং কবির পরম সুহৃৎ। এই জীবন

চরিত্রেই দেখতে পাই হ.াফিজ. ছিলেন আসমানের মত উদার হৃদয়, পরধর্মে সতত বিদ্বেষশূন্য, অকৃপণ উদারহস্ত এবং সর্বোপরি মানব-প্রেমিক। বিশ্বপ্রেমের বিশাল কক্ষেও তাঁর জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা কখনো মানদণ্ডে লঘুতা স্বীকার করে নি। এই কবির প্রসিদ্ধি তাঁর জীবদ্দশাতেই ফার্স থেকে খোরাসান এবং ভারত থেকে আজ.ার বায়জান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, ইরান তুরানের সঙ্গে তাইগ্রিস ফোরাতের দোয়াবসহ সমগ্র আরব জগৎ স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের কবি বিহঙ্গরাও এই শীরাজ.-তুতীর অমৃতকণ্ঠ-নিঃসৃত বাণীভঙ্গিমার প্রভূত সমাদর আরম্ভ করেছিল।

মনে রাখতে হবে ভারত তখন পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। মোঙ্গল আক্রমণের অবশ্যম্ভাবী ফলেই এই বিচ্ছিন্নতা। মোঙ্গলদের পারস্য ও আরব জয় দিল্লীকে পশ্চিমের মুসলিম জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। ফল অবশ্য ভাল হয়েছিল। জিয়াউদ্দীন বরনির ভাষায় 'Delhi became equal of Baghdad and rival of Cairo and Constantinople'!—বিচ্ছিন্ন ভারতে মুসলিম কৃষ্টি এবং পারস্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রেম অনুশীলিত হচ্ছিল সুলতানদের সভাকবি দ্বারা। তাঁরা হ.াফিজ শীরাজ.ীর মিছরীর দানাগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে আস্বাদ করে চলেছিলেন। 'হ.াফিজ স্বয়ং বলে গিয়েছেন—

সীহ্ চশমান্-এ কাশ্মীরী বো তুরকান্ এ সমরকন্দী।

কালো কাজল-নয়ন কাশ্মীরী থেকে সমরকন্দের তুর্কীরা একই তালে আজ হ.াফিজে.র গানে নেচে চলেছে।—শকর্ শিকন্ শবন্দ্ হমহ্ তূতীয়ান্ হিন্দ্ : শুধু তাই নয়, আজ ভারতের সব শুকপাখীরা ইরানী মিছরীর দানা ভেঙ্গে চলেছে—সে দানাগুলি আজ বঙ্গাল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। দেশ ও কালের সীমানা আজ কবিতা মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে চলেছে। একরাতের নবজাতক অবিশ্বসনীয় বেগে এক বছরের পথ উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে।—

'কীন্ ত্বিফল্-এ ইক্‌শবহ্ রহ্ ইক্‌সালহ্ মীররদ্।'

কত দেশ থেকে যে এই শীরাজ.ী বুলবুলের আমন্ত্রণ এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। বাগদাদের ঈলখানী সুলতান্ ছিলেন স্বয়ং কবি ও সংগীতজ্ঞ।

সেই সুলতান্ আহ.মদ্ হ.াফিজ.কে তাঁর রাজ্যে চেয়েছিলেন। কবি প্রত্যুত্তরে তাঁর প্রশস্তিগাথা পাঠিয়ে দিয়ে জানিয়েছিলেন—"নমীদহন্দ্ ইজাজ.ত্ মরা বহ্ সয়ীর্ রো সফর্। নসীম্-এ বাদ্ মোস.ল্লী রো আব্-এ রুকনাবাদ্।" মুসল্লায় মৃদু মন্দ সমীরণ ও রুকনাবাদের স্রোতস্বিনী আমাকে সঞ্চরণ ও ভ্রমণের জন্য বিরহ অনুমোদন করে না, সুলতান্ আমি কি করব? ভারতবর্ষ থেকে পর পর দু'জন সুলতান সাদর আহ্বান জানালেন। প্রথম জন বাহমনী সুলতান মহ.মুদশাহ্। কবির কাছে পাথেয় পর্যন্ত চলে গেল। তিনি তার থেকে একটা বড় অংশ শীরাজে.ই খরচ করে ফেললেন। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁকে ছাড়তে চায় না। দুজন খুব বড় সওদাগর কবির পাথেয় ভার বহন করতে চাইলেন। তিনি হুরমুজ. বন্দর পর্যন্ত অগ্রসরও হলেন। এমন সময় কবির অনীহা বাইরে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে দেখা দিল। অশুভ যাত্রার অজুহাতে কবি দেশে ফিরে গেলেন। অবশ্য মহ.ম্মদ্ শাহ্কে অশেষ ধন্যবাদে তিনি কৃতার্থ করেছিলেন—

"দুখের সাগর সুখ মনে হলো আশা ও লাভের পরশ স্মরি ;

আশা ছিঁড়ে যায় তুফানের বেগে, সুলতান্ বলো—আমি কি করি ?"

বিভূতিভূষণের হাজারী ঠাকুরকে হাজার টাকা মাইনে দিয়েও তার আদর্শ হিন্দু হোটেল ছাড়াতে পারা যায় নি। সুলতান ঘ্যাসউদ্দীন ইব্ন্ সুলতান্ সিকন্দর বাংলাদেশ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন এবং কবির শুভাগমন কামনা করলেন। কবি জানালেন—বাংলার গিয়াস-উদ্দীন আমাকে ডাকছেন—জানি আমি, হিন্দোস্তানের শুকপাখীরা এই ইরানী শুকের মিছরীদানা ভেঙ্গে চলেছে। হাফিজ. তুমি সুলতান গিয়াস-উদ্দীনের আগ্রহে হতাদর হয়ো না—"গ.াফিল মশব কেহ্ কারে তু অজ. নালহ্ মীরবদ্।" কিন্তু বঙ্গালেও তিনি এলেন না। ১৯৩২ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফিজ.কে বাংলায় নিমন্ত্রণ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আজ বাংলার কবি শীরাজে. এসে শুভ কামনা জানিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করল। ইরানীরা সেদিন অনুভব করেছিলেন, সা'দীর দেহ শতাব্দীসমূহের চিরনিদ্রা ত্যাগ করে মৌন কাফনের মুখ খুলে আজ ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে এসেছে। আজ হ.াফিজে.র পরিতৃপ্ত হাসি তাঁর স্বদেশবাসীর আনন্দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

এইবার কবি হ.াফিজের পারিবারিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন অনুভব করি। শীরাজ. অনতিপ্রাচীন শহর। আরব-বিজিত ইরানেই এই শহরের পত্তন। হ.াফিজে.র পিতৃদেব বহাউদ্দীন এসফহান থেকে শীরাজে. অতাবেক রাজবংশের শাসনকালে বসতি স্থাপন করেন। যদিচ প্রথম জীবনে ব্যবসাবাণিজ্যে তিনি প্রভূত অর্থ ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হন, তবু শেষ বয়সে সবকিছু অব্যবস্থার মধ্যে. ফেলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর বিধবা পত্নী এবং শিশুপুত্র—ভবিষ্যতের হ.াফিজ, তখন চরম দারিদ্র্যের মুখে। কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা যার প্রবল তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বালক শিক্ষার্থী জ্ঞান-সাম্রাজ্যের প্রবেশমুখেই কোরানশরীফ কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। শ্রুতিধর অভ্রান্ত 'কোরানস্মারক' পরিচিত হলেন 'হ াফিজ.' রূপে। এই 'হ.াফিজ.' হলো তাঁর ভবিষ্যৎ কবিনাম বা তখল্লুস্। এখানে এক অলৌকিক কাহিনীর গ্রন্থি-বন্ধন হয়েছে। শীরাজে.র উত্তর প্রান্তে বাবা কূহীর পবিত্র আশ্রমে ইমাম আলী নামক সাধুর হাতে এক স্বর্গীয় ফল খেয়েই নাকি এই বালক অদ্বিতীয় যশস্বী কবি হয়ে যান। শিবলী নু'মানী তাঁর উর্দূ গ্রন্থে হ.াফিজে.র পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গের এক নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি হ াফিজে.র দীর্ঘশ্বাসে ভরা একটি স্মরণ কবিতা আছে। তার মর্ম—"শাহ্ শেখ আবু ইশাকের রাজত্বে ফার্স রাজ্যের উন্নতি হয়েছিল অপরিসীম। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্‌বিদিকে, দেশবিদেশে। সেকালের শাসন-ধুরীণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন পাঁচজন। (১) প্রথম আবু ইশাক স্বয়ং —যিনি সুশাসনের প্রবর্তকরূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর উদারতা, সমদর্শিতা ও ন্যায়ধর্ম তাঁকে অসমোর্ধ্ব যশের অধিকারী করেছে। (২) দ্বিতীয় নাম অধুনা অদৃশ্য লোকবিহারী, কিন্তু একদা তিনি ছিলেন অপ্রমত্ত শক্তির প্রতীক। তাঁর নাম আমীন উদ্দীন। (৩) তৃতীয় নাম আসিলুল মিল্লাত্ উদ্দীন। বেহেসতও বুঝি তাঁর সমকক্ষ বিচারক পাবে না। (৪) এই প্রকার সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার প্রসঙ্গেই চতুর্থ নাম কীর্তন করি—তিনি অদুদ্-উদ্দীন। তারপর সর্বশেষ পঞ্চম নামটি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি—(৫) তিনি হাজ.ী কিরাম্—হৃদয় যাঁর বিস্তীর্ণ দরিয়া। হাতেমতাই এর মত যিনি সর্বস্বদানে আনন্দিত হতেন। নিষ্কিঞ্চন

হওয়ার গৌরব কয়জন এই দুনিয়ায় আচরণ করে দেখাতে পারে? এত বড় হৃদয় ছিল কিরামের। ওরা সব চলে গেলেন। অদ্বিতীয়রা উত্তরযুগে তাঁদের সমকক্ষ রেখে গেলেন না। অপরিসীম মহিমান্বিত আল্লাহ্‌তা'লা সেই মরহুমদের ক্ষমা করুন,—এই মোনাজাত করি।

এতে বোঝা যায়, হ.াফিজ. তাঁর চৌষট্টি বছরের জীবনে (১৩২৫-১৩৮৯) বহু জ্ঞানীগুণী শাসকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক জীবনের পরিধি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এদিকে কাব্য সাধনা, ওদিকে ধর্মগ্রন্থের ভাষ্য ও বিশ্লেষণ, অপরদিকে ফার্সের শাসনব্যবস্থায় এবং উত্থানপতনের সঙ্গে ভাবাতিশয্যে বিজড়িত—এমন মানুষের কি অবসর আছে তাঁর নিজের রচনা গুছিয়ে রেখে যাওয়ার? ছিল না বলেই কবি-সুহৃৎ গুলন্দাম্ দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন—'যদি তিনি নিজে স্বহস্তে তাঁর কুল্লিয়ত্ সুবিন্যস্ত করে যেতেন তবে তা মহাকালের কণ্ঠে অম্লান মালিকা হয়ে থাকতো।' বিভিন্ন রাজসভার রাজকবি হয়ে তিনি বাতানুকূল বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করেন নি, তিনি ছিলেন ঘটনাবলীর দ্রষ্টা, সমালোচক এবং ইষ্টানিষ্টের অংশীদার। রাজকর্মের কঠিন এবং নিপুণ সমালোচকরূপে কবি হ.াফিজের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই বলি অবূ ইশাক ইন্জুর কথা। ঘাজানখাঁর রাজত্বের সময় ইনি ফার্সের শাসনকর্তা। নিজে তিনি কবি এবং হ.াফিজের গুণগরিমায় মুগ্ধ। এ কথা সত্য হলেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, তিনি আসন্ন শত্রুআক্রমণের সম্মুখীন হয়েও পূর্ণিমা রাত্রির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শীরাজে.র দ্বারপ্রান্তে উপনীত সেনানায়ককে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন—আকাশে একবার চোখ মেলে তাকাও—দেখ, এমন সুন্দর রাত্রি ক'টা পাবে। এখানে চলে এসো, আমরা সকলে মিলে উৎসব করি—

"বেয়া, তা ইয়েক ইমশব তমাশা কুনেম্।
চূ ফরদা শবদ্—কারে ফরদা কুনেম্।"
দেখ, আজিকার রাতভোর শুধু চলেছে জ্যোৎস্না খেলা—
আকাশে ভুবনে বসেছে আজিকে একী অপরূপ মেলা।
দুশমনি আর লড়াই যা কিছু—আগামী দিনের কাজ;
আজিকার নিশি বিফল করোনা, পরো মিলনের সাজ।

এইবার কবি হ.াফিজের পারিবারিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজন অনুভব করি। শীরাজ. অনতিপ্রাচীন শহর। আরব-বিজিত ইরানেই এই শহরের পত্তন। হ.াফিজে.র পিতৃদেব বহাউদ্দীন এসফহান থেকে শীরাজে. অতাবেক রাজবংশের শাসনকালে বসতি স্থাপন করেন। যদিচ প্রথম জীবনে ব্যবসাবাণিজ্যে তিনি প্রভূত অর্থ ও ঐশ্বর্যের অধিপতি হন, তবু শেষ বয়সে সবকিছু অব্যবস্থার মধ্যে. ফেলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর বিধবা পত্নী এবং শিশুপুত্র—ভবিষ্যতের হ.াফিজ, তখন চরম দারিদ্র্যের মুখে। কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা যার প্রবল তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বালক শিক্ষার্থী জ্ঞান-সাম্রাজ্যের প্রবেশমুখেই কোরানশরীফ কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। শ্রুতিধর অভ্রান্ত 'কোরানস্মারক' পরিচিত হলেন 'হ.াফিজ.' রূপে। এই 'হ.াফিজ.' হলো তাঁর ভবিষ্যৎ কবিনাম বা তখল্লুস্। এখানে এক অলৌকিক কাহিনীর গ্রন্থি-বন্ধন হয়েছে। শীরাজে.র উত্তর প্রান্তে বাবা কূহীর পবিত্র আশ্রমে ইমাম আলী নামক সাধুর হাতে এক স্বর্গীয় ফল খেয়েই নাকি এই বালক অদ্বিতীয় যশস্বী কবি হয়ে যান। শিবলী নু'মানী তাঁর উর্দূ গ্রন্থে হ.াফিজে.র পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গের এক নাতিদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি হ.াফিজে.র দীর্ঘশ্বাসে ভরা একটি স্মরণ কবিতা আছে। তার মর্ম—"শাহ্ শেখ আবু ইশাকের রাজত্বে ফার্স রাজ্যের উন্নতি হয়েছিল অপরিসীম। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্‌বিদিকে, দেশবিদেশে। সেকালের শাসন-ধুরীণ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন পাঁচজন। (১) প্রথম আবু ইশাক স্বয়ং —যিনি সুশাসনের প্রবর্তকরূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর উদারতা, সমদর্শিতা ও ন্যায়ধর্ম তাঁকে অসমোর্ধ্ব যশের অধিকারী করেছে। (২) দ্বিতীয় নাম অধুনা অদৃশ্য লোকবিহারী, কিন্তু একদা তিনি ছিলেন অপ্রমত্ত শক্তির প্রতীক। তাঁর নাম আমীন উদ্দীন। (৩) তৃতীয় নাম আসিলুল মিল্লাত্‌উদ্দীন। বেহেসতও বুঝি তাঁর সমকক্ষ বিচারক পাবে না। (৪) এই প্রকার সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার প্রসঙ্গেই চতুর্থ নাম কীর্তন করি—তিনি অদুদ্-উদ্দীন। তারপর সর্বশেষ পঞ্চম নামটি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি—(৫) তিনি হাজ.ী কিরাম্—হৃদয় যাঁর বিস্তীর্ণ দরিয়া। হাতেমতাই এর মত যিনি সর্বস্বদানে আনন্দিত হতেন। নিষ্কিঞ্চন

হওয়ার গৌরব কয়জন এই দুনিয়ায় আচরণ করে দেখাতে পারে? এত বড় হৃদয় ছিল কিরামের। ওরা সব চলে গেলেন। অদ্বিতীয়রা উত্তরযুগে তাঁদের সমকক্ষ রেখে গেলেন না। অপরিসীম মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'লা সেই মরহুমদের ক্ষমা করুন,—এই মোনাজাত করি।

এতে বোঝা যায়, হ.াফিজ. তাঁর চৌষট্টি বছরের জীবনে (১৩২৫-১৩৮৯) বহু জ্ঞানীগুণী শাসকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক জীবনের পরিধি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এদিকে কাব্য সাধনা, ওদিকে ধর্মগ্রন্থের ভাষ্য ও বিশ্লেষণ, অপরদিকে ফার্সের শাসনব্যবস্থায় এবং উত্থানপতনের সঙ্গে ভাবাতিশয্যে বিজড়িত—এমন মানুষের কি অবসর আছে তাঁর নিজের রচনা গুছিয়ে রেখে যাওয়ার? ছিল না বলেই কবি-সুহৃৎ গুলন্দাম্ দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন—'যদি তিনি নিজে স্বহস্তে তাঁর কুল্লিয়ত্ সুবিন্যস্ত করে যেতেন তবে তা মহাকালের কণ্ঠে অম্লান মালিকা হয়ে থাকতো।' বিভিন্ন রাজসভার রাজকবি হয়ে তিনি বাতানুকূল বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করেন নি, তিনি ছিলেন ঘটনাবলীর দ্রষ্টা, সমালোচক এবং ইষ্টানিষ্টের অংশীদার। রাজকর্মের কঠিন এবং নিপুণ সমালোচকরূপে কবি হ.াফিজের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই বলি অবু ইশাক ইন্জ়ুর কথা। ঘাজানখাঁর রাজত্বের সময় ইনি ফার্সের শাসনকর্তা। নিজে তিনি কবি এবং হ.াফিজের গুণগরিমায় মুগ্ধ। এ কথা সত্য হলেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, তিনি আসন্ন শত্রুআক্রমণের সম্মুখীন হয়েও পূর্ণিমা রাত্রির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শীরাজে.র দ্বারপ্রান্তে উপনীত সেনানায়ককে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন—আকাশে একবার চোখ মেলে তাকাও—দেখ, এমন সুন্দর রাত্রি ক'টা পাবে। এখানে চলে এসো, আমরা সকলে মিলে উৎসব করি—

"বেয়া, তা ইয়েক ইমশব তমাশা কুনেম্।
চু ফরদা শরদ্—কারে ফরদা কুনেম্।"
দেখ, আজিকার রাতভোর শুধু চলেছে জ্যোৎস্না খেলা
আকাশে ভুবনে বসেছে আজিকে একী অপরূপ মেলা।
দুশমনি আর লড়াই যা কিছু—আগামী দিনের কাজ;
আজিকার নিশি বিফল করোনা, পরো মিলনের সাজ।

এই শাসনকর্তাই কবি-সুহৃৎ 'আবু ইশাক. ঈনজু'। হাফিজ. দুঃখ করেছেন তিনি অল্প কিছুদিনের জন্যই এই কোমলপ্রাণ উদার হৃদয় বন্ধুটিকে পেয়েছিলেন।—

'রাস্তী খাতেম-এ-ফেরোজা. বু ইসহাকী।
খুশ্ দরখশীদ্ বলে দৌলতে মুসতা'জল্ বুদ্'।
'আবুইশাকের ফেরোজা আংটি, দীপ্তি দিয়েছে ভালো।
দীর্ঘ তো নয়. অল্পদিনেই সে আলো হয়েছে কালো।'

এর পরের শাসনকর্তার কর্তৃত্ব পাঁচ বছর ছিল। তিনি মুবারিজ. উদ্দীন মুহ.ম্মদ বিন মুজাফ্ফর। ধর্মের ধ্বজা তুলে নিষ্ঠুর পীড়নের মধ্য দিয়ে তিনি শীরাজ.কে পান-মুক্ত উষর মরুভূমি করে ছাড়লেন। শরাব অচল, আনন্দ উল্লাস স্তব্ধ। লোক নির্বাক, শুধু চোখে চোখে কথা হয়। প্রহরী সতর্ক, পানপাত্র আস্তিনে লুকিয়ে ফেলতে হয়। যদি দাগ লেগেই যায়. তা জলে ধোয়ার প্রয়োজন হয় না, বেত্রাঘাতে যে চোখের জল পড়ে তাতেই ধোয়া হয়ে যায়; আর দাগ লাগে না। হ.াফিজ. সে দিনগুলি স্মরণ করেছিলেন—

শরাবের সুধা মন ভরে দেয়, বাতাসে গোলাপ নাচে।
তুমি নাচিও না তবলা ঘুঙ্গুরে, তাতে যদি প্রাণ বাঁচে!
জামার হাতায় পাত্র লুকাও, কালের বিধান তাই,
পোশাকে যে কিছু শরাবের দাগ—দেখিতে যেন না পাই।
চোখের জোয়ারে মুছিতে হইবে, হে সখা! শুনিয়ো কথা;
'সংযমী আর ধর্মের যুগ!'—ইয়াদে পেয়ো না ব্যথা।

হ.াফিজ. বলেছেন ওরা ময়খানার দরজা বন্ধ করে দিয়ে শয়তানখানার দুয়ার খুলে দিয়েছে। যত সব ভণ্ড প্রতারকের দল! আমি আব-এ আঙ্গুর দুহিতাকে শোকবার্তা জ্ঞাপন করছি, অন্তরের অন্তস্থল থেকে—কারণ আমার ভণ্ডামী নেই। আল্লাহ্তা'লা জানেন কবে এ পাপের শাসন কবরের কাফনে আবৃত হবে।

হ.াফিজে.র ক্রন্দন ব্যর্থ হয়নি। নির্মম পিতার পুত্র দয়ালু শাহ্ শুজা' অচিরেই শাসনভার প্রাপ্ত হলেন। তিনি শীরাজে.র মর্ম জানেন। ময়খানা উন্মুক্ত হলো। হাফিজ আনন্দে আত্মহারা। 'কেহ দৌরে শাহ্শুজা' অস্ত্

ময় দিলের বনোশ্'। আজ যে শাহ্‌শুজা'র আমল! আশ্ মিটিয়ে পান কর।—

আজি প্রভাতের শীতল বাতাসে ভাসিয়া আসিছে বাণী—
জমানা আজিকে—শাহসুজা' প্রভু, সুখ ফিরে এল জানি।
কর উৎসব শরাব ঢালিয়া, দূর হয়ে যাক ব্যথা,
প্রহরীরা শুধু প্রহর গণিবে বলিবে না কোন কথা।
স্মরণে আসিছে, মেধাবী পুরুষ আকলমন্দী যারা
চলে পাশাপাশি, মুখে আছে কথা, ঠোঁট নাড়ে না তো তারা।
শোন সেতারের আবাজের সাথে গাহিব আজিকে গান—
'পাপ অবসান' অতীতস্মরণে ফেটে যায় বুঝি প্রাণ!
বাপ ও ছেলেতে এতটা ফারাক! জানিনে তো নীতি নয়।
রাজারা জানেন রাজাশাসন আমাদের প্রাণে ভয়।
গরীব হ়াফিজ়. খাদেম সবার, পরেছে ভিখারী বেশ।
কথা কহিও না,—শান্তি জপিও—রেখো না কথার রেশ।
[রমূজে. মমলিকত্-এ খে্শ্ খিসরবান্ দানন্দ্।
গদা-এ-গূশাহ্ নশীনী তূ হ়াফজ়া মাখরোশ্॥]

আনন্দ আজ থামতে চায় না। গানে গানে আজ হাফিজ়. বেদিল, আত্মহারা। সুরের মূর্ছনা বুঝি বাঁধ মানে না। একদিন, সেই বিশুষ্ক দিনগুলিতে বলেছিলাম—

ওরা যদি আজ খুলে দেয় প্রভু শরাবখানার দ্বার,
মনের গ্রন্থি সব টুটে যায়,—তুলনা আছে কি তার?
ছিন্ন সেতার, শুষ্ক শরাব চলেছে মৃত্যুদেশ।
অগ্নি-সাধক বালক করিছে চুলের বাঁধন শেষ॥
আঙুরকুমারী শরাবের শোক লিখিও,—বলিও গুণ;
ঝরে বধূদের আঁখির পাতায় চোখের জলের খুন।
শরাবখানার দরজা বন্ধ সহ্য ক'রো না প্রভু,
এতটা চাতুরী ভণ্ডামি তুমি দেখ নাই আর কভু।
আত্মসুখের কারণে যদি বা দুয়ার বন্ধ আজি।
স্থৈর্যের সাথে দেখে যাও খোদা! জানি তুমি নহ রাজি।*

* Satisfied.

জানি খোদা! তুমি এতে খুশী হও নি, হতে পারো না। হ.াফিজে.র মধ্যে আজ আনন্দ পাগল হ'য়ে নৃত্য শুরু করেছে—

ধনের লাগিয়া গৌরব লাগি কাহারো সঙ্গে বিরোধ নাই।
বাদশা শুজা'র নাম ধরে আমি কসম খাইয়া বলি গো তাই।
সুরের সোহাগ নাচের আসর বারণ করেছে যেই বা লোক,
চোখ খুলে দেখো, সে আজি নাচিছে সেতারের সুরে ভুলিয়া শোক।
সেতার বলিছে আরাকের সাথে—'কোথায় আজিকে নিষেধ কার?'
পেয়ালা হাসিছে গড়িয়ে গড়িয়ে—'মানিনে নিষেধ, মানা বা কার?'
দুনিয়ায় যদি কুশল চাহিবে—বাদশা শুজা'র জীবন দেখো।
তাঁহার জীবন সার্থক আজি দানে ও ধ্যানেতে—ইযাদ রেখো।
নয়নের আলো, জগতের সুখ, আশার আশয় সকলি যিনি।
জ্ঞান ও কর্ম মিলিয়ে সাধেন, ধরার জীবন-স্বরূপ তিনি।
[মজহার-এ-লুত্‌ফে আজল, রোশনী-এ-চশমে আ'মল।
জামে-ইলম্ বো আ'মল, জানে-জহান শাহ্ শুজা' ॥]

হ.াফিজে.র সবশেষ উৎসাহদাতা—মুজ.াফ্ ফরিদ্ শাহ্ মনসূর, ১৩৮৭-১৩৯২। তিনি তাঁর রাজসভায় কবিকে সম্মানিত আসন দিয়েছিলেন।

ময়খানার দ্বারোদ্মোচন উৎসবের ঘটা একটু বেশি করেই পরিবেশন করলাম। যাঁরা বলেন সূফীদের শরাব শুধু স্বর্গীয় উন্মাদনা আর সাকী শুধু পথপ্রদর্শক ধর্মগুরু তাঁদের কথা অশ্রদ্ধেয়। সত্য বটে নিজ.ামী গঞ্জবীর মত সূফী কবি জীবনে মদ্য স্পর্শ করে নি। কিন্তু সে এক বিরল দৃষ্টান্ত। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা আনতে সুরার প্রয়োজন চিরকালই আছে। ইরানে ছিল—ভারতে ছিল। তান্ত্রিক সাধনায় বহিরঙ্গ উপকরণ-রূপে কারণের কথা স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে।

হ.াফিজে.র দীবান ৫০০ গ.জ.ল, তিনটি সুদীর্ঘ গীতিকবিতা, বহু রুবাই এবং কিছু মসনবীর ও কসীদার সমষ্টি। একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাঁর একটি মরসীয়াও আছে।

গ.জ.লে হ.াফিজ. সিদ্ধহস্ত, বলা চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জীবন দর্শনে তাঁর আবরণভেদী সূক্ষ্মদৃষ্টি, রহস্যের যবনিকার ব্যবধানে চলে তার বাচনভঙ্গী, অত্যন্ত শালীন অথচ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তাঁকে প্রশ্নাতীতভাবে সাধারণ গীতি-

কবির অনেক ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। হাফিজ. পারস্যসাহিত্যে অসমোর্দ্ধ, তাঁর জুড়ি নেই। দূর পশ্চিমকেও এই কবি প্রভাবিত করেছে। Goethe-র Westöstlicher Divan (1819) উল্লেখযোগ্য। হ.াফিজে.র কবিতা-বলীর পরিচয় ইংরেজী ভাষায় দিয়ে গিয়েছেন Miss Gertrude Margaret Lowthian Bell, সংক্ষিপ্তভাবে Miss Bell—পরিব্রাজিকা অসমসাহসিকা আরবজগতের প্রাণরহস্যের মর্মজ্ঞা। তিনি হা.ফিজ.কে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজীভাষীদের মধ্যে সুপরিচিত করে তোলেন। তাঁর গ্রন্থ 'Poems from the Diwan of Hafiz' লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় (১৮৯৭)। দৌলতশার কবিস্মৃতি (Memoirs) হ.াফিজে.র জীবনীর আকর গ্রন্থরূপে সমাদৃত হয়ে থাকে। সূফী শিরোমণি জামীর 'বহারিস্তানে কবিবৃত্তে হা.ফিজে.র সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তাঁর 'নফহ.াতু'ল উনস্' এ বিষয়ে অপর একখানি আকর গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর পিতৃদেবের কাছে হ.াফিজে.র কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি পারস্যযাত্রীতে বলেছেন—'আমার পিতা ছিলেন হ.াফিজে.র অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হা.ফি.জের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।'

হ.াফিজ. পবিত্র কোরানের সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বদর্শন মিশিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনদর্শন সার্থক করেছিলেন। এ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি বলে গিয়েছেন কোরানস্মারকদের মধ্যে অপর কেউ কি পবিত্র গ্রন্থের সঙ্গে দার্শনিক সূত্রগুলি গেঁথে দিতে পেরেছে?—'হ.াফিজ.ান্-এ-জহান্ কসী চু বন্দহ্ জমা' ন করদ্। লতাফ্-এ-হ.কৃমা বা কিতাবে কুর.বানী।' তিনি শুধু কোরানের শ্রুতিধর স্মারক ছিলেন না, তিনি দিব্যবাণীসমূহ সর্বদা হৃদয়ে রাখতেন—'ন দীদম্ খুশতর অজ. শ'য়র্-এতূ হা.ফিজ. বকুরানী কেহ্ অন্দর্ সীনহ্ দারী'। অথচ জনশ্রুতি আছে—কবির মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল। সে কি তাঁর সূফী-মতবাদের জন্য? আশ্চর্য হলেও এমন ঘটনা আরও ঘটেছে। ফেরদৌসীর শেষ সৎকার নিয়ে মতবিভেদ ঘটে। বাংলার কবি মধুসূদনকে নিয়েও গোরস্থানের গোলমাল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা।

এইবার কবি হা.ফিজে.র কবিতাবলীর কিঞ্চিৎ বিচার বিশ্লেষণ করা কর্তব্য। প্রত্যেক কবিরই প্রকাশের একপ্রকার বিশিষ্ট রীতি থাকে। রীতি সম্প্রদায়ে মিশে যায় না, রীতি ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। এটাই সাহিত্যের প্রকাশতত্ত্ব। এইক্ষেত্রে হ.াফিজ. শীরাজী অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট। তাঁর নিগূঢ় কথাও সুস্পষ্ট মূর্তি নিয়ে প্রকাশিত হয়। কারণ তাঁর কথার রূপ, রং, সবই এই পৃথিবীর। সে প্রকাশ অত্যন্ত সহজ, তাতে মনোরাজ্যের শ্রম-বিন্দুও লক্ষিত হয় না এবং ভাষার সঙ্গে ভাবের যে অন্বয় সম্বন্ধ আছে, তা কদাচ ক্ষুণ্ণ হয় না। অথচ তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্য, দার্শনিক তত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং লোকচরিত্র শোভাযাত্রা করে চলেছে। প্রত্যেক পাঠককে সর্বদা মনে রাখতে হবে—সহজে তিনি যা বলে গেলেন—সহজে তা বোঝা শেষ হয়ে গেল না। কথার আওয়াজ থেমে যায় কিন্তু আওয়াজের রেশ অনেকদূর চলতে থাকে। হ.াফিজ. যেন অনন্তকালের কথারই প্রতিধ্বনি তুলে গিয়েছেন। আজও ভক্তি-বিনম্র চিত্তে তাঁর সমাধি ক্ষেত্রে রক্ষিত তাঁর দীবান যদৃচ্ছাক্রমে খুলে জিজ্ঞাসুরা নিজেদের জিজ্ঞাসার উত্তর পান। ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক পৃথিবীর ধর্মান্ধতায় ক্লিষ্ট হ'য়ে হ.াফিজ. খুলে উত্তর পেয়েছিলেন—সর্বপ্রথমে মনে হলো হ.াফিজ. বিশ্ববন্দিত কবির অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। 'মুকুটধারী রাজারা তোমার মনোমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুধা নিঃসৃত হয়, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত। স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি. এও কি হবে সম্ভব ? অহংকৃত ধার্মিক নামধারীদের জন্য যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে, ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।' কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন বসন্তের রৌদ্র ঝলমলে প্রভাতে হ.াফিজে.র হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুটি অনুভব করেছিলেন।

শ্রীমতী লোথিয়ান বেল হ.াফিজ.কে কালজয়ী মহাকবির সম্মানে ভূষিত করেছেন। তিনি বলেছেন সমসাময়িক কালের তরঙ্গ তার সম্মুখে উঠেছে আর পড়েছে। একথা ঠিক, শীরাজের মোঙ্গল যুগের অস্থির উত্থান পতনের তরঙ্গে কবিকে দুলতে হয়েছে। ভালকে বেশিদিন আঁকড়ে রাখা যায় নি। মন্দের বেগ সহসা এসে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। আবার

ভালোমন্দের গতাগতি চলেছে। হ.াফিজ. দেখেছেন রাজা আর রাজন্য-বর্গের চলিষ্ণু শোভাযাত্রা। সেই শূন্য আস্ফালনের মূঢ় অহঙ্কার মরুভূমির উত্তপ্তধূলিতে বরফের মত অচিরেই গলে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হ.াফিজে.র রচনায় এই শূন্যগর্ভের রেখাপাত নেই। তিনি যখন কথা বলেন, তখন যেন বিপুলা পৃথিবী ও অনন্তকাল কান পেতে শুনতে থাকে। দান্তে কালজয়ী কবি। তাঁর দর্শন প্রজ্ঞার দর্শন, তাঁর প্রেম উত্তপ্ত বহ্নিশিখা, তাঁর প্রকাশ স্বচ্ছ, সহজ এবং গভীর, ঠিক হ.াফি.জের মত। কিন্তু হ.াফিজ. তাঁর কবিতায় স্বর্গ নরক মথিত ক'রে চলেন নি। দান্তের মত রাজনীতির আবর্তে পড়েও হাবুডুবু খান নি। হ.াফিজ. রাজনীতির কর্দমেও অক্লিন্ন। তাঁর করকমল মহাকালের আসন ছুঁয়ে আছে, চোখে দূরবীণ, কাণে অনন্তের পদধ্বনি।

তবু একবার সর্বনাশা প্রলয়ঙ্কর হস্ত তাঁকে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে ফেলেছিল। সত্যমিথ্যার বিচার না তোলাই ভাল। কারণ এখানেও মতভেদ। আর পূর্বেই বলেছি—কিংবদন্তী সর্বদাই কবির জীবনেতিহাসকে আপন ইচ্ছায় রঙ্গীন করে গিয়েছে! এইবার সেই কথা। কিন্তু কথার সূত্রপাতে একটুখানি খাঁটি ইতিহাসের পৃষ্ঠা গুলটানো প্রয়োজন।

চিঙ্গীজ ও তাইমুর উভয়েই মধ্য-এশিয়ার গগনললাটে বিভীষিকার ধূমকেতু। চিঙ্গীজ. অখ্রীস্ট অমুসলিম প্রকৃতি-উপাসক বিধর্মী। তাইমুর মুসলিম হয়েও ইসলাম জগতের সন্ত্রাস। জিগীষা উভয়েরই উদ্দেশ্য। চিঙ্গীজ ও তাইমুরের মধ্যে নরহত্যা, লুণ্ঠনে কোন পার্থক্য নেই। চিঙ্গীজের সময় ইরান সঙ্ঘবদ্ধ—নাম খ্বারজমশাহী, তাইমুরের সময় ইরান বহুধা বিভক্ত। নানা রাজবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে তখন খণ্ড বিখণ্ড। উভয়ের কাছেই মনুষ্যত্বের কোন মূল্যই ছিল না; মানুষের ব্যক্তিগত বা সমাজগত সুখ-দুঃখের ওজন পাখীর খসে-পড়া একটি পালকের সমানও ছিল না। তাইমুর নামের তুর্কি ভাষায় অর্থ হচ্ছে লৌহ। বিশ্বত্রাস তাইমুর লৌহ-মানব। তার নামের পুচ্ছ 'ল্যাং' মানে খোঁড়া! বাল্য ও তারুণ্যের ইতিহাস ওটা খুঁজতে হয়। ভেড়াচরানো ডাকাত প্রকৃতির নষ্টভ্রষ্ট ছেলেটি পরের পালে ভেড়া চুরি করতে গিয়ে পায়ের একটু অংশের মূল্য দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছিল। ১৩৮১ সালে ৪৫ বছর বয়সে তার

পারস্য অভিযান। ১৪৮৭ সালে শীরাজ. বিজয়। ইতিপূর্বে দুর্ধর্ষ তাইমুর সমরকন্দ্ ও বোখারাকে মনের মত করে সাজিয়েছে। সমরকন্দ্ ছিল রাজধানী। জীবনীকার দৌলতশাহ্ এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী সংযোজনা করেছেন। শীরাজে.র ভক্তে নশীন তাইমুরের কাছে হ.াফিজে.র নামে এক অভিযোগ এল—তিনি সমরকন্দ্ ও বোখারার ইজ্জত নষ্ট করে গ.জ.ল গাইছেন। অপরাধী হাজির। তাইমুরের আদেশে হ.াফিজ. গ.জ.ল গাইলেন—

'আগর আঁ তুর্কী শীরাজ.ী বদস্ত আরাদ্ দেল-এ-মারা
বখালে হিন্দুবাশ্ বখশম্ সমরকন্দ্ বো বোখারারা ॥'
প্রাণ যদি মোর দেয় ফিরিয়ে
তুর্ক শীরাজ.ী মনচোরা।
(তার) ওই মোহন চাঁদ কপোলে
একটি কালো তিলের তরে,
দিই বিলিয়ে সমরকন্দ ও
রত্নখচা এই বোখারা।

'এতবড় ঔদ্ধত্য! আমার উদ্যত তরবারির আঘাতে দুনিয়া তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছে, অজস্র লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যে সাজিয়েছি আমার সমরকন্দ আর বোখারা। বেইয়াকুব! তুমি তাকে তোমার শীরাজ. সুন্দরীর গালের এক তিলের মূল্যও দিতে চাও না। কোত্‌ল্! না, বন্দী করো এই কম্-বক্‌তকে।' কবির মুখে দ্রুত উত্তর এল, হ্যাঁ প্রভু! সত্যই আমি কম্‌বক্ত—এই হতভাগ্যের দুর্দশা তো ওই অবুঝ দানের জন্যই। সুন্দর দেখলে আমার ওজন জ্ঞান থাকে না।

খুশী হলেন বিশ্বত্রাস। আশীর্বাদের খিলাত পরিয়ে কবিকে মুক্ত করে দিলেন। এই অংশের সঙ্গে জড়িত গ.জ.লের সবটুকু অংশ তুলে ধরে আমরা সৌন্দর্য-পিপাসু স্বদেশপ্রেমিক, উদারহৃদয় এবং রহস্যের ভাষ্যকার কবিটির আর একবার আর এক দফা পরিচয় দিতে চাই।—

অগর্ আন্ তুরক্-ই-শীরাজ.ী বদস্ত্ আরাদ্ দিল্-ই-মারা।
বখাল্-ই-হিন্দুবশ্ বখ্‌শম্ সমরক.ন্দ্ বো বোখারা রা ॥

বদিহ্ সাকী ময়্-ই-বাকী কি দর্ জন্নত্ না খাহী য়াফ্ত্।
কিনার্-ই-আব-ই রুক্নাবাদ্ বো গুল্‌গশত্-ই-মুস.ল্লহ্.রা॥

হাঁ, আমি সেই শিরাজী সুন্দরীর কালো তিলের বদলে তমাম সমরকন্দ্ ও বোখারা দিয়ে দেবো; এই হ'লো পৃথিবীর নগদ। সাকী তোমার শাস্ত্রের মন ভোলানো কথা বলো না, আর বলে বলে পরকালের জন্য মজুদ করতে শিখিও না। পাত্র পূর্ণ কর। বাকী তোমার ওই শাশ্বত সুরাটুকু ঢেলে দাও এই পাত্রেই, এই মাটির ভাঁড়ে। তুমি বুঝতে পারছো না। তোমার বেহেশ্‌তে গিয়ে কি আমার এই রুকনাবাদের তীর আর মুসল্লাহ্‌র ফুলের বাগান পাবো?

ফখান্ কয়িন্ লুলিয়ান্-ই-শোখ্ বো শীরীন্-কার্-ই-শহর্-আশূব্।
চুনান্ বুরদন্দ্ স.ব্‌র্-অজ্. দিল কি তুর্কান্ খান্-ই-য়ঘ্‌মারা॥

দেখেছো আমাদের অবস্থা? এই শহরের চটুল সুন্দরীরা আমাদের মন থেকে সব ধৈর্য কেড়ে নিয়ে চলেছে। তাদের এই অপহরণ তুর্কীদের দস্যুবৃত্তির মত, কিছুই রেখে যায় না। সবটুকু নিয়ে যায়। আমরা সর্বস্ব পরিত্যাগ করে খালিস হয়ে যাই।

জ. 'ইশক.-ই-নাতমাম্-ই-মা জমাল্-ই-ইয়ার্ মুস্‌তগ্ নীস্ত্।
ব তাব্ বো রঙ্গ্ বো খাল্ বো খত্. চি হা.জত রূয় জ.ীবারা॥

সর্বস্ব ত্যাগ না করে উপায় আছে? একটু কিছুও রাখতে দেয় না; বলে 'অসম্পূর্ণ প্রেম অস্পৃশ্য'। [মনে হয় আবরণটুকুও টেনে নিয়ে যেতে চায়।] আমরা সব দিয়ে দিই! কেন জানো?

বধূ আমাদের বড় সুন্দর—সেই সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। তাকে লাবণ্য, বর্ণ, অধরের তিল বা গালের টোল দিয়ে বুঝতে যেও না। সে শুধু সুন্দর নয়, অনুপম। জেনে রাখো সে নিত্য কেড়ে নেয়—নিত্য তার আকর্ষণ।

আমি একটা সুন্দর গল্পের প্রতীক দিচ্ছি—

মন্-অজ. আন্ হু.সন্-ই-রূজ. আফ্‌জূন্ কি য়ূউসুফ্ দাশ্‌ত্ দানিস্তম্
কি ইশ্‌ক্ অজ্ পরদয়ি ইস.মত্ বিরূন্ আরদ্ জুলয়খা.রা॥

ইউসুফের লাবণ্য এবং তারুণ্য যখন সীমা ছাড়িয়ে ছিল, আমি তখনই জেনে ছিলাম অনুরাগ জুলয়খাকে সংস্কারের আবরণ থেকে বাইরে টেনে আনবে। জানি তার বল্‌তে হবে—

'হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল, প্রেম প্রহরি রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর সদৃশ ভেল, দূরহি দূরে রহু ভাগি॥
(গোবিন্দ দাস)

শুনবে, তোমরা শুনবে? ও মুখের গালি শুনলেও দুঃখ হয় না। ও যে বড় সুন্দর। সুন্দর ওষ্ঠ দিয়ে আসছে, তা তেতো হলেও আমার কাছে বড় মিষ্টি মনে হয়। আসল ধাতুটা তো প্রেম। তা যখন আছে তার বিকারগুলো যা' খুশী তাই হোক্।—

বদম্ গুফতী বো খুরসন্দম্ আ'ফাক্ আল্লা নিকু গুফ্তী।
জবাব্-ই-তল্খ মীজ়ীবদ্ লব্-ই-ল্'অল্-ই-শক্‌র খারা॥

তুমি গাল দিয়েছ আমি খুশী। খোদা তোমাকে যেন ক্ষমা করেন, তুমি ভাল বলেছ। মধু মাখানো ঠোঁটে যা বেরোয় তাই মিষ্টি—হোকনা কেন তেতো কথা—তাও আমি মিষ্টি শুনি।—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদ শ্রুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।

তোমাকে আবার কি উপদেশ দেবো? যদি শোন, তবে বলি—

নসীহত্ গুশ্ কুন্ জানা কি, অজ়্‌জান্ দুস্ত্‌তর্ দারন্দ্।
জুবানান্-ই-স'আদত্‌মন্দ্ পন্দ্-ই-পীর্-ই-দানারা—॥

হাঁ তুমি উপদেশ অবশ্য শুনবে, কারণ ভাগ্যবান্ যোয়ানেরা প্রাণ থেকেও প্রিয় মনে করে জ্ঞানবৃদ্ধদের উপদেশ। তুমিও ক'রো।

এইবার তুমি শ্রবণ করো—

হ়দীস্ অজ়্‌মুত়্‌রিব বো ময় গ্ বো রাজ়্-ই-দহর্ কম্‌তরজু।
কি কস্ ন গুশদ্ বো ন গুশায়দ্ ব হি়কমত্ ইন্ মু'অম্মারা॥

উপদেশ নাও—কথা শোন শরাব থেকে আর গানের ওস্তাদ্ থেকে, আর কিছু শুনো না। এই সৃষ্টির রহস্য খুব অল্প জানার চেষ্টা করো। কেউ শোনে নি এবং শোনায় নি এই সৃষ্টি রহস্যের তথ্য বা জ্ঞান। সব ঝুট হ্যায়্—আনন্দ কর।

আমার ঢক্কা নিনাদের তো কোন মানুষ নেই। নিজের ঢাক নিজেই পেটাই—

গ.জ.ল্ গুফ্‌তী বো দুর্‌রত্‌ সুফ্‌তী বীয়া বো খুশ্‌ বখ্‌ান্ হ.াফিজ.।
কি বর্ নজ.ম্-ই-তু অফ্‌শানদ্ ফলক্ 'ইক.দ্-ই-সুরয়্যায়া।

হাফিজ. তুমি গজ.ল গেয়ে চলেছ, মুক্তোও অনেক ছড়িয়েছো—এসো এবং আনন্দের পাঠ গ্রহণ কর। জান, তোমার গানের উপর বেহেশ্‌ত্ থেকে পুষ্পবৃষ্টি চলেছে।

অনেকেই কবি হ.াফিজে.র কবিতার অলঙ্কার সম্বন্ধে সাধুবাদ দিয়ে বলেছেন—তিনি বহুপ্রকার অলঙ্কারের জুলুস্ দেখিয়ে পাঠককে মুগ্ধ করেছেন। তশ্‌বীহ্‌ বা উপমা, ঈহাম্ নামক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জনা, তজনীস্, কিনায়হ্‌ প্রভৃতি রূপকাদি সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারের যথোচিত প্রয়োগ করে তিনি তাঁর কাব্য সুন্দরীকে প্রসাধিত করেছেন। ছন্দের দিকে 'ক.াফিয়হ' বা অন্ত্যানুপ্রাস তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। আমাদের কিন্তু অন্য কথা মনে হয়। সত্য বটে, নিজ.ামী আরূজীর চহার মকালা (১২শ-১৩শ) এবং সজাতীয় অন্যান্য গ্রন্থে রাজচর্যা এবং কবিচর্যার চূড়ান্ত করা হয়েছে; কিন্তু গ্রীকো ইতালীয় জগৎ বা ভারতের মত সৌন্দর্যতত্ত্বের মীমাংসাদর্শন ইরানে রচিত হয়নি।

কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে বলি। সাহিত্যের রূপ ও তত্ত্ব বিশ্লেষণে আগাগোড়া ইরানীদের অনীহা বর্তমান। এ বিষয়ে তাঁরা এক প্রকার বলিষ্ঠ মনোভাবের তালঠোকা তাকত্‌ দেখিয়েছেন। তারা বলেন জে.বাসেনাসী বা Æsthetics এর অতিবিশ্লেষণ সাহিত্যচর্যায় অসুস্থতার লক্ষণ। তাঁরা বলেন, আমরা চাই 'তাজা গুই', অভিনব বস্তু, চমক লাগানো বাচনভঙ্গী এবং আস্বাদনের আনন্দ। তাঁরা বলেন, মানুষ যখন স্বাস্থ্য হারায় তখন স্বাস্থ্যতত্ত্বে মনোনিবেশ করে। সুস্থ অবস্থায় ঐসব তত্ত্বের ধার কেউ ধারে না। অতি সাবধানীর অত্যন্ত অবধানও এক মানসিক রোগ। আমাদের কথা, কবির বচনে চাই রোশনী, তাবিশ্‌ ও শিরনী—যাকে বলে আলো, তাপ ও মাধুর্য। ওই সবে মশগুল হয়ে আমরা চোখ বুজি—জান তর হ'য়ে যায়। মুখে কথা বলতে চাইনে। কেউ বলতে এলে থামিয়ে দিয়ে বলি 'খামোশ্‌'।

এই সব মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের একটি ঘটনার কথা শুনুন। রবীন্দ্রনাথ শীরাজে. অতিথি। কবিসম্বর্ধনা করতে

গিয়ে সেখানকার এক সাহিত্যিক যা বললেন তাতে ইরানী সাহিত্যের মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। তিনি বললেন—"আমরা জানি অলঙ্কার বিহীন সৌন্দর্যই সুন্দরতম অলঙ্কার।" একথার পরে কেউ যেন হ.াফিজে.র কাব্যকলাকে প্রাকোভারতী পন্থায় বিশ্লেষণ আরম্ভ না করেন। হ.াফিজে.র বচন তাজা। সে অনিন্দ্য বচন সর্বদাই প্রাণপ্রচুর। তার ঔজ্জ্বল্যে চমক আসে, আর মাধুর্যে হৃদয় গলে যায়। আমরা তাঁর বাক্যভঙ্গিমা বিশ্লেষণ করতে চাই না। কেউ কি সাতরঙা রামধনুর রঙগুলি খুলে খুলে দেখতে চায়? শুধু আমরা তাঁর হুসন্-ই-তলীল বা সৌন্দর্য প্রদক্ষিণ করে চলি; আর অস্ফুট আওয়াজে বলি 'তামাম উসূল'—সবই তো পাওয়া হয়ে গেল। হ.াফিজে.র রচনাবলীর সঙ্গে এই প্রবন্ধে যতটুকু পরিচয় আমাদের ঘটেছে তাতে এই মানদণ্ডের গুজনই কাজের হবে।

* * * *

এইবার উপসংহার টেনে আনতে চাই। সূফীরা আনন্দের উপাসক। আনন্দরূপ অমৃতের এক একটি টুকরো এই ধরার মানুষ—আতসের এক জ.র্রা। বসন্ত বা বহার প্রকৃতিতে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। দেখা যায় হ.াফিজ. বার বার কবিদের তূতী বা শুকপাখী বলে অভিহিত করেছেন। পাখীর গানেই ঋতুরাজ বসন্ত জেগে ওঠে—এ কবিদের কথা। বিজ্ঞানীরা বলবেন বসন্তের জাগরণেই পাখীরা আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়। যাই হোক্ উভয়ের মত্ত উৎসব যুগপৎ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ কবিদৃষ্টি দিয়ে দেখে কবির মতো বলেছেন—'প্রকৃতিতে নিমন্ত্রণের ভার বসন্ত ঋতুর উপরে—তার সুগন্ধ পুষ্পগুচ্ছে, পাখীর গানে তার নিমন্ত্রণের বার্তা। কবিরাও বসন্ত ঋতুর আদর্শ পূজারী। তারা আপন দেশ, আপনকালের মধ্যে থেকে সর্ব দেশ, সর্বকালকে আমন্ত্রণ জানায়।' এ কথাই আমরা হ.াফিজে.র গজ.লের মর্মরূপে পাই। এমন সার্বজনীন আহ্বান আর কোথাও নেই। সে আমন্ত্রণ লিপি জানায়—দূরে থেকো না, এসো আমরা মিলেমিশে উৎসব করি। ঠিক যেন তাঁর বন্ধু আবূ ইশাক্ ইনজুর ভাব—"বেইয়া ইমশব তমশা কুনেম্…চু ফরদা শবদ্ কারে ফরদা কুনেম্"।

আমাদের ভাবনা অন্যদিকেও অঙ্গুলি-সঙ্কেত করে। নির্মল আকাশ,

উদ্যানে নিবিড়-নিবদ্ধ বনস্পতির ঊর্মিল বিস্তার, দিগন্তে গিরি-শ্রেণীর নীল আভা—সব মিলে মিশে ইরানের ভূপ্রকৃতিতে যা' জানায় তা চটুল নয়, গভীর ও গূঢ়। হ.াফিজে.র গজ.ল সেই নিগূঢ় রহস্যের বার্তা আনে। চিত্তের আলো জ্বলে উঠলেই মানুষে মানুষে ভালবাসা জমে ওঠে। হ.াফিজ. ছিলেন মানব প্রেমিক। শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন সমগ্র পার্থিব সৃষ্টিরই প্রণয়ী—যে ভাবের অর্থ বহন করতে পারে আরবী 'ইনসান্' কথাটি। সারা দুনিয়ার শব্দকোষ মানুষ বোঝাতে এমন সুন্দর একটি কথা দিতে পারে নি। Man, মানব, মনুষ্য, আদমী, mortal, মরদ্, শক্স্, wiros, vir viriles সব কথাগুলি এর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। হ.াফিজে.র ভাব, যেন এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টিকর্তার প্রেমের পিয়ালা। তাকে প্রাণভরে পান করো। এই জন্য তিনি বলেন মজহাব-এ-ই'শ্ক্ দারম্। এই জন্য এই পৃথিবীকে তিনি স্বর্গের চাইতেও বড় মনে করেছেন—বরতর অজ. গরদূঁ মোকামে আদমস্ত্। হ.দীস বলেন—লব লাকলমা খলক. তু-ল্ আফ্লাক—তোমার জন্যই তো এই মহাসৃষ্টি। এই বিশ্বপ্রেমের বৃহৎকক্ষে আবার সব চাইতে সুন্দর হ.াফিজে.র বাসস্থানটি—মুসল্লার সুরভি উদ্যান আর রুকনাবাদের স্রোতস্বিনী। হ.াফিজ. তাঁর জীবনে বর-রূএ-জমীন্ এই বেহেশ্তের প্রতি কোন দিনই প্রণয়-বিমুখ হয়ে মুখ ঘোরাতে পারলেন না।

রুকনাবাদের তীরে, মুসল্লার জমিনেই আছে হ.াফিজে.র সমাধিস্তম্ভ। তাতে উৎকীর্ণ আছে—চিরাঘ-ই-অহ্ল্-ই-ম'অনী খ্বাজাহ্ হ.াফিজ.

কি শম'য়ি বুদ্ অজ. নূর-ই-তজল্লী।
চূঁ দর খাক-ই-মুস্বল্ল সাখত্ মনজিল
বজূ তারীখশ্ অজ. 'খাক্-ই-মুস্বল্লাহ্॥
হাফিজ কবি জ্ঞানের রাজা—সবার সেরা খোদার আলো।
মুসল্লার মাটির কোলে কুটির তার লাগতো ভালো॥
খেলা তাঁহার সাঙ্গ হ'লো, সেদিন কবে প্রশ্ন করো?
জবাব তুমি পাবে রে ভাই, মুসল্লার জমীন ধরো।

মৃত্যুর তারিখ দেবে 'খাক-ই-মুস্বল্লাহ্' কথাটি। আরবী সাঙ্কেতিক গণনায় এর অর্থ ৭৯১ হিজরী, বা দাঁড়াবে ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

মহ.মুদ শবিস্তরী

কৃষ্ণ-কাসপিয়ান সাগরদ্বয় মধ্যে জর্জিয়ার পূর্বে আজ.রবাইজান নামে এক দেশ আছে। এই দেশের দক্ষিণে ইরানের তবরীজ। এরই উপকণ্ঠে শবিস্তর নামে এক গ্রাম। শেখ স'অদুদ্দীন মহ.মুদ বিন আবদুল করীম—এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি মহ.মুদ শবিস্তরী। তাঁর জন্ম হয় ত্রয়োদশ শতকের উত্তরার্ধে, মৃত্যু ১৩২০ সালে। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা এবং সূফীতত্ত্বের জ্ঞান-গবেষণা তাঁকে শুধু পণ্ডিত ও জ্ঞানী নয়, একজন তত্ত্বজ্ঞ ব'লে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। দেখতে পাই ১৩১৭ ঈশাব্দে তিনি একজন তত্ত্বব্যাখ্যাতা-রূপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এই আত্ম-পরিচয় আছে তাঁর "গুলশন-ই-রাজ." গ্রন্থে। পার্সী ভাষায় 'রাজ.' মানে গুপ্ত বিষয়। এই 'রাজ.' সংস্কৃত রহস্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রহস্য > রহস্ > রাজ.। একটি চলিত বাগ্-ভঙ্গিমা আছে—"রাজ. বর শহ্.রা আফগানদন্" যার অর্থ রহস্যকে সর্বসমক্ষে ছুঁড়ে দেওয়া। মহ.মুদ শবিস্তরী তাঁর গুলশন্-ই-রাজ. গ্রন্থে উদ্যানে সেই রহস্য সর্বসমক্ষে নিক্ষিপ্ত ক'রেছেন। এই গ্রন্থে দেখি খোরাসানী আমীর সৈয়দ্ হু.সয়নী প্রশ্ন কর্তা এবং মহ.মুদ শবিস্তরী উত্তর দাতা। এই প্রশ্নোত্তর সুন্দর জমে উঠেছে। কৌতূহলী পাঠককে আমরা পালিগ্রন্থের মিলিন্দপঞ্হো বা মিনান্দার প্রশ্নের কথা স্মরণ করাতে পারি। সেখানে গ্রীক রাজ মিনান্দার মহাস্থবির নাগসেনকে রহস্য কথা জিজ্ঞাসা করে যথোচিত উত্তর পাচ্ছেন। আমাদের রহস্য-উদ্যানে প্রশ্নোত্তরের সন তারিখও দেওয়া আছে।—

'ব সাল-ই-হফ্‌দহ্ অজ. হফ্‌ত্-স্বদ সাল।
জ. হিজরত্ নাগহান্ দরমাহ্-ই-শবাল্॥
রসূলী বা হজারান্ লুত্‌ফ্ বো অহ.সান্।
রসীদ্ অজ. খিদমত্-ই-অহল্-ই খুরাসান্॥

হিজরী ৭১৭ ঈশাই ১৩১৭ শব্বাল মাসে খুরাসানী জিজ্ঞাসু শতশত অর্থভরা-তথ্যাদি নিয়ে আমার সম্মুখে পৌঁছল।

প্রশ্ন হ'লো—তফকুর্ বা ধ্যান কাকে বলে ? মরমী উত্তর দিলেন—

'তফকুর্—রফতন্ অজ. বাত্বিল্ সুয় হ.ক.।
বজুজ. রো অন্দর্ বদীদন্ কুল্ল্-ই-মত্বলক্.॥

ধ্যান হ'লো বাতিল থেকে সত্যের দিকে অভিগমন। বাহির এবং ভিতর সব দিকেই অসীমের সত্তা উপলব্ধি। সংক্ষেপে বলা চলে 'বুরদ্ ফিক্র্-ই-নিকুরা শরত্ব্ তজ.রীদ্। উৎকৃষ্টতম ধ্যান ও ধারণার একটি শর্ত—তজ.রীদ বা নির্জনতা। পস্ আন্ গহ্ লম্' অঈ অজ. বরক্. তা'য়িদ্॥ পশ্চাৎ এই বিষয়-বিমুক্ত (তৈলধারাবৎ) ধ্যানে ধ্যানী দেখে বিদ্যুৎ আভাসের মত স্পষ্ট বেহেশ্তের ছবি। প্রশ্ন হলো সালিক-ই-রাহ্-ই-হক. কে ? অর্থাৎ সত্যের প্রকৃত পথিক কে ? মরমী উত্তর দিলেন—

"মুসাফির আন বুবদ কেহ্ বগজরদ্ জ.,দ্।
জ. খুদ্ স্বাফীশুবদ্ চূঁ আতিশ্ অজ. দূদ্॥

খুব সোজা উত্তর—সেই সত্য পথের প্রকৃত পথিক হয় সে, যে খুব তাড়াতাড়ি তাঁর আদর্শ পথের দিকে অগ্রসর হয়—আগুন যেমন শীঘ্র মুক্ত হয় ধোঁয়ার আবরণ থেকে সেও তেমনি স্বার্থপরতার নির্মোক থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

মরমী কবি শবিস্তরীর রহস্য উদ্যানে আরও নানা প্রশ্ন ও নানা রঙের উত্তর কুসুম হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ কি ? সেই জ্ঞান যখন করায়ত্ত হয় তখন আল্লার রহ.াদত্ বা ঐক্য লাভের উপায় কি ? সব চেয়ে সুন্দর হয়েছে সূফী সাধনার উপায় এবং উপকরণ ব্যাখ্যা—এগুলি সূফীকাব্য এবং সূফী সাধনায় সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে—শরাব, ময়খানা বা শৌণ্ডিকালয়; সাকী বা সুরা পরিবেশনকারী অগ্নি উপাসক বালক, আলিঙ্গন ও চুম্বন। খুশবূ বা সৌরভ, কালো কেশপাশ, সুন্দর মুখ, বুৎপরস্ত বা মূর্তি উপাসক—এইসব পারিভাষিক কথা সূফী সাহিত্য ও সূফীসাধনায় সর্বদা প্রযুক্ত হয়। এদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শরাব প্রেম বা প্রেমের উন্মাদনা। এই উন্মাদনা ঢেলে

দেয় সাকী যিনি গুরু বা পীর। ময়খানা হচ্ছে—খোদার সান্নিধ্য—এখানে থাকা মানে সালোক্য এবং সামীপ্য মুক্তির আস্বাদ পাওয়া। প্রেমের উন্মাদনা এলেই আলিঙ্গন এবং চুম্বন—সে তো প্রেমেরই অনুভব বা বিকাশ। খুশবু তাঁর অস্তিত্বের অনুভব। কালো কেশপাশ মাঝে মাঝে দিনকে রাত করে দেয়—তাঁর সুন্দর মুখকে দেখতে দেয় না। ওরা বাধা বা অন্তরায়, সুন্দর হলেও এক বিরক্তিকর বঞ্চনা। এইজন্য মরমিয়ারা বলে—ময়খানায় এসে সব খোয়াতে চাও তো পেছনের ডাক শুনো না—সোজা চ'লে এসো। মূর্তি পূজারী হচ্ছে সরল বিশ্বাসী Pagan—এই মহা গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন—'হুইনফিণ্ড্'।

'উবায়দ্-ই-জ়াকানী

কবির পূরো নাম—নিজ়ামুদ্দীন 'উবায়দু'ল্লাহ্ জ়াকানী। চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে ক়জবীন্ শহরের সন্নিকটে জ়াকান্ নামক এক পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি যান শীরাজ়. নগরে। সেখানে তিনি আবূ ইশাক. ইন্জূ.র স্নেহধন্য হন। ইনি সেই হ়াফিজে.র বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক শীরাজের শাসনকর্তা। জ়াকানী ফিরে আসেন তাঁরই স্বদেশ ক়জবীন শহরে কাজীর অধিকার নিয়ে। কিন্তু এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি নানাভাবে তখনকার বিজয়ী তুর্কীদের অসদ্ আচরণগুলি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান এবং কবি মর্মাহত হন এদের সংসর্গে ইরানীদের চরিত্রের অধোগতি দেখে। কাজীর চাবুক অপরাধীর পৃষ্ঠে পড়ে—কিন্তু এক্ষেত্রে নিরুপায় কাজী অন্যদিকে, লেখনীর মুখে তাঁর চারপাশের ঐশ্বর্যমত্তদের চাবুক মারতে থাকেন। এসব ব্যাপারে তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপগুলি বড় উপভোগ্য হ'য়ে প্রকাশিত হ'তে থাকে। কবির কাব্য ও অন্যান্য রচনাগুলির নাম শুনলেই বোঝা যায় তিনি কতবড় রসিক ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকার। 'মূশ্ ও গুবরা' ইঁদুরবিড়াল-কথা, রীশ্ বা দাঁড়ি মাহাত্ম্য—নামগুলিই মর্মান্তিক বিদ্রূপ-বহ। এই চাবুক যাদের আঘাত করত তাঁদের পক্ষে কবিকে

অসহ্য বোধ হ'তো। এইজন্য অনেকেই তীব্রতম ভাষায় জ.াকানীকে গালি দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন ইরাক.বাসী একজন সভ্রান্ত কবির নাম করি; তিনি সলমান্ সাবজী। সলমান্এর চক্ষুশূল ছিলেন জ.াকানী। তীব্রতম ভাষায় তিনি একদা নিন্দা করলেন জ.াকানীকে—

'জহন্নমী হিজা গো 'উবয়দ্-ই-জ.াকানী।
মুকর্রর্ অস্ত বে দৌলতী বো বেদীনী॥
অগর চেহ্ নীস্ত্ জ. ক.জ.বীন্ বো রুস্তাজ.াদ.া অস্ত্।
বো লীক মী শবদ্ অন্দর হ.দীস্-ই-ক.জ.বীনী।

'উবয়দ্-ই-জ.াকানী আবার কবি নাকি! ওটা এক মিলগাঁথুনে—(rhymester) ওর জহন্নমী কলম সর্বদা পরনিন্দায় লগ্ন। ও অভিশপ্ত করেছে নিজেকে মানুষের কাছে, ধর্মের কাছে। একটা গেঁয়োভূত জ.াকানী নিজেকে আবার ক.জবীনী বলে শহুরে পরিচয় দেয়! ঠিক ঠিক ও 'কজ.বীনী'—সত্যই—বোকার বোকা, গাধা ক.জবীনী।

তখনকার দিনে ক.জবীনীদের আহাম্মুক বলা হ'তো, খোরাসানীদের গাধা বলা হ'তো, তূসীদের বলা হ'তো গরু, বোখারীদের নিন্দা ছিল—ভালুক ব'লে!—

অসহিষ্ণু জ.াকানী সব কর্ম পরিত্যাগ ক'রে ছুটলেন কবি সলমানের উদ্দেশে—সেই ইরাকে.। পথশ্রান্ত জ.াকানী দেখলেন তাইগ্রিসের তীরে সম্পন্ন, অভিজাত এবং ঐশ্বর্যবান্ কবি সপারিষদ্ বসে আছেন। উভয়ের সলাম বিনিময় হ'লো। সলমান্ অপরিচিত আগন্তুককে একটি কবিতার অর্ধাংশ শোনালেন। জানেন পথিকপ্রবর! এবার তাইগ্রিস্ যেন ক্ষেপা হ'য়ে ছুটছে—'দজাহ্রা ইমসাল রফতারী আ'জব মস্তানহ্ অস্ত্।' তাই নয় কি? নেশায় মত্ত মস্তান, ভীষণ রোষে ওর ছুটে যাওয়া।

'দুর্বার গতি বয়ে যায় নদী—নেশায় মত্ত পাগল পারা।' আশ্চর্য! পথিক শুনেই অপর অর্ধ পূরণ করে দিলেন।

'চরণে নিগড়, মুখে ওঠে ফেনা, নদী বুঝি আজ চেতনা হারা!' হুজুর—পাগলটার পায়ের বাঁধন খুলবেন না। তা হ'লে দেশ রসাতলে যাবে।

'পায়ে দর জ.নজীর বো কফ্ বর লব্ মগর দীরানাহ্ অস্ত্॥

অভাবিত আনন্দ-বিস্ময়ে সলমান্ হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'ওঃ কবি বুঝি।' উত্তর এলো, 'আজ্ঞে সামান্য একটু মিলটিল দিয়ে থাকি।' তখন সলমান্ আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং কবি চেতনায় কিছুটা উদ্ধত। প্রশ্ন করলেন— আমার পরিচয় জানা আছে? আমি প্রসিদ্ধ কবি 'সলমান্ সাবজী'। ওগো বিদেশী কবি! আমার কবিতার সঙ্গে পরিচয় আছে কি? আজ্ঞে তা' আবার নেই! আমি এক্ষুনি আপনার একটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাতে পারি। আনন্দে মশগুল সলমান্ উৎকর্ণ হ'লেন। জ.কানী স্পষ্টভাবে আবৃত্তি ক'রে শোনালেন—

'মন্ খরাবাতীম্ বো বাদহ্-পরীস্ত্।
দর খরাবত্-ই-মঘ.ান্ আ' শিক. বো মস্ত্॥
মী কুশন্দম্ চু সবু দোশ্ ব-দোশ্।
মী বরন্দম্ চু ক.দহ. দস্ত্ ব-দস্ত্॥

আমি চ'লে যাই শুড়িখানা মুখে—শরাবে পাগল হামেশাই।
কাফেরের ঠাঁই, আরো কোথা যাই—প্রেমিকে পাগল সদা ভাই॥
আমি যেন এক শরাব কলস, কাঁধে কাঁধে ফিরে সারা হই।
হাতে হাতে ফেরা শূন্য পাত্র—নেশার উর্দ্ধে কভু নই॥

আবৃত্তি শুনে সলমান্ পুলকিত, প্রায় বিগলিত। কিন্তু ওদিক থেকে সর্বনাশা ইঙ্গিত আসে। হুজুর—শুনে আপনার ভাল লাগলো। কিন্তু! আমার ভাল লাগেনি। লোকে বলে এটা আপনার রচনা, কিন্তু আমি মনে করি এটা আপনার স্ত্রীর রচনা। ওটা একবার বললাম। এটা সবার কাছে না বলাই ভালো। হাজার হলেও আপনি উচ্চ বংশের, আর মান মর্যাদাও যথেষ্ট। সলমান্ তখন একটু ক্ষণের জন্য গম্ভীর হ'লেন। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে কবিকে শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝেছিলেন—এটুকুতেই বুঝেছি জ.াকানীকে চটিয়ে কোন লাভ হবে না। এ আমার নিন্দার তীক্ষ্ণতম উত্তর দিয়েছে। এর পর থেকে উভয় কবির বন্ধুত্বের ইতিহাস শুরু হ'লো।

এইবার জ.াকানীর গ্রন্থগুলির পরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি—

(১) অখ লা কু.'ল অশ্রাফ—আভিজাত্যের নীতিশাস্ত্র।

(২) রীশনামা—দাড়ি মাহাত্ম্য।

(৩) রিসালা-ই-দিলগুশা—আনন্দ লহরী।

(৪) দহ্‌ ফস.ল্‌—দশাধ্যায়ী।

(৫) রিসালা-ই-সদ্‌পন্দ্‌—শতোপদেশমালা।

এছাড়া আছে কবির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা বিষয়ক রচনাবলী।

ব্যঙ্গবিদ্রূপে তীক্ষ্ণতম তীরন্দাজ, সৎ উত্তম বন্ধু এবং অত্যন্ত অধম ক্ষমাহীন শত্রুরূপে—জ.াকানী পারস্য সাহিত্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এটাই ছিল কবির বৈশিষ্ট্য।

সলমান্‌-ই-সারজী

সলমান্‌ সারজীর 'উবয়দ্‌-ই-জ.াকানীর সঙ্গে তিক্ত-মধুর সম্বন্ধের কথা জা.কানী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এই সলমান্‌-ই-সারজীর পরিপূর্ণ নাম—'জমালুদ্দীন মুহ.ম্মদ সলমান্‌ বিন্‌ আলাউদ্দীন মহ.ম্মদ।' এই কবি নিম্নমানের ছিলেন না ; তার কারণ সমসাময়িক সলমানকে স্বয়ং হ.াফিজ. প্রশংসা করে গিয়েছেন।

"শহন্‌ শহ্‌-ই-ফজ.লা পাদ্‌শাহ্‌-ই-মুল্‌ক্‌-ই-সখুন্‌।
জমাল্‌-ই-মিল্লত্‌ বো দীন্‌, খ্বাজহ্‌-ই-জহান্‌ সলমান্‌॥"

হ.াফিজ. বলছেন বিদগ্ধের রাজা, কবিতা রাজ্যের সম্রাট্‌, জাতির এবং ধর্মের তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং তিনি সমগ্র জগতের মাননীয় ব্যক্তি।

হ.াফিজে.র গুণগ্রাহিতার অতিশয্য তাঁকে অনেকদূর টেনে নিয়েছে। আসলে সলমান্‌ সার ছিলেন বানিয়াবুদ্ধিসম্পন্ন এবং আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষকের স্তুতিপাঠক কবি। জলারিয় বংশের ইলখানী সুলতান্‌ বংশের কয়েকজন এবং মুজফ.ফরিয় সম্রাট শাহশুজা ছিলেন তাঁর কস.ীদের অবলম্বিত পুরুষ। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য অর্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকেও তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে—প্রমাণ তাঁর খোদা, পয়গম্বর, ইমামগণ বিশেষ হজরত্‌ আলী সম্বন্ধে স্তব-স্তুতি। যে ভাবেই হোক সলমান্‌ আত্মধর্মে যেন স্তবের কবি। বীরুদ্‌ রচনায় তিনি নিত্য-

সিদ্ধ। জ.াকানী যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জগৎ নিরীক্ষণ ক'রে তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করেন, ইনি তেমনটি ছিলেন না। সলমানের কবি-দৃষ্টি ছিল না বা কাব্যরসের চেতনা ছিল না, এমন দুঃসাহসিক উক্তি আমরা করব না। তাঁর ফিরাক.নামা এবং জমশীদ্ বো খুরশীদ্ কস.ীদা হলেও উৎকৃষ্ট রচনা। কস.ীদা ছাড়া তাঁর রচনায় আছে গজ.ল এবং রুবায়ত্। জামী সলমানের সমালোচনায় বলেছেন—তাঁর গ.জ.লে প্রেমের তন্ময়তাও ছিল না, তীব্রতাও ছিল না। তবে হাঁ, কস.ীদায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

একটি কথা সলমান্ সর্বদা স্তুতি-মুখর ছিলেন বলে, এই বীরুদাবলীতে সমসাময়িক রাজন্যবর্গের ইতিহাস—অন্তত ইতিহাসের চূর্ণক আমরা লাভ করি।—

ইলখানী শেখ হাসান-ই-বুজু.র্গ 'ধনুকের' গুণ টানলেন—সে যেন চক্রীকৃত চারু চাপ হ'য়ে গেল। বাণ ছুঁড়লেন মালিক একস্থানে দাঁড়িয়ে কিন্তু টঙ্কার ছড়িয়ে গেল চারদিকে। সুলতান্ তোমাকে কি বলব? তীর তোমার হুকুমের নোকর। সৌভাগ্য সর্বদা জড়িয়ে থাকে ওই ভ্রাম্যমান তীরে।··· ···তোমার ছুঁড়ে দেওয়া তীরে অনিষ্ট সাধন করে বটে, কিন্তু সমগ্র রাজ্যের অপরাধ প্রবণতা স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

কবি শেখ উবয়সের অকাল মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হ'য়ে বলেন—সুদর্শন যুবরাজ! পরমাত্মার রাজ্যথেকে দেহ ও ইন্দ্রিয় নিয়ে আমাদের দেখা দিয়েছিলে। তোমার শ্বেতবস্ত্রের শয্যা পার্শ্বে অপরাধীর মতো এসেছি। মহান যুবরাজ—তুমি ছিলে অমিত-শক্তিধর। তোমার আনন্দ যাত্রায় শেষ অভিনন্দন জানিয়ে এ দাস বিদায় গ্রহণ করছে।······

সলমান্ কাব্যরস বিবর্জিত ছিলেন না; কিন্তু প্রশংসার পর কেবল প্রশংসা করে তিনি স্তবস্তুতির ক্ষীরসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছেন। কবির যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যে সাধারণ থেকে সর্বদাই তাঁকে অসাধারণ করে তোলে—সেই ব্যক্তিত্বের বৃহৎ এবং মহৎ ভূমিকা তাঁর কোন দিনই ছিল না।

সলমান্ সাবজী কত সুন্দর ক'রে কথা বলতে পারেন. তার একটু নিদর্শন দিই—

"খনদহ্ অ.দ্ দহনত্ তুঙ্গ-ই-শকর পয়দা করদ্।
সখুনী শুক্ত্ লবত্ লূলূয়ী তর্ পয়দা করদ্॥"
বুদ্ না ইয়াক্ত মিয়ান্-ই-তু বো লিকন্ কোমরত্।
চুসত্ বর্ বসত্ মিয়ান্ রা বো বজ.র্ পয়দা করদ্॥
পরদহ্ অজ. চিহরহ্ বর আন্দাজ. কি আন্ জুলফ্-ই-সীআহ্।
দর্ সুপীদী আ'জ.ার-ই-তু আস.র্ পয়দা করদ্॥

তোমার দর্শন থেকে হাসিটি ফুটে বেরিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সে হাসি এক শর্করার পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। তোমার ওষ্ঠ কথা বলছে—যেন শব্দগুলো টলমলে মুক্তো হয়ে বেরিয়ে আসছে।

তোমার লিকলিকে মধ্যদেশে বুঝি কটি দেশের অস্তিত্বই নেই; না, ভুল বলা হলো। যদি না থাকবে তবে ওই কটিবন্ধ তাকে সোনা করে জাহির করবে কেন?

সুন্দরী! তোমার ঘোমটা খুলে দাও; দেখি তোমার কালো চুল-গুলো কতক্ষণ তোমার (শুভ্র) সুন্দর গণ্ডাভোগ আবৃত করে রাখতে পারে!

জামী

মুল্লা নূরউদ্দীন আবদুর্ রহ.মান্ জামী খোরাসানের অন্তর্গত জাম নামক ক্ষুদ্র এক নগরে জন্মগ্রহণ করেন ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ। তারপর ১৪৯২ পর্যন্ত ৭৮ বছরের দীর্ঘ পরমায়ু তিনি পেয়েছিলেন। পার্সী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অসাধারণ এক পুরুষ। তিনি কবি, তিনি সুচিন্তিত বিষয় বস্তুর প্রাবন্ধিক, তিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিশ্লেষণে প্রায় অদ্বিতীয়, মর্মসাধনার সোপানপরম্পরায় তাঁর সাবলীল উত্তরণ—সব কিছুর শুভসম্মিলনে স্বীকার করতেই হবে তাঁর প্রতিভা অসমোর্ধ্ব। তাঁর গ্রন্থগুলিকে সাজিয়ে কেউ কেউ বলেছেন গ্রন্থ সংখ্যা হবে চুয়ান্ন। এ সম্বন্ধে তাঁরা বলেন জামীর বর্ণ বিশ্লেষণের সংখ্যাই তাঁর সংখ্যা।

জীম ত্রি-সংখ্যা জ্ঞাপক হরফ, আলিফ বুঝায় এক, মীম চল্লিশ এবং ইয়ে দশ একসঙ্গে করলে ৩+১+৪০+১০=৫৪। পাণ্ডিত্যে, কবিতায় এবং তত্ত্ববিশ্লেষণের ত্রিবেণীতীর্থে দণ্ডায়মান এই অসাধারণ পুরুষের হাতে গণনায় চুয়ান্নখানা গ্রন্থ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তত্ত্বরস বিশ্লেষণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত অনেক তত্ত্বকে প্রহেলিকার আকারে গুপ্ত ক'রে রেখেছেন। এই রচনাশৈলীকে পার্সীতে বলে মু'আম্মা। তিনখানা গীতি কবিতার দীবান, সাতখানা মসনবী কাব্য, কয়েকখানা কসীদা বা বিরুদ, যাকে বলে স্তুতিকাব্য, অজস্র ব্যাখ্যাবিশ্লেষণাত্মক রচনা, এমন কি ব্যাকরণের সূত্রবিশ্লেষণ, ছন্দোনিরূপণ, সঙ্গীতকলা সব নিয়ে জামীকে মনে হয় জ্ঞান-রত্নাকর। যে যা চায়, তাই উঠিয়ে নিতে পারে এই মহাসমুদ্র থেকে।

এই মহাজ্ঞানীর কীর্তিকথা শুধু ইরানে, আফঘানীস্তানে এবং ভারতে ছড়িয়ে পড়েনি, রূমী দুনিয়া ছেড়ে ওসমানী তুর্কী সুলতানের রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছিল। সুলতান্ কবিকে সাদর আহ্বান জানান; কিন্তু কবি স্বীকৃত হননি। তাঁর মধ্যে রাজানুগ্রহের স্তুতিপ্রবণতার অভাব ছিল। নিজ়ামী গঞ্জবীর মতই তিনি ঐশ্বর্য-সেবায় সর্বদা অনাগ্রহ দেখিয়েছেন। গঞ্জবী বলেছিলেন—'খোদা! ছাড়িনি শুধু একজনকে, সে তুমি। কারো দুয়ারে কৃপা ভিখারি হইনি'—

'বদর্-এ কস্ ন রফতম্ অজ়. দর-এ-তূ'

কিন্তু তুমি সকলকে আমার দুয়ারে মিলিয়ে দিয়েছো। শোন প্রভু! আমি তাও চাইনি, তুমিই দিয়েছ—

'মন্ নমী খ্বাস্তম্, তূ মীদাদী।'

আশ্চর্যের বিষয় ওসমানী তুর্কী রাজ্যের প্রতি কবির অনাগ্রহ থাকলেও ভারত তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। তিনি ভারতের তদানীন্তন শাসন কর্তাদের প্রশংসা করে গিয়েছেন, একটি গজ়ল দিয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত বণিক, ভক্তিমান্ শেখ মহ.ম্মদ গৱানকে অভিনন্দিত করেছেন। আমার কবিতা চলে যাক্ ভারত যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ ভারতে। বণিক্-শ্রেষ্ঠ গৱানের সমাদর লাভে সে ধন্য হ'তে পারে—

'হম্ রহ্-ই-কাফিল্-ই-হিন্দ্ রবান কুন কি রসদ্।
শরফ্-ই-মিহর-ই—কবুল অজ. মালিকুল্‌তজ্জারশ্॥'

এর অনেকদিন পরও ভারতে জামী স্নেহধন্য কবি। স্বয়ং সম্রাট্ শাহ্‌জাহান্ বিশেষ সমাদরের সঙ্গে জামীর 'বহারিস্তান্'-এর চমৎকার এক পাণ্ডুলিপি তৈরী করিয়েছিলেন মহম্মদ্ হুসেনকে দিয়ে। তিনি পরিচিত ছিলেন 'জররীন্ কলাম্' বলে। জামীর প্রচার ও প্রশংসা ছিল সর্বত্র। দেশ দেশান্তরে তাঁর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনের কোন তুলনা ছিল না। বাবর নামায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে—'নিগূঢ় রহস্যের উন্মোচনে জামী অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর সীমাহীন প্রতিভা প্রশংসায় আয়ত্ত করা যায় না; শুধু নীরব হ'য়ে অনুভব করতে হয়।' বহু নিন্দিত এবং উচ্চ প্রশংসিত সাহিত্য-ঐতিহাসিক দৌলতশাহ্ তাঁর 'সমসাময়িক কবি পরিচ্ছেদে' বাবরের কথারই যেন পূর্বাভাস দিয়ে গিয়েছেন। এই হ'লো আকৌমার যশস্বী, জ্ঞানগম্ভীর পণ্ডিত এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সুনিপুণ মরমিয়া মহাসাধক নূরউদ্দীন আবদুর রহমান জামীর মোটামুটি পরিচয়।

এ হেন প্রশংসাধন্য, অজাতশত্রু জামীও বাগদাদে এক ঠোকর খেয়েছিলেন। কথাটা উপেক্ষা করা চলে না, কারণ এ হচ্ছে নির্দ্বন্দ্ব-প্রীতির রাজ্যে বিপর্যয়। ১৪৭২ সালে তীর্থ-পরিক্রমা ক'রে তিনি বাগদাদ হ'য়ে ফিরছেন। সেখানে এক জমায়তে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'লো, তিনি নাকি হজরত আলীর বংশধরদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করেছেন। জামীও এক মহতী সভায় এই অভিযোগের যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন। তাঁর বাগ্মিতায় তিনি সকলকে কারবালা প্রান্তরের করুণ কাহিনী দিয়ে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু ফোরাতকূলে এই বাগদাদের অবাঞ্ছিত ঘটনাটি তাঁর মন থেকে দীর্ঘদিন তিনি সরিয়ে নিতে পারেন নি। তিনি এই অরিজনসুলভ দুর্ব্যবহার স্মরণ ক'রে পরে লিখেছিলেন, 'সাকী, তুমি আমার মন থেকে বাগদাদীদের ওই অসৎ আচরণ ধুয়ে ফেলে দাও—

"বজ্. খাত্বিরম্ কু দৌরত্-ই-বাঘদাদিয়ান্ বশুয়ি।"
'সাকী তোমার সুরার জলে ধুইয়ে দিও মনের ব্যথা,
শাত্‌ল্ আরব নদীর জল ভুলায় যেন পাপের কথা।

ঐ পিয়ালার প্রান্ত দিয়ে বন্ধ করো আমার মুখ।
বাগদাদের পুণ্যকথা শূন্য হ'লেই আমার সুখ॥

ঈশ্বরের এক গুণবাচক নাম হ'লো নক.শ্.বন্দী হ.রাদিস। এই গুণনামে চিহ্নিত সূফীদের এক সম্প্রদায় আছে নক.শ্.বন্দী। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বহাউদ্দীন নক.শ্.বন্দ্। তাঁর মৃত্যুর পর স'দ্-উদ্দীন কাশগ.রী হন এই সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। তাঁর মৃত্যুর পর এই মহান্ পণ্ডিত জামী হলেন তৃতীয় গুরু।

জামী তাঁর বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যের নানা রূপের অনুশীলন ক'রে গিয়েছেন। তাঁর অনুশীলনের রাজ্যে গজ.ল এবং রুবাইও সার্থকভাবে গৃহীত হ'য়েছিল। আমরা ইতিপূর্বে দক্ষিণভারতী গবান্‌কে সম্বোধিত গজ.ল উদ্ধৃত করেছি। একস্থানে জামী এক গজ.লে বলছেন, 'সাকী তুমি কাছে এসো। তুমি কি এতদিনও বোঝনি যে, আমাদেরই কামনা নিয়ে এই বসুন্ধরা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে! ওই যে ঊর্ধ্ব আকাশে সূর্য দেখছ ওকেও কিছু দাও—আমাদের পেয়ালার প্রতিবিম্ব থেকে ওই সূর্যকে আলো দাও। বুঝতে পার না সাকী? চেতন পুরুষের ইচ্ছাতেই সমগ্র বিশ্বের জড় প্রকৃতির খেলা চলেছে—'

সাকী বিয়া দৌর-ই-ফলক্ শুদ্ ব কাম্-ই-মা।
খুরশীদরা ফ.রূঘ. দিহ্ অজ. অক্স্-ই-জাম-ই-মা॥

আর একখানা গজ.লে তিনি খোদার মহিমা কীর্তনে আত্মনিয়োগ ক'রেছেন।—সেখানে তিনি বহুরূপে বর্তমান এই বিশ্বের কেন্দ্রানুগ শক্তিকে প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। একই তো বহুতে বহুধা বিভক্ত হ'য়েছে।

মুরস. সির্ দর্ বজুদ ইল্-লা য়কী নীস্ত্।
দরীন্ হ.রুফ্-ই-শিগরফ্ অস্বলান্ শকীনীস্ত্॥

কিন্তু জ্ঞানী ছাড়া কে এই তত্ত্ব বোঝে?

রলী জুজ. জ.ীরকান্ ইন্ রা ন দানন্দ্।

এই বিশ্বের উত্তাপ এবং উত্তাপে গড়া সমগ্র সৃষ্টিই তো তাঁর স্বরূপ; আর একদিকে তিনি ভিতরের, বাইরের নয়; কারণ তাঁর স্বরূপজ্ঞান আসে উপলব্ধিতে, ধ্যানে।

জমাল্-ই-উস্ত্-তাবান্ বর্ নিহ. বীরূন্।

ভাল ক'রে উপলব্ধি করো তাঁর ভালবাসার দামের অন্ত নেই—

অন্দাযি ইশ্‌ক. বসয়ার্ অস্ত্ দর্‌দা।

এসব ক্ষেত্রে নূরউদ্দীন্ আবদুর্ রহমান্ জামী বৈদান্তিক। তাঁর মধ্যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এর তত্ত্ব; কিন্তু তিনি মায়াবাদী নন। প্রকৃতির আনন্দরূপের স্রষ্টা একজন আছেন—তিনি চৈতন্যময় পুরুষ বলা চলে। তাঁর এই সাংখ্যজ্ঞান একেশ্বরবাদে বলাহিত হ'য়েছে।

দেখা যায় ইরানে এবং ইরানী সাহিত্যে পূর্বসূরিদের অনুসরণ খুব বেশি। এসব ক্ষেত্রে মনে হয় পূর্ব প্রতিভার প্রতি উত্তরযুগের কবিদের আনুগত্যই আসল কথা। লায়লা বো মজনূন কাব্যে জামী পূর্ববর্তী দুই কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—

অজ. গঞ্জ্ হ্ চু গন্জ্ আন্ গহর্ রীজ.।

দর হন্দ্ চূ তূতী আন্ শকর্ রীজ.।

সেই গঞ্জ্‌বী মুক্তোর মত দৌলত গঞ্জ থেকে বর্ষণ ক'রেছেন আর এই একজন ভারতে শুকের মত শর্কর (চিনি) ছড়িয়েছেন।

অবশ্য উত্তর যুগের কবিদের একই বিষয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয়ও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শাহ্‌নামার কথা ও কাহিনীকে গঞ্জ.বী অবলম্বন করেছেন, আমীর খুসরো নিজ.ামী গঞ্জ.বীর কাহিনী কাব্যগুলিকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন। নিজ.ামী গঞ্জ.বীর 'খাম্‌সা' বা কাব্য-পঞ্চকের অনুসরণে জামী রচনা করেছেন—'হফ্‌ত্ অউরন্‌গ্' বা "সিংহাসন-সপ্তক"। এইবার সেই রাজাসন সপ্তকের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

(১) সিল্ সিলত্তু-জ.-ধহব্ বা স্বর্ণশৃঙ্খল। গল্পের মধ্য দিয়ে ইস্‌লাম ধর্ম, দর্শন ও নীতি বিশ্লেষণ প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ভাগে দিব্যপ্রেমের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, সেই সঙ্গে সন্ত বা আউলিয়াদের নানাপ্রকার কথা ও কাহিনী। তৃতীয় ভাগে রাজন্যবর্গের কাহিনী। একটু উদ্ধৃতি দিই। তুমি কি বুঝতে পারো পৃথিবী কি? আর পৃথিবীর সার কি? শোন—

উস্ত্ মঘজ.-ই-জহান্, জহান্ হম পুস্ত্।

খুদ্ চে মঘজ. বো চে পুস্ত্ চূন্ হম উস্ত্॥

তিনি পৃথিবীর সার। মৃৎপিণ্ড জল ধারায় বলয়িত এই পৃথিবী আবরণের

চর্ম। তিনি যদি সার তবে তার আবরণসহ এই সার নিয়েই তিনি সব। সার বলার তাৎপর্য—তিনি দর-উ মসতূর (লুক্কায়িত), জালালের কথায় র'শূক নিহান। জীবের বিচ্ছেদ ঐকান্তিক নয়। ঈশ্বর আত্মগোপন ক'রে তাঁর সঙ্গে সর্বদাই বর্তমান। সাধক বৈষ্ণব হ'লে বলতেন—

'তোর সনে ভাই লুকোচুরি খেলা চলিতেছে মোর চিরকাল।
ধরে ফেলি তোরে, যেমনই লুকাস শ্যামলাল।'

(২) সলামান্ বো অব্সাল্—সূফীতত্ত্বের এক রূপক কাব্য। এটি আবু আলী সীনার রূপক-কাহিনী থেকে গৃহীত। গ্রীক যুবক সলামান্ আপন ধাত্রী অব্সালের কামজ মোহ থেকে কেমন ক'রে মুক্ত হ'লো তারই রূপক। কামের অগ্নিতে অবসাল ভস্মীভূত, সলামান্ কামোত্তীর্ণ হ'য়ে উজ্জলরূপে পিতার কাছে ফিরে গিয়ে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'লো। Fitz Gerald এই কাব্যের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন।

(৩) তুহ্ফতুল্ অহ্রার—এই গ্রন্থে নিজামীর মখ্জ়ুন্ উল্ অসরারের নিয়ম-সরণিতে সূফীরহস্যের উন্মোচন হ'য়েছে।

(৪) সুব্হ্তুল অব্রার বা ধর্মনিষ্ঠের জপমালা—এই গ্রন্থও সূফী-তত্ত্বের বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। অনেকটা উপদেশাত্মক কাব্য একে বলা চলে। একটু উদ্ধৃতি দিই—স্বার্থপরতা থেকে মনটি তুলে নিয়ে খোদায় সমর্পণের নামই সরলতা—

চীস্ত্ ইখলাস্ ? দিল অজ. খুদ্ করদন্।
কার্-ই-খুদ্রা বখুদা আফগানদন্।

(৫) ইয়ূসুফ্ বো জুলয়খা—আরম্ভ যার কোরানশরীফে এবং যে কাহিনী বিবর্তিত হ'য়েছে বহু কবির প্রেমসাধনার রূপকরূপে, তাকে জামী তাঁর গভীর রহস্যদৃষ্টিতে দেখে, তাকে এক অভিনব আলোকসজ্জায় রূপান্তরিত করেছেন। এই কাব্যের শুভারম্ভেই দিব্য আলোকের পুণ্যছটা দেখা দিয়েছে।

"ইলাহী ঘুনচহ্-ই-উম্মীদ্ বাগশাই।
গুলী অজ. রৌজ়হ্-ই-জাবীদ্ বনমাই॥

বখান্দান অজ. লব-ই-আন্ ঘুন্চহ্ বাঘ.ম্।
বো জ.ান্ গুল অম্বর্ পর্বর্ কুন্ দমাঘম্॥
দরীন্ মহ.নত্ সবায় বে মুরাসা।
ব ন'অমত্ হায় এ খ্বীশম্ কুন্ শিনাসা॥

আশার মুকুল ফোটাও তুমিহে রাজার রাজা।
আমার মনের কুসুমে করগো বাগান তাজা॥
হাসির অধর ঝরিয়া পড়ুক ফুলের রূপে।
সুবাসিত হোক আমার মগজ গন্ধ-ধূপে॥
মেহনতে ভরা পান্থশালায় কোথায় সুখ?
তোমার পরশে ভরিয়া উঠুক আমার বুক।

কিন্তু তুমি কে? আমিই বা কে? তোমাতে আমাতে কোথায় সম্বন্ধ? এইসব কথা ওঠা স্বাভাবিক। জামী এইসব কথার উত্তর দার্শনিকরূপে এই কাব্যে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে কাব্যখানা রূপক এবং রূপক বা Allegory সত্যে পৌঁছবার এক মনোরম সহজ সেতু—

'অল্ মজাজ. বো ক.ন্ত.রত্ উ'ল্ হক.ীক.ত্'

জামী 'ইউসুফ্ বো জুলয়খা' কাব্যে প্রেমের প্রথম প্রকাশ এবং সৃষ্টি বিবর্তনের তত্ত্ববিশ্লেষণ ক'রে চলেছেন।

সুরায় দিলবরী বাখ্বীশ্ মী সাখ্ত্।
ক.মর্-ই-'আশিক.ী বাখ্বীশ্ মীসাখ্ত্॥

আল্লাহ্ নিজের দিকে, নিজের মনে, নিজেকে নিয়েই গান গাইছিলেন। প্রেমের খেলায় নিজেই নিজের দিকে পাশা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু ওতে কি আর খেলা জমে? সব খেলাতেই যে একাধিক চাই—ক্রমে বহু চাই। আনন্দ যত বিভক্ত হয় ততই জমে ওঠে।

উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বে ঋষি বলেছেন—'তদৈক্ষত বহু স্যাম্'—শেষে তিনি বহুতে বিভক্ত হ'তে চাইলেন; খেলা জমে উঠলো। দার্শনিকরা এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। অব্যক্ত অবস্থায় তুমি-আমির ভেদ ছিল না। ভেদাভেদের জ্ঞানই ছিল না। যেখানে আলো নেই, আঁধারও

নেই, কোনপ্রকার বন্ধ নেই—তা তো অজানা এবং অনির্বচনীয়। সেখানে বায়ু বয় না, কালের স্রোতও নিস্তব্ধ।

'নাহি রাত্তি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ।
যে অতলে গীত গান কিছু নাহি বাজে॥' —রবীন্দ্রনাথ

সেই অতলে একদা প্রকাশের প্রথম তরঙ্গ উঠলো। সেখানে তুমি থেকে আমি পৃথক্ হ'য়ে এলুম। সেই তো স্রষ্টার প্রথম আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে আনন্দময়ী জ্যোতির্ময়ী সৃষ্টির ধারা বইতে আরম্ভ হ'লো—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা,
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
* * *
আমি এলেম, ভাঙ্‌ল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুট্‌ল আলোর আনন্দ কুসুম।
—রবীন্দ্রনাথ (বলাকা)

জামীর 'ইউসুফ্ বো জুলয়খা' পার্থিব মোড়কে আঁটা একখানা স্বর্গের চিঠি। জুলয়খার নিমন্ত্রিতারা নির্নিমেষ নয়নে য়ুসুফের রূপ দেখতে দেখতে বঁটিতে হাত কেটে ফেলে স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছিল—আল্লাহ্ তোমার ঐশ্বর্যের তুলনা নেই; এ মানুষ নয় দেবদূত! রূপের মধ্যে এই অরূপের মাধুর্য সকলের হৃদয়কে সমভাবে টেনে নিলো।

অল্ আলী ঈশ্বর কতো যে ছলনায় আমাদের আকর্ষণ ক'রে চলেছেন তার কি সীমা আছে? 'মাকার আল্লাহো খয়ের-উল্ মাকেরীন্' আছে কোরানশরীফে। ঈশ্বর সৃষ্টির খেলায় মেতে উঠে কত যে ছলনা করেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁর ছলনা বড় খয়ের—বড় সুন্দর। খেলায় একবার জমে উঠে বুঝবে সেটা।

(৬) লায়লা বো মজনূন্—আদিতে আরবের লোকগাথার প্রেম-কাহিনী। নিজ়ামীগঞ্জ়বী ও আমীর খুসরো, অন্তত এই দুজন কবি তাঁদের দিক থেকে এই প্রেমগাথা আবার গেয়েছিলেন। জামী স্বয়ং এতে হস্তক্ষেপ ক'রে একে নতুন আলোর শিখায় উদ্ভাসিত করে তুললেন। লায়লাকে হারিয়ে মজনূন্ পাগল হয়েও শেষে সান্ত্বনা লাভ করেছিল আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে। মানুষই আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে বীতশোক

আনন্দসত্তায় উপনীত হতে পারে। অন্য সৃষ্টি অন্নময়-প্রাণময় কোশে বিবর্তিত হতে হ'তে চলেছে। এই ঔপনিষদিক তত্ত্বের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে ইরানী জামী বলেছেন—

অয় খাক্ তু তাজ-ই-সর বুলন্দান্।
মজনূন্-ই-তু অক.ল্-ই-হূশ্ মন্দান্॥

মানুষই মাটির সৃষ্টির মধ্যে সমুন্নত শির; আর তোমার মজনূন্ জ্ঞান ও বোধে বিভূষিত, তাই আনন্দ পেয়েছিল। প্রেমকে তো অস্বীকার করা যায় না। প্রেমই এই মহাসৃষ্টির মূলবীজ। প্রেম ছাড়া পৃথিবীতে ভালও নেই, মন্দও নেই।

হস্তন্দ্ অফ্লাক্ জ.াদহ্-ই-ইশক.

*　　　　*　　　　*

বে ইশ্ক. নিশান্ জ. নীক্ বো বদ্নীস্ত্॥
চীজ.ী কে জ.্ ইশ্ক. নীস্ত্ খুদ্ নীস্ত্।

যে বস্তুতে প্রেম নেই, তার অস্তিত্বও নেই॥

(৭) খিরদ্ নামা-ই-সিকন্দরী—আলেকসান্দারের জ্ঞান। এও অভিনব একখানা গ্রন্থ যার বিষয়বস্তু ভুবনবিজয়ী ইস্কন্দরের জ্ঞান-গরিমা। গঞ্জ.বী, আমীর খুসরো এবং নূরউদ্দীন আবদুর রহমান জামী—এই তিনজন প্রথম সারির কবি এই বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থ অদ্যাপি প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ অজ্ঞাত। প্রকাশিত হ'লে নিশ্চয় নতুন ভাবের আলো দেখা যেতো।

সর্বশেষে গদ্যগ্রন্থ বহারিস্তান্ সম্বন্ধে কিছু বলে এই অধ্যায় সমাপ্ত করছি। বহারিস্তান্ মানে বসন্তের দেশ। মনে হয় কবির সম্মুখে আদর্শ রয়েছে শেখ স'দীর গুলিস্তান্। জামীর গ্রন্থে আছে আটটি রবদা বা পরিচ্ছেদ; রবদা হচ্ছে উদ্যান। প্রথমে সন্তসূফীদের জীবন কথা, দ্বিতীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞদের সম্বন্ধে। তৃতীয়ে আছে রাজাদের বিচার সম্বন্ধে। চতুর্থে উদারতা বিষয়বস্তু। পঞ্চম প্রেম-বিষয়ক। ষষ্ঠ বলছে চাতুরী ও রং তামাসার কথা। সপ্তমে আছে কবিবৃত্ত। আর শেষ পরিচ্ছেদ অষ্টমে মূক ও ভাষাবঞ্চিত প্রাণী জগতের কথা। গুলিস্তাঁর মতই

বহাবিস্তান্ গন্ত-পন্তময়ী রচনা। এই জাতীয় রচনাকে সংস্কৃতে বলে চম্পূ। এতে বোঝা যায়—জামী যেমন প্রজ্ঞা চক্ষু দিয়ে দার্শনিক বিষয়গুলি দেখেছেন, তেমনই তিনি তাঁর চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে জাগতিক স্থূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণও কম করেননি।

তৈমুর যুগের শেষ পর্যায় ও স্বফবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

এসিয়ার সন্ত্রাস তৈমুরলঙের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়তে আরম্ভ করলো। এই সময়ের সমুত্থান বা বিদ্রোহ উল্লেখনীয় দুটি। প্রথম উজ.বেকী সমুত্থান; দ্বিতীয় হচ্ছে পর পর দুটি তাতার বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ আলাদা দুটি উপবংশ। একটিকে ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়েছে 'ক.ার কে.ায়ুন্‌লূ' বা কৃষ্ণমেষ গোষ্ঠী, অপরটি 'আক. কে.ায়ুন্‌লূ' বা শ্বেত মেষগোষ্ঠী। এর পর প্রায় অজ্ঞাত অন্ধকার থেকে অকস্মাৎ দেখা দেয় সমগ্র ইরানে অভিনন্দিত সফবী বংশের সুনিশ্চিত বিজয়। এই অতর্কিত বিজয় অভিনন্দিত হয়েছিল বিশেষ এই কারণে যে, এটি ছিল ইরানে ইরানীর জয়। সকলে সগৌরবে মেনে নিয়েছিল এই পুনরুত্থানকে। প্রাচীনের বিধ্বস্ত শেষ শয্যায় গ্রীক অধিকার এবং পার্থিয় অধিকারের পর যেমন ইরানে প্রাচীন রক্তের পুনর্জাগরণ অনুভূত হ'য়েছিল সাসান অধিকারে, ঠিক সেই প্রাচীনের ঐতিহাসিক পুনরাবর্তন ঘটেছিল স.ফবী সমুত্থানে; এর সূচনা হ'য়েছিল সেই কালে যে কালে ১৫০১ সালে স.ফবী শাহ্ ইস্‌মা'ইল শ্বেতমেষবংশের শক্তিকে শুরুরের যুদ্ধে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়ে তব্রিজ.কে অস্থায়ী রাজধানী ক'রে স.ফবীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছিলেন।

এ ঘটনা প্রায়শই সত্য হয় যে, দুর্ধর্ষ অথবা মহান্ ঐতিহাসিক পুরুষদের পুত্রের গৌরবে রাহু মুখ ব্যাদান ক'রে থাকে। কখনও কোন প্রসিদ্ধ বংশ একটু কিছু সময়ের জন্য রাহুমুক্ত হয়, কখনো একেবারেই নিষ্প্রভ বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিশ্ববিজয়ী চিঙ্গীজ. খানকে দেখুন—তৎপুত্র ওগদই খাঁ দয়ালু হৃদয় হ'য়েও অপদার্থ। পৌত্র খুবিলাই খাঁ

কিন্তু ইতিহাসে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিলেন। মহান্ সম্রাট্ অশোকের বংশধরগণ ঐতিহাসিক দিকে তিমিরাচ্ছন্ন। লড়াইবাজ ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারে আলমগীরী বহ্নির উত্তাপ নির্বাপিত হ'য়ে গেল। মোগল মহিমা মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে সীমা চিহ্নিত করে দিল। নিরপেক্ষ বিচারে তৈমুরের বংশধরদের কিন্তু অতদূর তুচ্ছ করা যায় না। ম'রে মরেও তৈমুর-সন্তানরা মুমূর্ষুর মুখশ্বাসে নানা বিদ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন। এটা কম গৌরবের কথা নয়। এমন কি সেকালের বিশ্বত্রাস তৈমুরের উপরও নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণ গালি বর্ষণ করতে ঐতিহাসিকরা দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়েছেন। তৈমুর দেশের পর দেশকে শ্মশান ক'রে যান নি। ধ্বংসের পর পুনরায় যে সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। সমরকন্দ বোখারা তো বটেই, ইস্‌ফাহানেও নরমুণ্ডের মিনার চিরস্থায়ী হয় নি। নতুন ইস্‌ফাহান গড়ে উঠেছিল। নরহন্তার বরাভয় মুদ্রার আশ্বাস না পেলে তৈমুরযুগের জ্ঞানবিজ্ঞান এবং সাহিত্য চর্চা সম্ভব হ'লো কি ক'রে? ঐতিহাসিক সত্য কথা—তৈমুর মধ্য প্রাচ্যকে নতুন ক'রে গড়ে তুলেছিলেন। এ কথা ঠিক, তৈমুরের বংশধরগণ অলস জীবনের অভিশাপগুলি থেকে মুক্ত ছিল না। কিন্তু দুচারজন অলস ও বিলাসী বংশধর তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহে নিরুদ্যম শাসনকালকে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ক'রে তুলেছিলেন। তৈমুরোত্তর তৈমুর-যুগে মধ্য এশিয়া চিত্র শিল্পে এবং বয়ন শিল্পে সে যুগের পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। সাহিত্য রচনাও গদ্যে এবং পদ্যে নিরঙ্কুশ অগ্রগতিতে চলেছিল, থেমে থাকে নি। Dr. F. R. Martin যিনি পারস্যের চিত্রকলা ও বয়ন শিল্পের বিশেষজ্ঞ, তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তৈমুরোত্তর যুগকে সাহিত্য ও শিল্পকলায় বিশেষত ক্ষুদ্রায়ন শিল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ যুগ বলে অভিনন্দিত ক'রেছেন। তৈমুরের বংশধররা বর্বর ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন মার্জিতরুচি, পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কদরদান। ব্রাউন বলেন—এমনও মনে হয় তাঁরা শিল্পকলার জন্যই শিল্পকলা ভালবেসে সে যুগে কলা কৈবল্যবাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাঁদের চারুকলার প্রদর্শনীতে জাহিরী ভাবটা প্রকট হয় নি। বায়-সুঙ্কুর, শাহ্‌রুখ, উলুঘবেগ, সুলতান হুসন্ মীরজা প্রত্যেকেই সাহিত্য ও শিল্প

কলার অনুশীলন ক'রেছেন এবং কেউ কেউ স্বয়ং কবি ছিলেন। হুসন্ মীরজার তুর্কী ভাষার রচনা সে যুগে সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হ'তো। তাঁর আরবীতেও গ্রন্থাদি ছিল। শোনা যায় তাঁর পারসী রচনা কখনো কখনো বিশ্ববিখ্যাত জামীর রচনার প্রতিস্পর্ধী হ'য়ে উঠতো। বায়সুন্ক্ র ছিলেন পুস্তক-প্রেমিক এবং একজন অসাধারণ সংগ্রহ কর্তা। পুস্তকবাঁধান শিল্প ও কার্পেট শিল্প এই যুগে বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে উঠেছিল। তবে একথা মনে রাখতে হবে যুগধর্ম-বশেই সর্বকলানিধান ছিল রাজসভা। রাজানুগ্রহ এবং রাজ-পৃষ্ঠপোষিত হ'য়েই শিল্পকলা বিস্তৃত হ'য়েছে—জনগণের মধ্য থেকে নয়। জনসঙ্ঘ অথবা এমন কোন সাধারণ সমিতি ছিল না যারা কোন প্রকার মহৎ শিল্পের, বৃহৎ প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগের সামর্থ্য রাখতো। শীর্ষতম স্থানে উঠলেই পতন অনিবার্য এবং উত্থান যতশীঘ্র পতনও ততশীঘ্র এ জাতীয় দার্শনিক সত্যপ্রতিষ্ঠা তৈমুরোত্তর যুগে ঘটে নি। ইতিহাসেও একটি কথা আছে—বর্বররা বিজেতা হয়, শিল্প কলার অত্যন্ত অনুশীলন জাতিকে দুর্বল ক'রে অন্য বিজয়ী বর্বরের শিকার করে তোলে—এ সত্যও সে যুগে সফল হয় নি। তৈমুরের বংশধররা কৃষ্ণ ও শ্বেত মেষ গোষ্ঠীর তুরানীদের সঙ্গে পরাক্রমের সঙ্গে লড়াই ক'রেছেন। স্বয়ং তৈমুরের মধ্যেও দ্বৈতসত্তা ছিল। তিনি ধ্বংসযজ্ঞের শেষে নতুন সৃষ্টিতে শিল্পীর স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। সেই রক্তধারার সন্তানরা ধ্বংস বাদ দিয়ে পুনর্গঠন এবং পুনর্বিন্যাসের শৃঙ্খলাকে যত্নের সঙ্গে অনুসরণ করে গিয়েছেন।

তৈমুরের চতুর্থ পুত্র শাহ্ রুখের তেতাল্লিশ বছরের সুশাসন উল্লেখনীয় ঘটনা। সাহিত্য, সঙ্গীত, চারু এবং কারুশিল্পে এ যুগ সুসমৃদ্ধ। মণ্ডন-শিল্পে এ যুগ ছিল সমগ্র এসিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ঠিক এই সময় কৃষ্ণমেষ এবং শ্বেতমেষ নামক তাতার গোষ্ঠীদ্বয়ের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম উপস্থিত হয়। শাহ্ রুখ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে বুঝেছিলেন রাজ্য-সীমা বাড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। সঙ্কুচিত রাজ্যটিকে সংরক্ষিত করতে পারলেই যথেষ্ট। এই বাস্তব সত্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দের বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন। চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক তাঁর দূরদর্শিতা প্রমাণ করে। সাহিত্যের

ইতিহাসপ্রণেতা দৌলতশাহ্‌কে অনেকেই তাঁর অতিরঞ্জনের জন্য উপেক্ষা করেন। মাঝে মাঝে তাঁর লেখা অসত্যভাষণে আকাশস্পর্শী হ'য়ে ওঠে। তবু দৌলতশাহের মুন্সীয়ানার প্রশংসা অনেকেই করেছেন। দৌলতশাহ্‌ বলছেন—'আমার ইতিবৃত্তের পাঠকরা জেনে রাখুন, প্রথম মানব আদমের দিন থেকে আমার এই দিন পর্যন্ত শাহ্‌রুখের মত ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী, সাহিত্যের এবং ললিতকলার উৎসাহ দাতা সুশাসক আর দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি জন্মগ্রহণ করে নাই।' অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে, শাহ্‌রুখ যে সে যুগে এক উজ্জ্বল ঐতিহাসিক চরিত্র—এ কথা আমরা স্বীকার করি।

ঐশ্বর্যের বিলীয়মান যুগেও পররাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইরানের সৌজন্যমূলক সম্বন্ধ সংস্থাপিত ছিল। হুরমুজ সে যুগে এক বিশাল বন্দর। সেই শুল্ক-মুক্ত বাণিজ্য-কেন্দ্রের ব্যবসাবাণিজ্য দেখবার মত ছিল। আরবের ক্রেতা আকর্ষণ-শক্তি, ভারতের চাতুর্য, প্রভৃতির উল্লেখ কৌতূহল উদ্দীপক। ঘ্যাসউদ্দীন নক্‌কাশ নামে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চলেছেন চীনে; হেরাত থেকে তাঁর যাত্রা হুরমুজ হ'য়ে। আব্‌দুর রজ্জাক ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ১৪৪৪ সালের এপ্রিল মাসে রওনা হচ্ছেন—ঐ হুরমুজ বন্দর হ'য়ে। তিনি এই বাণিজ্য কেন্দ্রের মনোরম বর্ণনা লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। মিসর, সীরিয়া, রূম, আজার বাইজান, আরব, পারস্য নানা দেশের নানাভাষার কোলাহলে পূর্ণ হ'য়ে থাকতো এই বন্দর। ভারতবর্ষ থেকে আসত গুজরাটী, বিজয়নগরী, গুলবার্গী এবং কম্বোজীরা। ওথমানী সুলতানদের সঙ্গেও মৈত্রীর সম্বন্ধ ছিল তৈমুর বংশধরদের। তৈমুর বংশের শ্রেষ্ঠ গৌরবপূর্ণ নাম জহীরুদ্দীন মহম্মদ বাবর। কবি বাবরের পরিচয় 'মুঘল ভারতে পার্সী সাহিত্য' অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হবে।

ষোড়শ শতকের সূত্রপাতে ইরানে স্বফবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবের এক প্লাবন এল। এ ভাব সাহিত্য জগতের কোন অভিনব ভাব নয়, এ ভাবের নাম স্বজাতি চেতনা। সুলতান মহ্‌মুদ ছিলেন আফঘানী। সেলজুক্‌রা দুর্ধর্ষ তুর্কী। তারপরও ইরানের শাসককুল তুর্কোমোঙ্গল। তারই অনুবৃত্তি চলে এসেছিল তৈমুর ও

তৈমুরোত্তর যুগ পর্যন্ত। এইবার এলেন ইরানী রক্তের ইসমা'ইল। ইনি ছিলেন স্বফী-উদ্দীন অরদবীলীর বংশে উদ্ভূত। স্বফী-উদ্দীন ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের বিখ্যাত সূফীসাধক। গৌরবের জন্য ইসমাইল স্বফবী বংশীয় ব'লে আত্মপরিচয় দিতেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে নয়টি উপ-জাতীয় সৈন্যসামন্ত সহায় হ'য়ে তিনি বিজয় অভিযানে আত্মনিয়োগ করেন। ইরানী সাধক শেখের বংশধর তাঁর অধিকার দাবী করছেন জানামাত্র তাঁর ছত্রতলে এসে দাঁড়ালেন অগণিত শিষ্যবংশ। তিনি দেখলেন সাতহাজার তরবারি তাঁর সমর্থনে প্রস্তুত। কুর নদী অতিক্রম ক'রেই তিনি তাঁর পিতৃহন্তা শীরবানরাজ ফররুখ য়সার এর সম্মুখীন হ'য়ে তাঁকে হত্যা করলেন। সেখানকার রাজভাণ্ডার অধিকৃত হলো। অগ্রসর হয়ে তিনি আজারবাইজনের রাজধানী বাকুতে উপনীত—হঠাৎ শুনলেন শ্বেতমেষ তুর্কমানী যুসুফবেগ তাঁকে আক্রমণে উদ্যত। তিনি শুরূরের যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিসহ তুর্কমানী সৈন্যব্যূহ চূর্ণ করে দিলেন। ইসমাইল সদর্পে অধিকার করলেন তব্রীজ.। তারপর ১৫০৫ পর্যন্ত অক্লান্ত যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ। শেষে ইসফাহানকে তিনি রাজধানী নির্বাচন করলেন। ওথ.মানী সুলতান দ্বিতীয় বায়জ.ীদ তাঁকে দূত পাঠিয়ে সম্বর্ধিত করলেন।

অদৃষ্ট দেবতা ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ইস্মা'ইলকে জ.হীরুদ্দীন বাবরের সঙ্গে কিভাবে সৌহার্দ সূত্রে আবদ্ধ করলেন, এইবার সেই কথা বলি। বাবরের প্রিয় ভগিনী খানজ.াদ বেগম দশ বৎসর পূর্বে উজ.বেকীদের হাতে পড়েছিল। স্বফবী ইসমা'ইল উজবেকীদের সমূলে বিনাশ করে বাবরের এই প্রিয় ভগিনীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাগ্যান্বেষী বাবর ভারত অধিকার না করলেও আফঘানীস্তান অধিকার ক'রে ফেলেছেন এবং পাত্‌শাহ্‌ উপাধি সগৌরবে ধারণ করেছেন। যিনি ১৫২৬ সালে ভারতের প্রথম মোঘল বাদ্‌শাহ হবেন সেই ভাবী বাদশাহের সঙ্গে ইরানের মৈত্রীবন্ধন এইভাবে ঘটেছিল। এই মৈত্রী সুদীর্ঘকাল নরমগরমে চলে ক্রমশঃ শিথিল হ'তে আরম্ভ করেছিল এবং ঔরঙ্গজেবের শেষ উত্তরাকারীদের সময় বিদ্বেষে পরিণত হয়েছিল। ১৭৩৯ সালে মহ.ম্মদ শাহের দিল্লী নাদিরশাহ্‌ কর্তৃক শোচনীয়ভাবে লুণ্ঠিত

হ'য়েছিল। কিন্তু যা' বলছিলাম—ইরান-ভারতের মৈত্রী বন্ধনের ফলেই ইস্‌মা'ইলের পুত্র তহ্‌মাস্প্‌ ভারত থেকে পলাতক বাবর পুত্র হুমায়ুনকে ইরানে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বক্ষু নদীর পূর্বপ্রান্ত ভারতসহ সুন্নী-মতাবলম্বী। এদিকে বক্ষুর পশ্চিমপ্রান্ত থেকে সমগ্র ইরান শীয়াসম্প্রদায়-ভুক্ত। মনের একটু কালি জমে রইলো। কিন্তু সেটা নীচুর তলার জনসাধারণে, রাজপরিবারে কদাচ নয়। কিছুদিন পরে তো ভারত রাজ্য শীয়া ইরানীতে প্রায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। জহাঙ্গীরের হৃদয়েশ্বরী হবেন ইরানকন্যা নূরজহান। ওমরাও আর সভাসদে, রাজকর্মচারী ও সেনাপতিতে ইরানের জয়জয়কার। ইরান ছেড়ে ভারতে পদার্পণ করলেই কবিদের ভাগ্য খুলে যায়। রাজানুগ্রহ অভাবিতভাবে বর্ষিত হয়। সুতরাং ইরানের কোকিলেরা ভারতে পক্ষবিস্তার করলেন। ভারতে ইরানী সাহিত্যের মান ও মর্যাদা ক্রমশঃ বর্ধিত হয়ে চললো। পার্সী হ'লো ভারতে রাজভাষা। রাজভাষার সমাদর চিরকাল হ'য়ে আসছে। E. G. Browne বলেছেন—

"Nor were the relations between Persia and India confined to their rulers, for during the whole Safawr period and even beyond it, we shall meet with a whole series of Persian poets, including some of the most eminent of later days, who emigrated from their own country to India to seek their fortune at the splendid court of the so called Mogul Emperors, where until the final extinction of the dynasty in the Indian Mutiny Persian continued to hold the position not only of the language of diplomacy, but of polite intercourse."

স্বফরী বংশের মৈত্রীবন্ধনে ইরানী সাহিত্যস্রোত ভারতের দিকে এমনই দুর্বার গতিতে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছিল। কিন্তু সে কি শুধু মৈত্রীবন্ধন ?

কেন এই দুর্বার স্রোত ভারতমুখী হ'লো সে কথটাও প্রণিধানযোগ্য। অত্যন্ত আত্মসচেতন এবং নিজ সভ্যতায় বিমুগ্ধ ইরানীরা মন থেকে ভারতকে ভালবাসে নি। বরঞ্চ তাদের মনের কোণে থাকতো অনুকম্পা

মিশ্রিত অবজ্ঞা। সমরকন্দ বোখারা থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্য এসিয়ায় যিনি এতটুকু স্থান নিজ অধিকারে অর্জন করতে পারলেন না, শেষে আফঘানিস্তানে একটু অধিকার লাভ ক'রে পৈতৃক সম্পত্তিরূপে (যেহেতু একদা তৈমুর ভারতের অংশ জয় করেছিলেন) ভারতে প্রবেশ করলেন এবং পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বিজয়ী হ'য়ে ভারত সম্ভোগে প্রবৃত্ত হ'লেন, তিনি সেই বাবরও—ভারতবর্ষকে ভালবাসেন নি। বুলবুল নেই, গুল নেই—গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে প্রাণ আই ঢাই,—এমন দেশে কেউ স্থায়ীভাবে বাস করে? তবু দর্শনীয় এবং উপভোগ্য হচ্ছে ভারতের বর্ষা ঋতু—মৌসিম। এমন যে মহাপ্রাজ্ঞ, দেশ বিদেশ পর্যটনে সর্বদা উন্মুখ, সেই কবি শেখ স'দীও ভারতের নিন্দা করেছেন। ভারতে গুণের আদর নেই। ভারতের সুলতানী দরবারে চাকরি মিলে গুণে নয়—পোশাকে পরিচ্ছদে এবং পণ্ডিতম্মন্যতায়—আসল জ্ঞানে নয়—

'দর নৌকরী-এ-হিন্দ্ লবাসত্ বা-য়িদ্।
দস্তার-এ-জ.র রো জামা-এ-তাসত্ বায়িদ্॥
চূঁ গাব-এ-শিকম্ রীশ্-ই-দরাজ.ত্ বায়িদ্।
ন অক.ল্ রো খিরদ্ (ই) ফহম্ রো ফিরাসত্ বায়িদ্॥

[ভারতে চাকরির জন্য তোফা পোশাক চাই। সোনালী জরীর টুপী এবং রেশমী পরিচ্ছদ। ষাঁড়ের মত ভুঁড়ি এবং লম্বা দাড়ী চাই। আক্কেল, জ্ঞানবুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতার কোন প্রয়োজন নেই।]

এই সবদিকে চিন্তা করে কেবলি মনে হয় সফবী রাজত্বে এমন কিছু অভাব ছিল যার জন্য প্রতিভার স্রোত ভারতমুখী হ'তে বাধ্য হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বিজয়ী ইসমা'ইল প্রসঙ্গে পীর স্বফীউদ্দীনের পরিচয় দিয়েছি। স্বফী থেকে বিশেষণ 'স্বফবী'। 'স্বফী'—'সূফী'। সূফীধর্ম পীর মুরশিদদ্বারা দীক্ষা-নির্ভর বিশেষ ধর্ম। সূফীধর্মে অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে—'মুরশিদি রাহ্' বা গুরুপ্রদর্শিত পথ। স্বফীউদ্দীন ত্রয়োদশ শতকের ধর্মগুরু, ১৩৩৪ সালে জিলানে দেহরক্ষা ক'রেছিলেন এবং ইরানের এই পশ্চিমোত্তর প্রান্ত থেকেই স্বফবীকুলের জিহাদী সাত হাজার শিষ্যবর্গ তরবারি হস্তে গর্জে উঠেছিল। এটা জাতিচেতনার সঙ্গে একপ্রকার গুরুপদে আত্মনিবেদনের মত হ'য়েছিল।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বচন আছে—রক্ষা-চক্রের (ঢালের) অপর দিকটিও ভাল ক'রে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ইরানীদের প্রথম বিজয়োল্লাসে সেটি দেখার অবকাশ ঘটলো না। ইরানে বিদেশী শাসন বিধ্বস্ত, ইরানে আবার ইরানীর জয়—এটার নাম—ভাবাতিরেক। শাসন সংরক্ষণ রাজধর্ম, পীরের ধর্ম নয়। ধর্মগুরু-বংশের অপরিণত, অদূরদর্শী তরুণের কাছে কতটুকু আশা করা যায়? পূর্বপুরুষের পুণ্যনাম সাময়িক উত্তেজনা আনতে পারে—স্থায়ী কিছু গড়ে দিতে পারে না; কারণ জনসাধারণ পুণ্যাত্মা হয় না, তারা রক্তমাংসের প্রাণী মাত্র। তারা শক্তির পূজা করে—তারা নৈষ্ঠিক ধর্মাচারী কদাচ নয়। কাজেই এই বংশ শিল্পসাহিত্যের উৎসাহদাতা হ'য়ে—সর্বপ্রকার কারু ও চারুশিল্প বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা হারালেন। রাজবংশ কঠোর শীয়া মতবাদী। তাঁরা ওসমানী সুন্নীদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা বিশ্বাস করলেন, কারবালা প্রান্তরের করুণ কাহিনী ছাড়া কবিদের আর অবলম্বনীয় কিছু থাকতে পারে না। সাহিত্য ও চারুকলায় পরিমার্জিত ইরানী প্রতিভাও পশ্চিমের কারবালা প্রান্তরকে পৃষ্ঠদেশে রেখে পূর্বমুখী হ'লেন এবং দলে দলে ভারতে প্রবেশ করতে থাকলেন। ইতিপূর্বেই ইরান ভারতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গিয়েছিল, আমরা বিস্তৃতভাবে এ কথা বলে এসেছি। কাজেই তাঁদের রাজধানী ইস্ফাহান সেকালের ব্যাখ্যায় নিস্ফ্-ই-জহান্ বা দুনিয়ার অর্ধাংশ এই গৌরবান্বিত নাম পেয়েও ধীরে ধীরে রত্নগুলি হারাতে থাকল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই রাজবংশ দুশ বছর ইরান শাসন করেছে। এই দুশ বছরে ইরান প্রতিভার ভাস্বরতা হারিয়েছে। আর ভারত উজ্জ্বল এবং ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। এই যুগে জামী, হাতিফী, হিলালী এবং কিছু কিছু খোরাসানী কবি ছাড়া আর প্রতিভাবান্ কবি বা দার্শনিক কেউ ছিলেন না। উরফী শীরাজী (১৫৯০) স্বা'ইব ইস্ফাহানী—এঁরা সব ভারতে প্রস্থান করলেন।

পারস্য সাহিত্যে ইতিহাস-অংশ

কবিতা, কাব্যগ্রন্থ এবং কবিজীবনী নিয়ে পারস্য সাহিত্যের পরিক্রমা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। কাব্যের রূপলাবণ্যে মুগ্ধদৃষ্টি অভিযাত্রী দুপাশে অপেক্ষমান নিরাভরণ তথ্যস্তূপের নীরব শোভাযাত্রা উপেক্ষা ক'রে চলে এসেছে। শোভাযাত্রা বলছি পারস্য সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনার পর্যাপ্ততার অনুরোধে। পারস্য সাহিত্যে ইতিবৃত্তের অপ্রতুলতা নেই। এদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বিপরীত পারস্য সাহিত্য। প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নেই। এখানে ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু আধুনিকালের মানদণ্ডে যা খাঁটি ইতিহাস, তেমন ইতিহাস সে সব ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করে নি। কিংবদন্তীর নিবিড় অরণ্য এবং কল্পনার ধূসর দিগন্ত থেকে ইতিহাস উদ্ধার অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। বেদের ব্রাহ্মণ অংশের 'ইতি হ আস' বলে কাহিনীগুলি মূলপ্রতিপাদ্যের অনুকূল গল্পের আসর ভিন্ন কিছু নয়। এমন অসহনীয় অন্ধকারে অনেক পরবর্তী যুগে শিলালিপি ও তাম্রপট্টের প্রমাণ এবং নানা রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রাগুলি আমাদের সম্ভাব্য ইতিহাসের সীমারেখায় মাঝে মাঝে সফল তর্জনী সঙ্কেত করে। শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শন, তথা ভাষাতত্ত্বের বিচার আমাদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণক্ষেত্র আরও প্রশস্ত করে দেয়। অন্যদিকে বৈদেশিক দূত এবং পর্যটকদের বিবৃতি ও মন্তব্য আমাদের বিচারকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। এসব সত্ত্বেও বলব, প্রাচীন ভারত সর্বদাই ইতিহাস-বিমুখ। প্রসিদ্ধ লোকনায়ক এবং সমুদ্রমেখলা-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারীরাও আপন আপন ক্রিয়াকলাপের ইতিবৃত্ত রচনায় কোন উৎসাহ দেন নি। যদি বা কোন মহনীয় পুরুষ ইতিহাসের সম্ভাব্যতায় পদার্পণ করতে গিয়েছেন তখনই দেখা গিয়েছে কবি-ঐতিহাসিকের অতিকথনের লোল প্রবণতা এবং অকথনের কার্পণ্য। তাছাড়া অলঙ্কারের শিঞ্জা এবং রসের উচ্ছলতা সেই ঐতিহাসিক নায়ককে

কল্পনার কুহেলিকায় অস্পষ্ট ক'রে তুলে শুধু মানস সম্ভোগের উপকরণে পরিণত করেছে। ইতিহাসের তথ্যদৃঢ়তা রচনার চারুশিল্পে আত্মাহুতি দিয়ে বসেছে। হর্ষচরিতের মত ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতায় সমুজ্জ্বল গ্রন্থখানা সম্মুখে খুলেই একথা বলছি। হায় কবি বাণভট্ট! তোমার কাব্যবধূ যত সহজে রস শয্যায় 'স্বয়মভ্যুপাগতা' তত সহজে ঐতিহাসিক দৃঢ়তায় সুগঠিতা নয়। জানি, দেশে দেশে ইতিহাস রচনার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঘটে। ভারতেরও অবশ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু যে অর্থে কলহণের রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের ইতিহাস সে অর্থে হর্ষচরিত মধ্য ও পূর্ব ভারতের ইতিহাস নয়। কেন এমন ঘটেছিল? সভ্যতায় সমুজ্জ্বল পৃথিবীর পুরাতন দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বহুবিষয়ে পার্থক্য ছিল। অতীত যুগে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতে একক গৌরবের চেতনায় অনেকেই হানাহানি করেছে কিন্তু সর্ব ভারতের ঐক্য তাঁরা কেউ গড়ে তুলতে পারে নি। বোধ হয়, অশোক এক ব্যতিক্রম; মনে হয়, সে যুগে ইতিহাস চেতনাও উল্লসিত হ'য়ে ওঠার অবকাশ পায় নি। তারপর মহা মহা পণ্ডিতের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যেই এক মহদ্দোষ লুক্কায়িত হয়েছিল। য়ুয়ান চোয়াঙের মত বা আলবেরুনীর মত নিপুণ পর্যবেক্ষক ও জ্ঞান-গরিষ্ঠ কৌতূহলী পণ্ডিত ভারতবর্ষে ছিলেন না, তা নয়; কিন্তু তাঁদের সহজাত ধ্যান ধারণা যতটা ইহকাল-বিমুখ ছিল ততটাই ছিল পরকাল-তন্ময়। তাঁরা মনে করতেন পার্থিব সৃষ্টি-নামক অত্যন্ত বিনশ্বর বস্তু এবং তার বক্ষে সাগর লহরী সমান ঘটনাপুঞ্জ কোন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরই গবেষণার বস্তু হওয়া উচিত নয়। প্রপঞ্চের আদি উৎস এবং শেষ পরিণামই জ্ঞাতব্য এবং বিজিজ্ঞাসিতব্য। অনন্ত কালপ্রবাহের চিরন্তন সত্যের মুখে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নামক অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর ভাসমান তৃণখণ্ডগুলির কতটুকুই বা মূল্য? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমনটা কিন্তু অত সহজে ঘটে নি। সত্য বটে মেসো-পোতামিয়ার আদি ইতিহাস ধর্মমূলক এবং জিগ্‌গারাত পরিধিসীমিত। পুরাণ কথা অবশ্যই প্রাচীন ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হ'য়েছিল সর্ব বিশ্বে—সুমের, ব্যাবিলন, মিসর, চীন-ভারত—কেউ ব্যতিক্রম নয়। আমাদের পুরাণ কথা ইতিহাস ছুঁতে এসেও তাঁর পঞ্চলক্ষণ—সৃষ্টি, ধ্বংস, মন্বন্তর, রাজবংশ এবং ঋষিবংশ নিয়েই উন্মত্ত হয়েছে। গ্রীস ইতিহাসের নাম দিয়েছিল

হিস্টোরিআ যার অর্থ প্রশ্ন মুখে জ্ঞানানুসরণ। রোম গ্রীসকে সব বিষয়ে অনুসরণ করেছে। গ্রীস দাম্ভিক, রোমও তাই—তারা অপর মানব গোষ্ঠীকে 'বর্বর' বলে অবজ্ঞা করেছে। কিন্তু জ্ঞানানুশীলন যে ইতিহাসের মর্ম একথা গ্রীকোরোমান জগৎ স্বীকার করে নিয়েছিল। আধুনিক জগৎও স্বীকার করে নেয়। ইতিহাস বিজ্ঞান, কারণ ইতিহাস কার্য কারণের অনুসন্ধিৎসায় সর্বদা তৎপর। ইতিহাস—মানবিক, কারণ যুগে যুগে মানুষের ভাবনা-কল্পনা ও ধ্যান-ধারণারই তো অনুসরণ করে ইতিহাস। ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ আত্ম প্রকাশ করে। ইতিহাস মানুষেরই আত্মদর্শন। মধ্যযুগ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইতিহাস চর্চা আশা করাই ভুল। ইরানের রাজপূজা তথ্যাবলী সত্ত্বেও ইতিহাসকে কলুষিত করেছে। শাহ্‌নামাই তার দৃষ্টান্তস্থল হ'তে পারে। ইরানের ইতিহাস রাজদরবারের ইতিহাস। সে ইতিহাস স্তাবকতায় আধুনিক পাঠকের রুচিকে বিমুখ ক'রে তোলে। সেদিকে আরবের ইতিহাস জনগণের ইতিহাস। ঐতিহাসিক তাঁর মানসিকতার চিন্তাধারায় পূর্ব ও সমসাময়িক যুগের চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন। শুধু একেশ্বরবাদের সদ্য উল্লাসে এবং সর্বশক্তিমানের প্রত্যয়-দৃঢ়তায় ঘটনাপুঞ্জের সংঘটনায় ঈশ্বরেচ্ছা বা ঐশীশক্তিরই অনতিক্রম্য প্রভাব স্বীকৃত হ'য়ে চলেছে। কার্য কারণের পরম্পরা বিশ্লেষের চেয়ে 'আল্লার কুদ্‌রত্‌'ই সর্ব কারণ-কারণং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতবর্ষ বৈরাগ্যের ঔদাসীন্যে বিপরীত মুখ হ'য়েও মধ্যযুগে একবার ইতিহাস চারণায় আত্মনিয়োগ করেছিল। সেই স্পন্দন জেগেছিল কাশ্মীর থেকে কামরূপ পর্যন্ত। রাজতরঙ্গিনী দ্বাদশ শতকের রচনা। কল্‌হণ ব'লে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কল্যাণ তাঁর রাজতরঙ্গিণীতে ঐতিহাসিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য কল্‌হণ যে ঐতিহাসিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন ভারতে পরবর্তীযুগে সে আদর্শের অনুসরণ হয়নি। নীতিকথার উপদেশমালা এবং প্রাচীন যুগের কিংবদন্তীর মিশ্রণ থাকলেও রাজতরঙ্গিণী খাঁটি ইতিহাসের আদর্শ-সীমা স্পর্শ করেছে। একস্থানে কল্‌হণ আদর্শ ইতিহাসের কথায় কবিকে ঐতিহাসিক সত্যে আত্মাহুতি দিতে বলেছেন। ইতিহাসের আদর্শ এই বস্তু-নিষ্ঠার প্রতি

নির্দেশ সে যুগে বিরল। কল্হণ মাঝে মাঝে কবি কল্পনায় অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় না দিয়েছেন তাও নয়। স্ত্রীজাতি অশেষ দোষের আকর—তাদের পেটে কথা থাকে না। মন্ত্রগুপ্তি যাদের কাম্য তাদের স্ত্রীজাতি ধরেই 'বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ'। ওদের বুকে কথা চেপে রাখার জন্য বিধাতা বক্ষে অমন স্থূল মাংসপিণ্ড দিয়ে চাপা দিয়েছেন। বিধাতার সকল কৌশল ব্যর্থ করেছে নারীজাতি—'অবকাশঃ সুবৃত্তানাং হৃদয়েঽস্তুর্ন যোষিতাম্। ইতীব বিদধে ধাতা সুবৃত্তৌ তদ্বহিঃ কুচৌ॥' কোন Thucydides বা Polybius এমনভাবে ইতিবৃত্তরচনায় কবিতার রঙীন পাখা উড়িয়ে দিতেন না। আরব জগতে একদা ইব্ন্খালদূন যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আরবও সর্বাংশে তার অনুসরণ করতে পারে নি। এই ঐতিহাসিক (১৩৩২-১৪০৬) দার্শনিক বৈরাগ্য নিয়ে তথ্যানুসন্ধান ক'রে গিয়েছেন। কল্পনার রঙীন পাখা নয়, খালদূন সর্বদাই তথ্য ও তার তত্ত্বানুসন্ধানী। আরব, স্পেন ও আফ্রিকাবিস্তৃত তাঁর জ্ঞান সন্ধানী ইতিহাস কিতাব-অল্-ইবর ইতিহাসের আদর্শ মহিমায় মধ্যযুগের বিস্ময়। গ্রীক থুকিদিদেস ও রোমান তাসিতুসের সমকক্ষ এই ঐতিহাসিক। তাঁর পরিশীলিত বিচারবুদ্ধি ও তথ্যস্তূপের তত্ত্বানুসন্ধিৎসা সত্যই অদ্ভুত।

তুর্কোপার্সীরাও ইতিহাসকে উপেক্ষা করে নি —স্বদেশেও নয়, বিদেশ ভারতে উপনিবিষ্ট হয়েও নয়। সুলতানী যুগে ইতিহাস চর্চা হয়েছে—মুঘলযুগেও অপ্রতিহতবেগে তার অগ্রগতি ঘটেছে।

ইসলামদীক্ষিত তুর্কীরাই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতে ইতিহাস রচনা পদ্ধতির উৎসাহদাতা। ইতিহাসে রাজস্তুতির চিরায়ত পথ রুদ্ধ হ'য়ে এই যুগেই অভিনব পথ খুলে গিয়েছিল। সে পথের সন্ধান এবং পরিচয় না দিলে আমাদের পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থাকবে। পারসী তুর্কীর সঙ্গে আফঘানদেরও গ্রহণ করতে হবে। সর্বকালে, সর্বদেশে আদিম মানুষদের থাকত Saga বা কৌম ইতিবৃত্ত, যা জনশ্রুতিমূলক বীরত্বের আখ্যান। ইসলামের জন্ম উষাতেই—এই জাতীয় কাল্পনিক রচনা স্তব্ধ হ'য়ে গেল। আল্লাহ্ তা'লা একজাতীয় মানুষে এই পৃথিবী পূর্ণ করেন নি—যাদের উপর ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হয়েছে তাদের রক্ষা সর্বতোভাবে কর্তব্য একথা কোরান নির্দিষ্ট (১১-১২০ সুরা)। এর থেকেই সংগ্রাম, এর থেকেই উদ্ধারের ইতিবৃত্ত-

মূলক ইতিহাস। ইসলামের বড় কথা 'ইজমা' বা ঐকমত্যের মধ্যে সম্প্রদায়-চেতনা। ঐতিহাসিকের কর্তব্য হবে কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচয় দেওয়া। এর নাম ইল্ম্ অল্ তা'রিখ এই সোপানে আরবের ইতিহাস খাঁটি ইতিহাসের পর্যায়ে উঠল। শুধু রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ ইতিহাস হবে না—চাই সর্বতোমুখী অবেক্ষণ। গ্রীকরা ভৈষজ্যশাস্ত্রে এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আরবদের প্রভাবিত করলেও আরব ও পারস্য ইতিহাস রচনায় সর্বতোমুখী পর্যবেক্ষণমূলক ইতিহাসের আদর্শ নিজেরাই গড়ে তুলেছিল।

ঐস্লামিক ইতিহাসে স্পষ্টত তিনটি অংশ থাকবে—

(১) মঘ.জী বা স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ—যা সর্বদা স্মৃতিবাহিত হওয়া প্রয়োজন।

(২) অ'নসাব বংশাবলী বা genealogy।

(৩) তবকা.ত—জীবনী অংশ।

এই ত্রিধা-বিভক্ত ইতিহাসই মুসলিম ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়

(ক) ভারতে আরব-বিজয় অংশ ৭ম থেকে ১০ম শতক।

(খ) সুলতানী আমল ১১শ থেকে ষোড়শ শতক প্রথম পানি-পথের যুদ্ধ পর্যন্ত।

(গ) বাদশাহী আমল ১৬শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত।

এইবার আমরা ইরানী-ভারতী এবং প্রসঙ্গত আরব ঐতিহাসিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই অধ্যায় সমাপ্ত করব। প্রসঙ্গত বলে রাখি, অনেক ঐতিহাসিক ভৌগোলিক বৃত্তান্ত দিয়ে ইতিহাসকে ভূগোল-ভ্রমণ বৃত্তে বিধৃত করেছেন। সেইসব রচনা অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছে। জাকারিয়া বিন মুহ.ম্মদ বিন মুহ.ম্মদ (১২০৩-৮৩) তাঁর জগতের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সীমায় অবস্থিত পুরাকীর্তিগুলির বর্ণানুক্রমিক বর্ণনা দিয়েছেন। ইরান-তুরান-আরবসহ প্রতীচ্যের স্কাণ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এই মহাগ্রন্থ। ভ্রমণ ও ভৌগোলিক জ্ঞানের জন্য গ্রন্থকারকে পূর্বজগতের প্লিনি বলা হয়।

পারস্যের ইতিহাস রচনার মধ্যযুগীয় সফল প্রচেষ্টা শাহ্‌নামা। এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সুলতান মামুদ ভারতে স্থায়ী রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি। মহম্মদ ঘোরী থেকে ভারতে ইরান-

আফগান সম্বন্ধ ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে। তারপর তুর্কো আফগান অভিযান। এই সময় একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অভিযানগুলি স্বচক্ষে দেখে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ঐতিহাসিকের নাম আবু উমর উসমান মিনহাজ-উদ্দীন। তাঁর ইতিহাস "তবক.াত্-ই-নাস্‌সরী"। ইনি ইরান এবং ভারতের যুদ্ধবিগ্রহগুলি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তবক.াত্-ই-নাস্‌সিরী সেকালের ভারত-ইতিহাস ; সেইসঙ্গে এতে ইরানের ইতিহাসও আছে। ঐতিহাসিক ছিলেন ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরুদ্দীনের রাজসভায়। তাঁর তবক.াত্‌খানা Ravery দ্বারা ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়েছে। মূলরচনা ১২৬০ সাল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মহম্মদ ঘোরীর সাম্রাজ্যের পরিচালনা ভার পড়েছিল তাঁর তিনজন ক্রীতদাসের উপর—(১) তাজউদ্দীন গজনী ; (২) নাসিরুদ্দীন সিন্ধু ; (৩) কুতুবউদ্দীন দিল্লী।

সমগ্র মধ্য এসিয়ার যিনি ছিলেন সন্ত্রাস সেই চেঙ্গীজ.খান উপাধি-ধারী তেমুজীনের জীবন এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের কাহিনী রচনা ক'রেছিলেন—ঐতিহাসিক অত্বা মালিক জুবয়নী। তাঁর ইতিহাসের নাম "তারীখ-ই-জহান্‌গুশা", রচনা ১২৮০ সাল। এই গ্রন্থে খ্বারজ.ম্ সম্রাটদের ও ইসমায়লী সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। মালিক জুবয়নী ছিলেন সম্রাট হলকুখান্ এবং অবাক.া খানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ইনি পরে ইরাকের শাসনভার নিয়ে আজ.রবায়জানে দেহত্যাগ করেন।

এর পরের ঐতিহাসিক রশীদ্-উদ্দীন-ফজ.লুল্ হমদানী। এঁরও সম্পর্ক ঘটেছিল অবাক.াখান্ ও পরে ঘাজ.ান্ খাঁর সঙ্গে। এঁর ইতিহাস 'জামে' উত্-তবারীখ্" সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে ইরান ও আরবের ইতিহাস বিবৃত করার চেষ্টা করেছে। অনেকটা হিন্দু পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত এই গ্রন্থ। বিশেষত্ব এই, তিনি বিজ্ঞান ও প্রসঙ্গত ধর্মের আলোচনা ক'রে চলেছেন।

পরের ঐতিহাসিক হ.মদুল্লাহ্ মুস্তৌফী কজ.বীনী তাঁর পূর্ববর্তী রশীদুদ্দীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাঁর ইতিহাসের নাম—"তারীখ-ই-গুজ.ীদহ্" বা History of Selection. কজ.বীনীর অপর গ্রন্থ রীতিমত কাব্যলক্ষণাক্রান্ত। এই গ্রন্থের নাম Book of Victory বা 'জফ.র নামা'। তাঁর আদর্শ শাহ্‌নামা। তিনি শাহ্‌নামা রচনার কাল

থেকে ক্রমশঃ অগ্রসর হ'য়ে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত এসেছেন ১৩৩৪ সালে। ইনি নাজ. হতু'ল কুলুব (হৃদয়রঞ্জন) নামে ভূবিদ্যার গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

'ভারতের শুক' বলে প্রসিদ্ধ আমীর খুসরো অন্তত পাঁচজন সুলতানের রাজসভা অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন। মানসধর্মে কবি ও মরমী সাধক হলেও খুসরোর ঐতিহাসিক অবেক্ষণ এবং বস্তুনিষ্ঠায় যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। তিনি ছিলেন নানা বিদ্যা এবং নানা ভাষার অধিকারী পণ্ডিত। দাস-বংশের বলবন থেকে আলাউদ্দীন খালজীর মধ্য দিয়ে ঘ্যাসউদ্দীন তুঘলক পর্যন্ত সুলতানদের একটানা উত্থান-পতন তিনি দেখেছিলেন; নিজেকে রাজনীতিক আবর্তে ডুবিয়ে দেন নি ব'লেই সকলের প্রীতিধন্য সফল সাহিত্য ও শিল্পের জীবন ছিল তাঁর। আরম্ভ যাঁর আলাউদ্দীন থেকে শেষ হ'য়েছিল সে জীবন ঘ্যাসউদ্দীন তুঘলকের রাজত্বে (১৩২৪ সাল)। তাঁর গুরু নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধির পাদদেশেই তিনি দিল্লীতে সমাধিস্থ। তাঁর দুটি ইতিহাস গ্রন্থ প্রসিদ্ধ (১) তারিখ-ই-আলাই (২) তুঘলকনামা।

আফ্রিকার মরক্কোবাসী পরিব্রাজক ইবন বতুতা পর্যটকরূপে ভারতে এসে দিল্লীতে মহম্মদ তুঘলক কর্তৃক অভ্যর্থিত হন (সন ১৩৩৩)। সুলতান তাঁকে কাজী উলকাজ.তের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুদিন পর অস্থিরবুদ্ধি সুলতান তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। আবার তিনি এই পণ্ডিতের উপর প্রসন্ন হন। তাঁকে তখন চীনের রাষ্ট্রদূত ক'রে তিনি পাঠিয়ে দেন। এই পর্যটক মনীষী অব্যবস্থিত চিত্ত সুলতানের অনেক কার্যকলাপের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। তাঁর ঐতিহাসিক রচনার নাম "সফর নামা"। এই গ্রন্থে সমগ্র তুঘলক বংশের ইতিবৃত্ত দেওয়া আছে। স্থানে স্থানে অতিরঞ্জন দোষ ও সত্যভ্রংশ ঘটলেও সফরনামা উপাদেয় ইতিহাস। চীনের পথে বাংলাদেশেও এই মনীষী এসেছিলেন।

এইবার একটু ইরানের কথা বলি। মোঙ্গলদের ইতিবৃত্ত রচনা ক'রে আ'বদুর রজ্জাক. সমরকন্দী প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছেন। এঁর জন্ম ১৪১৩ সালে। ঐতিহাসিক যৌবনেই সম্রাট্ শাহ্ রুখের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরই নির্দেশে দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরে পরিব্রাজকরূপে

এসে তিনি প্রায় তিন বৎসর অবস্থান করেন। আবদুর রজ্জাকের ইতিহাস মত্ল‌া' উস্ সা'দয়ন্ ১৩০৪ থেকে ১৪৭০ সাল পর্যন্ত ঘটনাগুলির ইতিবৃত্ত দিয়েছে। মত্লা' উস্ সা'দয়ন অর্থ সৌভাগ্যের উদয়াচল।

মহম্মদ বিন তুঘলকের ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজশাহ্ তুঘলক অপুত্রক সুলতানের উত্তরাধিকারী হলেন। তিনি যতটা ছিলেন ধর্মানুরাগী, ঠিক ততটা শাসনকার্যে পারদর্শী ছিলেন না। কীর্তি কিছু ছিল—দিল্লীর উপকণ্ঠে ফিরোজাবাদ প্রতিষ্ঠা এবং জৌনপুর নগর পত্তন। বীরত্বের প্রেরণায় বিদ্রোহী বঙ্গাধিপ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে দমন করতে একডালা দুর্গ আক্রমণে অপদার্থতার পরিচয় দিলেন। এই ফিরোজশাহ্-অনুগৃহীত ছিলেন ঐতিহাসিক 'জ়িয়াউদ্দীন বরনী'। বর্তমান বুলন্দ্ শহরের সেকালের নাম ছিল বরন; সেখানে জন্মগ্রহণ করেন বলে তিনি ঐতিহাসিক বরনী। ইতিহাসের নাম 'তারীখ-ই-ফিরোজশাহী'। এছাড়া আছে স্বয়ং সুলতানের তুজুক্ বা আত্মচরিত 'তুজুক্ই ফিরোজশাহী'। বরনী সমগ্র তুঘলক বংশের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। মুহম্মদ তুঘলকের মূল্যায়নে তাঁর:বিকৃত অব্যবস্থিত চিত্তার জন্য কোন কঠোর সমালোচনা তিনি করেন নি; মনে হয়, সে সাহস তাঁর ছিল না। ফিরোজশাহের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তর্জমার কথা তিনি বলে গিয়েছেন। ফিরোজ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী।

এইবার ইরানে মুখ ফিরিয়ে একটু কথা বলতে হবে। ঐতিহাসিক 'মীর খ্বান্দ্' লিখিত 'রোজ়.ত্ উস্স.ফা' অবশ্য উল্লেখনীয়। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে আছে তৈমুর ও তাঁর বংশধরদের কাহিনী। ষষ্ঠ খণ্ডের পর এই ইতিহাসে হাত দেন মীর খ্বান্দের পৌত্র খ্বান্দমীর। পঞ্চদশ শতকের এই গ্রন্থ একদা পারস্যে এতই প্রসিদ্ধি অর্জন করে যে উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রিদাকু.লীখাঁ (ছদ্মনাম হিদায়ৎ) আর একবার এই মহাগ্রন্থকে সাগ্রহে পরিবর্ধিত করেন। তিনি একে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত টেনে আনেন। ফলে তাঁর অবসর ঘটে বাবী ধর্মের উত্থান ও বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করার। পারস্যে ঐতিহাসিক রচনায় একদা যে পল্লবিত ভাষণ সমাদৃত হয়েছিল তার জের চলেছিল বহুদিন। রৌজ়.ত্ উস্স.ফাও তার ব্যতিক্রম নয়।

মুঘলযুগের ইতিবৃত্ত রচনার ইতিহাস দেওয়ার পূর্বে মোঙ্গল তৈমুরের কথা ব'লে নিতে হয়। তৈমুরের রক্তধারায় নৃশংসতার সঙ্গে জ্ঞানানুশীলনের দুর্দম স্পৃহা এবং কাব্যানুরাগ মিশ্রিত হ'য়েছিল। সেই রক্তস্রোত ভারতের মুঘলদেরও প্রভাবিত ক'রেছে। তৈমুর আত্মচরিত রচনা ক'রেছিলেন 'মালফুজ.ত্-ই-তৈমুরী'—ভাষা চাঘতাই তুর্কী। এই গ্রন্থকে তিরিশ বছর পর শরফ্উদ্দীনয়জদী আর একবার পার্সী জ.ফর-নামা রূপে রূপান্তরিত করেছেন। কজ.বীনীর জ.ফরনামা থেকে এটি পৃথক এক জ.ফরনামা। জ.ফরনামা মানে বিজয় কাহিনী। মোঙ্গল যুগের বিধিবদ্ধ, তথ্যনিষ্ঠ রচনা ধারাকেই পরবর্তী যুগে আবুলফজ.ল আদর্শ ক'রেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য তৈমুর ১৩৯৮-৯৯ সালে দিল্লী বিধ্বস্ত ক'রে যান। তখন সিংহাসনে ছিলেন ফিরোজশাহের পৌত্র নাসিরুদ্দীনের পুত্র সুলতান মামুদশাহ্। নিরুপায় মামুদ প্রাণভয়ে গুজরাটে পালিয়ে যান।

মুঘলযুগের ইতিহাসের উপাদান শুধু-তুজু.ক, মালফুজতগুলি নয়; এ ছাড়া ছিল রুক্কত্ ও মুরক্কাত্গুলি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইশ্তহারও ইতিহাসের উপাদান রূপে গণ্য হতে পারে—যেমন, ফরমান, মিশান, পরবানহ্। এই জাতীয় তথ্য পুঞ্জের একদা সঙ্কলন হ'য়েছিল; সেই সঙ্কলনের নাম মুরক্কত্-ই-হসান (১৬৫৫-৬৭)। রাজকীয় ঘোষণাসমূহের আর একটি সংগ্রহ গ্রন্থের নাম 'আখবরাত্-ই-দরবার-ই-মু'আলা'—যার অর্থ 'রাজ-দরবারের নব নব ঘোষণাপত্র'। এই ঘোষণাসমূহ কর্মচারীরা প্রত্যহ যথাযথরূপে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতেন।

বাবুর থেকে প্রায় সকল বাদশাহ্ই আত্মচরিত লিখে যেতেন। 'তুজু.কই বাবুরী' থেকে একটানা তুজু.কই জহাঙ্গীরী পর্যন্ত চলে যেতে পারি। বাবুর কন্যা গুলবদন বেগম হুমায়ুনের জীবনচরিত লিখেছিলেন—নাম 'হুমায়ুন-নামা'। মুঘলের জাতশত্রু, হুমায়ুনের দুষ্টগ্রহ শূরবংশের শেরশাহ্ সম্বন্ধে আছে তারিখ-ই-শেরশাহী। এই গ্রন্থের লেখক—আব্বাস সরবানী।

শাহ্জহানের জীবনবৃত্তান্ত 'শাহ্জহান-নামা'র লেখক মহম্মদ সাদিক খাঁ বলেছেন, তিনি স্বচক্ষে শামুগড়ের (শম্ভুগড়) যুদ্ধ দেখেছিলেন।

তাঁর ইতিহাস শাহানশাহ্‌র বন্দীদশার বৃত্তান্তও দিয়েছে। সাদিকের লেখায় আমরা একটি চমকপ্রদ খবর পাই। তিনি বলেছেন পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবুর প্রায় পরাজিত হতে চলেছিলেন। হুমায়ুনের প্রশস্তি তাঁর গ্রন্থে আছে। হুমায়ুন পণ্ডিত এবং সর্বদা পণ্ডিত জনের সঙ্গ কামনা করতেন।

শাহ্‌জহান থেকে ঔরঙ্গজেবের মধ্যদিয়ে তৎপুত্র বাহাদুর শাহ্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস 'পাদশাহ্‌-নামা'। 'আলমগীর-নামা' ঔরঙ্গজেবের প্রথম দশবছরের রাজত্বের ইতিহাস। খ্বাফী খাঁ নামে পরিচিত মুহ্‌ম্মদ হাশিম খোরাসানী খ্বাফী লিখেছিলেন তাঁর প্রখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'মুন্ত খাবুল লুবাব'। ইনি মুঘলবাদশাহ্‌ মহম্মদ শাহের ১৭১৯-৪৮ আশ্রিত হ'য়ে তাঁরই উৎসাহে ইতিহাস রচনা প্রকাশিত করেন। ঔরঙ্গজেবের কাল দেখলেও এবং সে সম্বন্ধে লিখলেও তা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল; কারণ শাহীজীবনের দশবছর পর থেকে ফরমান দিয়ে ইতিহাস রচনা ঔরঙ্গজেব বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। 'খ্বাফী' শব্দের অর্থান্তর হ'লো গুপ্ত। এই ইতিহাস এতদিন গুপ্ত ছিল—ঐতিহাসিকও আত্মপরিচয় ঐতিহাসিক-রূপে দেন নি—তাই তিনি খ্বাফী খাঁ। খ্বাফী খাঁর মধ্যে অমুসলিমের প্রতি ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণা থাকলেও তিনি শিবাজীর অনেক বিষয়ে প্রশংসা করে গিয়েছেন। শিবাজীর তারিফ আছে নারীর প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহারে এবং অনুচর মুসলমানের মধ্যে কোরানশরীফ বিতরণের মধ্যে। মীরজ়া নাথনের বহারিস্তান-ই-ঘ়ায়েবী জহাঙ্গীরের সময়কার বাংলার ইতিহাস। পুস্তকখানা অবশ্য শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে লিখিত। ইহতমাম্‌ খাঁ ছিলেন ঢাকার প্রথম সুবাদার ইসলাম খাঁর একজন গোলন্দাজ সেনানায়ক। তাঁর পুত্র ছিলেন মীরজ়ানাথন। ইতিহাসহীন মরুভূমির দেশে এই গ্রন্থখানাকে মরূদ্যান বলে অভিনন্দিত করা হয়।

চহরচমন-ই-ব্রাহ্‌মন্‌ চন্দরভান (চন্দ্র-ভানু) লিখিত চার অধ্যায়ে সমাপ্ত একখানি উপাদেয় ইতিহাস। গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায় বৃহত্তর ইতিহাস—শাহ্‌জহানের রাজসভার স্মৃতিচারণা, দৌলতাবাদ, আসাম, বলখ্‌ বদখশান ও চিতোরের অভিযানগুলি। দ্বিতীয় অধ্যায় সর্বভারতের সমকালীন অবস্থা। তৃতীয় ও চতুর্থে ঐতিহাসিকের নিজের কথা এবং চিঠিপত্র সঙ্কলন।

মুহম্মদ মা'সুমের 'তারীখ্-ই-শাহ্ শূজায়ী' শাহ্জহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলার শাসনকর্তার ইতিহাস। এই গ্রন্থে তৃতীয় ভ্রাতা ঔরঙ্গজে.বের সঙ্গে বিরোধ এবং তাঁর সেনাপতি মীরজু.মলার সঙ্গে দ্বন্দ্বের ইতিহাস আছে।

একজন বিচক্ষণ ফরাসী চিকিৎসক পর্যটকরূপে ভারতে আসেন। তাঁর নাম ফ্রাসোয়া. বের্নিয়ে Francois Bernier. তিনি ভারতে ছিলেন ১৬৫৬-৬৮ মোট ১১ বছর। তিনি শাহ্জাহনের শেষ জীবন থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম পর্যায়ের বৃত্তান্ত দিয়ে গিয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং কৃষক শোষণের চরম অবস্থা তিনি লিপিবদ্ধ করে যান। দারাশিকোর নির্যাতন এবং প্রাণদণ্ডের এক করুণ বৃত্তান্ত তিনি রেখে গিয়েছেন। শাহ্জহান ও ঔরঙ্গজেবের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। বাংলা দেশের তিনি প্রশংসা করে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—বাংলা দেশ স্বনির্ভর এর স্বয়ংভর, কোন কিছুর জন্য বাংলার বাইরে হাত বাড়াতে হয় না। তিনি ব'লে গিয়েছেন পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের মধ্যে প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে যে বাংলায় প্রবেশ করার হাজার দুয়ার খোলা আছে, প্রবেশ করলে বাইরে যাওয়ার দুয়ার একেবারেই বন্ধ। এই প্রবচনের মর্মার্থ হচ্ছে বাংলায় এলে মানুষ আর বাইরে যেতে চায় না।

মুঘলযুগের দৈন্যদশায় বাংলাদেশের একটি সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থের নাম অবশ্য করতে হবে। গ্রন্থকার প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশ সম্ভূত। তিনি বাংলার বিপর্যস্ত দিনে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। নবাব আলীবর্দীর সঙ্গে তিনি অনেকদিন পাটনায় ছিলেন ১৭৩৩-৪৪। এঁর নাম গোলাম হুসেন তবাতবাই। তাঁর গ্রন্থের নাম সিয়ার-উল-মুতাকখরীন্ বা সমসাময়িক ইতিহাস। এই গ্রন্থখানাকে ভারতের সমসাময়িক সাধারণ ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা চলে, কারণ গ্রন্থকার দিল্লীবাসী পিতা ও পিতৃব্য থেকে সর্বদা মুঘলরাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। মীরকাসেমের প্রতিনিধি হ'য়ে তিনি ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে আলোচনা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের ঐতিহাসিকবৃত্ত এই সিয়ার-উল্-মুতাক্খরীন সাহায্যে বুঝলে ঠিক বোঝা হয়। এই গ্রন্থখানা ফরাসী

Raymond দ্বারা ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়েছিল, Raymond পরে ইসলামে ধর্মান্তরিত হ'য়ে হাজী মুস্তাফা নাম গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রন্থখানা রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসকে উপজীব্য ক'রে ইতিহাসের স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

ভারতবর্ষ ও পারস্য সাহিত্য মুঘলযুগ—বাবর

এইবার আমরা পার্সী সাহিত্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ করব। সুলতানী যুগের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এইবারে বাদশাহী যুগ। বাদশাহী যুগের সূত্রপাত করব ভারতে বাদশাহী যুগের প্রথম মানুষটি দিয়ে, তিনি জ.হীরুদ্দীন মহ.ম্মদ বাবুর। ইতিপূর্বে ভারতে পার্সী-সাহিত্যের আদর এবং কদর সম্বন্ধে সামান্য একটু কথা বলতে হবে।

ভারতবর্ষে মুসলিম আক্রমণের পর সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদিকে বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা সর্বজনবোধ্য ভাষা ছিল না—সেই ভাষায় নিবদ্ধ সাহিত্য দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তার অর্গল খুলে দেয় নি। দেশের শাসক সম্প্রদায় এদেশের সাহিত্যকে বিনষ্ট না করে সেই সাহিত্যের বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়বস্তু, বিশেষত কাহিনী কাব্যগুলি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত হ'য়ে উৎসবে, রাজসভায় এবং ধর্মসভায় পরিবেশিত হ'য়ে চলেছিল। অপরদিকে সুসমৃদ্ধ পার্সী ভাষায় নিবদ্ধ কাব্য সাহিত্যের শ্রোতৃমণ্ডলীরও অভাব ছিল না। পার্সী ততদিনে রাজকীয় ভাষার মর্যাদা পেয়ে গিয়েছে। সুলতানী যুগে ভারতে পার্সী সাহিত্যের সমুন্নতি উল্লেখনীয় ঘটনা। সুলতান ও আমীরগণ ছিলেন বিদেশী। পার্সী সাহিত্যের সহজাত অনুরাগ নিয়ে এই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা হ'য়ে দাঁড়ালেন তাঁরা। তাঁদের সভায় পার্সী কবি, পণ্ডিত ও গুণীজনের অভাব ছিল না। সে যুগের জাতীয় কবি,

ভারত-প্রেমিক আমীর খুসরো একাই পার্সী সাহিত্যকে উন্নতির শিখর-স্পর্শী করে তুলেছিলেন। নাজ়.মুদ্দীন হাসান আর একজন উল্লেখনীয় পার্সী কবি। স্বয়ং সুলতান ফিরোজ়.শাহ তুঘলক পার্সী সাহিত্যে শুধু অনুরাগী ছিলেন না, ছিলেন শক্তিমান কবি। বহু ঐতিহাসিক রচনাতেও এই যুগ সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। মিনহাজউদ্দীনের তবাকত্-ই-নাসিরী সুলতান নাসিরুদ্দীন সহ সে যুগের ঐতিহাসিক ঘটনার দর্পণ। 'তারিখ-ই-ফিরোজ়.শাহী' এবং 'তারিখ-ই-মুবারকশাহী' চতুর্দশ শতকের প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত।

আমরা সুলতানী যুগকে পানিপথের প্রান্তরে বিসর্জন দিয়ে শাহী যুগে অবতীর্ণ হচ্ছি। এইবার ফরগণার উত্তরাধিকারী আফগানীস্তান বিজয়ী বাবরের ইতিবৃত্তে প্রবেশ করতে চাই।

জ়.হীরুদ্দীন মহ.ম্মদ বাবুর

ভারতে মুঘল বাদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা উমর আলী খাঁর পুত্র জ়.হীরুদ্দীন মহ.ম্মদের উপাধি ছিল বাবুর। বাবুর উচ্চারণই শুদ্ধ উচ্চারণ, বাবর নয়। বাবুর লিখতে দ্বিতীয় 'বে' বর্ণে পেশ্ হবে জ়.বর নয়, পেশের উচ্চারণ হ্রস্ব উ। হ্রস্বস্বর পার্সীতে লেখা হয় না, সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে তাদের বুঝে নিতে হয়। যে বংশে বাবুরের জন্ম সেটি চাগতাই তুর্কী বংশ। পিতৃকুলে সন্ত্রাসের প্রতিমূর্তি 'তাইমুর' তাঁর পূর্বপুরুষ এবং মাতৃকুলের রক্তধারায় সেকালের বিশ্ববিজয়ী তেমুজীন চেঙ্গীজ়. খাঁ। সুতরাং কৈশোরেই ভবিষ্যতের অদম্য বাবুরকে অত্যন্ত সহজে অনুমান করা যেতো। দুঃসাহসিক. দেহবল ও মনোবলে লৌহদৃঢ় (তুর্কী ভাষায় 'তাইমুর' অর্থই ইস্পাত—বাবুর পেয়েছিলেন সেই উত্তরাধিকার)। ত্যাগ, তিতিক্ষা, বুদ্ধি ও কৌশলে সে যুগে প্রায় অদ্বিতীয় বাবুর সর্বদাই ছিলেন অপ্রতিহত। চরিত্রের অপর দিকটাও লক্ষণীয়। পিতৃদেবের কবিপ্রতিভা বাবুরের মধ্যে সহজাত শক্তি রূপেই এসে গিয়েছিল। চাগতাই তুর্কী বংশের প্রবণতাবশেই তাঁর সুরায় অত্যধিক আসক্তি ছিল।

পিতৃকূলের রাজধানী সমরকন্দ্‌ দখল করলেও সেখানে দীর্ঘ প্রতিষ্ঠা বাবুরের ভাগ্যে ঘটেনি। ফর.ঘনা থেকেই উজ.বেকী সর্দার শায়বাণী খাঁর অত্যাচারে তিনি অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন। ভাগ্যবিড়ম্বিত বাবুরের ভগিনী খানজ.াদা বেগমকে এই উজ.বেকীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। ইরান অধিপতি সফবী সম্রাট ইসমাইলের সহায়তায় বাবুর তাঁর অপহৃতা ভগিনীকে উদ্ধার করেন। সফবী রাজবংশের সঙ্গে সেই থেকে বাবুরের ভালোবাসার সম্বন্ধ হয়—শিয়া-সুন্নী মতপার্থক্য সত্বেও। সে সৌহার্দের সম্বন্ধ অন্তত দু' পুরুষ অক্ষুণ্ণ ছিল। পিতৃদেবের মত ভাগ্যাহত হুমায়ুন কান্দাহারে ছোট ভাই কামরান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ইরানে ইসমাইলের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্‌-ই-ইরান্‌ তহমস্পের শরণাগত হয়ে সাদরে গৃহীত হন। ভারত-ইরানের সম্বন্ধ মধ্যযুগে নরম-গরমের মধ্য দিয়ে ক্রমশ যাত্রা করে' নাদিরশাহ কর্তৃক সমূলে বিনস্ট হয়ে যায়। কিন্তু যে কথা বলছিলাম—বাবুর ও খানজ.াদা বেগমের, ভ্রাতা ও ভগিনীর, পুনর্মিলনে যে আনন্দের উল্লাস ঘটেছিল তার প্রাণস্পর্শী বর্ণনা 'বাবুরনামায়' আছে। ইতিহাস পাঠক পুষ্যভূতি বংশের ইতিহাসে মালবাধিপতি দেবগুপ্ত কর্তৃক অপহৃতা ভগিনী রাজ্যশ্রীর সঙ্গে, দেবগুপ্ত নিধনের পর, ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের পুনর্মিলনের দৃশ্য স্মরণ করতে পারেন। কবি বাণভট্ট হর্ষচরিতে তার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

ভাগ্যবিড়ম্বিত বাবুরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, কাবুলের কিঞ্চিৎ সুস্থজীবনে, শুভবুদ্ধির উদয় হয়। এক ভাবের স্বপ্নে তিনি অদূরে হিন্দুস্তানকে দেখেন। উত্তর-পশ্চিম হিন্দুস্তানে একদা তাঁর পৈতৃক অধিকার ছিল—তাইমুর-বিজিত সে দেশ। সুতরাং অভিযান এবার চলুক দক্ষিণদিকে। বাবুর তাঁর আত্মচরিত রচনা করেন তুর্কী ভাষায়। এই আত্মচরিতের নাম "বাবুরনামা"। শাহ আকবর এই গ্রন্থের পার্সী অনুবাদ করান তাঁর সুবিখ্যাত সেনাপতি মীরজ.া আবদুর রহীম খান্‌-এ-খানান্‌ দ্বারা। তখন সেই গ্রন্থের নাম হয় 'তুজু.ক-ই বাবুরী'। অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ এই বাবুরনামা—কবিত্বে উজ্জ্বল এবং যথার্থ বর্ণনায় সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। বাবুর-জীবনীর সর্বশ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ এইখানি। কবিদৃষ্টি সর্বদা ভাবালু

থেকেও কতদূর দৃঢ়ভাবে সত্যনিষ্ঠ হতে পারে—তার দৃষ্টান্ত এই মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ফরঘনার সিংহাসনলাভ থেকে বাবুরের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলেছে। মাতৃ-ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়ে তিনি গৌণভাবে জাতীয় মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই আত্মচরিত উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য এবং ঐতিহাসিক নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ যুগোচিত ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের ঘনঘটায় পরিপূর্ণ হয়নি। আত্মম্ভরিতা ও অস্মিতা থেকে এই গ্রন্থে নিবিষ্ট নিরীক্ষা এবং সরল অবেক্ষণ অধিক। বাবুরনামাকে এক দিগ্‌বিজয়ী বীরের অকপট স্বীকৃতির ইতিহাস বলা চলে। মধ্যএশিয়া ও ভারত-প্রকৃতির প্রতিবিম্ব এটি। কৌতূহলী পাঠককে বাবুরনামা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"আমি হারিয়েছি অনেক, আমি পেয়েছি অনেক। হারিয়ে পাওয়ার যে সুখ, সে সুখের তুলনা হয় না। দুঃখের নিশাবসানে আসে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আমার জীবনে এমন ঘটেছে। তেইশ বছর বয়সে কাবুল অধিকার করেছিলাম। অন্তরে জিগীষা শান্ত হয় নি—হিন্দুস্তান আমার পৈতৃক রাজ্য—ওখানে অধিকার কায়েম করতে হবে। দুটিমাত্র ছেঁড়া তাঁবুর মালিক আমি, সৈন্য সামন্ত জড় করে অসম সাহসে অগ্রসর হচ্ছি। মাকে ভাল তাঁবুতে আশ্রয় দিয়েছি, আমি নিজে তাঁবুর আশ্রয় নিইনি; এমন কি বন্ধুদের সেধে দেওয়া গুহার (Cave) আশ্রয়ও প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার সৈন্যরা উন্মুক্ত আকাশের নীচে, আমি নির্লজ্জের মত সুখ-তপ্ত শয্যা গ্রহণ করতে পারি না। চিরকাল আমার সহচর-অনুচরদের দুঃখ বুঝেছি বলেই বিপদে তাদের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছি। এইজন্যই মনে হয়েছে আমি কি সৌভাগ্যবান!......কাবুল ছেড়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি; দক্ষিণে সেই আকাঙ্ক্ষিত দেশ। হিন্দুকুশ পর্বতের মাথায় উপর আমরা। দূরের আকাশে ঝলমল করছে একটি তারা। ওকি সুহাইল—অগস্ত্য তারা? ওকি আমার অদৃষ্টের অগ্রদূত? আমার অন্তর্নিহিত অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন আমারই এক সঙ্গী—

'সুহাইল !* তুমি কতদূর ?
দূরের আকাশে উদয় তোমার,
আলোর ঝলকে দিয়েছ সুর।
'ক্লান্ত পথিক, শক্তি সাধক !
আর নহি আমি বহুদূর !'

আমার সঙ্গীদের কি তুলনা হয় ? মাঝে মাঝে আমার সৈন্যদের মধ্যে দুরন্ত অভিযানে বিতৃষ্ণা লক্ষ্য করেছি। কাবুল জয় করার পরই সৈন্যরা দেশে ফিরে যেতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম জয়কে সুনিশ্চিত করতে হয় সুশাসনের মধ্য দিয়ে। আফঘানীস্তানের হৃদয় জয় করা এখনও হয় নি। সৈন্যরা আমার কথার মর্ম বুঝে শান্ত হ'লো। তাদের গৃহ-বিচ্ছেদ পীড়া দূর হ'লো। এইবার সম্মুখে আমার মহাব্রত—ভারত অভিযান এবং পিতৃরাজ্য উদ্ধার। আমার রণকৌশলে এবং উস্তাদ্ আলীকুলির আগ্নেয়াস্ত্রসজ্জায় পানিপথের প্রান্তরে অত্যন্ত সহজে লড়াই ফতে। কিন্তু তোমরা শুনে রাখো, আমার নিজের কাছে পানিপথের বিজয়োল্লাসের কোন মূল্যই ছিল না। আমি বুঝেছিলাম ভীষণতর সংগ্রাম আমার সম্মুখে। সেখানে চোট-খাওয়া লোদী সমর্থকরা এবং তামাম রাজপুতনার সঙ্ঘশক্তি আমার সঙ্গে শেষ লড়াই লড়বে। আমার নষ্টাবশিষ্ট সৈন্যব্যূহ দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত নয় জ.হীরুদ্দীন। বারো-হাজার সৈন্য নিয়ে ইব্রাহীমের লক্ষ সৈন্য মাত্র আধখানা দিনমানে

---

* অগস্ত্যনক্ষত্র। লাতীন নাম Canopus—আকাশের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারা। সে দক্ষিণায়নে দৃষ্টিগোচর হয়। কালপুরুষ (Orion) এর সন্নিকটে এটি। অগস্ত্য কম নন—২৬টি ঋক্ সূক্তের রচয়িতা। পুণ্যকীর্তির জন্য কর্মদেব হয়ে দক্ষিণ আকাশে নক্ষত্ররূপে বিরাজমান। Argo (আর্গো) মণ্ডলের সর্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মিসরের পুরাণ কথায় আছে Canopus সমুদ্রদেব। হিন্দুপুরাণে অগস্ত্য সমুদ্র পান করে ফেলেন। অসীম শক্তিশালী অগস্ত্য। মিসরের পুরাণ কথায় দেখা যায় কলডীয় জাতি অগ্নি-উপাসক। তারা অগ্নিদ্বারা শক্তি পরীক্ষায় বিশ্বের সমস্ত দেবতাকে সংগ্রামে আহ্বান জানালে মিসরের পুরোহিত সে আহ্বান গ্রহণ করে' Canopusকে প্রার্থনা জানায়। সমুদ্রদেব মুহূর্তে আগুন নিবিয়ে দেয়। এতে অগ্নির উপরে জলদেবতার জয় ঘোষিত হয়। মধ্য এসিয়ার জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে অগস্ত্য দর্শনে শুভ। হিন্দু শাস্ত্রে লেখে অগস্ত্যের যাত্রা দিনটি 'পয়লা ভাদ্র' যত্নের সঙ্গে পরিহার করা উচিত। বিবাদী পুরাণ কথাগুলিতে কোথায় যেন আসল সংবাদ লুকিয়ে আছে। অগস্ত্য কুম্ভযোনি, সমুদ্রশোষক, অসাধ্যসাধক। অগস্ত্যোদয়ে জলরাশির নির্মলতা। সবদিকেই তাঁর জলের সঙ্গে সম্বন্ধ।

(৬ ঘণ্টা) চূর্ণ করে দিয়েছি। আমার শক্তির উৎসকে দ্বিতীয় যুদ্ধ-ক্ষেত্র খানুয়া প্রান্তরে আবার রণমুখী করতে হবে। চাই সান্ত্বনা আর উদ্দীপনা। সে মুহূর্তে আমি আল্লার আদেশ উপলব্ধি করলাম। আবাল্য-সঞ্চিত পাপকে সেই মুহূর্তে পদাঘাত করে বিদায় করলাম। খানুয়া প্রান্তরে সৈন্যদের সম্মুখে বলেছিলাম, "বুঝতে চেষ্টা করো বন্ধুগণ! অগৌরবের পশ্চাদপসরণ থেকে গৌরবের মৃত্যু অনেক বড়। তোমাদের স্বদেশ বহুদূরে, কিন্তু তোমাদের পাশে আছেন মহিমময় আল্লাহ্‌তা.লা। বীর সৈন্যগণ! তাঁর অভিপ্রায় সার্থক কর। এই দেখ, আমি এতদিন পাপের পঙ্কে আচ্ছন্ন ছিলাম—সুরার আসক্তি ছাড়তে পারি নি। আল্লার কসম—জীবনে আর সুরা স্পর্শ করব না। এই বলে আমার সখের পানপাত্রগুলি চূর্ণ করে ফেললাম। দেখতে দেখতে সৈন্যরা নতুন শক্তিতে সঞ্জীবিত হ'লো। খানুয়ার প্রান্তরে মুঘলশক্তির বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত হ'লো।"

বাবুর জীবনে আর সুরা স্পর্শ করেন নি। চেঙ্গীজের জিঘাংসা এবং তাইমুরের সন্ত্রাস বাবুরের চরিত্রে ছিল না। উস্তাদ্‌ আলীকুলীর আগ্নেয়াস্ত্র-সজ্জার সম্মুখে সুলতানী ফৌজ পানিপথে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই শ্মশান-শয্যা রচনা করেছিল; কিন্তু বাবুর বিজিত দেশে অসামরিক প্রজাপুঞ্জের সম্মুখে অভয়বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সৈন্যদের হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন —"ওদের সূচাগ্রও স্পর্শ করবে না। ওদের পরিধেয় বস্ত্রের একটি সূত্রও যেন ছিন্ন না হয়।" ঈশ্বরে বিশ্বাস, সাহিত্যরসে পিপাসা, সঙ্গীতকলায় নিপুণ, বন্ধুপ্রীতিতে উচ্ছ্বসিত এবং আশ্রিতবাৎসল্যে উন্মুক্ত-হৃদয়, বাবুর-চরিত্র ছিল সত্যই অসাধারণ। এই জ.হীরুদ্দীন মহ.ম্মদ বাবুরের সাফল্য যেন আকবরের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রভাতী তূর্যধ্বনি। ঐতিহাসিক Lane Pool-এর ভাষায়—Babur is the link between Central Asia and India, between predatory hordes and imperial government, between Tamerlane and Akbar.

বাবুর সিদ্ধহস্ত ছিলেন গদ্যপদ্য উভয়বিধ রচনায়। সমগ্র য়ুরোপে সমাদৃত লাতীন ভাষার মত সমগ্র মধ্য এসিয়া ও ভারতে অভিনন্দিত পার্সী ভাষায় তাঁর প্রেম ছিল যতখানি, ঠিক ততখানি প্রেম ছিল তাঁর

মাতৃভাষা চাগতাই তুর্কীতে। কেউ কেউ তুর্কীকে তুলনায় মধুরতর বলে গিয়েছেন—তুর্কী "মেহেবুবুলকুলূব" যাকে বলে মনোমোহিনী। এ যেন সংস্কৃতব্যুৎপন্ন পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতির—'দেসল বয়না সবজন মিট্‌ঠা। তেঁ তৈসন জম্পিও অবহট্টা'—জানি সংস্কৃতের সংস্কৃতি, কিন্তু নিজদেশের বচন মিষ্টি ; তাই আমি বিদ্যাপতি অবহট্টে রচনা করছি। বাবুর পার্সীতে সুদক্ষ হয়েও তাঁর মহাগ্রন্থ তুর্কী ভাষায় রচনা করলেন। সাহিত্যের ঐতিহাসিক দৌলতশাহ—তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে খতিমা বা উপসংহারে তুর্কী রচয়িতাদের রচনা এবং জীবনী দিতে বাধ্য হয়েছেন—অনাদর করেন নি।

বাবুরনামা সম্বন্ধে Elphinstone বলেছেন—* * * 'a minute account of the life of a great Tartar monarch'. সত্যই এই মহাগ্রন্থে অভ্রান্ত নিরীক্ষণ, সূক্ষ্মচিন্তা এবং অসংবৃত তথ্যের অত্যুচ্ছ্বসিত প্রকাশ আছে। সমগ্র রচনা ছবির মত স্পষ্ট এবং সঙ্গীতের মত মধুর। প্রকাশ ভঙ্গিমায় পৌরুষের দৃপ্ত মহিমার সঙ্গে অপক্ষপাত উপস্থাপনা আছে। বাবুর সিদ্ধশিল্পীর মত ছবি দিয়ে পাঠককে বন্ধুর মত কাছে টেনে নেন। হিন্দুকুশ পর্বতশৃঙ্গ থেকে ভাস্বরতায় যে শুকতারার থেকে একটু নীচে সেই সুহায়িল বা Canopus দেখে দুঃখের অভিযানেও আশার আলোক জেগে ওঠে। একথা ঠিক গুল ও বুলবুলের দেশের বাবুর হিন্দোস্তানকে ভালোবেসে গ্রহণ করতে পারেন নি। এদেশের ঋতুচক্রে বর্ষার জলধারাকে তাঁর খুব ভাল লাগতো। হৃদয়ের দুয়ার অবারিত ক'রে তিনি সব কথা বলে গিয়েছেন—হেরাতে তাঁর প্রথম দিনের সুরাপান, প্রথম হৃদয়োচ্ছ্বাসে তুর্কীভাষায় কবিতা রচনা। তিনি যখন বলিষ্ঠ পরিপক্ক সুরাসেবী তখন একদিন সুরাপানের অভিনয় করে অপর সব পানোন্মত্তদের অবস্থা নিরীক্ষণ—সব কিছুর তথ্য নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেছেন। বাদশা বাবুরের আয়েশা বেগমের সঙ্গে অবাঞ্ছিত পরিণয়, বাবুরীর প্রতি অসংযত ও অবিমৃষ্য আসঙ্গলিপ্সা, কিছুই বাদ যায় নি। তাঁর পানপাত্রগুলি, নানা পাকের বিবিধ সুরা, সুরার জয়গান, যৌবনের জয়গান, সুখ ও আনন্দের উপায় ও উপকরণ, সকল বিষয়ে তিনি নিরর্গল ভাষণ দিয়ে চলেছেন—যেন এক বহুদশী সংস্কারমুক্ত পুরুষ নির্দ্বিধায় অকৃপণ জ্ঞান

বিতরণে উন্মুখ। খোরাসান ও হেরাত যখন বিস্তার বিদ্যুজ্জালায় উদ্ভাসিত, তখন তিনি প্রথম কবিতার উচ্ছ্বাস নিয়ে পাত্রের পর পাত্র গ্রহণ করে চলেছেন।

পূর্বেই বলেছি জহীরুদ্দীন মহম্মদ বাবুর এসিয়ায় বন্দিত পার্সী ভাষাতেও সুদক্ষ ছিলেন। বহু শে'র তিনি এই ভাষায় রচনা করেছিলেন। তার একটি গুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এক অতিরিক্ত সংখ্যায়। [দ্রষ্টব্য : A Collection of Poems by Emperor Babur—1910, 16th October, extra number Vol. VI of J. A. Society Bengal, Introduction pp.4-6]।

আমরা কয়েকটি শে'র পাঠককে উপহার দেব। স্থান কাবুল, আফগানীস্তান বিজয় সুসম্পন্ন। একটি মনোরম পুষ্পোদ্যানে নিজ-তত্ত্বাবধানে তিনি এক জলাধার তৈরী করিয়ে আঙ্গুর-সুরায় পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। সেখানে তিনি আরামে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতেন। সেই সুরাধারের গায়ে তিনি নিজের রচনা উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন—

(১) "নৌ রোজ. বো নৌ বহার বো ময় বো দিলরুবা খুশস্ত্।
বাবুর ব 'আয়িশ্ কুশ্ কেহ্ 'আলম দোবারহ্ নীস্ত্॥"

নতুন বছর, নব বসন্ত, রঙ্গিনী বধূ মদিরা সার।
বাবুর বুঝেছে আয়েশ আরাম, জীবন ফুরালে আসে না আর॥

(২) নববসন্ত দুয়ারে ঘুরিয়া মরে/কলিকাফুলের পাবড়ি বৃথাই ঝরে,
এই পৃথিবীর ক্ষয়ক্ষতি যত মোর/তুচ্ছ হইল বক্র নয়নে তোর।

(৩) তোমার মুখের ছবি পরিপূর্ণ আকাশের চাঁদ;
মিলনে তোমার গণি রাত্রিগুলি দিনের সমান।
তোমার বিরহ রাত্রি—হোক তাহা দিবা বা রজনী।

হৃদয় রঙ্গিনী সখী! ক্ষত যদি কর বক্ষ মোর,
এই দগ্ধ শ্রান্ত দেহে সেই ক্ষত স্নিগ্ধ প্রলেপন।
নিঠুর আঘাতে তোর শুধু দেয় আনন্দ অপার,
যদি তাহা হয় সুধা-সার।

বাবুর বলতেন তাঁর জানা পৃথিবীর কোন অংশ কাবুলের এই পুষ্পোদ্যানের মত নয়। এইজন্যই বোধহয় বাবুরের মৃতদেহ কাবুলের পুষ্পোদ্যানে সমাহিত করা হয়েছিল। তাঁর পাশে তাঁর অনৈকা হৃদয়রঙ্গিনী বেগমেরও মক.বরা বর্তমান আছে।

বাদশাহ্ হুমায়ূন

আবদুল কাদির অল বদ'াওনী ছিলেন আকবরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক। তাঁর 'মুন্‌তাখাবুত্. তবরিখ' গ্রন্থে আকবরের জীবনবৃত্ত কিঞ্চিৎ প্রতিকূলভাবে পাই; কারণ বদা'ওনী সুন্নি, আর আকবর সর্বধর্মে সমদর্শী। সুতরাং বোঝা যায়, আবুলফজ.ল্-এর প্রশংসামুখর 'আকবর নামা'র সংশোধনাত্মক গ্রন্থ এটি। আমাদের সৌভাগ্য বদা'ওনী ১৭০ জন সাহিত্য সাধকের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা অধিকাংশই জাত ইরানী বা ভারতে জাত ইরানী। শিব্লা'লীর তালিকায় ৫২ জন কবির পরিচয় আছে। এঁরা অধিকাংশই পারস্য থেকে ভারতে এসেছিলেন এবং আকবরের রাজসভায় সম্মানিত হয়েছিলেন। সা'ইব একখানা কাব্য-সঙ্কলন রেখে গিয়েছেন 'খরাবাত্' ('পানশালা'); রচনা ১৬৬৯-১৬৭০ সালে—আকবরের মৃত্যুর ৬৪-৬৫ বছর পর। তবু এ গ্রন্থের বিশেষ মূল্য আছে; কারণ বহু কবির কবিতার সঙ্গে সঙ্গে শাহ্ হুমায়ূনের কয়েকটি কবিতা এই সঙ্কলনে আমরা পাই। এই গ্রন্থে কবিতা ধ'রে ধ'রে তার অলঙ্কার বিশ্লেষণ করা আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ষোড়শ সপ্তদশ শতক ছিল যেন ভারতে পার্সী সাহিত্যের বুস্তান বা ফলের বাগান। চারদিকে নিদাঘের ফল-সমারোহ। অধ্যাপক Ethe এ যুগকে রসাল ফলের মধুর নিদাঘ ঋতুই বলেছেন। এই সময় থেকেই দলে দলে ইরানী কবিরা ভারতে চলে আসছিলেন। স'দী ভারতের রাজসভার যত নিন্দাই করুন—ভারত তখন নানাদিকে কবিদের হাতছানি দিয়ে চলেছে। সা'ইবের তুর্কী পার্সী আরবী কাব্যসঙ্কলন খরাবাত্ থেকে ভারতপ্রেমিক কবিদের কবিতা উদ্ধৃত করে এই সত্যের

সন্ধান দিচ্ছি। এই খরাবাত্‌এ বাদশাহ্‌ হুমায়ুনের কবিতারও উদ্ধৃতি আছে। সঙ্কলন-কর্তা সা'ইব নিজেই বলেছেন—

'হমচু গু.ল.স্‌-এ সফর্‌-এ-হিন্দ্‌ কেহ্‌ দর হর দিল্‌ হস্ত্‌।
রক.স.-এ-সূদায়ী তু দর হীচ্‌ সরী নীস্ত্‌ কেহ্‌ নীস্ত্‌।

প্রত্যেকের হৃদয়ে ভারত ভ্রমণের অদম্য বাসনা আছে। আমি তো দেখি এমন কোন মস্তিষ্ক নেই যেখানে এই পাগলা ভাবের নৃত্য না চলছে।

কুআ'লী.লী বলেছেন—

নীস্ত্‌ দর ইরান্‌ জ.মীন্‌ সামান-এ-তহ.স.ীল্‌ কামাল।
তা নী আমদ সূয়ী হিন্দুস্তান্‌ হি.না রনগীন্‌ নাশদ্‌॥

ইরানে নাহিরে জমীন যেখানে কামাল কলমা[১] ফোটে।
ভারতে আসিয়া মেহেদীর গায় রঙের বাহার ছোটে।

"শিরু'ল আজম্‌" নামক গ্রন্থে রুসূমী নামে এক কবি জানাচ্ছেন—দুনিয়ায় অসাধারণ একজন মানুষ আছেন, তিনি ইব্রাহীম্‌ খান-এ-খানান্‌। তাঁর বদান্যতারও তুলনা নেই, কাব্যোৎসাহেরও তুলনা নেই। তাঁর গুণগ্রাহিতা স্মরণ ক'রে মুগ্ধ হৃদয়ে কবি বলেছেন—

'কনন্দ্‌ বহর-এ-মদী হ.শ্‌ ক.সীদা' আন্‌শা।
কেহ্‌ খুন্‌-এ-রশক্‌ চরকদ্‌ অজ. দিলে-এ সুখুন পরবর॥

যিনি সকল শূন্য ক'রে গেলেন সেই খান-এ-খানানের জন্য এমন শোকগাথা রচনা কর--হে কবি! যা গাইতে গাইতে গায়কের চোখ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে অশ্রুর ছলে রক্তধারা ঝ'রে পড়ে, যে গানের বাঁধুনিতে গায়ক কবির প্রতি ঈর্ষান্বিত হ'য়ে ওঠে।

ইব্রাহীম খান-এ-খানান ছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহামতি আকবরের অভিভাবক তুর্কী বৈরাম খাঁর পুত্র। বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর চার বৎসরের বালক ইব্রাহীমকে আকবর প্রতিপালন করে' যোগ্যতায় অসাধারণ করে' তোলেন। তিনি হ'য়েছিলেন দুর্ধর্ষ সেনাপতি, সুযোগ্য পণ্ডিত, অসমোর্দ্ধ প্রতিভাবান, সর্বজনবন্দিত কবি এবং রাজনীতি ধুরন্ধর।

১। সব চাইতে সেরা বচন

এহো বাহ্য ; তাঁর দানের পরিসীমা ছিল না। আকাশের মত উদার এই মহান্ দাতা একদা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে রিক্ত ফকীররূপে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি যখন দান করতেন তখন তাঁর দৃষ্টি অহঙ্কারে উর্ধ্বে উঠতো না, বিনয়ে আনত হতো। এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন অন্য এক কবি—'গাঙ্গ্'। আবদুর রহীম খান-এ-খানান আনত দৃষ্টিতেই উত্তর দিলেন—'আমি যখন কিছু দিই, তখন আমি কিন্তু দিই না, আল্লাই আমার হাত তুলিয়ে দান করান—আমি যে নিজে দিতে পারি নি, তাই ভেবে লজ্জায় চোখ নীচু করি। এ বিষয়ে সমভাবের এক উর্দু শের আছে—অষ্টাদশ শতকের এক কবি নাজি.র দেহলবীর।—

"গ.্যার অজ. খুদা কে কিসমেঁ হ্যায়্ কুদরত্ জো হাথ উঠায়ে।
মক.দুর ক্যায়া কিসী-কা, রহী দে রহী দিলায়ে॥"

এক খোদা ছাড়া হাতটাকে কেউ তুলতে নারে।
ওই তো দেওয়ায়, ওই তো আবার দিতে পারে॥ (মানুষ দরিদ্র তুচ্ছ)

এইবার হুমায়ূনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন। শেরশাহের দাপটে, হুমায়ূন দিশেহারা—বৈমাত্রেয় ভাই তিনজনই তাঁর সঙ্গে পূর্বাপর বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে—কামরান, হিন্দাল ও আসকরী। স্থান থেকে স্থানান্তরে হুমায়ূন পলাতক হয়ে ঘুরেছেন। সিন্ধুদেশের আশ্রয়ও নিরাপদ মনে না হওয়ায় তিনি রাজপুতনার ভিতরে ঢুকে যোধপুরাধিপতি মালদেবের আশ্রয় চান। তিনি ভীত হন। তারপর আবার সিন্ধুদেশে উমরকোটে রানা প্রসাদের আশ্রিত হন। এইখানে হামিদা বেগম চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রাজপ্রাসাদের আশ্রয়ে ভবিষ্যতের মহান আকবরকে প্রসব করেন। আবার স্থানচ্যুত হুমায়ূন পলাতক। একদা কাবুল পাঞ্জাব ও কান্দাহারে এই-জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠিত অনুজ কামরান্ জ্যেষ্ঠকে আশ্রয় দিলেন না। শেষে আশ্রয় মিলেছিল ইরানাধিপতি তহমাস্প্-এর কাছে। শেরশাহের সঙ্গে বহু ব্যর্থ সংগ্রামে পরাজিত হুমায়ূন। চাগতাই বংশের সুরাসক্তি তাঁর ছিল না, কিন্তু সর্বনাশা অহিফেন তাঁকে প্রায়শই নিরুদ্যম, অসহায় এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখতো।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে শেরশাহের মৃত্যুর পর তিনি আবার কয়েক

মাসের জন্য দিল্লী অধিকার করেছিলেন (১৫৫৫-৫৬)। নিরুপদ্রব সেই কয়েকমাসের সংক্ষিপ্ত জীবনে পণ্ডিত হুমায়ুন জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস এবং সাহিত্য—নানা বিদ্যার চর্চায় মগ্ন থাকতেন। পিতৃদেবের বাবুরনামাকে তিনি পার্শীতে অনুবাদ করার অবকাশ পাননি ; কিন্তু স্বহস্তে অতি যত্নে তুর্কী লিপিকে পার্শী হরফে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। অধ্যয়নে প্রায়শ নিবিষ্ট শাহ হুমায়ুন একদা সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে যান—এবং সেই অবস্থায় অতর্কিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। হুমায়ুন যে স্বয়ং কবি এবং কবিবৃন্দের উৎসাহদাতা, তিনি যে সর্বগুণের আধার, স্বয়ং পণ্ডিত এবং পাণ্ডিত্যের কদরদান সে কথার বিস্তৃত ইতিহাস মাওলানা কাসিম তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর চিরস্মরণীয় করে গিয়েছেন—

হুমায়ুন বাদশাহ্ মুল্ক-এ মা'নী। নদারদ্ কস্ চু উ শাহান্শাহী য়াদ্॥
জ. বামে ক. স. র্-এ-খোদ্ উফ্তাদ্ নাগাহ্। বরু 'উমর-এ-গরামী
রফ্ত্ বরবাদ্॥

পীতারীখ-এ-উ কাসম্ রক.ম্ জ.দ্। হুমায়ুন্ পাদ্শাহ্ অজ.বাম্
উফ্তাদ্॥

তিনি পড়ে গেলেন তাঁর প্রাসাদের অন্ধকার সিঁড়ি থেকে। একটি মহামূল্য অসমোর্ধ্ব প্রাণ তাঁর দেহ থেকে হাওয়ায় মিশে গেল। কাসিম তাঁর মৃত্যুর ইতিহাস এইভাবেই দিয়েছেন—'মহামান্য শাহান্শাহের অতর্কিত মৃত্যু ঘটল আঁধার সিঁড়ি থেকে পদস্খলনে। একদা যাঁর শিক্ষক ছিলেন পিতৃদেবের সচিব খ্বাজা কলান্ ও শেখ জয়নুদ্দীন, যাঁর নিত্যসহচর ছিলেন অস্তরবাদী, মোল্লা নূরুদ্দীন, মৌলানা ইলিয়াস্—তিনি তাঁর জীবনের অসম্পূর্ণ এক ইতিহাস রেখে তিরোহিত হলেন।

উঁচুদরের কবি না হলে তাঁর কাছে অপর কবিদের কাব্য সংশোধন ও পরিমার্জনের ভার আসে না। তাঁর কবিত্ব অবিসংবাদী একথা আবুল ফজল্ 'আকবরনামা'য় স্বীকার করেছেন। তাঁর কবিত্বের নিদর্শন আছে প্রধানত দুটি গ্রন্থে, তারীখ-ই-ফিরিশ্তহ্ ও আকবরনামায়।

এইবার আমরা হুমায়ুনের কবিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবো। হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কামরানের্ উল্লেখ একবার করা হয়েছে।

তিনি পিতৃদেবের এই দ্বিতীয় পুত্রটিকে স্নেহের চোখেই দেখতেন। দিল্লীর সিংহাসনে বসে তিনি বিদ্রোহী ভাইটির প্রতি সদ্ব্যবহারই করেছিলেন। ভ্রাতাকে পাঞ্জাব, কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্তা করে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। শেরশাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত এবং বিপর্যস্ত হুমায়ূন তাঁর ভাইএর মুক্তহৃদয় সাহায্য দূরে থাক, অস্থায়ী আশ্রয়টুকুও পেলেন না।

সহোদর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হুমায়ূন দুঃখভরে লিখেছিলেন—

মুখের ছবিটি বিম্বিত হয়, আয়না তাহারে টানে।
তবু দূর সে-টা, মুখ নহে কভু, সেকথা সবাই জানে।
সহোদর আর বাবুরাত্মজ! দূরে ঠেলে দিলি তুই।
এই তো সত্য! সাধ্য কি আছে আল্লার মায়া ছুঁই?

দর আয়িনা গরচে খুদ নুমায়ী বাশদ্
প্যায়ওসতা জ্‌া খেসতনজুদায়ী বাশদ্
খুদরা বেন্নুমায়ী গ্‌য়র দীদন্ আজব অস্ত্
ইন্ বুল আজবী কার-এ-খুদায়ী বাশদ্।

অনন্যোপায় হয়ে হুমায়ূন আশ্রয় খুঁজলেন ইরানের রাজদরবারে। ইরানাধিপতি তখন তহমস্প্। হুমায়ূন লিখলেন—

'দুশমন শের হেরে গিয়ে পিঠ ঘুরিয়ে, আবার সম্মুখে এসেছে। থাবায় শাণিত নখর, বিবৃত মুখে ধারাল দংষ্ট্রা। আমার সম্মুখে এই আততায়ী। ককেসাস পর্বত অতিক্রম করেছি। আজ তোমায় আশ্রয়প্রার্থী হুমায়ূন। জানতো রাজা। হুমা পবিত্র-পাখী সৌভাগ্যের জন্য সবাই তার ছায়া চায়। আজ বিধির বিধান উল্টে গেছে। হুমা* তোমার ছায়ায় আসতে চায়।

---

* রামকৃষ্ণ কথামৃতেও হুমাপাখীর প্রসঙ্গ আছে। শুকদেবের মত জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষদের সঙ্গে এর তুলনা করা আছে। এ পাখী নীড় বাঁধে না, অনন্তশূন্যে উড়ে বেড়ায়। ডিম পাড়ে শূন্যলোকে—সে ডিম ফোটে উৎক্রান্তপক্ষ শিশু হুমাও শূন্যলোকে উড়ে বেড়ায়। লোক প্রসিদ্ধি এইরকম। এর ছায়া লাভ পরমসৌভাগ্য।

তাকে ফিরিয়ে দিও না রাজা! আবজান মরুপ্রান্তরে আলী
যেমন সলমনকে আশ্রয় দিয়েছিল, তুমি আমাকে তেমনি দিও।'

এই চিঠিতে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বাচনভঙ্গিমার অপূর্ব মিলন হয়েছে। হুমায়ূন ছিলেন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এবং কলাকুশল কবি। পরের বয়ত্‌টিতে প্রার্থনা ও প্রার্থনা পূরণের কথা আছে।

'হুমায়ুন হুমা আশ্রয় মাগে বিপরীত আজ সব!
ইরান তৈয়ার, হুমাপাখী এস, মিটে যাবে কলরব।'

তহমস্পের আশ্রয়ে কৃতজ্ঞ হুমায়ূন তাঁর কবিতায় এক অংশে বলেছেন—ইরানের রাজা! উষার পবিত্র আলো ফুটেছে আজ তোমার মুখে। তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমার ভবিষ্যৎ বিজয়ের সিংহদ্বার সূচনা করছে। হে অতুলনীয়! খোদা তোমাকে সুখী করুন।

কাবুল নিয়ে উভয় ভ্রাতার একাধিকবার টানাটানি হয়েছিল। হুমায়ূন মার্জিতরুচি, তিনি কাবুল অবরোধ করে কামরানকে চিঠি দিলেন—পবিত্র মোগল রক্ত তোমার গর্দানে, আমার শান্তি-প্রস্তাব না মানলে, জনগণ তোমার বিপক্ষে যাবে, তোমার পক্ষে সন্ধির চিন্তা করাই উচিত; এতে তোমার উদারতার জয়গান উঠবে—

বুবদ্ খুন্-ই-আন্ কৌম্ দর গরদনত্।
বুবদ্ দস্ত-ই-হুমা' দর দামনত্॥
হুমান্ বিহ্ কেহ্ বর্ স.লহ. রায় আবরী।
ত.রীক.-ই-মর্রত্ বজায় আবরী॥

তোমার শিরায় ব'য়ে চলে যায় কুলের রক্তধার।
তোমার আঁচল টেনে ছিঁড়ে দেবে বিশ্বের দরবার॥
শান্তির পথে ফিরে পাবে সব, এই সে তোমার কাল।
দরাজ হৃদয় পরিহার করে যুদ্ধের জঞ্জাল॥

কিন্তু উদ্ধত কামরান কোন সন্ধির ধার ধারেন না। তিনি চিঠির উত্তর দিলেন সন্ধি নয়, যুদ্ধ চাই। বীরত্বের প্রতিষ্ঠা হয় উদ্যত অসির মুখচুম্বনে।

আ'রুস্-ই-মুল্‌ক্ কসী দর্ কিনার গীরদ্ তংগ্।
কেহ্ বুসাহ্ বর্ লব্-ই-শম্‌শীর্-ই-আবদার দিহদ্॥

বীরের কর্ণে সঙ্গীত আনে যুদ্ধের কলরব।
শাণিত অস্ত্র চুম্বন তার পরম মহোৎসব॥

খাস্ ইরানে যখন হুমায়ুন্ অধিষ্ঠিত, নির্বিঘ্ন আশ্রয়, তখন কোন সূফী কবি তাঁর একটি কবিতা পরিশোধন এবং পরিমার্জনের জন্য আসেন। তিনি লিখেছিলেন—'আমার প্রেমিকার প্রেম আমার দেহমন পুড়িয়ে চলেছে। প্রতিদিনের ঘাত-প্রতিঘাতে সে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। হবেই তো; শমা' পোকার মত মোমবাতিতে ঝাঁপিয়ে পড়াই আমার কাজ। আর একটু দূরে এগিয়ে গেলেই আমার রোমাবলী ও পাখা সব যে জ্বলে যাবে!

গহ্ দিল অজ. ই'শক্.-ই-বুতান্ গহ্ জিগরম্ মী সূজ.দ্।
ই'শক. হর লহ.জহ্ ব দাঘ্.ই-দিগরম্ মী সূজ.দ্॥
হমচু পরবানহ্ ব শম'ই সররকার অস্ত্ মরা।
কেহ্ অগর্ পেশ্ ররম্ বাল্ বো পরম্ মী সূজ.দ্॥

হুমায়ুন্ সূফীকবির শে'রটির তারিফ করলেন; তবু সর্বশেষ চরণটি একটু ঘুরিয়ে দিলেন। 'মীররম্ পেশ্ অগর্ বাল বো পরম্ মী সূজ.দ্' —আমার যে পালক ডানা সব জ্বলে যাচ্ছে'। কবি! এতে দুঃখ, যন্ত্রণা এবং বিস্ময়ের কি আছে? তুমি সূফী। পুড়ুক সব, জ্বলে পুড়ে ছাই হোক্—আলোর দিকে ছুটে গিয়ে আত্ম বিসর্জনই তোমার ধর্ম, তুমি তাই লেখো—

জ্বলে পুড়ে আমি ছাই হয়ে যাব তবু যাই সম্মুখে।

তুমি সূফী, বলো—কেহ্ অগর্ পেশ্ ররম্ বাল্ বো পরম্ মী সূজ.দ্।'

হুমায়ুনের কবিতাবলীর এক অংশে আল্লার প্রশংসাবাণী উদ্‌ঘোষিত হ'য়েছে। 'সারাৎসার তুমি! তোমার উপমা নেই। সমুদ্র যদি লেখার কালি হ'য়ে যায়, আকাশ যদি সেই কালির আধার হয় তবু লেখনী তোমার গুণকীর্তন শেষ করতে পারবে না।'

গর বহর শবদ্ মেদাদ্ বো আফলক্ দবাত্।
আ'জিজ. শবদ্ অজ. শরহ.-এ-সেফাতে-তূ কলম্।

হুমায়ুনের এই খোদা প্রশস্তির সঙ্গে কৌতূহলী পাঠক শিবমহিম্ন স্তোত্র মিলিয়ে নিতে পারেন।

'অসিতগিরি-সমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং।
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং।
তদপি তবগুণানাং ঈশ! পারং ন যাতি॥'

কালো পাহাড় গলে গিয়ে কালি হয়ে যদি সাতসমুদ্র ভরে দেয়; স্বর্গের কল্পতরুর শাখা যদি লেখনী হয়; কাগজ যদি হয় সমগ্র পৃথিবী আর স্বয়ং সরস্বতী যদি সেই লেখনী ধরে অনন্তকাল লিখে যান, তথাপি হে মহেশ্বর! তোমার গুণের শেষ পাবে না।

বাদশাহ্ আকবর

আকবরের পিতৃদেব হুমায়ুন ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়েও শৌর্যে তাঁর মহান্ বংশের গৌরব রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর বংশধারায় আগত সংস্কৃতি ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ এবং সূক্ষ্ম শিল্পবোধ চাঘতাই রক্তের দুরন্ত নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও তাঁকে মহিমান্বিত করেছিল। স্বয়ং যিনি বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী তিনি কেমন করে পুত্র আকবরের বিদ্যানুশীলনে পরাঙ্‌মুখ হবেন? বাল্যে তিনি পুত্র আকবরকে সুশিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। খেলাধূলা এবং জন্তু জানোয়ার বশীভূত করার কৌশল আয়ত্ত করাকেই বালক আকবর সবচেয়ে সেরা কাজ মনে করেছিল। অত্যন্ত হিংস্র প্রাণীকে বধ, উচ্ছৃঙ্খল মত্ত হস্তীকে সুকৌশলে বশীভূত করা—এই সব ব্যসনে প্রমত্ত থেকেই কৈশোরে তিনি পিতৃদেবকে হারালেন। ভাবী ভারতেশ্বর হয়ে রইলেন নিরক্ষর। কিন্তু যত্নসিদ্ধ বিদ্যা নিষ্ফল হয় না। উদ্ধতকে বশীভূত করার কৌশল তাঁর উত্তর কালের বাদশাহী জীবনে ফলপ্রসূ হ'য়েছিল। বাধায় নিষ্ঠুর, মৈত্রী ও আত্মসমর্পণে উদার আকবর ইতিহাসে অতুলনীয় হয়েছিলেন। আকবর চরিত্র বিচিত্র তরঙ্গের মহাসিন্ধু—একটুতেই উদ্বেল ক্রোধ, তাতে অতিক্রান্ত ধৈর্যের বাঁধ, তারপর নিস্তরঙ্গ বক্ষে ক্ষমার প্রশান্তি; অন্তরের গূঢ় কক্ষে মরমী সাধক, বাইরের প্রকাশ ক্ষেত্রে সমন্বয়ের উদ্‌গাতা।

সমরক্ষেত্রে নির্মম ও অপ্রতিহত, বিদ্বেষে ক্ষমাহীন; কিন্তু আত্মসমর্পণে বৈরমুক্ত ও ক্ষমাসুন্দর। একদিকে তিনি চরম ভোগী, অন্যদিকে পরম ত্যাগী। আকবর চরিত্র সত্যই ইতিহাসের বিস্ময়।

প্রচলিত অর্থে যাকে বলা হয় প্রাতিষ্ঠিক বিদ্যা তা তিনি শিখলেন না, এমন কি তাঁর বিদ্যা সাক্ষরতার সীমাও স্পর্শ করল না। কিন্তু বিদ্যার যে অবশ্যম্ভাবী ফল জ্ঞান, সেই জ্ঞানের আলোকে তিনি ছিলেন ভাস্বর। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানী গুণীর 'সুহবত্' বা সাহচর্য তাঁকে বিশ্ববিদ্যায় জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল। ফতেপুরসিক্রীর 'ইবাদদ্‌খানা' প্রত্যহ বিদ্বজ্জন-সমাগমে মুখর হয়ে থাকত। পরস্পর বিবদমান ধর্মসমূহের সার সংগ্রহে নিয়ত আগ্রহী বাদশাহ্ ধর্ম আলোচনা করতেন মৌলানা, জেসুইট্ খ্রীস্টান ধর্মযাজক, হিন্দু পণ্ডিত ও অগ্নি উপাসক পার্সী ধর্মাচার্যদের সঙ্গে। মিঞা-তানসেন এবং বৈজুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা যেমন প্রচলিত তেমনি বাদশাহ আকবরের রাজসভায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সঙ্গে অগ্নি উপাসক পার্সীর অলৌকিক মন্ত্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বৈদিক মন্ত্রবলে একটি চাকা শূন্যলোকে তুলে দিলেন। জরথুস্ত্রীয় অগ্নি-উপাসক পুরোহিত অবেস্তার মন্ত্রবলে তাকে শূন্যলোক থেকে নামিয়ে আনলেন।[১] এটাকে বলা যায়, দুই যজ্ঞসূত্রের লড়াই। হিন্দু ব্রাহ্মণের গলায় উপবীতসূত্র, আর পার্সীর কোমরে বাঁধা থাকে 'কুস্তি'—যা হচ্ছে কটিবদ্ধ পবিত্রসূত্র। লড়াইটা জমেছিল ভাল। আকবর কত উদার! সেই যুগে পার্সী ও খ্রীস্টান জর্জিয়াবাসীদের অবিশ্রান্ত লড়াই হতো। মুসলিমরা দুটো জাতিকেই ঘৃণাভরে বলতো 'গব্‌রান্'। "দর্ আন্ সংগলাক্ আন দদান্ করদা জাই। রো তংগাহ্ গবরান্-এ-মরদম্ রবাই।" সেই কাঁকরভরা শূন্য প্রান্তরে দুটো পশুর জাত নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। 'গব্রান্' ধর্মভ্রষ্টদের মানুষ চুরির অমেধ্য দেশ ওটা।

নানাধর্মের নানা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেও অন্তরের অন্তরালে বাদশাহ্ ছিলেন সমন্বয়বাদী ও মরমী সূফী। ভারতেশ্বর অখণ্ড ভারতকে

১। পিলু নানাবতি—'The Parsis' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত। [সংস্করণ—National Book Trust]

সার্থক করতে এক সমন্বিত ধর্মের ফরমান দিলেন, তার নাম 'দীন ইলাহী'। এ অভিনব ধর্ম ব্যর্থ হ'য়েও সার্থক হয়েছে; চিরকালের মানুষের মধ্যে ধর্মচিন্তায় ঐক্য বুদ্ধি ও সহনশীলতা জাগ্রত করে রেখেছে। ভারতের কল্যাণে নিত্যপ্রবুদ্ধ বাদশার স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে যায় নি। আকবরের মধ্যে ছিল বিশ্বধর্মের সত্যাস্পৃহালুতা, এরই নাম—"সিলাহ-এ-কুল" বা বিশ্ব সমন্বয়—reconciliation of all. অন্তরে লালিত এই তপশ্চর্যার সাক্ষাৎ ফল এসেছিল চতুর্থ পুরুষে—শাহ্‌জহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোর মধ্য দিয়ে। তাঁর "মজমা' উল্ বাহ্‌রায়ন্" বা দুই সমুদ্রের সম্মেলন, সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। আকবর বুঝেছিলেন, এই ভারত সমন্বয়ের মুক্তভূমি। ধর্মসম্প্রদায়ের তিক্ত কলহ এর মর্যাদাকে শুধু আহত ও অপমানিত করবে। ভারতের আকাশে বাতাসে এমন কিছু আছে যা মানবাত্মার সনাতন প্রেমকে অতি সহজে চিরকাল উজ্জীবিত করে রাখতে চায়। এই পৃথিবীতে য়ুনানী সভ্যতা, রোমের সভ্যতা ধূলায় শেষ শয্যা রচনা করেছে; কিন্তু সমন্বয়ের মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাতেই ভারত দীর্ঘকাল বেঁচে আছে। আকবরের তিন শতাব্দী পরে এক ভারতী কবি[২] বলেছেন—'য়ুনান্ মিসর রোম মিটগয়ে জহানসে। কুছ্ বাত্ হ্যায়্ কি, হস্তী মিট্ নহীঁ হমারী।'

শুধু ধর্মজগতে নয়, আকবরের মধ্যে স্বপ্নালুতা তাঁকে মাঝে মাঝে বিচিত্র জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছে। তখন অল্প-বয়স। বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে তিনি কৈশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধিতে বর্তমান, মাঝে মাঝে বাদশাহী তাঁকে ব্যঙ্গ করে একটা অলব্ধ অলৌকিক রাজ্যের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। কাল সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণ। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে আগ্রার সীমা অতিক্রম করে শূন্য প্রান্তরে ছুটে এলেন। ঘোড়া থেকে নামলেন। মুক্তবল্গা অশ্ব অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সম্মোহের সমাধি। আকবর বলেছেন তখন তাঁর দিব্যানুভূতি ঘটে গেল। ঘোড়া তখন ফিরে এসেছে। তিনি তখনই সেই অনুভূতির আস্বাদ পেয়ে নতুন করে তাঁর সংসারে ফিরলেন। তাঁর ভেতরে তখন এই ভাব—'আমি সম্রাট্ ভারতের ভাগ্য-

---

২। ইকবাল।

বিধাতা, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আমি আজ বাদ্‌শাহ।' এই জাতীয় দিব্য উচ্ছ্বাসে আলেকসান্দার মিসরের মরুপ্রান্তরে নিজকে ধন্য মনে করেছিলেন। 'আমি সূর্যপুত্র—অথবা স্বয়ং সূর্য। আমি অপ্রতিরোধ্য।' এই জাতীয় ভাবোচ্ছ্বাসে চিঙ্গীজ. খাঁ মাঝে মাঝে মূর্ছিত হ'য়ে পড়তেন, মূর্ছাভঙ্গে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা তলোয়ার তাঁকে অপ্রতিরোধ্য দিগ্‌বিজয়ী করে দিত। লৌকিক হোক্‌, অলৌকিক হোক্‌—এসব ঘটনা তাঁদের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনা।

এত ঘটা করে এসব বলার উদ্দেশ্য আকবরের ভাবাবেগকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য। এই প্রকার আবেগ থেকেই কবিতার সৃষ্টি হয়। এই প্রকার ভাবাবেগের জোয়ারে ভেসে আসা উপলব্ধি সত্যকে আবরণ মুক্ত করে দেয়। আকবর কবি হতে পারতেন, হন নি। আর একদিকে তিনি শুধু পশুপাখীর জীবন অধ্যয়ন করে ক্ষান্ত হননি; তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করে যেতেন মানুষের জীবন। রাজপ্রাসাদের মানুষ, ছদ্মবেশে দেখা রাজপথের মানুষ, ঈর্ষ্যাদ্বেষ, জিগীষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষত বিক্ষত রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের জীবন—সবই তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল। এই প্রকার জগৎ ও জীবন নিরীক্ষা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেয়। উপন্যাস তিনি রচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য মীমাংসার সূত্র ধরে নীরব কবিকে উপহাস করেছেন। 'যে কাঠ জ্বললো না, তাকে আগুন নাম দেওয়া যায় না, যিনি আকাশের দিকে চেয়ে আকাশের মতই নীরব হয়ে থাকেন তাকে কবি নাম দেওয়া যায় না।' সকলে এ রায় মেনে নেয় না। অপ্রকাশের অন্তরালে গভীর উপলব্ধিকে তারা মর্যাদা দিতে চায়। হায়, আকবর নিরক্ষর, অথচ জগৎ ও জীবন দর্শনে তাঁর সামর্থ্যের অভাব নেই। তিনি এ অভাব পূরণ করেছিলেন ষোল কলায়। বিদগ্ধ পণ্ডিত ও অসাধারণ শিল্পীদের তিনি একসঙ্গে বসিয়ে প্রাণভরে আনন্দ সম্ভোগ করেছিলেন। সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক অবুল ফজল, তাঁর অগ্রজ কবি ও দার্শনিক ফৈজী, রসরাজ কবি বীরবল, সঙ্গীতাচার্য তানসেন, ও ভূতপূর্ব মালবাধিপতি, পরম বান্ধবরূপে স্বীকৃত, রাজধানী সুরস্রষ্টা বাজবাহাদুর; একাধারে সূক্ষ্ম গবেষক, সুবিবেচক, জরীপ কার্যে প্রশ্নাতীত প্রাবীণ্যের অধিকারী মশ্‌রক্‌-

এ-দেওয়ান্ কবি তোডরমল ; বাহুবলে অদ্বিতীয় হয়েও পণ্ডিত ও কবি আবদুর রহীম খান্-ই-খানান্, এবং দুর্ধর্ষ অথচ মহাভক্ত, মহাবৈষ্ণব মহাশাক্ত অম্বরাধিপতি মানসিংহ। এঁরাই আকবরের রাজসভার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং এঁরা সকলেই কবি। সকলেরই কাব্য রচনা সে যুগে প্রসিদ্ধ ছিল। নানা ভাষায় এঁরা রচনা করেছেন। তার মধ্যে পার্সী, উর্দ্দু, সংস্কৃত ও হিন্দ্‌বী উল্লেখযোগ্য।

আকবরের প্রেরণায় আবুল ফজ়ল পার্সীতে তিনখণ্ডে তৈমুর থেকে আকবর পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস 'আকবরনামা' রচনা করেন। তিনিই আবার 'আইন-ই-আকবরী'তে আকবরের শাসন পদ্ধতির সুস্পষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। আবুল ফজ়ল সর্বদাই সালঙ্কার রীতি অবলম্বন করতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজ়ী ছিলেন কবি ও দার্শনিক। তাঁর রচিত 'খুতবা' রাজ্যাভিষেকের সময় বাদশা সর্বপ্রথম পাঠ করেছিলেন। সেই প্রচার হয়েছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িকভাবে। বহুধর্মভূয়িষ্ঠ ভারতের উপযুক্ত খুতবা সেটি। এর থেকেই বাদশার মনে অখণ্ড ভারতের জন্য এক বিশ্বধর্মের প্রেরণা আসে। হিন্দু মুসলিম—জাতিদ্বয়ের সাংস্কৃতিক মিলনের জন্য আকবর সংস্কৃতে রচিত হিন্দু শাস্ত্রগুলি পার্সীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। তাঁর দরবারে আমীর খুসরো প্রবর্তিত সঙ্গীত ধারার চেয়ে বেশি অভিনন্দিত হতো বিশুদ্ধ ভারতীয় রীতি। আকবরেরই উৎসাহে পিতামহ বাবুরের 'বাবুরনামা'কে তুর্কী ভাষা থেকে পার্সীর রূপসজ্জায় সাজিয়ে দিলেন আবদুর রহীম খান-ই-খানান। নিরক্ষর বাদশা আকবরের অমর কীর্তি এই সব। তিনি গানের মজলিসে শাস্ত্রীয় আলোচনায় মেতে উঠতেন। বাদশা অথর্ব বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন গণিত লীলাবতী পারসীতে তরজমা করালেন। তাঁরই উৎসাহে অপর ঐতিহাসিক নিজামউদ্দীন রচনা করলেন 'তবকত্-ই-আকবরী।' বদাউনী রচনা করলেন—'মুন্তখাবুৎ তবারিখ্' বা ইতিহাস সঞ্চয়ন। গ্রন্থখানা আকবর সম্বন্ধে প্রামাণিক রচনা।

ষোড়শ শতাব্দী সঙ্গীত ও কাব্যকলার পুনরুজ্জীবন কাল। ধর্মের জগতেও তখন সহনশীলতা ও সমন্বয় বুদ্ধি জাগ্রত হ'য়েছে। বাদশা আকবর যখন সিংহাসনে তখন উগ্র সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এই কালেই আবির্ভূত একাধারে ধর্মনেতা এবং সঙ্গীতের অভিনব শিল্পীবৃন্দ

—তুলসীদাস, সুরদাস, হরিদাস। নিশ্চিন্ততা থেকেই সাহিত্য সেবার অবসর মিলে। আমার তো মনে হয় তখন আমুজগার থেকে বকীল, মীরবখশী থেকে দেওয়ান, খান-ই-খানান থেকে কাজী উল কুজা.ত্ পর্যন্ত সকলেই কিছু না কিছু রচনা করতেন। অনুমান যদি সত্য হয় তবে স্বয়ং বাদশার কিছু কিছু মৌখিক রচনা অবিশ্বাস্য হতে পারে না। শাহ্ আকবর অন্তরে সূফী প্রেমিক। লায়লা ও মজনূ নিয়ে বহু কবি তাঁদের নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। আমরা ইতিপূর্বে সেই সব কবির পরিচয় দিয়ে এসেছি। বাদশাহ্ আকবর সেই প্রচলিত প্রেমগাথা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন। সেই আলোচনা করে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। আবুল ফজ.লের কৃপায় বাদশাহ্ আকবরের একটি কবিতা আমরা পেয়েছি।—

নীস্ত্ জি.নজ.ীর-ই-জনূন দর গরদন-ই-মজনূন্ জ.ার।
ইশক. দস্ত্-ই-দূস্তী দর গরদনশ্ আফগন্দাহ্ অস্ত্॥

লায়লার প্রেমে আত্মহারা মজনূন তার মূঢ়তার জন্য দুর্ভোগ ভোগেনি। তার গলায় যে প্রেমের ফাঁস পড়েছিল পৃথিবীর সাধারণ মানুষ তাকে দেখেছে জি.নজ.ীর-ই-জ.ার বা দুখের শেকল রূপে। ওরা ভুল বুঝেছে। মরমীরা জানে এই প্রেমের বন্ধনই বঁধূর কণ্ঠালিঙ্গন—দস্ত্-ই-দূস্তী। এই পাশবদ্ধ হওয়ার ভাগ্য সবার জীবনে আসে না। কাব্যগাথা শেষ করলে বোঝা যায় মজনূন্ প্রেমের অদ্বৈতসত্তায় আত্মাহুতি দিয়ে ধন্য হয়েছিল। অদ্বৈতের কেন্দ্রচ্যুতির ভাবনাটাই ভ্রম বা মায়া। আমরা আছি, তাতেই আছি। এই বোধ এসেছিল প্রেম নামক অনির্বচনীয় অনুভূতির মধ্য দিয়ে। প্রেমই অমৃত লোকের অঙ্গুলিসঙ্কেত দিয়েছিল—অপর কেউ নয়। এইজন্য ইশ্ক. হলো দস্ত্-ই-দূস্তী, বন্ধুত্বের বাহুপাশ। তাই বেঁধেছিল মজনূনের কণ্ঠকে, দুঃখের জি.নজ.ীর নয়।

বলেছি শাহ্ আকবর শুধু নিখিল ধর্মের আগ্রহী শ্রোতা ছিলেন না, অন্তরে তিনি উপাসনা করেছিলেন সূফীদের প্রেম সাধনাকে। করেছিলেন বলেই 'লায়লা মজনূন্' নামক প্রেমগাথা তার সবটুকু মর্ম নিংড়ে দিয়েছিল আকবরের হৃদয়ে। নিরক্ষর আকবর স্মরণীয় ঐতিহাসিক পুরুষ।

আবদুর রহীম খান্-ই-খানান্

হুমায়ুনের অভাবিত মৃত্যুর পর তেরো বছর বয়সে আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। তাঁর অভিভাবক হলেন পিতৃবন্ধু অসমসাহসিক দুর্জয় সেনাপতি বৈরাম খান্-ই-খানান্। উপযুক্ত হ'য়ে আকবর নিজহস্তে শাসন-ভার গ্রহণ ক'রে সপুত্রক বৈরাম খাঁকে মক্কা যাত্রার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। পথিমধ্যে বৈরাম খাঁ নিহত হ'লেন। আকবর কালবিলম্ব না ক'রে বৈরাম-পুত্র রহীমকে রাজধানীতে নিয়ে এসে তার প্রতিপালনভা'র গ্রহণ করলেন। রহীম তখন বালক। এই বালক উপযুক্ত হ'য়ে আকবরের অত্যন্ত স্নেহভাজন সেনাপতি হলেন এবং স্বর্গীয় পিতারই উপাধিতে ভূষিত হ'লেন। গুজরাট অভিযানে তিনি আকবরের সুদক্ষ সহায়তা ক'রে তাঁর হৃদয় জয় করেছিলেন। তাঁরই সুদক্ষ সৈন্য চালনায় গুজরাটের সুলতান মুজ.ফর পরাজিত হন। এর পর থেকে আকবরের সভায় আবদুর রহীম খান-ই-খানান একটি বিশ্রুত নাম। এ নামের মর্যাদা তিনি আপন চরিত্র দ্বারা সর্বদা রক্ষা ক'রে চলেছিলেন। তাঁর জীবনে বিপর্যয় আসে জাহাঙ্গীরের আমলে। সে কথা পরে বলব।

আবদুর রহীম শুধু যশস্বী সেনাপতি ছিলেন না, তিনি নানা বিদ্যায় ভূষিত ছিলেন। ভাষায় পারদর্শিতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। তিনি তুর্কী, আরবী, পার্সী, সংস্কৃত ও হিন্দ্.বীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। সে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন ক'রেছেন তিনি সব কটি ভাষায় কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। 'বাবুরনামা'কে তুর্কী ভাষা থেকে তিনি পার্সীভাষায় অনুবাদ ক'রেছিলেন। তিনি স্বয়ং কবি এবং কবিকুলের উৎসাহদাতা। উরফী, ফৈজ.ী, নাজি.রী, শকীবী, হয়াতী, নবই ও কুফ.রী তাঁরই উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য হ'য়েছিলেন। এঁরা সেকালের ভারত-বন্দিত কবি ও দার্শনিক। "রহীম সত.সঙ্গ" খান্-ই-খানানের প্রসিদ্ধ এবং মনে হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। এই কাব্য হিন্দীভাষায় রচিত। কবি

রহীম আরবী, পার্সী, হিন্দী, সংস্কৃতে যেন চতুরানন। 'চতুর্মুখ মুখাম্ভোজ-বনহংসী' সরস্বতীর মতই তাঁর সুললিত বাণী। রহীম পেশায় সেনাপতি হ'লেও রচনার কলাকৌশলে যেন স্বয়ং বাক্‌পতি। তাঁর চুয়াত্তর বছর পরিমিতজীবন ভাষায় ও সাহিত্যে তার অনলস সাধনার স্বাক্ষরে উজ্জ্বল হ'য়েছিল। একাধারে বীররসে উদ্দীপ্ত এবং হাস্যরসে উচ্ছল কবি গঙ্গ ছিলেন তাঁর পরম সুহৃৎ। আবদুর রহীমের রচনায় নানা রসের প্রকাশ থাকলেও শান্তরসের প্রাবল্য অধিক। জগৎ ও জীবনকে তিনি নির্লিপ্ত উদাসীন দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রথম জীবনের রাজানুগ্রহ কদাচ তাঁকে উদ্বেল, উল্লসিত বা মদোদ্ধত করেনি।

অজস্র দানে তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছেন। তাঁর বদান্যতার কথা ইরানেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ইরানী কবিরা বলতেন—

ভারত টানিছে, কবিদল আজ ইরান ছাড়িয়া বাঁধিবে ঘর।
মান ও খ্যাতির উদ্দাম নেশা ভুলিয়ে দিয়েছে আপন পর।

ইতিবৃত্তকার শিবলী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শিরুল্ আজ.ম'-এ উল্লেখ ক'রেছেন—

হম চু আ'জ.ম্-এ-সফর-এ-হিন্দ্
কেহ্ দর হরদিল হস্ত্।
র.ক্স্-এ-সরদাই তু দরহীচ্
সরী নীস্ত্ কেহ্ নীস্ত্॥

সকলের মাথায় আজ প্রবাসী হ'য়ে লাভের নেশার উদ্দাম নৃত্য চলছে। ঠেকিয়ে রাখবে কাকে? বাস্তবিক পক্ষে ষোড়শ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জহান এমন কি অনমনীয় ধর্মান্ধ ঔরংজেবের কাল পর্যন্ত ভারত পারস্য থেকে আকর্ষণ ক'রেছে কলাকুশল কবি, নিপুণ শিল্পী এবং প্রতিভাবান্ ঐতিহাসিকদের। ঐতিহাসিক বদাউনী অন্তত একশো সত্তর জনের আগমন উল্লেখ ক'রেছেন। এঁরা রক্তে খাস পার্সী— জন্ম অবশ্য কারো ইরানে, কারো ভারতে। শিবলী তাঁর 'শিরুল আজ.ম্' গ্রন্থে ইরান থেকে আগত ভারত-লুব্ধ একান্ন জন কবি ও সাহিত্যিকের নাম লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। এঁরা সকলেই আকবরের সভায় সমাদৃত হ'য়েছিলেন। 'উরফী' এই সংক্ষিপ্ত

হিন্দুস্তানেই রফতানি করব। কাব্যজগতের বোঝার পরিধি এখানে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে; আমি দেখছি ভারতবর্ষের খান্-ই-খানান্ ভিন্ন সমঝদার ক্রেতা আর কেউ নেই।

এই কবিবিলাপের মধ্য দিয়ে একদিকে ষোড়শ শতকে কবিসমাজের লালন-পালনে ইরানের অনীহা এবং ভারতের আগ্রহ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। অন্যদিকে মহানুভব, অসমোর্ধ্ব দাতা, কবিকুল-সুহৃদ্, কাব্যরসবেত্তা ইব্রাহীম্ খান্খানানের অসামান্য চরিত্র উদ্ঘাটিত হ'য়ে উঠেছে।

দুঃখের কথা, মহানুভব আকবরের উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীর খান্খানানের সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছিলেন। অপরাধ? সে কথা বলতে হ'লে মুঘল যুগে দাক্ষিণাত্য সম্প্রসারণের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বলতে হয়। উত্তর ও মধ্য ভারতে মুঘল শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত করার চেষ্টা করেন। সুযোগও ছিল, কারণ আত্ম-কলহে দাক্ষিণাত্যের সুলতানরা তখন হীনবল। তখনকার প্রসিদ্ধ দক্ষিণী রাজ্যগুলি হচ্ছে—আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বেরার ও খান্দেশ। আহম্মদনগর বিজয়ে আবদুর রহীম এবং পর পর দুই শাহ্জাদা মোরাদ ও দানিয়ালের যৌথ সৈনাপত্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু দাক্ষিণাত্য অন্তর দিয়ে মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেনি। এ বিষয়ে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত সুদীর্ঘ অভিযানগুলি প্রমাণরূপে রয়েছে। আমাদের আসল কথা আবদুর রহীমের ভাগ্যবিপর্যয়। আকবরের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৬১০ সালে আহম্মদনগরের কাফ্রী মন্ত্রী মালেক অম্বরের পরিচালনায় দুর্জয় আহম্মদনগর আবদুর রহীমের বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করে দেয়। মুঘলসম্রাট জাহাঙ্গীর অত্যন্ত বিরক্ত হন। আবদুর রহীমের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে তখন থেকে। জাহাঙ্গীর দক্ষিণ অভিযানের ভার অর্পণ করেন আপন পুত্র পারভেজ ও খুররমের উপর। সৈনাপত্য ও রাজনীতিতে অপ্রয়োজনীয় আবদুর রহীম ক্রমশ কোণঠাসা হ'য়ে সর্বস্ব হারালেন। তখনকার দিন-গুলিকে কবি রহীম বড় করুণভাবে আত্মকথায় রূপ দিয়েছেন। শান্ত-রসিক কবির আপন ভাগ্যের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ নেই। আছে শুধু বন্ধুদের প্রতি কাতর মিনতি। আত্মগ্রহণের আকুতি নেই, আছে আত্মদানের অসামর্থ্যে করুণ বেদনা। তিনি বলছেন খোদার দানে ধন্য রহীম আজ

কর্মফলে ভাগ্যবিড়ম্বিত। আল্লাহ্ আমার হাতখানা তুলে ধরার ক্ষমতা রাখলেন না। বন্ধুরূপে প্রার্থী হ'য়ে আর আমাকে লজ্জিত ক'রো না; আজ রহীম নিজেই মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ফিরছে; সহায় নেই, সঙ্গতি নেই। বিদায় বন্ধুগণ বিদায়!

অব রহীম দরদর ফিরে, মাঁগে মধুকরী খাহি।
ইয়ারোঁ ইয়ারী ছোড় দো, অবরহীম বোহ নাহি॥

উরফী শীরাজ়ী

উরফী যাঁর সংক্ষিপ্ত নাম, তাঁর আসল নাম জমাল-উদ্দীন মহম্মদ। তাঁর পিতা ছিলেন বদর উদ্দীন। উরফী ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর জন্ম শীরাজ় নগরে হলেও তিনি ভারতেই সুপ্রসিদ্ধ হ'য়ে ওঠেন। তুর্কিস্তান ও হিন্দুস্তানেই তিনি অভিনন্দিত এবং চিরস্মরণীয়। ইরানে তাঁর স্বীকৃতি এবং পুরস্কৃতি ছিল না। আমরা পূর্বে একবার বলে এসেছি, ভারত তখন ইরান থেকে শিল্পী ও কবিদের আকর্ষণ করে আনছিল। কবি কসৌরীর কথায়—

'কি দর ইরান্ কসী নায়িদ পদীদার।
কি বাশদ্ জিন্স্-ই-মা'নী রা খরীদার॥
দর ইরান্ তলখ্ গুশ্ত কাম-ই-জানম্।
বরায়িদ্ শুদ্ সূয় হিন্দুস্তানম্॥

উরফীও তেমনই একজন ভারত অভিযাত্রী কবি। তখন বৈরাম খাঁর পুত্র আকবরের স্নেহপাত্র আবদুর রহীম খান্খানানের নানাদিকে খুব সুনাম। ইরানের কবিরা জানতেন—ন বুবদ্ দর সখুন দানান্-ই-দৌরান্। খরীদার-ই-সখুন জুজ় খান-ই-খানান্॥ কাব্যসংসারে খান্খানান্ ছাড়া আর কাউকে কাব্যসামগ্রীর ক্রেতা দেখি নাই। উরফী এলেন, শীঘ্রই রাজকবি আবুল ফজ়লের ভ্রাতা ফৈজ়ীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি বন্ধুরূপে গৃহীত হ'লেন। সে বন্ধুত্ব ছিল একেবারে গলায় গলায়।

শিবলী নু'মানী তাঁর শিরুল আজম গ্রন্থে উভয় কবিবন্ধুর অশেষ গুণগান করেছেন। তাঁদের অত্যাগসহন বন্ধুত্বের ইতিহাস আছে—'ফয়জ়ী আইআহ্ উরফী হমা'বামদর, সর জুমলহ্ আখর আল'জ়মানন্দর' ফয়জ়ী এবং উরফী গলায় গলায় ছুটতেন। তাঁরা ছিলেন পরবর্তী যুগের নায়ক। ফয়জীর ছিল অসামান্য বাক্‌পটুতা এবং সর্বদাই তাজা বচন-কৌশল। উরফীর ছিল বচনের মাধুর্য এবং সাবলীল অপ্রতিহত বাক্যের প্রবহমানতা। এ হেন দুটি বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটেছিল সামান্য একটু ঘটনায়। রসিকতাও প্রতিকূল সময়ে বিধিবশে বন্ধুত্বের সামরস্যে বৈরস্য ঘটায়। অথবা কে জানে, দুই বন্ধুর কথায় মর্মন্তুদ কোন শ্লেষের তীক্ষ্ণ বাণ ছিল কি না! ফৈজ়ী রাজকবি। তিনি কর্মবিরামের দুর্লভ অবসরে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন—একটি কুকুরের বাচ্চা নিয়ে। উরফীর শুভাগমন হ'লো। তিনি রাজকবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—মখদূম্ জ়াদাটি কে? মখদূম্ মানে হয়—প্রভু। উরফীর কথায় শ্লেষ অনুভব করলেন ফৈজ়ী। ফৈজ়ী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, উরফী!—কেন জান না, এটিতো প্রসিদ্ধ কুকুর শাবক। উরফী মানে প্রসিদ্ধ। উরফী হঠবার পাত্র নন—বললেন—'মুবারক বাশদ্'—নামটা পবিত্র বটে—প্রসিদ্ধও বটে। শেখ মুবারক ছিলেন ফৈজ়ীর পিতৃনাম। এই ঘটনায় তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের শৈথিল্য দেখা দিল।

প্রসঙ্গত বলি ঐতিহাসিক Vincent Smith ফয়জ়ীর প্রভূত প্রশংসা করে গিয়েছেন। শাহ্ আকবর আশ্রয় দিতেন অনেককেই; কিন্তু ফৈজ়ীর তুলনা ছিল না। তিনি কবি, পণ্ডিত, দার্শনিক, সুবিবেচক। সর্বোপরি হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। সমদর্শিতার গুণ অবশ্য উরফীতেও ছিল। কিন্তু উরফী ছিলেন উদ্ধত। তাঁর ঔদ্ধত্যের একটি প্রমাণ দিই। তিনি বলেছিলেন,—শীরাজ়ের মাটিতে শেখ সা'দীর এত গর্ব কেন জান? তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন—এই শীরাজ়েই ভূমিষ্ঠ হবে—উরফী। আমি যে আসছি, তাই সা'দীর গর্ব—না হ'লে ওটা হতো না—গর নমীদানস্ত্ বাশদ্ মাওলদ্ রো মা'রুআএ মন্।

উরফীর রচনায় সর্বপ্রকার রূপই সুবিদিত—কসীদহ্, গ়জ়ল, কিতা। দুখানা মসনবী কাব্যও তিনি রচনা ক'রেছেন। মসনবীতে

পূর্বসূরিদের অনুকরণ সুবিদিত। উরফীর ছিল ললিতকণ্ঠ, শ্রুতিমধুর সুর এবং কাব্যের আবৃত্তিতে অন্তর বাহিরের এক অনিবার্য হিন্দোল। উনিশ শতকের বাঙ্গালী কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কথা মনে পড়ে। তিনি যখন কবিতা আবৃত্তি করতেন, তখন মনে হতো তাঁর সর্ব দেহ-মনে সরস্বতী স্বয়ং আবির্ভূতা হ'য়েছেন। উরফীর চিন্তাধারায় সর্বদা ভারতীয় বোধ। মনে হতো যেন আমীর খুসরো আবার আবির্ভূত হ'য়েছেন। 'উরফী তরজীবন্দেও অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর দীবানে বহু-রূপের রচনা থাকলেও প্রত্যেক রচনায় তিনি স্বয়ংসিদ্ধ স্বপ্রতিষ্ঠিত কবি। এইজন্যই উরফীকে আকবর-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়ে থাকে।

অপার্থিব চিন্তার ক্ষেত্রে উরফী সমন্বয়বাদী। এইজন্য হিন্দু মুসলিমে তাঁর ঐক্যদর্শনের কথা পূর্বে বলে এসেছি। এটা আকবরের যুগধর্ম। উরফী অন্তরে সূফী সাধক। তাঁর নফ্‌সিস্‌য় নামে সূফীতত্ত্বের গবেষণা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ হ'য়ে আছে। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে লাহোরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। উরফীর অসাধারণ বাক্‌পটুতার সঙ্গে ছিল অযত্নসিদ্ধ বাক্‌চাতুর্য। সব মিলে তাঁর বাক্যভঙ্গিমা হ'তো অভিনব। নব নব শব্দ নির্মাণ এবং উদ্ভাবনে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর অলঙ্করণ হ'তো বাক্যের সংযোজনে অপৃথক্ যত্ন-সিদ্ধ।

গোঁড়া মুসলমানরা ফয়জী ও উরফীর একজনকেও দেখতে পারতো না। ফয়জীর মৃত্যুতে তাঁরা উল্লসিত হয় এই ভেবে যে, যাক্ একটা কুকুর নিকৃষ্ট পন্থায় এই পৃথিবী থেকে চলে গেল। 'সগী অজ. জহান্ রফ্‌ত্ বহাল-এ-ক.বীহ.'—কারণ ফয়জী সমন্বয়বাদী, কাজেই বিধর্মী; উরফীর সূফীমতে আস্থা স্থাপনেও গোঁড়া সম্প্রদায় তাঁকে বিদ্বিষ্ট ক'রে তুলেছিল, অথচ উভয়েই পণ্ডিত। বিচিত্রবিদ্যা সংগ্রহের অমূল্য গ্রন্থশালা ছিল ফয়জীর—সে গ্রন্থশালায় সংগৃহীত ছিল চার হাজার ছ'শ' হস্ত-লিখিত পুঁথি। বহু পুঁথি আসল গ্রন্থকারের, নকল নয়।

চিন্তাবীর উরফীর গদ্য রচনা হ'লো তাঁর সূফীতত্ত্ববিষয়ক গদ্যগ্রন্থ যার নাম 'নফ্‌স্‌িসয়্'।

উরফীর সূফী চিন্তাধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।

"তাঁর চরণধূলার তলে সব প্রেমিক তাদের মাথা নত করে দেয়। তাদের মুক্তিপণ তারা নিজেরাই ঠিক করে নেয়—স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন।

ঈশ্বর একথা জানেন, যদি আমার ঐকান্তিক ভালবাসা পাপ হয়, তবে এই পাপ হিন্দু মুসলমান তাদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে যুগে যুগে অনুষ্ঠান করে চলেছে। আমার নিজের এই পাপে তাঁরা সবাই একসঙ্গে মগফুর বা ক্ষমাপ্রাপ্তের মর্যাদা লাভ করবেন।

যদি বল এই ভালোবাসা বিধিবহির্ভূত দুরারোগ্য ব্যাধি বিশেষ, তবে বলব, তাঁর স্বর্গলোক সর্বব্যাধির আরোগ্য নিকেতন। সেখানে কোন ব্যাধিগ্রস্ত শৃঙ্খলিত হয়ে শাস্তি পায় না।

ফিনিক্স পাখীর জীবনের শেষ নেই। পাঁচশো বছরের জীর্ণ দেহ দগ্ধ ক'রে সে নবজীবন লাভ ক'রে পূর্ববৎ বলশালী হয়। চিরাচরিত মতে বিশ্বাসী এবং পরমতাসহিষ্ণু সেই অমর পক্ষী বার বার তার পাখার ঝাপটা দেয়। ওই অমর পাখী দেখে প্রেমধর্মে বিশ্বাসীরা ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নেয়; ধর্মে সূফীরা পুরাতনের উত্তরাধিকার বরদাস্ত্‌ করে না।

হে ঈশ্বর! যদি সন্তসাধুরা আমাদের ভুলভ্রান্তিকে দুর্লঙ্ঘ্য ভাগ্যদোষ ব'লে তোমার কাছে পেশ করেন, তবে আমরা কৃতার্থ হব।

আমি তো কতভাবে পাপী! এবং জানি আমার প্রার্থনা অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হতে পারেনি। জানি, জানি আমার প্রেমময় আমার সে অপরাধ ক্ষমা করবেন।

তুমি নিত্য কিছু সদাচার এবং পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করে যাও। তুমি জান না, যখন তাঁর কাছে তোমাকে দাঁড়াতে হবে, তখন হয়তো, তোমার সদ্য অনুষ্ঠিত পাপের অনুতাপ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সময় থাকতে পুণ্য করে যাও।

উরফী আজও বিদেশী। স্বদেশে গিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালে 'উরফী জানে তিনি এই বিদেশীকে এই বলে ক্ষমা করবেন যে, সে সর্বদা ম.াশূকের আলোচনায় যোগদান করেছে।

ফৈজী

ফৈজী বিশ্রুতকীর্তি আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আগ্রায়। এঁর পিতার নাম ছিল শাহ্ মুবারক। ১৫৬৭ সালে কোন শুভদিনে বাদশাহ আকবরের সঙ্গে ফৈজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনাতেই আকবর মুগ্ধ হয়ে যান। আকবর পূর্বেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই পুরুষটির কথা শুনে আসছিলেন। তাঁর শ্রুতিগোচর হয়েছিল ফৈজী কবি এবং দার্শনিক। আলাপের অবসরে এই দার্শনিকের উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আকবর বিমুগ্ধ হলেন। রাজসভায় তিনি সাদরে গৃহীত হ'লেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বাদশাহ্ তাঁকে মলিকুশ শুআ'রা বা রাজকবির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজসভার গৌরব নিশ্চিতই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো; কিন্তু অবিমিশ্র সার্বজনীন আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সে কথা পরে বলব।

ফৈজীর উদার হৃদয় বাদশাহ্ আকবরের উদার হৃদয়ে মিশে গেল। হিন্দু মুস্লিমের দেশ এই ভারতবর্ষ। বাদশাহ অনুভব করতেন মহিমময় ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা বশেই তিনি ভারতেশ্বর। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই তাঁর সমান স্নেহ-ভাজন প্রজা। ভারত চিরকাল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে এক প্রেমধর্মে সম্মিলিত দেশ। মহান্ সম্রাটের এই ঔদার্যের অনুরূপ অভিভাষণ তৈরী ক'রে দিলেন ফৈজী। অভিষেককালে উপদেশাত্মক অভিভাষণের নাম 'খুতবা'। দীনদার ও কাফিরের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ সীমারেখা গোঁড়াসম্প্রদায় পছন্দ করেন। সুতরাং এই 'খুতবা' সমগ্র দেশবাসীকে সমান আনন্দ দিয়েছিল—একথা কিছুতেই বলা চলে না। সম্রাটের অসাম্প্রদায়িক 'দীন এলাহী' নামক সমন্বিত ধর্মে দীক্ষা সম্রাটের জীবদ্দশাতেই একশ' জনের ঊর্ধ্বে ওঠেনি—একথা ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই কার্যকারণ পরম্পরা বিশ্লেষণে 'খুতবা'র রচয়িতা ফৈজীকে অজাতশত্রু প্রিয়জনরূপে চিন্তা করার সত্যের অপলাপ ঘটে। ফৈজীর শত্রুর

অভাব ছিল না। সমগ্র গোঁড়াসম্প্রদায়টাই তাঁর ক্ষমাহীন শত্রুরাজ্য। অনেক দার্শনিক মনে করেন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ইহজীবনের মান-অভিমান এবং আক্রোশের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষও ক্ষমার দৃষ্টিতে সবকিছু দেখে থাকে। ফৈজীর অদৃষ্টে এটুকুও ঘটতে পারে নি। ঐতিহাসিক কথা আছে—ফৈজী যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন তখন কাসীক্. সে মৃত্যু দিবসটিকে অভিনন্দিত করলেন এই বলে—একটি কুকুর এই সংসার থেকে বিশ্রী আবর্জনার মত সরে গেল—ফৈজী বেদীনী চু মুরদক্ সালে ওকাতশ্ কসীহ. গুফ্ত—সগী অজ. জহান্ রফতহ্ বজালে ক.বীহ্—ভালই হ'য়েছে একটা নিকৃষ্ট মৃত্যুজালে অধার্মিক কাফির এইবার ধরা পড়েছে। এটা নিকৃষ্ট শ্বাপদের অগৌরবের মৃত্যু। এই মৃত্যু ঘটেছিল আকবরের মৃত্যুর ১২ বছর পূর্বে। মহান্ আকবরকেও এই কটূক্তির দুঃখ সহ্য করতে হ'য়েছিল।

শত্রুমিত্রে পরিবৃত প্রেম-বৈরমিশ্রিত ফৈজীর জীবনকথার সামান্য পরিচয় দেওয়া হ'লো। এইবার ফৈজীর কাব্য ও কবিতার কথা কিছু বলা যাক। ফৈজীর কাব্য ও কবিতা নানারূপে প্রকাশিত হ'তো। তিনি রচনা করেছিলেন কসীদা, গ.জ.ল, কিতা', তরজীবন্দ্। কবিতার নানারূপ তাঁর কবিহৃদয়কে ক্ষণে ক্ষণে আকৃষ্ট করতো—তাই তিনি নানা রূপের সেবা ক'রে গিয়েছেন। প্রসিদ্ধ কবি নিজ.মী গঞ্জবীর আদর্শ অনুসরণ ক'রে তিনি একখানা 'খামসা' রচনা করে গিয়েছেন। পঞ্চাবয়ব কাব্যের নাম হয় পার্সীতে 'খামসা'। এ যেন এক মহাকাব্য পঞ্চধারায় প্রবাহিত। এতে পাঁচটি আখ্যান আছে। তাঁর পঞ্চসর্গের নাম—(১) মরকজ.-ই-অদবার (২) সুলয়মান-বো বিলকীস্ (৩) নল বো দমন্ত্ (৪) হফত-কিশবার্ (৫) আকবরনামা।

ফৈজী ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। নল বোদমন্ত্ মহাভারতের উপাখ্যান 'নলদময়ন্তী'। খামসার উৎকৃষ্টতম সর্গ এটি। ফৈজী বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পার্সী অনুবাদ ক'রেছিলেন। তাঁর সমগ্র রচনাই সাবলীল ও সুললিত। খরাবাত্ গ্রন্থে ইরানী কবিদের প্রশংসা পরিচ্ছেদে জি.য়া পাশা বলেছেন—ফৈজীর ছিল তাজা কথার বাগ্‌বৈভব। প্রাণময় প্রেরণা ও রচনার বিশদ চারুকলা তাঁর রচনাকে সর্বদা উদ্দীপ্ত ক'রে রাখতো।

চারুকলার বিশদ প্রাণময়তার জন্যই রাজসভায় তিনি অভ্যর্থিত হ'তেন একটি বিশেষ পরিচয়ে। গুণীরা তাঁকে বলতেন "শীরীন-কলাম" যার অর্থ ফৈজী কবি 'সুভাষণরত্ন'। ফৈজীর একটি শোকগাথা আছে। তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে তিনি এটি রচনা করেছিলেন। সেই শোকগাথা থেকে মাত্র একটি চরণ উদ্ধৃত করছি। কবরের অন্ধকারে পুত্রকে স্মরণ ক'রে তিনি বলছেন—

বর খার রো খস্ কি বিস্তার
রো বালীন্-ই-খ্বাব-ইতুস্ত্।
অয় ইয়াসমীন্ ইজার-ই-সমন্-ইতন্ চিগূনয়ী।
তৃণকণ্টকে ভরা শয্যায় চামেলী-তনুটি রেখেছো কেন?

তোমার পিতা এ কথার উত্তর চায়।

মহামহিমান্বিত শাহ্ আব্বাস আকবরের রাজসভায় রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেছিলেন। সেই রাষ্ট্রদূত আকবরের প্রকাশ্য দরবারে সদম্ভে পাঠ করলেন—

'কাফ্রি সম্রাট্ খাস আফ্রিকার দেহরক্ষী নিয়ে গর্বিত, তুর্কিরা বড়াই করে তাদের শাণিত বর্শাফলকের। আকবর গর্ব অনুভব করেন তাঁর সিন্দুকভরা সঞ্চিত স্বর্ণে। কিন্তু, আমাদের শাহ্ আব্বাসের গর্ব হজরত আলীর তলোয়ার জুলফিকার নিয়ে।'

বাদশাহ্ আকবর মৃদু হাস্য ক'রে তাঁর রাজকবি ফৈজীর দিকে এর সদুত্তরের জন্য চোখ ফেরালেন। ফৈজী তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে উত্তর দিলেন —স্বর্গের গর্ব তার নদীতে—যার নাম সলসবীল, সমুদ্রের গর্ব মুক্তার জন্ম দিয়ে। আকাশের অহঙ্কার তার উজ্জ্বল নক্ষত্রমালায়। শাহ্ আব্বাস গর্ব অনুভব করেন আলীর তরবারি জুলফিকার নিয়ে। কিন্তু 'আকবর' এই নামটিতেই কত মহিমা একবার অনুভব করুন। স্মরণ করুন— "আল্লাহু আকবর"।

ফৈজীর অপর একটি সরস সপ্রতিভ মৌখিক রচনা—'বিধাতার অপূর্ব দুই দান-মহিমা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আলেকসান্দারের ছিল সুন্দর একখানা আয়না; আর বাদশাহ্ আকবরকে তিনি দিয়েছেন সূর্য।

সিকন্দরশাহ্ সেই আয়নায় শুধু নিজেকে দেখতেন। শাহ্ আকবর সূর্যমণ্ডলে ঈশ্বরকে দেখেন।

এমনি একটি ক্ষুদ্র রচনায় ফৈজী বলেন—আমাদের বাদশাহ্ পদব্রজে আজমীরে মৈন-উদ্দীন চীস্তীর মাজারে দেখতে এসেছেন। রাজা পায়ে হাঁটলে দোষ নেই। দাবা খেলায় রাজা পায়ে হাঁটেন।

লোভীরা সমুদ্রের শুক্তির মত! জলে ডুবে থাকলেও বসন্তে-ঝরা বৃষ্টির সামান্য এক বিন্দুর জন্য হাঁ করে।

জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান্

বাল্যপ্রণয় ব্যর্থ হয়েছিল। আকবর উদ্‌যোগী হ'য়ে বর্ধমানের জায়গীরদার আলিকুলী শেরআফগানের সঙ্গে জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম নূরউদ্দীনের বাল্য-প্রণয়িনী মেহেরউন্নিসার বিবাহ সম্পন্ন ক'রে দিলেন। আকবরের মৃত্যুর পরই নূরউদ্দীন জাহাঙ্গীর কৌশলে আলিকুলীর মৃত্যু ঘটিয়ে মেহেরকে রাজধানী আগ্রায় আনলেন; দীর্ঘ চারবছরে মনের দ্বিধা কাটিয়ে মেহের জাহাঙ্গীরের প্রধানা বেগম হলেন; জাহাঙ্গীর আপন নাম নূরউদ্দীনের সঙ্গে সঙ্গতি ঘটিযে অনুরাগের নামটি দিলেন নূরজাহান। নূরজাহানের মধ্যে বাল্যাবধি চারুকলা বোধ ছিল। কবিতা রচনায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। জাহাঙ্গীর নানা বিদ্যায় অনুরাগী ছিলেন। চারুকলা কবিতা ও অঙ্কন বিদ্যা তো বটেই কারুকলাতেও তিনি সে যুগে অসামান্য ছিলেন। আকবরের সমাধি সেকেন্দ্রায় পরিকল্পনা তাঁর; মুঘল যুগের স্থাপত্য এবং চিত্র সেযুগে জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছিল। তিনি তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী গ্রন্থের রচয়িতা। নিপুণ হস্তে ঘটনার বিবৃতি যেমন তিনি দিয়েছেন—তেমনি ক্ষণে ক্ষণে তিনি আত্মবিশ্লেষণ ক'রে চলেছেন। এতে ১৯ বছরের রাজত্বের ইতিহাস অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। প্রত্যেক গ্রীষ্মঋতুতে তাঁর কাশ্মীর বাস অভ্যস্ত হ'য়েছিল। সেখানে পশু পাখী ফুল—কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ ক'রে চলেছেন! দাবানলের মত জ্বলে ওঠা পলাশ ফুলের সৌন্দর্য তাঁর কাছে অনির্বচনীয়। কিন্তু ওই সুরায় আসক্তি, শেষে অহিফেনের নেশা এতবড় গুণীকে অকর্মণ্য

ক'রে ফেলেছিল। নূরজাহান শাহবানুই তখন সব। রাজকার্য পরিচালনায় তিনি, রাজকোষের মুদ্রায় তাঁর ছাপ। তখন তাঁর প্রায় আত্মবিলুপ্তির অবস্থা। এক কবিতায় তিনি তাঁর অবস্থা তুলে ধরেছেন—'অত্যগ্নি ধাবমান শলভ আমি। নিজের অস্তিত্ব রূপের বহ্নিতে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছি। ফুল বাগিচায় স্বেচ্ছাচার বুলবুল তো আমি নই—আর বুলবুলের মত কান্নাকাটিও করতে জানিনে—আমি আগুন দেখে মরণ ঝাঁপ দি'য়ে থাকি—

'বুল বুল নী-অম্ কে না'রাহ্ কুনম্ দর্দ-ই-সর।
পরবানা-অম্ কে সূজম্ বো দম্ বর্ নী আবরম্॥'

বুলবুল নই কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধরাব মাথা,
আমি শামা'পোকা এক ঝাঁপ দিয়ে মরিব হেথা।
আগুনে পুড়িব, দম ফেলিব না, কব না কথা॥

আর শাহবানু নূরজাহান্? দুঃখে জীবন শুরু, প্রথম প্রণয়ে দুঃখ। বিবাহোত্তর জীবন ব্যর্থ; আবার নতুন জীবন আরম্ভে মনের গহনে—অজানা রাজ্যে দুঃখ। সফল জীবনে আবার রাজনীতির ষড়যন্ত্রে দুঃখ। এসব বেদনার রাজ্য খুলে কাউকে দেখান যায় না; কেউ বুঝতেও পারে না। তাই স্বামীর এই শ্লোকের ভাবার্থ অনুসরণ ক'রে তিনি তাঁর জীবনের গোপন কক্ষে পদ সঞ্চার ক'রে দেখলেন। তাঁর অন্তরের কথা যেন—

'মোর হৃদয়ের বিজন গোপন ঘরে,
একলা র'য়েছো নীরব শয়ন পরে—
প্রিয়তম হে জাগো!'

জেগে দেখো আমার অবস্থা কি! আমি ধীরে ধীরে গলে পড়া মোমবাতি। প্রতিটি গলে পড়া ফোঁটার জ্বালা আমাকে নিরন্তর বহন করতে হচ্ছে। শামা'পোকা এক ঝাঁপে পুড়ে শেষ হয়, প্রতিক্ষণের মৌন জ্বালা সইতে হয় না—জীবন-বল্লভ জাহাঙ্গীর! আমার কথাটা বুঝতে চেষ্টা করো—

পরবানা মন নী-অম্ কে ব য়েক শুঅ'ল জান দিহম্।
শমা'অম্ কে শব ব সূজম্ বো দম্ নী আবরম্॥

শামা'পোকা নই, এক ঝাঁপে মরা, বুঝি না তাকে।
আমি মোমবাতি, পুড়ি সারারাত বুঝাব কাকে?
পুড়ি ধীরে ধীরে, কথাটি কহিনা দমের ফাঁকে।

পরিণত জীবনের এই নূরজাহান যে প্রথম জীবনে অব্যর্থ-লক্ষ্য শিকারী ছিলেন, একদা চার গুলিতে পর পর চারটি বাঘ শিকার করেছিলেন—তা মনেও হয় না। তিনি শেরআফগানের গৃহিণী হ'য়েছিলেন—নিজেও ছিলেন শেরআফগান্ বা 'ব্যাঘ্রনিক্ষেপকারিণী'। এইজন্য রসিকজনেরা বলতেন—যদিও নূরজাহান বাইরে থেকে দেখলে এক রমণী, পুরুষদলে দাঁড়ালে মহিলাটি শেরআফগান্—

নূরজাহান গরচে বসূরত্ জ.ন্ অস্ত্।
দর সূসফ্ মরদান্ জ.ন্ শের আফগান্ অস্ত্॥

নূরজাহান বুঝেছিলেন—রূপ, ঐশ্বর্য, শক্তি—সব শেষ উৎসবে সমাহিত হ'য়ে মাটিতে মিশে যেতেই মানুষের দেহ আশ্রয় করে। হারায় না কিছু—সে জানা কথা; এই বসুন্ধরার অক্ষয় সৌন্দর্য ও প্রাণ ভাণ্ডারে তা রূপান্তরিত হতে যায়। এখানে কিছুই ফুরায় না—এও যেমন সত্য, আবার সব ফুরিয়ে যায়—তাও তেমনই সত্য। নূরজাহান এই হারানোর বেদনাটা উপলব্ধি ক'রেই উৎসবের জন্য ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গ—এমন কি সামান্য পাখীকেও কোন কষ্ট দিতে চাননি।

জাহাঙ্গীরের মৃতদেহ তাঁরই লাহোরের প্রিয় পুষ্পোদ্যানে সমাহিত হ'য়েছিল। সেই ঐশ্বর্যে সমুজ্জ্বল সমাধি পার্শ্বে নূরজাহানও তাঁর পার্থিব দেহাবশেষ রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'য়েছিল। সেখানকার সমাধিলিপি তাঁরই নিজের রচনা। সে সমাধি শয্যায় কোন আড়ম্বর নেই।

বর মাজ.ার-এ-মাগরীবা নী চিরাগী. নীগুলী।
নাচার-এ-পরবানা সূজ.দ নী সেদায়ী বুলবুলী॥

আমাদের এই গরীব কবরে জ্বালিওনা কভু
একটি মোমের বাতি।

সেথায় যেন না, ফোটে কোন গুল, মিনতি আমার
রুদ্ধ শ্বাসের সাথী।
শামা'পোকা কেন পুড়িবে জ্বলিয়া? বুলবুল কেন
কাঁদিবে দিবস রাতি?

শাহ্ জহান্ ও মুমতাজ.মহল

শাহ্ জহান মুঘলরাজপরিবারের অন্দর ও বাহির মহলের ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন ক'রে আগ্রায় নিজেকে সম্রাট্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। জগদ্‌বিখ্যাত সুন্দরী নূরজহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী (আসফ্ খাঁর কন্যা) আলিয়া বেগম বা আরজুমন্দ্ বানু হলেন তাঁর মহিষী। তাঁর উপাধি হ'য়ে গেল মুমতাজ.মহল বা প্রাসাদভূষণ। উভয়ের দাম্পত্য প্রেম ছিল অসামান্য।

শাহ্ জহান সৌন্দর্যপ্রিয়, ঐশ্বর্যপ্রিয়, পত্নী-প্রেমিক এবং কাব্য-প্রেমিক। সর্বোপরি কথা, তিনি স্বয়ং কবি। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, তরুণ কবি, আলঙ্কারিক ও দার্শনিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন এবং সর্বদা কাছে কাছে রাখেন। জগন্নাথ পণ্ডিতও দিল্লীশ্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি বলেন—হাত তুলে দিতে জানেন জগদীশ্বর এবং দিল্লীশ্বর। কুঁচো ভুইঞা আর জমিদাররা কি দেবেন? তাঁদের দান শাক কিনতে আর লবণ কিনতে ফুরিয়ে যায়।

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ
অন্যৈর্নৃপালৈঃ পরিদীয়মানং শাকায় বা স্যাদ্ লবণায় বা স্যাৎ।"

শাহ্ জহানের পত্নীপ্রেম ও ঐশ্বর্যপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিতে তাজ.মহল ও ময়ূর সিংহাসনই যথেষ্ট।

সম্রাট্ ও সম্রাট্-পত্নীর বাক্‌চাতুর্য ও কবিত্বের সামান্য একটু নিদর্শন দিই। তখনকার দিনে আগ্রার রাজান্তঃপুরের ঘাট পর্যন্ত যমুনার জল উছলে পড়তো। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী যমুনার ফেনিল তরঙ্গ চূড়া ও শিলার

পিঠে তরঙ্গের উচ্ছলে পড়ায় দৃশ্য দেখছেন। আছাড় খেয়ে খেয়ে ঢেউগুলো আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। শাহ্‌জহান বলছেন—ওগো সুন্দরী! দেখ, দেখ তোমার চাঁদ মুখের লোভে যমুনা উত্তাল হ'য়ে ছুটে আসছে। সম্রাজ্ঞী তখনই উত্তর দিলেন—তা হবেও বা। কিন্তু দুনিয়ার অধিপতির (শাহ্‌জহান) রাঙা চোখ দেখে কাছে এসেও দুঃখে ক্ষোভে শিলার পিঠে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করছে। তুমি যে শাহ্‌জহান্, দুনিয়ার অধিপতি! ভয় যে আছে; কাছে আসতে সাহস পায় না।

আব্ অজ. বরায়ে দীদনত্ মী আয়দ্ অজ. ফরসাঙ্গহা।
অজ. হায়বত-এ-শাহ্‌জহান্ সর মীজ.নদ্ বর সাঙ্গহা॥

শাহ্‌জহান বলেন—এতদূর আসে যমুনার জল তোমারি মুখের লোভে।

মুমতাজ. বলেন—শাহ্‌জহান্ দেখে ভীত কলেবর শিলায় চূর্ণ ক্ষোভে॥

রসিক কবি শাহ্‌জহানের হঠাৎ একটি কবিতার টুকরো মনে আসতো। সেইসব খণ্ডিত অংশকে পার্সীতে বলে মিস্‌রা। অন্য কবিকে আবার সেই মিস্‌রা বা সমস্যাকে পূরণ ক'রে দিতে হয়। একবার শাহানশাহের এক টুকরো মনে এল। কবি-মন নিয়ে তিনি দেখলেন (কাল) কাক মুখের উপর থেকে উড়ে গেল—'জ.াঘ অজ. দহন পরীদ্'। এই শেষ চরণ নিয়ে পরিপূর্ণ একটি শ্লোক তৈরীর আদেশ জারী করলেন রাজ-কবিদের সভায়। কবিরা ঘন ঘন ঘর্মাক্ত হ'লেন; কিন্তু মিস্‌রা পূরণ করতে পারলেন না। অক্ষমতায় নতশিরে কবিদের মধ্যে একজন মাথা তুলে সমস্যা পূরণ করে দিলেন। তিনি পারলেন কারণ, কাককে ওষ্ঠের কৃত্রিম কাল তিল বলে বুঝতে পারলেন। সমস্যায় এমন চাতুরী থাকে। কবি বললেন—বুঝেছি,—চুম্বনে সযত্নে রচিত ওষ্ঠের কালো কৃত্রিম তিলটি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে গেল—

খালী কি বুদ বর লব অজ.আন শহদ্ মী চকীদ্
হনুগাম-ই-বুসহ্ দাদন্ আন খালরা গুজ.ীদ্।

দর অরুমহ্ বরীদ ব লব থালয়া ম দীদ্
হ.য়য়ান অজ. আন ব মান্দ, কি জ.াৎ অজ.দহন্ পরীদ্ ॥

রঙীন ঠোঁটের তির্যক্ নীচে কালো তিল আছে মুখে ;
মধুচক্রের সব মধুটুকু শুষে নিতে চায় সুখে।
কালো মিটে যায় পান-উৎসবে, মুখ যেন শতদল
আয়নায় দেখে, ফুরায়েছে আজ যত কৃত্রিম ছল।
আপদ বালাই দূরে চলে যায়, চিন্তা নাহিক আর,
কাক উড়ে গেছে, পুণ্যের ঠাঁই—চিত্ত চমৎকার ॥

একদিন সম্রাটকে রাত্রিশেষে ডেকে দেবার ভার পড়েছিল কোন পরমাসুন্দরী বাঁদীর উপর। সে না বুঝে মোরগের ডাক শুনেই মধ্যরাত্রে সম্রাটের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁর বিরক্তিভাজন হ'লো। সম্রাট মুমতাজ.কে বললেন—'সর বুরীদন্ লাজেমস্ত্'—ওই বাঁদীর মাথাটা কেটে ফেলা প্রয়োজন। মুমতাজ. সম্রাটকে শান্ত করলেন সত্য ঘটনা বলে। মোরগ অসময়ে ডেকে বিপত্তি ঘটিয়েছে। সম্রাট! হুকুম করুন, মোরগের মাথাটা কাটা হোক। পরীর মত সুন্দরী আমার ছোট্ট বাঁদী কেমন ক'রে জানবে কোনটা রাত্রি, আর কোনটা রাত্রি শেষের প্রভাত। মুমতাজে.র কথাগুলি দিয়ে সমগ্র শ্লোকটি একটি জনশ্রুতি হ'য়ে আছে—

সরবুরীদন লাজেমস্ত্ মুর্গ্ বেহনগামরা।
ইঁচে দানদ্ পরী পায়কর কেহ সুভ্. ও শামরা ॥

আবূ ত.ালিব কলীম

আবূ ত.ালিব কলীমের জন্ম হয় হমদানে ; কিন্তু জীবনের কিয়দংশ তিনি কাটান কাশানে। এইজন্য তাঁকে কখনো কলীম হমদানীও যেমন বলা হয়, তেমনি বলা হয়, কলীম কাশানী। ইনিও ভারতে ভাগ্যান্বেষী কবি-বৃন্দের অন্যতম। এই কবিরও ভাগ্যে ঘটেছিল শাহ্জহানের রাজসভায় রাজকবির সম্মান লাভ। কবি দীর্ঘদিন সম্রাটের সঙ্গে কাশ্মীর বাসের

সুযোগ লাভ করেন। কবি ছিলেন মার্জিতরুচি এবং সকলেরই স্নেহধন্য বা প্রীতিভাজন। অজাতশত্রু এই কবির সর্বজনীন প্রীতির মূলে ছিল সেই যুগের একটি মহৎ দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার সহজাত আত্মশক্তি। সে যুগ সুযোগসন্ধান ও পরনিন্দার যুগ। কাজ মিটে গেলে কৃতজ্ঞতার কোন বালাই ছিল না। ভাগ্যান্বেষণে ভারতে এসে ভাগ্যবান্ হ'য়ে দেশে ফিরে ভারত নিন্দায় মুখর হওয়ায় লজ্জার কিছু ছিল না। বহু কবি এই আচরণের আদর্শ রেখে গিয়েছেন। কলীম ছিলেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তিনি ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিলেন এবং ভারতীয় ভাষার সভ্যকার প্রেমিক ছিলেন। হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করতে তিনি ভালবাসতেন।

কলীমের ভারত-প্রীতির একটি উদাহরণ দিই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি ব'লেছেন—

তবান্ বেহশ্ ত্-এ-দোম গুফতনশ্ ব। ইন্ মা'নী।
কেহ্ হরকেহ্ রফ্ ত্ অজ. ইন্ বুস্তান পশীমান্ শুদ্॥

ভারতকে দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য এই অর্থে বলা যায় যে, যে কেউ এই ফলোদ্যান ছেড়ে যাক্, সেই দুঃখে ম্রিয়মান হ'তে বাধ্য।

একবার তুরস্কের সুলতান ভারতসম্রাটের 'শাহ্ জহান্' উপাধিকে বিদ্রূপ করলেন। জহান্ অর্থ পৃথিবী সুতরাং ক্ষুদ্র ভারত-অধীশ্বরের নিজেকে 'শাহ্ জহান্' নামে পরিচিত করা উচিত নয়। রাজকবি কলীম জানালেন, কোন অন্যায় হয়নি এই উপাধি গ্রহণে। আরবী গণনা পদ্ধতিতে জহান্ ও হিন্দ্ (ভারত) সমার্থক। সুতরাং তুরস্ক সুলতানের কোন দুঃখ থাকা উচিত নয়। শাহ্ জহান্ পৃথিবীশ্বর নাই বা হ'লেন, ভারতেশ্বর তো বটেন। এ নিয়ে বাদ-বিসংবাদ অর্থহীন।

আবূ ত.ালিব কলীম গ.জ.লের গীতিসুধায় আকৃষ্ট হ'তেন বেশি। কয়েকটি গ.জ.ল উদ্ধৃত ক'রে কবির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথ ব'লেছিলেন—'সুবাসিত পুষ্প থাকে পত্রের আড়ালে, কিন্তু গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?' কলীম বললেন—

গ.ম্-এ-আঁনদারদ্ কি পুশীদহ্ অস্ত্ রাজ.-ই-ইশ্ ক.রা।
শম'রা ফানুস্ পিনদারদ্ কি পিনহান্ করদহ্ অস্ত্॥

মন আবরণে প্রেম ঢেকে চলি, মানুষ বুঝিবে পাছে।
আলোকের শিখা ফানুশ ঢাকিবে এমন ক্ষমতা আছে?

বা মন্ আমীজ.শে উ উলফৎ-ই-মৌজ অস্ত্ রো কিনার।
দম্ বদম্ বা মন্ রো পয়বস্তহ্ গুরীজ.ান্ অজ. মন্॥

তটরেখা স্রোত লাগালাগি তবু ছাড়াছাড়ি থেকে যায়।
আশিকে মা'শূকে সেই লীলা চলে তত্ত্ব বুঝান দায়॥

সব রহস্য যখন জানার রাজ্যে চলে আসে তখন বিচিত্র এ ধরণীর আকর্ষণ আর থাকে না। লেখাপড়া শেষ হ'য়ে গেলে পাঠশালার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

জ়.দ রফত্ আনকে জ. আসরার-এ-জহান্ আগহ্ শুদ্।
অজ. দবেস্তান্ বরবদ্ হরকে সবক. রোশন্ করদ্॥

পৃথিবীর পাঠ শেষে মূল্যহীন হ'য়ে যায় রহস্যের ঠাট।
বিদ্যার্থীর দল সবে পাঠশালা ছেড়ে দেয় সাঙ্গ হ'লে পাঠ॥

স.াইব তিবরীজ.

সা.ইবের পুরুষানুক্রমিক আদি বাসস্থান ছিল তিবরীজ.। কিন্তু পিতৃদেব মীরজ.া আবদুর রহীম শাহ্ আব্বাসের রাজত্বকালে পৈতৃক বাসস্থান তিবরীজ. পরিত্যাগ করে চলে আসেন এস্ফ্হানে এবং এই এস্ফ্হানেই সা.ইবের জন্ম হয় ১৫৯৩ সালে। কাজেই আমাদের কবি 'এস্ফ্হানী' বলেও প্রসিদ্ধ। এই কালটা ভারতের মুঘল যুগ। পূর্বেই এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে তখন ইরানে কবি বা কাব্যগাথার সমাদর নেই। সেইজন্য দলে দলে কবিরা ইরান পরিত্যাগ করে ভারতের অভিযাত্রী হয়েছিল। সা.ইবও দেশত্যাগী ভারতপ্রেমিক কবির দলে অন্যতম। ইরানকে কাব্য সমাদরে ঊষর ক্ষেত্র দেখেই তিনি সে যুগে ব'লেছিলেন—'রক.সে সূদাই তূ দর হীচ সরী নীস্ত্ কে নীস্ত্'—আমি তো ইরানে আজ

দেখতে পাচ্ছি, এমন কোন মাথা নেই যেখানে ভারত দর্শনের উন্মত্ত নৃত্য না চলেছে। সা.ইব যেমন তেমন কবি ছিলেন না। ঐতিহাসিক শিবলী সা.ইবকে কা.নী থেকেও বড় শিল্পী মনে করতেন। তিনি বলতেন সা.ইব বোধ হয় ইরানের খাঁটি কবি সম্প্রদায়ের শেষ কবি। সেই কবি স্বদেশ পরিত্যাগ করে এলেন ভারতবর্ষে। কাবুল হয়ে তিনি ভারতে আসেন। কাবুলের শাসনকর্তা জাফর খানের মধ্যস্থতায় তিনি পরিচিত হন—শাহানশাহ্ সম্রাট শাহ্জহানের সঙ্গে। সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হয়ে তাঁর দরবারে সম্মানিত আসন লাভে তাঁর বিলম্ব ঘটেনি। কিন্তু মাত্র ৬ বৎসর তাঁর ভারত বাস। পিতৃদেবের আদেশে তিনি আবার ইসফ্হানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাসের রাজসভায় মালিকুশ্-শু'অরা বা রাজকবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এই পর্যায়ে তিনি শাহ্ আব্বাসের প্রশংসামুখর হন এবং বিস্তর রাজপ্রশস্তি রচনা করেন।

সা.ইব ছিলেন গ.জ.লে সিদ্ধহস্ত। এই জাতীয় রচনায় তিনি সর্বদা শেখসা'দী এবং হাফিজে.র অনুবর্তন ক'রেছেন। এই দুটি কবিশেখরের প্রশংসাতেও তিনি পঞ্চমুখ। হাফিজ.কে তিনি মানসগুরুর পদে বসিয়ে সর্বদা আনন্দ পেতেন। তিনি বলেছিলেন—

জ. বুলবুলান্-ই-খু.শ্ অলহান্-ই-ঈন্ চমন্ সা.ইব।
মুরীদ্-ই-জ.ম্ জ.ম-ই-হা.ফিজ.-ই খু.শ্ অলহ.ান্ বাশ্॥

সা.ইব, দেখছো কি? তোমার সমুখের এই বাগিচার বুলবুলদের সুর শুনে তাদের মধ্যেই তুমি হাফিজের শিষ্য হয়ে যাও। অলহান্ হ'লো সুরের লহর।

আবার তাঁর শেখ সা'দীর কথা মনে পড়ছে। তখন তিনি বলছেন —সা'দী আমার ভাবগুরু। সা'দী শীরাজের ফুল ও মাটীর মধ্য থেকে জন্মেছিলেন, আর আমার জন্মধারায় আছে তিবরীজের পবিত্র মাটি। তা থাক না, ভাব ও ভাবনায় আমি মহান্ সা'দীর ভাবশিষ্য—

সা.ইব অজ. খাক্-ই-পাক্-ই তিবরীজ. অস্ত।
হস্ত্ স'দী গর অজ. গুল-ই-শীরাজ॥

Browne বলেন, সা.ইব তাঁর প্রাঞ্জলতা ও বিশদ রচনাভঙ্গীর জন্যই

চিরকাল সমাদৃত থাকবেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কার্যকারণগরিষ্ঠ কাব্য-লিঙ্গ নামক অলঙ্কার হুসন্-ই-তা'লীল যেমন আনন্দের কারণ হয়, তেমনই হয় তাঁর বচনের প্রবাদভঙ্গিমা যাকে বলা হয় 'ইরসা'লুল্ মসল্'। তাঁর রচনায় প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির ঝলক আমাদের মুগ্ধ করে। কোন কবি বললেন, সুরাশূন্য পাত্র থেকে পাত্রশূন্য সুরা কামনা ক'রো। সা.ইব শুনে তৎক্ষণাৎ বললেন—'ত.ক. রা জ.দিল খালী অজ. অনদীশহ্ ত.লবকুন্'। সত্য যদি অনুসন্ধান কর, তবে এমন হৃদয় থেকে তাকে খুঁজে বের কর যেখানে কোন চিন্তা নেই। চিন্তামুক্ত নিষ্কলুষ হৃদয়েই সত্যের প্রতিফলন ঘটে।

সা.ইবের সুভাষিতাবলী থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা যায় না। তিনি বলেছেন—

বিষ অভ্যস্ত হ'লে আর ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তোমার হৃদয়কে সবিক্রমে মৃত্যুর সম্মুখীন করে তোলে। প্রত্যেক মাথায় নব নব চিন্তার খেলা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ রুচি অনুসারে নতুন নতুন ঢং নিয়ে পাগড়ী বাঁধে।

নাকি.স. অজ. কামিল বুবদ লজ্জ.ত্ জ. দুনিয়া বীশ্তর।
দীদহ্-ই-অহ.ল কুনদ্ অয়শ্-ই-দুবালা বীশ্তর॥

পৃথিবীর সুখভোগ নরোত্তমরা পায় না। মধ্যমাধমদের উপভোগ্য সে বস্তু। প্রশান্ত প্রসারিত দৃষ্টিতে দেখার চাইতে, তির্যক্ চাহনি বেশি দেখতে পায়।

চূন্ জ.মীন্-ই-নরম্ অজ.মন্ বর মী আবরন্দ্।
মী কুনন্ হর চন্দ্ বা মরদুম্ মদারা বীশতর্॥

আমার মত নরম মাটি থেকে মানুষ বালি কুড়িয়ে নেয় বেশি করে। আমি বুঝেও লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে চলি।

জি.শত্রা আয়নহ্-ই-তারীক বাশদ্ পরদহ্ পুশ্।
মীরসদ্ অজা.র-ই-বদ্ গৌহর ব বীনা বীশতর্॥

অস্পষ্ট আয়নায় কুরূপের প্রতিভাস নেই। জহুরীর হাতে জওহরের ঠিক ঠিক পরীক্ষা হয়। নিকৃষ্ট ধাতুর অপকর্ষ তার কাছেই ধরা পড়ে।

খানহায় কুহ্নহ্ সা.হিব মসকন্-ই-মার অস্ত্বো মূর।
দর কুহন্ সালান্ বুবদ্ হি.র্স্. বো ভমন্না বীশ্তর॥

ভাঙ্গা বাড়ী ঘর সাপের বসতি পিপীলিকা আরো তায়।
বৃদ্ধের দল কামনা বাসনা আরো বেশি করে চায়॥

সুবহ্. বর কফ্ তৌবহ্ বর লব্ দিল্ পুর-অজ. শৌক.-ই-গুনাহ্।
ম্ অ'সি.য়ৎ রা খন্দহ্ মী আয়দ্ জ. ইস্তিগ্ ফার-ই-মা॥
জপমালা হাতে, মুখে অনুতাপ, লালসায় খোঁজে মনের সুখ।
বিরাগী মনের ধ্বজা তুলে তারা হাসিয়ে চলেছে পাপের মুখ॥

পর্দহ্-পিন্দার রা বশিগাফ সা.হিব চুন্ হ.বাব্।
তা চুন্ মৌজ-ই-দিল শবী বহ্বরঙ্গ চুন্ জয়হু.ন্ শবী॥

চঞ্চল ঢেউ কভু দেখে নাকো সাগরের তলদেশ।
'আমি' ভুলে যাও, ঢেউ ওঠা শুধু পরেছে মায়ার বেশ॥

ভুরা জ. জান্ ঘম-ই-মাল অয় অ'জ.ীজ. বীশতর অস্ত্॥
ই'লাক.হ্-ই-ভূ ব-দস্তার বীশতর্ জ. সর অস্ত্॥

ধন থেকে প্রাণ প্রিয়তর বুঝো; এ কথা বোঝে না সবে।
পাগড়ীর চেয়ে মাথা প্রিয় বেশি, সত্য বুঝিবে কবে?

কুফর বো দীন রা পরদহ্-দার-ই-জলুবহ্-ই-ম'শুক. দান্।
গাহ্ দর বয়তু-ল্ হ.রাম বো গাহ্ দর বুৎখানহ্ বাশ্॥
জলু বহ্-ই-মরদান্-ই-রাহ্ অজ. খ্বীশ্ বীরূন্ রফ্তন্ অস্ত্।
জৌহর্-ই-মর্দীন্দারী চুন্ জ.নান্ দর খানহ্ বাশ্॥

বিশ্বাসহীন ধর্মের ভান প্রিয়তম থেকে দূরে;
মন্দির আর মসজিদ জেনো একটি কেন্দ্রে ঘোরে।
স্বার্থের ত্যাগ শ্রেষ্ঠ সাধন, মনে রেখো সেই কথা;
বহু সন্ধানে পৌরুষ মিলে, কাপুরুষ যথা তথা॥

দর সয়াহী মী তবান্ গুল চীদ্ অজ. আব্-ই-হ.য়াৎ।
গিরিয়হ্ রা বাশদ্ অস.র্ দামান্-ই শব্হা বীশ্তর॥

দুঃখ জাগায় জীবন-মূল্য, শুধু সুখ কভু নয়।
রাতের আঁধারে রোদন বেদনা সীমাহীন হয়ে রয়॥
স্বচ্ছ শিশায় অতি সহজেই বিম্বিত হয় কায়া,
ধূলায় মলিন দর্পণ কভু তোলে না তাহার ছায়া।
জহুরী বুঝিবে মণির মূল্য অপর কেহ তো নহে ;
অনভিজ্ঞের ব্যর্থ সাধনা বিফল বেদনা বহে॥

সুলতান হওয়ার সহজ পথ আপন গৃহের সামান্য আসনে বসে নিজেকে সুলতান মনে ভাবা। অবশ্য সেই ভাবনায় সহজ প্রাপ্তির স্বর্গীয় সুখ জাগিয়ে তুলতে হবে। পরের উপর প্রভুত্বের বাসনা নয়, অপ্রাপ্ত ও অপ্রাপ্যের ব্যাকুল পিপাসাও নয়।

দরূন্-ই-খান্-ই-খুদ্ হরগদা শহন্ শাহ্ অস্ত্।
কদম্ বিরূন্ মনিহ্ অজ. হদ্দ-ই-খ্বীশ্ রো সুলতান্ বাশ্॥

সুলতান্ আমি নিজের ঘরের আসনে বসিয়া অনুক্ষণ।
পাই নাই যাহা, সে পিপাসা যেন দগ্ধ করে না আমার মন॥

মানুষ তিন প্রকার—খোদাপরস্ত্, বুৎপরস্ত্ এবং খোদ্ পরস্ত্—যাকে বলা যায় ঈশ্বর-উপাসক, মূর্তি-উপাসক এবং আত্ম-উপাসক। এদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে—আত্ম-উপাসকরা। তাঁরা শুধু নিজেদের গুণকীর্তনে মশগুল।

আনজাম্ বুৎপরস্ত্ বুদ্ বহ্ জ. খুদ্ পরস্ত্।
দর কী.দ্ খুদ্ ম বাশ্ রো ব কয়দ্-ই-ফরনগ বাশ্।

মূর্তির পূজা তবু ভাল বলি, ভাল নয় কভু আত্মপূজার মালা।
খোদা ছেড়ে শুধু আত্মগরিমা! তার চেয়ে ভাল ফেরেঙ্গ্ বন্দীশালা।

সরমদ

ঔরঙ্গজেবের সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে, সম্রাটের সঙ্গীত সম্বন্ধে অনাদর এবং অনীহা যখন সুরকার ও সঙ্গীত-শিল্পীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে

ফেলেছিল তখন অত্যন্ত দুঃসাহস ক'রে তাঁরা এক জানাজা সাজিয়ে নীরব শোভাযাত্রা ক'রে চলেছিলেন। শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উৎসুক সম্রাট জানতে পারলেন তাঁরা সঙ্গীতকে কবর দিতে চলেছেন। সম্রাট পরম উৎসাহে বলে পাঠালেন—'ভাল ক'রে কবর দিও, যেন তোমাদের সঙ্গীত আর মাটি থেকে উঠতে না পারে।' সত্য হোক্, মিথ্যা হোক, এ গল্পের মধ্য দিয়ে ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটেছে।

ধর্মের নির্দেশকে যিনি জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে অনন্ত আকাশের আর কিছুই দেখার অবকাশ পেলেন না, তিনি নগ্ন ফকীর সর্বত্যাগী সূফী সন্ন্যাসীকে কেমন ক'রে বুঝবেন? এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন 'সরমদ্'। ঔরঙ্গজেবের আদেশে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। ঘটনাটি ঘটে ঔরঙ্গজেবের ১৭০৬ সালে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে।

সরমদ্ জন্মেছিলেন ইরানে। অর্থের ও প্রতিপত্তির লালসা নয়, ভারত সরমদ্কে টেনেছিল অন্যভাবে। সরমদ্ ছিলেন সমন্বয়বাদী, সত্যকার সূফী। ভারতের নগ্নসন্ন্যাসীদের সর্বত্যাগ তাঁকে প্রভাবিত ক'রেছিল। আধুনিক জগতে বহুনিন্দিত হ'লেও ভারতে দিগম্বর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় একদা সম্মানিত হয়েই ছিলেন। তাঁদের প্রধান কেন্দ্র ছিল দুটি—দক্ষিণ ভারতের মহীশূরে শ্রবণবেলগোলা এবং উত্তর ভারতে মথুরা। জৈন সম্প্রদায়ের দুটি সম্প্রদায়ই প্রসিদ্ধ ছিল (১) দিগম্বর (২) শ্বেতাম্বর। আধুনিক যুগেও সন্ন্যাসীদের মধ্যে নাগা সম্প্রদায়ের কুম্ভমেলায় স্নানের অগ্রাধিকার সুপ্রসিদ্ধ।

সরমদ্ ছিলেন সূফী কবি। তাঁর কবিতা চতুষ্পদী রুবায়িতে প্রাণবন্ত হয়েছে বেশি। দুটি রুবাই উদ্ধৃত ক'রে কবি স্বআত্মধর্ম-নিষ্ঠায় নির্ভীক হৃদয়ের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি।

গর মুত্তকী য়ম্ কার ব ইয়ার অস্ত্ মরা।
বা সুব্হ. য়ো জু.ন্নার চি কার অস্ত্ মরা॥
ইন্ খয়্ক.হ্-ই-পশ্মীন কি স.দ্
ফিৎনহ্ দর উ-অস্ত্।
বারশ্ নকশম্ বদুশ্ আ'র অস্ত্ মরা॥

সাধু যদি হই সঙ্গম শুধু প্রাণ-প্রিয়তম সনে।
উপবীত আর তসবীর মালা গাঁথা থাকে শুধু মনে॥
লোটা কম্বল ঝামেলা বাড়ায় অর্থহীনের বোঝা।
বাহিরের সাজ ঘৃণা করি আমি, আমার পথ যে সোজা॥

সুলত়ান্ মনম্ বো মিন্নত্-ই-সুলতান্ নকশম্।
অজ়. বহর-ই দূ নান্ মিন্নৎ-ই-দূনান্ নকশম্॥
নফসম্ চু সগ্-অস্ত্ বো মন্ মসাল্-ই-সগবান্।
অজ়. বহর-ই-সগী মিন্নৎ-ই-সগবান্ নকশম্॥

সুলতান আমি নিজে, ধার ধারি না কোন রাজার।
আমি কি দুখানা রুটীর ভিখারী? জানি আমি,
ভিক্ষা অপবিত্র। জানা আছে ভাল ক'রে ষড়রিপুর তত্ত্ব কথা।
কিন্তু, জেনে রেখো আমি শ্বপতি, 'শুনোচ্ছিষ্টে' আমার ঘৃণা।
আমি যাই না কামনা বাসনার টানে কোন কুকুরের কাছে॥

দারাশিকোহ্

মুঘল রাজসভার সাধারণ কবিরূপে নয়, মুঘল সমৃদ্ধির পরিণত যুগে কবিরূপে, দার্শনিকরূপে এবং এক উদার চিন্তানায়করূপে শাহ্জহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা কোন প্রকারেই উপেক্ষিত হ'তে পারেন না। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, যিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক এবং আলঙ্কারিক, ঘটনাচক্রে শাহ্জহানের অত্যন্ত স্নেহভাজন হ'য়েছিলেন। দিল্লীশ্বর পুত্রবৎ স্নেহে তাঁকে বর্ধিত ক'রেছিলেন। পণ্ডিতরাজ সে কথা কৃতজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্মরণ ক'রে গিয়েছেন—'দিল্লীবল্লভ-পাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ'—আমি দিল্লীশ্বর শাহ্জহানের করকিশলয়ের স্নেহচ্ছায়ায় আমার নবীন বয়স সুখে যাপন করেছি। দারাশিকোহ্র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তাঁর এই সূত্রে বেড়ে উঠেছিল। পণ্ডিতরাজকে নিজ সমাজে নিন্দিত হ'তে হ'য়েছিল। যবনসংস্পর্শদুষ্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ব'লে গোঁড়া

দক্ষিণী ব্রাহ্মণ সমাজ, বিশেষ ক'রে দীক্ষিত বংশ তাঁকে পদে পদে অপমান ক'রেছে; জগন্নাথ গ্রাহ্যও করেননি। জগন্নাথের বন্ধু ব'লে, হিন্দুদর্শনের মর্মবেত্তা এবং সর্বধর্মের সমন্বয় প্রচারকরূপে দারাকে মুসলিম গোঁড়া সম্প্রদায়ের শুধু নিন্দাভাজন হ'তে হয়নি, প্রাণের মূল্য দিয়ে তাঁর সে অপরাধ পরিশোধ ক'রে যেতে হয়েছে। বড় দুঃখে আজ সে মৃত্যুদণ্ডের দিনটি স্মরণে আসে; ১৬৫৯ সালের ৩০শে আগস্ট দিনপঞ্জীতে চিরকাল রক্তাক্ষরে লিখিত থাকবে। হাঁ, ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। এর ৭৩৭ বছর পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ সূফী সাধক ইব্‌ন্ মনসূর অল্ হল্লাজ উপলব্ধি ক'রেছিলেন 'অন্ অল্ হক্'-আমি সত্যস্বরূপ মানুষ যে মহত্তোমহিয়ান ঈশ্বরেরই এক অংশ। এ কথা শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক ছাড়া প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ধর্মগুলি নানাভাবে স্বীকার ক'রে গিয়েছে। ধ্যানযোগে মাঝে মাঝে বিশ্বাত্মার উপলব্ধি জীবাত্মায় এসে যায়। সাধকের অস্মিতা (ego) তখন সম্পূর্ণভাবে অদ্বৈতসত্তায় বিলীন হ'য়ে যায়—দ্বৈতের লেশটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। এ কথা প্রচার ক'রে ইব্‌ন্ মনসূরকে মৃত্যুদণ্ড স্বীকার করে নিতে হ'য়েছিল। অবিচলিত নির্ভীক সে মরণ একটি চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। উভয় সমুদ্র সঙ্গম (মজ্‌ম' উল বহ্‌রয়ন্) লিখে দারাশিকোহ্‌কে কাজীর বিচারে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করতে হ'য়েছিল। মনে হয় এটা গৌণ কারণ : মৃত্যুদণ্ডের আসল কারণ রাজনীতির একটা কুৎসিত আবর্ত। সেকালের একটা প্রচলিত কথা ছিল 'তক্ত্ য়া তক্তা'। সম্রাটের একাধিক উত্তরাধিকারীর মধ্যে সিংহাসনের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী পুত্র পাবে তক্ত্ বা সিংহাসন, আর বিজিতের ভাগ্যে তক্তা বা ফাঁসীকাষ্ঠ। কঠিন পীড়ার সংবাদমাত্রই শাহ্‌জহানের পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হ'লো। সুজা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার বিফল চেষ্টা করল। মুরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করল। দারা আপন মুণ্ড উপহার দিয়ে বিজয়ী বীর ঔরঙ্গজেবকে নিষ্কণ্টক সিংহাসনে বসিয়ে গেলেন। ধর্মট্, শামুগড় ও দেওরই পরপর এই তিনটি যুদ্ধে পরাজিত এবং পলায়িত, অবশেষে আফ্‌গান জীবন খাঁ দ্বারা ঔরঙ্গজেব-হস্তে সমর্পিত দারাশিকোহ্‌র প্রাণদণ্ড তিনি দিলেন কাজীর বিচার সম্মুখে রেখে। প্রাণদণ্ডই তাঁর সমুচিত বিচার; কারণ দারা বিধর্মীর ধর্মে বিশ্বাসী এবং সেইজন্যই স্বধর্মত্যাগী মৃত্যুই তাঁর

স্বল্পতম প্রাপ্য। মৃত্যুর পূর্বে দারাকে দরিদ্রের মত ছিন্ন বেশ পরিয়ে অত্যন্ত কুৎসিত কুদর্শন হস্তিনীপৃষ্ঠে বসিয়ে দিল্লীর রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়ে দিল্লীবাসীকে আদর্শ বিচারে দণ্ডিতের দুর্দশা দেখান হ'য়েছিল। সেদিন সহস্র সহস্র দর্শকের চোখ দিয়ে নীরব অশ্রু গড়িয়েছিল; কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে সাহসী হয়নি। "বুক চাপড়ে কেঁদেছিলও অনেকে। কয়েকজন ফকীর এবং কয়েকজন দরিদ্র দর্শক এই নির্দয় শোভাযাত্রার দিকে ইঁট ছুঁড়েও মেরেছিল. কিন্তু কারোও তরবারি কোশমুক্ত হ'য়ে দিল্লীর জনগণবল্লভ রাজকুমারের এই অশোভন যাত্রাকে প্রতিহত করতে সাহস পায়নি।"—বলেছেন জনৈক মর্যাদাসম্পন্ন এক বিদেশী প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা। তিনি খ্যাতিমান ফরাসী চিকিৎসক সমসাময়িক মুঘল রাজদরবারের ইতিবৃত্ত রচয়িতা François Bernier. উত্তরাধিকারের সকল সংঘর্ষে যা অনিবার্য ছিল, তাকে স্বধর্মবিচ্যুতিরূপ অপরাধের মুখোশ পরিয়ে সজ্ঞান পাপের ব্যর্থ আচ্ছাদন নির্মাণ করা হ'য়েছিল।

দারাশিকোহ্ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানে সমদর্শী ছিলেন। মহান্ আকবরের সার্থক উত্তরাধিকারীর ছিন্নমুণ্ডের পবিত্র রক্ত সেদিন দিল্লীর বিচারগৃহ কলুষিত করেছিল। এই কথা স্মরণ করেই বলছিলাম—উভয় সমুদ্রের সঙ্গম তীর্থ. মজ্‌ম' উল বহ্‌রয়ান্ গ্রন্থখানাই বিচারমূঢ় ধর্মোন্মত্তদের ছিল আসল হাতিয়ার। দারাশিকোহ্ যে ছিলেন হানিফী-শাখাভুক্ত সমন্বয়বাদী সূফী। ধর্মে ধর্মে বিরোধ নেই—এমন প্রচারককে মরতেই হবে। জানি না তাঁর বিদেহ আত্মা বিচারকদের শয়তান ব'লে উপহাস করে ঊর্ধ্বে উঠেছিল কি না। হিব্রুভাষার আদি অর্থ দ্যোতনায় 'Satan' বা শয়তান অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধপক্ষাবলম্বী শত্রু, Milton-এর Paradise Lost-এর ভাষায়—

> 'To whom the Arch-enemy
> And hence in heaven called Satan.'

আল্লাহ্ বিচার ক'রো শয়তান কে? আমি না এই বিচারকমণ্ডলী? দারা কি জানতেন না, কথায় কথায় ধর্মশাস্ত্র বা শির'ত্ দোহাই দিয়ে গেলেও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভণ্ড ধর্মযাজকরা চিরকালই শয়তান।

য়িহুদী শাস্ত্রে দেখা যায় শয়তান ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রে বসেছিল। তার উদ্দেশ্য কার্যসিদ্ধি।

দারাশিকোহ্ হিন্দুমুসলিমে এবং তাদের ধর্মশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্যে কোন বিরোধ দেখেননি। এইজন্য তাঁর চিন্তাধারার রূপ দিয়েছিলেন তিনি তাঁর বহুযত্নে লিখিত গ্রন্থে—মজ্‌ম' উল বহ্‌রয়ন্ যার অর্থ 'উভয় সমুদ্রসঙ্গম'। উপযুক্ত উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা সে সত্যের প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করব। দারাশিকোহ্ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—অল্পবুদ্ধি স্বার্থান্বেষী অনুদার মোল্লাদের জন্যই যুগে যুগে দিব্যদর্শী মহাপুরুষগণ নির্যাতিত হ'য়ে চলেছেন। তাঁর কথার অনুবাদ চলে—

'যদি চাও তুমি সত্যস্বরূপ অন্তরে চেয়ে দেখো।
আদিম মানবে ভুলপথে নেয় শয়তান মনে রেখো।'

পিতামাতার অনন্যসুলভ স্নেহে বর্ধিত দারার জন্য দুঃখ হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা। পিতার অত্যন্ত স্নেহভাজন ব'লেই দুটি সৌভাগ্য তাঁর জীবনে ঘটেছিল। এক এক ক'রে বলছি। শাহান্‌শাহ্ তাঁর চারটি পুত্রকেই রাজপ্রতিনিধি শাসকরূপে চারদিকে প্রেরণ করলেন। সুজা গেলেন পূর্বভারতের বাঙ্গলাদেশে, ঔরঙ্গজেব পেলেন দাক্ষিণাত্যের ভার, কনিষ্ঠ মোরাদ গেলেন গুজরাটে, আর সর্বজ্যেষ্ঠ দারা পেলেন পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব। কিন্তু দারা দূরে গেলেন না। নিজ প্রতিনিধি দিয়ে পাঞ্জাব শাসন ক'রে চললেন। প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব পিতৃদেব অনুমোদন করলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্বদাই পিতার কাছে। কালিদাসের আঁকা মেঘদূতের এক ছবির কথা মনে হয়। এ যেন দেবগিরিতে মহেশ্বরের সন্নিহিত কুমার কার্তিকেয়! 'দারাশিকো'হ্ পিতৃপ্রদত্ত নামের তাৎপর্য ছিল—'দারিয়ুসের মত' সুন্দর। দারিয়ুস ছিলেন প্রাচীন ইরানের হখামনীশীয় বংশের দিগ্‌বিজয়ী অনিন্দ্য-কান্তি সম্রাট্। 'দারাশিকোহ্' নামের মধ্যে বহু কল্পনা ও সত্যের ধূপছায়া ছিল। সুন্দর, সুগঠিত দেহ, অপূর্ব লাবণ্যে উদ্ভাসিত; বৃষস্কন্ধ উন্নত শির দারা সত্যই ছিলেন দর্শকের নয়নানন্দ। মুক্তো এবং হীরক খচিত পোশাকে সজ্জিত হ'য়ে তিনি দরবারে বসতেন। তাঁর শিরস্ত্রাণ থেকে রক্তবর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল একখণ্ড পদ্মরাগ লাল আলোর প্রভামণ্ডল সৃষ্টি করতো। ময়ূর

সিংহাসনের পাশেই পৃথক একটি আসন তিনি গ্রহণ করতেন। মুঘল দরবারে সম্রাট্ ভিন্ন অন্যের কোন আসনে বসা নিয়ম ছিল না। প্রতিনিধি দিয়ে পাঞ্জাব শাসন এবং তক্ত-এ-তাউসের পাশেই আসনে উপবেশন—এই দুইটি বিরল সৌভাগ্য দারাশিকোহ্ ভোগ ক'রেছিলেন। অপর তিন পুত্রের ঈর্ষ্যা-ভাজন হওয়ার এটিও বোধ হয় এক কারণ।

দারাশিকোহ্ শক্তির কাছে মাথা নত না ক'রে সত্যের পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রেছিলেন। আমি রাজনীতির কথায় এ প্রসঙ্গ টানছি না। দারার সত্যদর্শন সার্থক হ'য়েছিল সর্বধর্মের মূল অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। সেদিকে তিনি অপক্ষপাত আত্ম-জিজ্ঞাসু এবং উদার-দর্শন দার্শনিক। পিতামহ জহাঙ্গীর সর্বধর্মের কথা মন দিয়ে শুনেও নৈষ্ঠিক মুসলমান। ঐতিহাসিক Rawlinson বলেন, কোন সময় তিনি ঈশাই ধর্মের দিকে একটু বেশি ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু জেসুইট্ ধর্মযাজকদের ভুল ভাঙ্গতে দেরী হ'লো না। তাঁর লোকায়ত আচার-সর্বস্ব হিন্দুধর্মের প্রতি বরঞ্চ ঘৃণাই ছিল বেশি। কিন্তু পৌত্র দারার ক্ষেত্রে ঘটনার গতি অদৃষ্টপূর্ব আবর্তিত গতি নিয়েছিল। আকবরের হিন্দুমুসলিম সমদর্শনের ভিত্তি রাজনীতিক। দারার সমদর্শন বিপুল অধ্যয়ন এবং পরিশীলিত বিচার-বুদ্ধির ফল। অবস্থা অনুকূলও ছিল। একটি ব্রাহ্মণ সন্তান, প্রায় দিগ্‌বিজয়ী হওয়ার উপযুক্ত, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ঘটনাচক্রে দারার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ'লেন, এবং তাঁর পথপ্রদর্শক হ'লেন। শাহ্‌জহান তাঁকে পুত্রস্নেহে লালিত ক'রেছিলেন। তিনি সেই স্নেহ উচ্ছ্বসিত ক'রে দিয়েছিলেন আসফ খাঁর (জহাঙ্গীরের উজীর-এ-আজম) জীবনবৃত্ত লিখে। গ্রন্থখানার নাম "আসফ-বিলাসঃ"। পণ্ডিতরাজ বলতেন—'দিল্লীবল্লভপাণি পল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ'—আমার তরুণ জীবন কাটিয়েছি দিল্লীশ্বরের স্নিগ্ধ করতলে। ইনি রসগঙ্গাধর নামে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র এক অলঙ্কার গ্রন্থ রচয়িতা। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা বিশেষতঃ দক্ষিণীরা তাঁকে যবনসংসর্গ-দুষ্ট বলে ঘৃণা করতেন। যে বংশে বৈয়াকরণ ভট্টোজিদীক্ষিত, দার্শনিক এবং আলঙ্কারিক অপ্‌পয়দীক্ষিত সেই দীক্ষিতকুলের সঙ্গে তাঁর অহি নকুলসম্বন্ধ। এই যেখানে অবস্থা সেখানে অতত্ত্বজ্ঞ বৈদেশিক লেখকরা বলবেন দারা উপনিষৎ-এর অংশবিশেষ

পড়েছিলেন—একথা অজ্ঞানপ্রসূত এবং অশ্রদ্ধেয়। দারা মনে হয় উপনিষৎ না ব'লে উপনিষৎই বলতেন। দক্ষিণী বিশুদ্ধ মূর্ধণ্য ধ্বনি তিনি অবগত ছিলেন। মুসলিমশাস্ত্রের এবং হিন্দু দর্শন ও পুরাণশাস্ত্রে দারার ব্যুৎপত্তি কদাচ উপেক্ষণীয় ছিল না। তিনি অসি-নিষ্পাদ্য ও মসী-উৎপাদ্য বস্তুগুলির প্রতি সমানই উৎসাহী ছিলেন। সংযত মনের নিয়ম ও নিষ্ঠার ফল তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "মজমা' উল-বহ্‌রায়ন্", যার অর্থ- "উভয় সমুদ্রসঙ্গম"—ইসলাম ও সনাতন হিন্দুধর্মের শুভ সম্মেলন।

আকারে ক্ষুদ্র হলেও তিনি এই মহাগ্রন্থে দুটি ধর্মের চিন্তাধারার সমতা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখেছেন সৃষ্টি আর সৃষ্টিতত্ত্বই দুটি ধর্মে প্রধান বিষয়। দারাশিকোহ্ আলোচনায় গ্রহণ ক'রেছেন—

পার্থিব সৃষ্টির মৌল উপাদানসমূহ (আ'নাসীর)।
ইন্দ্রিয় গ্রাম (হ্‌ররাস)। ভক্তি পরিশীলন (আশঘ্‌ান)।
ঈশ্বর মহিমা (সি্‌ফা-ই-আল্লাহ্ তা' আলা)।
আত্মা (রূহ্‌)। মরুৎ (বাদ)। চতুর্ভুবন (আ'ৱালিম্-ই-অরবা')।
শব্দ বা ধ্বনি (অৱাজ্‌)। জ্যোতি বা তেজ (নূর)।
ভগবদ্দর্শন (রূয়ৎ)। ঈশ-নামাবলী (অস্‌মা-ই-আল্লাহ্)।
মহাপৌরুষ বা সন্ত্‌চরিত (নুবুররাত্ ৱ ৱিলায়ৎ)।
সাযুজ্যমুক্তি (তৌহীদ্)। ব্রহ্মাণ্ড বা মহা বিশ্ব।
আকাশ বা শূন্যলোক (আসমান্)। মৃৎ উপাদান (জ্‌মীন্)
পাপপুণ্যের শেষ বিচার (কিয়ামৎ)। মুক্তি বা নির্বাণ॥

এইসব আলোচনায় দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি দুটি সাগরের তরঙ্গ মিলিয়ে দিতে সমর্থ হ'য়েছেন। এ তাঁর কৃতিত্বের অসাধারণ পরিচয়। দারা কাদেরী সম্প্রদায়ভুক্ত সূফী ছিলেন। সূফী দারা বলছেন—

রংদার আর রংহীন সব একাকার হয় তাতে।
দূর আর ওই নিকট যা কিছু মিলে যায় এক সাথে॥

তাঁর তুলনা নেই, তিনি ভুবনমোহন, তিনি সর্ববিষয়ে নিরুপম। এ দুটি চোখ তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনিই চক্ষুকে জ্যোতির্ময়

করেন—তাই চোখ সব দেখে। এতো কেনোপনিষদের সেই অবিস্মরণীয় বাণী—যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি, যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।

এইসব উপলব্ধ সত্যের কাছে আত্মসমর্পণই তাঁর পার্থিব জীবনে নিষ্ঠুর পরিণতি ঘটিয়েছিল। বিচারে তাঁর শিরচ্ছেদ, কারণ? দারা কাফের। কিন্তু তিনি তো একা নন। সত্যযোদ্ধারা এমন ক'রেই যুগে যুগে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এসেছে। মনসূর ক্রুশ-বিদ্ধ হলেন; সুহ্‌রাবর্দীকে ঘাতকের অস্ত্রে প্রাণ দিতে হ'লো। সরমাদও নিষ্কৃতি পেলেন না।

দারাশিকোহ্ তাঁর মহামিলন গ্রন্থে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—তোমরা যাকে দীন বা একমাত্র ধর্ম বল, দেখছো না, তারই পাশে র'য়েছে তোমাদের বিচারে ভ্রান্তধর্ম কুফর্। কিন্তু ওরা একই সঙ্গে ছুটে চলেছে একই দিকে। খোদার ভুবনমোহন মুখের দুই দিকে শোভমান দুটি কেশগুচ্ছ (জুল্‌ফ) ওরা। মনে রেখো ওদের দ্বারা কিন্তু তাঁর জ্যোর্তিময় মুখ ঢাকা পড়ে না।

তাঁহার মুখের উজ্জল প্রভায় দীপ্ত ভুবন চলিছে ঠিক:
সকল শাস্ত্র বলে সেই কথা, নেই তার কিছু অপর দিক।
ইসলাম আর হিন্দু কুফর যুগ্মবেণীতে তাঁহার সুখ।
তারা আছে তার পার্শ্বে লালিত, ওতে ঢাকে নাকো তাহার মুখ।

এইবার দারাশিকোহ্‌র ধর্মজগতে উদার দর্শনের কিছু পরিচয় দিতে চাই। এই প্রসঙ্গে বোঝা যাবে কি নির্ভীকভাবে তিনি অনুষ্ঠানসর্বস্ব গতানুগতিক আচরণগুলির নিন্দা করেছেন। তিনি যা' বলেছেন তাতে বোঝা যায়, পড়ার চেয়ে জানা ভালো, জানার চেয়ে ভাল উপলব্ধি এবং তার অনুকূল অনুষ্ঠান।

'জগৎ ভুলিয়ো এক প্রেমে শুধু, সত্যের নেই ভুল।
শাখা-প্রশাখায় ভ্রমণের শেষে নিশ্চয় পাবে মূল॥'
'জ্ঞানযোগী: যারা অভিনব ধ্যানে মশগুল দিবা নিশা।
দিব্য প্রেরণা সন্ধান দেয় বিরোধ-বিহীন দিশা॥'
'তিনি এক' এই বাণী শুনে শুনে সত্য জাগে না বুকে।
"আহা কি মিষ্টি"—প্রচারিলে কভু মিষ্টি ওঠে না মুখে॥'

'মর্মের কথা উঘারিয়া বলে ধর্মনায়ক যারা।
অন্ধভক্ত বিচারবিহীন ঘুরে ঘুরে শুধু সারা॥'
'পশুরাজ খায় আপন শিকার পরিহার করে তুচ্ছ।
নষ্টোচ্ছিষ্টে তুষ্ট শৃগাল উন্নত করে পুচ্ছ॥'
'কাঁটা তুলে রচে ফুলের বাগান জ্ঞানীগুণী মহাজন।
মহাপুরুষের সঙ্গ সেবায় লভিবে পরম ধন॥'
'একটি প্রদীপে আঁধার পালায় চলে আলোকের স্নান।
শতদীপ জ্বলে সেই শিখা হতে মূল জ্যোতি অম্লান॥'
মরমিয়া জানে মরণতত্ত্ব, সেথা নাই কোন দুখ।
(সে যে) চিন্তামুক্ত মনের দুয়ার, জাগে শুধু মহা সুখ॥
প্রাণ ছেড়ে দেয় দেহের বাঁধন কে বলে সে পরীশান্* ?
নির্মোক-ভেদে ভুজঙ্গে দেখ, নব বলে বলীয়ান্॥

জে.বউন্নিসা

বাদশাহ্ আলমগীরের পঞ্চকন্যার মধ্যে তিনটি ছিলেন সহোদরা। প্রধানা বেগম দিলরস বানুর গর্ভসম্ভূতা তিন কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন জে.বউন্নিসা। ইনি ছিলেন চিরকুমারী। প্রথম জীবনে অন্দর মহলের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল তাঁর। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায়, জে.ব একজন বিখ্যাত লিপি-বিশারদ, অক্ষরের কারুকার্যে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠা। তাঁর একটি গ্রন্থাগারও ছিল। তিনি সেখানে নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করতেন। নিয়মিত সময় কোরান শরীফের ভাষ্য রচনা করাও তাঁর অভ্যস্ত কর্ম ছিল। একে তিনি অসামান্যা সুন্দরী তাতে আবার প্রতিশ্রুত কুমারী। এ অবস্থায় জে.বউন্নিসাকে ঘিরে মানুষের মনে কল্পনার ধূপছায়া সে যুগেই রচিত হ'য়ে চলেছিল। কিন্তু মৃদুগুঞ্জন কখনো স্পষ্ট কথায় প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি; কারণ বাদশাহ্ ঔরঙ্গজে.ব সশরীরে বিদ্যমান। মুঘল-বিভীষিকা ভস্মরেখাকারে সীমা টানলেও সেই বিলীন

* পরীশান—ধ্বংস বা অত্যন্ত বিনাশ

মহিমার যুগে—বিগত শতাব্দীতে (১৯শ শতক) লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের উর্দু সাহিত্যিকরা সেই পুরণো কল্পনাকে আবার পাখা মেলে ওড়ায় সাহায্য করে দেন। সেই কণ্ডুতিকলুষ পথে এক বিদেশিনীও সারা পৃথিবীতে শাহ্জাদীর সন্দিগ্ধ চরিত্র-কথা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ ক'রে দেন। এঁর নাম 'West Brook'। তাঁর গ্রন্থ 'Diwan of Zebunnisa' বা জে.বউন্নিসার কবিতাবলীতে জে.বের প্রণয়-কাহিনী বিবৃত করা আছে। কৌতূহলী পাঠকবৃন্দকে জে.বউন্নিসার অমূলক প্রণয়-কাহিনীর কিছুটা অংশ উপহার দিতে হবে।

(১) ১৬৬২ সালে ঔরঙ্গজেব পীড়িত। তিনি হাওয়া বদল করতে লাহোরে যান। লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন ঔরঙ্গজেবের উজীর পুত্র আকিল খাঁ। আকিল খাঁর রূপ ছিল, যৌবন ছিল, কবিত্ব ছিল। জে.বউন্নিসাও এইসব গুণের অধিকারিণী। তিনি জে.বকে একদিন ছাদে দেখে এক বার্তা পাঠালেন—

'প্রাসাদ শিখরে আমার স্বপ্ন-প্রতিমা খ্বাব-এ-স.নম্ রক্তিম আভায় ফুটে উঠেছে।' জে.ব সে চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন—'বিনয়, অনুনয়, জবরদস্তি, স্বর্ণমুদ্রা কোন কিছুতেই এ স্বর্ণপ্রতিমা কেনা যাবে না।' মনে হয়, আকিল খাঁর আকিল একটা বড় রকমের চোট খেয়েছিল। জে.বের চিঠির শেষে শেখ সা'দীর উপদেশ মালার একটু অংশও উদ্ধৃত ছিল।

'চেরা কারী কুনদ্ আ'কল কেহ্ বাজ. আমীদ্ পাশীমানী' মানুষের বুদ্ধি এমন কাজ করবে কেন, যাতে পরে মনস্তাপ আসে। এটা মৃদু তিরস্কার। আমরা মনে করি, আকিল খাঁর এ আক্কেল ছিল না কি যে, সে উজীর পুত্র, রাজপুত্র নয়; ঔরঙ্গজেবের খাঁচায় সিংহগুলো নির্জীব হয়ে ছিল না, এ কথাও ভাবা উচিত ছিল।

(২) জে.বকে নিয়ে আর এক আকিল খাঁর প্রেম কাহিনী আছে। এর পূর্ব নাম ছিল মীর আসকরী। এঁর জন্মস্থান ছিল ইরানের 'খ্বাফ' নগর। এই আকিল খাঁ খ্বাফী ঔরঙ্গজেবের অধীন এক কর্মচারী ছিলেন। ইতিহাসে আছে, তিনি ঔরঙ্গজেবের অশ্বারোহী পার্শ্বচর বা 'জিলোদার' ছিলেন। এই আকিল খাঁও ছিলেন শ'য়ের বা কবি। তাঁর ছদ্মনাম

বা তখল্লুস্ ছিল 'রাজী' যার অর্থ 'সদাতুষ্ট'। এই প্রেমেও পদাধিকারের প্রশ্ন ওঠে, সে যে সামান্য 'জিলোদার'। তা না মানলেও বয়সের কথাটা মনে করতে হয়। ইনি ছিলেন জে.বউন্নিসা থেকে চল্লিশ বছরের বড়।

(৩) এইবার গল্পে আসছেন খাঁটি ইরানী রাজকুমার—নাম জানা যায় না; তবে বলা আছে ইরানের বহ্‌মন বংশের কুমার। এই বংশ কিছুদিন ইরানে রাজত্ব করেছে। এই বহ্‌মনী রাজকুমার দিল্লী এসে শাহ্‌জাদী জে.বউন্নিসার কথা শুনে প্রেমে দীবানা হয়ে গেলেন। ইনিও কবি। তিনি গোপনে মনের বাসনা জে.বকে জানালেন।

'তুরা আয়ে মাহ্ জবীন বে পরদা দীদন
আরজ. দারম্।
জমালত্ হা-এ-হুসনত্ রা রশীদন্
আরজ্. দারম্॥

ওগো চন্দ্রনিভাননে! তোমাকে অনবগুন্ঠিত দেখব—এই আমার প্রার্থনা। তোমার সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যভাণ্ডারে পৌঁছতে দাও—এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

এ কাহিনীরও মূলোচ্ছেদ অত্যন্ত সহজে হয়। তখন শাহ্ আব্বাস ইরান-অধিপতি। তিনি বহমন বংশের নন। আর এক কথা, শাহ্ আব্বাসের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের তখন ভীষণ শত্রুতা চলেছে। পুত্র আকবর পালিয়ে ইরানের শাহী শ্বশুর বাড়ী আশ্রয় করেছেন। আর শাহ্ আব্বাস কঠিনতম ভাষায় ঔরঙ্গজেবকে ভৎ‍সনা ক'রে চলেছেন—"আন খিলাফত্ মা বো পেদরগীরী-রা আলমগীরী নাম্ নেহাদন্ বো অজ. কুশতন্-এ-বেরাদরান্ খাতিরজমা করদাহ্......' তুমি ঔরঙ্গজেব খিলাফতের অধীন এই বিস্তীর্ণ পৈতৃক সাম্রাজ্যটাকে আলমগীরীতে পরিণত ক'রেছ। ভাইদের হত্যা ক'রে ক'রে, এখন খুব খাতিরজমা হ'য়ে বসেছ...... সাবধান! প্রয়োজন হলে ইরান ভারতে অভিযান চালাবে।"—সেই দেশের যুবরাজ দিল্লীতে আসবে শাহজাদীর সঙ্গে প্রেম করতে! রামচন্দ্র!

কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রতি জে.ব উন্নিসার মনটা কিছুদিনের জন্য

কোমল হ'য়েছিল মনে হয়। শাহ্জাদীর পক্ষে যা অসম্ভব, ঔরঙ্গজেব দুহিতার পক্ষে যা একান্ত অসম্ভব—সেই অসম্ভবে অগ্রসর হওয়া স্বপ্নেরও সাধ্য নয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ কুমার কেবলই প্রার্থনা জানিয়েছে—তারও মনের কথা "প্রার্থয়ে" ওই আজর্.দারম্। বংশ মর্যাদা, প্রতিশ্রুত চিরকৌমার্য, সমাজ, সর্বোপরি বিধর্ম-বিদ্বেষী পিতৃচরিত্র সম্মুখে রেখে জে.ব এক পাও অগ্রসর হতে পারেনি। শুধু একটুমাত্র চোখে দেখার প্রার্থনাও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তিনি ব্রাহ্মণের প্রার্থনার উত্তরে সখীমুখে জানিয়েছিলেন—কবিতারই মধ্য দিয়ে।—

'বুলবুল অজ.গুল বগুজ.রদ্ চূঁ দরচ মন্ বীনদ্ ম'রা।
বুৎপরস্তী কেহ্ কুনদ্ গর বরহমন্ বীনদ্ ম'রা॥
দর স্থুখুন্ মখফী শুদম্ মানিন্দ্-এ-বূ দর বর্গ-এ-গুল্।
হর কেহ্ দীদন্ মেল দারদ্, দর স্থুখুন বীনদ্ মরা॥

জে.ব উন্নিসার কবি নাম ছিল 'মখফী' যার মানে 'গুপ্ত'। এই কবিতায় মহীয়সী মহিলাকবি প্রণয়ীর কাছে তার গুপ্ত হৃদয় উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। কবিতার কথায় কথায় সংযম এবং শালীনতা। এই কবিতার স্তরে স্তরে এক বিশুদ্ধ ভাবময় প্রেম (Platonic love) বিকশিত হ'য়ে উঠেছে। যে প্রেমের সঙ্গে দেহের কোন সম্বন্ধ নেই, থাকতে পারে না, সে অনঙ্গ প্রেমে সবই সম্ভব। তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি কবি, তুমি রসিক, তুমি রসজ্ঞ। আশা করি, তুমি অনঙ্গ প্রেমের তত্ত্বটায় ভুল করবে না। ফুলের পাপড়িতে সুগন্ধের মত আমি তো কবিতার ছত্রে ছত্রে আমাকেই সাজিয়ে রেখেছি। ব্রাহ্মণ তুমি তুলে নাও—

বুলবুল যদি দেখে মোরে হায়
চকিত চমকে সেও চলে যায়
সঙ্গীত করি ভগ্ন।
মূর্তি পূজারী ব্রাহ্মণে কবে
দেখিয়া আমারে কোন ফল হবে?
নিষ্ফল ধ্যানে মগ্ন!

ব. বি./পারস্য সাহিত্য/৫৬-২১

গন্ধ লুকায় ফুলের মাঝারে,
আমি আছি মোর কাব্য বিথারে
সে কথা কি গেছ ভুলে ?
সেই শয্যায় উছলে হৃদয়
যা' কিছু আমার প্রাণ-মনময়,
সেই শেজ থেকে ওগো ব্রাহ্মণ
আমাকে লইও তুলে।

জে.বউন্নিসার মানসলোকের শূন্যতা তাঁকে মাঝে মাঝে পীড়িত ক'রে তুলতো। জলপ্রপাতের নীচে-বয়ে-যাওয়ার আর্তনাদ শুনে তিনি বলছেন—

'জলপ্রপাত ! তুমি দুঃখবেদনায় মুখর স্রোতে কেবলই নীচে
বয়ে চলেছ। কার জন্য এই দুঃখের নিম্নাভিসার ?
সে কি তোমার ললাট লিপি ?
বুঝি তোমার অব্যক্ত দুঃখ আমারি মত, যার তীব্র
অনু'ভূতি আছে, কিন্তু কথায় প্রকাশ নেই।
প্রকাশ শুধু ক্রন্দনে।'

আমরা জে.বের মধ্যে দার্শনিকসুলভ ধ্যানসমাধিতে যেমন বিস্মিত হই, তেমনি বিস্মিত হই তার রচনার মধ্যে শাণিত বুদ্ধির বাক্‌চাতুর্য দেখে। ইংরেজীতে একে বলে 'Wit'। কথার পিঠে কথা ছুঁড়ে দিতে শাহ্‌জ়াদী অদ্বিতীয়। কেউ কিছু বলে রেহাই পায় না। যোগ্য উত্তর যেন তাঁর ঠোঁটে তৈরী হ'য়েই আছে।—

পরিচারিকা বলে—শাহ্‌জ়াদী ! তোমার সুন্দর চীনে-আয়নাটা আজ ভেঙ্গে গেল। উত্তর হ'লো—ভালই হ'লো, রূপের অহঙ্কারের মাধ্যমটাই গেছে, নিজেকে দেখে আর দেমাক আসবে না।

কেউ বললে হাঁ শাহ্‌জ়াদী। কালো ধলোতে মেশান মুক্তো কখনো দেখেছ ? উত্তর হ'লো—হাঁ দেখেছি, কাজল পরা চোখে যখন সুন্দরী কাঁদে, তখন দেখেছি !

জে.বউন্নিসার তখল্লুস, বা কবিনাম 'মখ্‌ফী'কে আমি 'গোপী' বলতে চাই। গোপীরা মানুষ নয়—'গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া স্বাবশ্যা গোপকন্যকা।

দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মনুষ্যাঃ কথঞ্চন।' ঐতরেয় আরণ্যকে স্বাকন্যা অর্থ—চিন্তায়, ভাবনায়, কর্মে সর্বদা স্বাধীন। সে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরে না; নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ দেবকন্যার মত শুচিশুভ্র গোপী মখ্‌ফী শাহ্‌জ়াদী জে.বকে কলঙ্কের কালিমা দেওয়া অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য। জন্মদাতা ঔরঙ্গজেব ও দিলরসবানু।

পার্থিব কার্যকারণে তাঁর জন্ম হ'লেও তাঁর চরিত্রে অপার্থিব গুণগরিমা ছিল। ব্রজবালার মতই তিনি ছিলেন—পূর্ণরসা, রসপীযূষধামা, রসতরঙ্গিনী, ললিতা, ললিতযৌবনা; কিন্তু অপার্থিব প্রেমে মুগ্ধা। কোরানশরীফ ছিল তাঁর নিত্য সহচর।

হাতিফ এস্‌.ফহানী

আমরা ইতিপূর্বে একাধিক প্রসঙ্গে ইরানে ভারতে কবিবৃন্দ নিয়ে মেশা-মেশির কথা ব'লে এসেছি। মুঘলযুগের সমৃদ্ধযুগে ভারত ইরানী কবিদের আকর্ষণ করে এনেছিল। ইরানে সে যুগে ঘটেছিল কাব্যোৎসাহে শোচনীয় মান্দ্যদশা। কিন্তু এ দৈন্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মুঘলযুগের অধঃপতন ঘটলো ঔরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই। বলা বাহুল্য, তখন থেকেই কবিদের ভারত-অভিসার শুরু; সে যুগ ইরানী শাহ্‌দের ভারত-অভিযানের যুগ। এমন একটি যুগের কবি হাতিফ এস্‌.ফহানী। তাঁর পুরো নাম ছিল সৈয়দ্‌ মোহম্মদ হাতিফ। হাতিফের জন্মস্থান এস্‌.ফহান, মৃত্যু ঘটেছিল তেহরান ও এস্‌.ফহানের মধ্যবর্তী একটি শহরে নাম কে.াম—শিয়াদের পবিত্র তীর্থ। মৃত্যুকাল ১৭৮৩ সাল। ইরানের তখন ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কাল। নাদিরশাহ্‌ আফগানীস্থানকে ভারত থেকে কেড়ে নিয়েছেন। তাঁর নিষ্ঠুর আক্রমণে এবং নৃশংস নরহত্যায় দিল্লী প্রায় শ্মশানে পরিণত। এর কিছুকাল পরেই আহ্‌মদশাহ্‌ আবদালীর পর পর কয়েকটি ভারত অভিযান। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মুঘল ও মারাঠাশক্তি একই সঙ্গে বিধ্বস্ত। তখন কবিদের দিল্লী থেকে পালাবার পালা শুরু হ'য়েছে।

এমন একযুগে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাতিফ তাঁর সুমধুর কাব্য-গানে ইরানকে মাতিয়ে তুলেছেন। তাঁর দক্ষতা ছিল বিবিধ কাব্যরূপে। কিত্তা, গ.জল, কস.ীদা, রুবায়ি—তিনি কাব্যবন্ধের নানারূপ প্রদক্ষিণ ক'রেছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তিনি তাঁর তরজী'বন্দ্ কবিতা-সমূহে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এই জাতীয় কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে—একই অন্ত্যশব্দ বার বার ঘুরে ফিরে এসে ঐ শব্দসংশ্লিষ্ট বাক্যাংশের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে এবং তাতে প্রবহমান জলস্রোতের ভ্রমির মত এক প্রকার শাব্দিক আবর্তের সৃষ্টি হয়। শুধু স্বদেশ ইরান নয়—তরজী'বন্দ কবির যশোরাশিকে বিদেশেও ছড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা কবি হাতিফের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় তাঁর তরজী'বন্দে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। হাতিফ ছিলেন 'সূফী' দর্শনে বিশ্বাসী। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সূক্ষ্ম দর্শনকে ইন্দ্রিয়গোচর ক'রে তোলা অসম্ভব। তথাপি দার্শনিকরা বলেন অনুভব করতে চাইলে অতীন্দ্রিয়কেও ইন্দ্রিয়ার্থে পর্যবসিত করা যায়। কারবার চলে তখন অন্তঃকরণে। ক্রিয়া সাধনের প্রকৃষ্ট সাধক যে, সেই তো ব্যাকরণ শাস্ত্রেও করণ। কানের ভিতরের কান, চোখের ভিতরের চোখ, এই ক্রমে অন্তরিন্দ্রিয়রা কাজ ক'রে চলে। নৈয়ায়িকরা সব বিষয়টাকে 'মানসপ্রত্যক্ষ' ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। হাতিফের সাধ্যসাধন তত্ত্ব সূক্ষ্ম পন্থায় চলে—

চশ্.ম্-এ-দিল বাজ. কুন কি জান্ বীনী।
আন্ চি নাদীদনীস্ত্ আন্ বীনী॥
গর ব-ইক.লীম্-ই ই'শ্.ক্. রূ আরী।
হম আফ্.লাক্. গুলিস্তান্ বীনী॥
আন্ চি ন-শুনীদহ্ গূশ্ আন্ শুনবী।
বো আন্ চি নাদীদহ্ চশ্.ম্ আন্ বীনী॥
তা বজায়ি রসানদত্ কি য়কী।
জুজ. জহান্ বো জহানিয়ান্ বীনী॥
বা য়কী ই'শক. বরজী. অজ. দিল্ বো জান্।
তা ব-অ'য়নু-ল-য়ক.ীন্ অ'য়ান্ বীনী॥

কি য়কী হস্ত্ বো হীচ্ নীস্ত্ জুজ্. উ।
বহ.দহু লা আল্লা ইল্লা হু॥
'অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ'—মিথ্যা কথা।
আত্মাও গোচর হয় অন্তরের চোখ খুলে গেলে।
এর নাম অদৃশ্য দর্শন। প্রেমে হয় অসাধ্যসাধন।
খণ্ড, ছিন্ন, বিকৃত জগৎ—মুহূর্তে সুন্দর হয়
গোলাপের গন্ধ-সুষমায়।
বাহিরের চক্ষুকর্ণ সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র সীমানায়।
অন্তরের করণ-কারণে যবে ঘটে
বিচিত্র দর্শন, বহুরূপ এক হ'য়ে যায়
অতীন্দ্রিয় অনুভব বশে।
বহু নিয়ে খেলা শুধু অর্থহীন শক্তি অপচয়।
একের আনন্দরসে মত্ত যেই জন,
সেই জন জানে শুধু অপার্থিব প্রেমের স্বরূপ।
সেই এক আছে। তিনি ছাড়া আর কেহ নাই।
আছে এক মহ'তো মহীয়ান্। অন্য সব শূন্যগর্ভ।
"বহদ হু লা আল্লা ইল্লাহু।"

এই অবস্থায় ভাবোল্লাসের তন্ময়তায় শ্রীমতী রাধার হৃদয়ে কৃষ্ণ শুধু ধরা দিয়েছিলেন তাই নয়, প্রাপ্তির আনন্দে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রেম যেখানে জাগ্রত প্রহরী হ'য়ে থাকে, সেখান থেকে তাঁর পালাবার উপায় নেই।

'হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।' —গোবিন্দদাস।

অপর একটি তরজী'বন্দের সংক্ষিপ্ত অংশের পরিচয় অনুবাদের মধ্য দিয়ে দিতে চেষ্টা করি। সর্বদা স্মরণযোগ্য, হাতিফ সর্বধর্মের মূল অনুসন্ধান করেন এবং সেখানে কোন বিরোধ তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় না!—
গীর্জার ঘরে শুধাই তাহারে একথা বোঝাতে পার?
ঈশাই সেবিকা! তিনে মিলে এক মগজে ঢুকিবে কারো?

* পিতা ও পুত্র দেবদূত আর, তিন কভু এক হয়?
'গণিতের ভুল'—শাস্ত্র প্রমাণ, ভুল হ'য়ে সদা রয়।
বলে সখী হেসে, রসিক শেখর! একথা বোঝ না কেন?
প্রিয়তম মুখ দর্পণত্রয়ে বিম্বিত হয় যেন।
এমন সময় উপাসনা ঘরে ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে।
কানে কানে বলে তিনে এক হওয়া বিরোধ নেইকো মোটে
আছে এক শুধু, বহু ভুল কথা, শরিক তাহার নাই।
'লাশরিক' বাণী মনে মনে জানি, তবু কেন ভুলে যাই?

চন্দরভন্ বরহমন্

সম্রাট্ শাহ্‌জহানের জ্যেষ্ঠপুত্র 'দারাশিকোহ্'—ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। দুই মহাসমুদ্রের পবিত্র সঙ্গমের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমানের মহামিলনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। ঔরঙ্গজে.বের নিষ্ঠুর বিচার সে স্বপ্ন সার্থক হতে দেয়নি। দারাশিকোহ্‌র অত্যন্ত প্রিয় বান্ধব এবং একান্ত সচিব ছিলেন—চন্দরভন্ বরহমন্। তিনি ব্রাহ্মণ এবং নাম ছিল চন্দ্রভানু। চন্দ্রভানু কবিতার মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রেছেন। রাজসভার ঐশ্বর্য এবং চঞ্চল বিলাসিতা তাঁর দার্শনিক হৃদয়কে আকর্ষণ করতে পারে নি। চিরচঞ্চলের মধ্যে চিরস্থির, কূটস্থ, অচল ধ্রুবকে উপলব্ধি করার আত্মিক শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন। এইজন্য বলা চলে চন্দ্রভানু ইন্দ্রিয়ের কবি নন, তিনি রহস্যবেত্তা এবং উপলব্ধিতে অতীন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা। তাঁর উপলব্ধি এসেছে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এইজন্য কবিতার বহুরূপের উপাসনা না ক'রে তিনি গ.জ.ল গানেই তন্ময় হতেন বেশি। একটি গ.জ.ল আমরা এই প্রসঙ্গে তাৎপর্য বিশ্লেষণ মুখে পাঠককে উপহার দিই।

---

* The Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God, and yet they are not three Gods but one God.—Athanasian Creed in the Book of Common Prayer.

ঈন্ হম আ'লম্ ফানীস্ত্, দর উ জিন্দহ্ য়কীস্ত্।
নক.শ্ বিসিয়ার বলী দীদহ্-ই-বীমিন্দহ্ য়কীস্ত্॥
দূ সি রূজ.ী বজহান্ জিলুহ্ কুনান্ বায়দ্ বুদ্।
নজ.দ্-ই-অরবাব-ই-খিরদ্ রফত্ বো আয়ন্দহ্ য়কীস্ত্॥
অ'য়ব্ কমগীর অগর অহল্-ই-খত.া বিসিয়ারন্দ্।
ঈন্ হম ক.াবিল্-ই-অ'ফু-অন্দ্ চূ বখশিন্দহ্ য়কীস্ত্॥
হর কি আমদ্ জ. জহান্ গুজ.রান্ খ্বাহ্দ রফত্।
বরহমন্ আন্ কি বুবদ্ বাক.ী বো পায়িন্দহ্ য়কীস্ত্॥

এই পৃথিবীতে নশ্বর সব চিরজীবী একজন;
বিস্তর ছবি আসে যায় হেথা এ কথা বুঝিও মন।
হারিয়ে যেওনা চিত্রমালায়, বুঝিও তত্ত্বসার,
দ্রষ্টা রূপেতে শুধু একজন, সব কথা জানা তাঁর।

তবে কি ওই চিত্রমালার ভোগে কোন বাধা আছে? তাও কিন্তু নয়। ইন্দ্রিয়ের তন্মাত্রগুলি বা ইন্দ্রিয়ার্থগুলির ভোগপ্রেরণা থেকেই তো ইন্দ্রিয়গ্রামের সৃষ্টি। আমরণ ভোগ করো, কিন্তু তত্ত্বটি ভুলো না।

দুচার দিনের জুলুস দুনিয়া, আনন্দে ভরে মন।
কেহ কি জানিবে কখন কাহার আসিবে বিদায় ক্ষণ?
এই পৃথিবীর জীবনে মরণে নাই কোন ভেদাভেদ,
মহাজীবনের মাল্য বাঁধনে পড়ে নাকো কোন ছেদ।

মৃত্যু কখনো জীবনের শেষ হতে পারে না। মৃত্যু নব জীবনের আঁধার তোরণ।

ভুলভ্রান্তিতে ভরা মানুষের অপরাধ বহু ঘটে।
শতগুণ ক'রে বাড়িয়ে ফেনিয়ে কুৎসা তাহার রটে॥
ক্ষমার যোগ্য মাটির মানুষ, এ কথা বুঝিও ভাই।
উর্ধ্বলোকের দয়াময় স্মরি এ কথাটি বলে যাই॥

ঈশ্বরে অনন্ত ক্ষমা। প্রেমময়ের প্রেমের শেষ নেই। জীবকে তিনি দুঃখ দিতে চান না; মানুষ আপন কর্ম-বিপাকে নিজ অদৃষ্ট তৈরী ক'রে

চলেছে। কোন মানুষই ঘৃণার যোগ্য নয়। তাদের উপাদান সেই অবিনশ্বর মহান্ থেকে। কর্মফলের বিচিত্রতায় তারা হ'য়ে দাঁড়ায় বিচিত্র।

যারা আসিয়াছে পৃথিবীর বুকে বিদায় তাদের ধ্রুব।
সেই নিয়মের বশীভূত ভানু, বিধির বিধান শুভ॥
চলিষ্ণু স্রোতে ভেসে যায় সবে, এক শুধু সনাতন।
সৃষ্টি-লয়ের শুভ ও অশুভ বুঝেও বোঝে না মন॥

আমি নিজেও এক বিচিত্র সৃষ্টি। নাম, রূপ, ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমি আলাদা; কিন্তু আমার আদি অন্তে এক রূপ, সেই বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের এক কণিকা আমি। শুধু বার বার বলছি—বৈচিত্র্যটা খেলা। লীলাময়ের লীলা মাত্র। ওতে চিরকাল ভুলে থেকো না।—

হর কেহ্ জররা রজ্‌দ বুবদ্।

যদি বুঝে থাকো, কণায় কণায় জ্বলছে আলো, ধোঁয়ার মূর্তি মিথ্যা সব। তবে তোমার ঠিক তত্ত্বটি অধিগত হ'লো।

তারণ মুন্সী

ইরানে ও ভারতে পার্সী সাহিত্যের পরিক্রমা সমাপ্ত করার পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একজন হিন্দু কবির পরিচয় দিতে চাই। দারাশিকোহ্‌র প্রিয়পাত্র, রাজকর্মচারী চন্দ্রভানু ব্রাহ্মণের কথা পূর্বেই ব'লেছি। তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের হিন্দু কবি। পার্সী ভাষার চর্চা ভারতে ইংরেজ অধিকারেও হীনবল হ'য়ে যায় নি। ইংরেজ অধিকারের পর ৮০ বছর পর্যন্ত পার্সী ছিল আইন আদালতের ভাষা। ভাষার মাধুর্যে এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধিতেই হোক অথবা রাজভাষার মর্যাদার নিমিত্তেই হোক, হিন্দু মুসলিম সমভাবে পার্সীর সেবা ক'রেছে এবং বহু হিন্দু পণ্ডিত এই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছে। এইবার উনিশ শতকের আর একটি ব্রাহ্মণ কবির পরিচয় দিই। এ র সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'তারণ মুন্সী' পুরো নাম 'রামতারণ মুখোপাধ্যায়'।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নদীয়া জেলায় রামতারণ জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁর অধ্যয়ন ছিল বহুমুখী এবং পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। আরবী ও পার্সী ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ও অধিকার ছিল সমভাবে। মুস্‌লিম শাস্ত্রের এমন দিক্ ছিল না, যা তাঁর অনধিগত ছিল। তারণ ছিলেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক। এটাও বিধাতার অভিপ্রেত নির্বন্ধ। রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম নামক অভিনব ধর্মের প্রবর্তক। তারণ ধর্মপ্রবর্তক নন; কিন্তু ধর্মবিষয়ে তাঁর অভিমত সে যুগে চমকপ্রদ ছিল। রামমোহন এবং রামতারণ উভয়েই আরবী পার্সীতে প্রগাঢ় পণ্ডিত। রামমোহনের অদ্বৈত-চিন্তায় উপনিষদ্ মূল প্রেরণা দিলেও ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ তাকে আহিতবল ক'রেছে। অন্তত পৌত্তলিকতা-বিরোধ সেইদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা বিবর্তবাদ চরাচরের কোন বস্তুকেই ব্রহ্মচক্র থেকে নিষ্কাশিত ক'রে দেয় না। আপাত জড়ের অন্তরালে চৈতন্য বেদান্তসূত্রে স্বীকৃত। মহর্ষি বাদরায়ণ 'অভিমানিব্যপদেশস্তু' সূত্রে তার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আচার্য শঙ্কর বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক'রে—সেই সূত্রবলে জড়ের অন্তর্লীন চৈতন্যস্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলাম এবং ব্রাহ্মধর্ম কদাচ এই সিদ্ধান্তের অনুরূপ নয়। অবশ্যই একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্ব রামমোহন যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন। তারণ মুন্‌শীর চিন্তাধারা সূফীমতের দ্বারা দৃঢ়ভাবে বলয়িত। এইজন্য অনুষ্ঠান-নির্ভর কোন ধর্মই তিনি মানতে চান নি। মুন্‌শীর মুখের কথাতেই বলি—আমি হিন্দুর ধর্ম দিয়েই বা কি করব? মুসলিম শাস্ত্রও বা আমার কতটুকু কাজে লাগবে? উভয় দিকের পুরোহিতরাই আমার কাছে পুরণো হ'য়ে গিয়েছে। ওরা শুধু ওদের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে মেতে আছে। প্রেমই আসল ধর্মবীজ। এই বীজ ঠিকভাবে মনের জমিনে পড়লে তা থেকে মহামহীরুহ হ'তে পারে। তারণ বলছেন

'অজ. কফ্‌র্ দীন-ই-মা রো মুসলিমান্ চিকার-ই-মাস্ত্?'

আমাদের কাফেরের ধর্মই বল, আর মুসলমানদের কথাই বল, ওসব দিয়ে আমাদের কি কাজ আছে? তারণ, তুমি ওইসব পুরণো বচন আর পুরণো পথের ধারে কাছেও যেও না।—

তারন্ চুনীন্ কলাম্ বো রাহ্-ই-কুহন্ কোময়য়াব্।

তারণের কথা শুনে বিংশ শতাব্দীর কবি ও দার্শনিক ইকবালের কথা মনে হয়। অনুষ্ঠান-সর্বস্ব পূজামণ্ডপের গোঁড়া ব্রাহ্মণদের তিনি বলেছিলেন—

'সচ্ কহদুঁ আয়্ বেরামহন্ গর তু বুরা ন মানে।
তেরে সনম কদোঁ-কে বুত্ হো গয়ে পুরানে।'
ব্রাহ্মণ, তুমি খারাপ ভেবো না সত্য কথাটা বলি।
উপাসনা ঘরে তোমার দেবতা বুড়ো হ'য়ে গেল চলি॥

আমারো এক দেবতা আছে। শুনবে সে কথা? তবে শোন—

'পত্থর কী মূর্তো মেঁ সমঝা হ্যায়্ তু খোদা হ্যায়।
খাক রতন্ কা মুঝকো হর জর্রা দেবতা হ্যায়॥'
পাথর পূজিয়া মনে করিয়াছ দেবতা তোমার আছে।
আমার দেশের প্রতি ধূলিকণা দেবতা আমার কাছে॥

তারণ মুন্‌শী সূফী সাধক। তিনি বিশেষ কোন ধর্মকে নিন্দা করেন না। তিনি স্বদেশ প্রেমের কোন উদাত্ত বাণীও আমাদের শোনান নি। তিনি বুঝেছিলেন, অন্তরের আসন মার্জিত ক'রে ঈশ্বরকে বসাতে হবে। মনের মুকুর অপরিচ্ছন্ন থাকলে তাতে ভগবানের ছায়া কদাচ পড়ে না। মরচে-ধরা আয়নায় তাঁর ছায়া না পড়ে, পড়ে পুতুলের প্রতিবিম্ব।

আ'য়নাহ্ স.াফ কুন কি ববীনী-জমাল-ই-দূস্ত্।
জংগ.ার গিরিফ্‌ত্ নবীনী বজুজ. সুফাল্॥

যদি বন্ধুর সৌন্দর্য দেখতে চাও, তবে আয়নাটা সাফ করো। যদি এতে মর্চে ধরে থাকে তবে মাটির পুতুল ছাড়া কিছু দেখবে না।

পরিক্রমায় আলোচিত গ্রন্থ-পঞ্জী

Encyclopaedia Britannica.

Encyclopaedia Americana.

Newnes Popular Encyclopaedia.

বিশ্বকোষ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু।

বিশ্বকোষ—(সাক্ষরতা প্রকাশন)।

Persian English Dictionary—F. Steingass.

A Dictionary of Indian History—S. Bhattacharyya.

A Literary History of Persia—E. G. Browne. 4 Volumes.

পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস—হরেন্দ্রচন্দ্র পাল।

Atharvan Jarathus'tra—J. M. Chatterjee.

পারস্য যাত্রী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Essays on Pahlavī—Martin Haugh.

Language and Religion of Persia—Martin Haugh.

Elements of the Science of Languge—T. S Taraporewala. (3rd Edition)

History of Persia—Sykes.

Indo Aryan and Hindi—Sunitikumar Chatterji.

History of Aurangzeb (5 Volumes)—Sir Jadunath Sarkar.

History of Persia. 2 Vols. (1815).—Sir John Malcolm

History of the World—Plantagenet Somerset Fry.

The Outline of History—H. G. Wells.

The Achievements of Archaeology—E. A. Gardener.
(An Essay in "An Outline of Modern History)

The Decline and Fall of the Roman empire—Gibbon.

Lost Cities—Leonard Cottrel.
The Riddle of the Universe—Earnst Hackel.
The Martyrdom of Man—Windwood Reade.
History of Greece—John Bagnell Bury.
History of Greece—Edmonds.
Oxford History of India—Vincent Smith.
Great men of India—Edited by L. F. Rushbrook Williams.
The Campaigns of Alexander (Penguin Series).
The Persian Boy—Mary Renault.
Plutarch's lives of Alexander and Caesar.
The Fall of the Safavī Dynasty and the Afghan Occupation of Persia—L. Lockart.
Nadir Shah—L. Lockart.
History of Afghanistan—Col. G. B. Malleson.
History of Nadir Shah—James Frazer.
The Pathans 550 B. C.—1957 A. D.—Olaf Caroe.
Indo-Persian Relations—Riazul Islam.
Malfuzat-i-Taimuri—Elliot and Dowson III.
Encyclopaedia of Philosophy and Religion.
History of the Moghuls of Central Asia—N. Elias and E. D. Ross.
Tarikh-i-Jahangusha—E J. Gibb (Memorial Series).
History of the Mongols—Sir Henry Howorth.
The Holy Quran.
The Holy Bible.
Rigveda—Edited by Max Muller.
'লোকরাজ'—Special issue for হজ.রত আমীর খুসরো Nov 1, 1955.
Islam in Bengal 13th-19th Century—Jagadish N. Sarkar.
Cultural Heritage of Kashmir—S. C. Banerjee.

বাংলাদেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার।
A History of English Literature—Legous and Cazamian.
A History of English Literature—A. C. Rickett.
Sohrab and Rustam—Matthew Arnold.
অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসন পদ্ধতির স্বরূপ—জগদীশনারায়ণ সরকার।
Amir Khusrau and the Art of War in Medieval India—Jagadishnarayan Sarkar.
A Layman's Homage to Avicenna. (Indo-Iranica—Special issue Sept.-Dec. 1951)—An essay by J. N. Sarkar.
বেদের পরিচয়—যোগীরাজ বসু।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—প্রমথ তর্কভূষণ সম্পাদিত।
উপনিষদ্—উদ্বোধন সম্পাদিত।
সূফীমত ও বেদান্ত—রমা চৌধুরী।
সূফীমতের উৎস সন্ধানে—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য।
বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
Attar—Sunitikumar Chatterji.
The way of the Sufi—Idres Shah.
বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ—আচার্য রামানুজ দাস।
অণুভাষ্য—আচার্য বল্লভ।
সাংখ্যদর্শনম্—সঙ্কলক পঞ্চানন তর্করত্ন।
Tantrik Texts ষট্চক্রনিরূপণম্ ও পাদুকা পঞ্চক—Arthur Avalon.
বৈষ্ণব পদাবলী—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ—ডক্টর বিমল রায়।
ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—উৎপলা গোস্বামী।
Atlas (Reader's Digest edition).
পাতঞ্জল যোগদর্শন—শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ-আরণ্য।
Speakability and Unspeakability—R. P. Pandey.
An essay in "Philosophica"—K. C. Bhattacharyya Centennial issue.

Poetry in Mughal Court—Md. Hassan Hadi.

Rubayyat of Omar Khayyam—Fitzgerald.

Omar Khayyam—J. Arberry.

The Nectar of Grace—শ্রীস্বামী গোবিন্দতীর্থ।

Omar Khayyam—Robert Graves and Omar Ali Shah.

শাহ্‌ জহাঁনামা—ভগবান দাস।

Majma ’ul Bah.rain Text and Translation—By Prince Dārā Shikoh. Edition by—M. Mahafuz-ul-Haq.

নির্দেশিকা

খ

গ

ব. বি./পারস্ত সাহিত্য/৫৬-২২

ঘ

চ

জ

ঝ

ট

ত

দ

ন

স

হ

